মার্কস এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

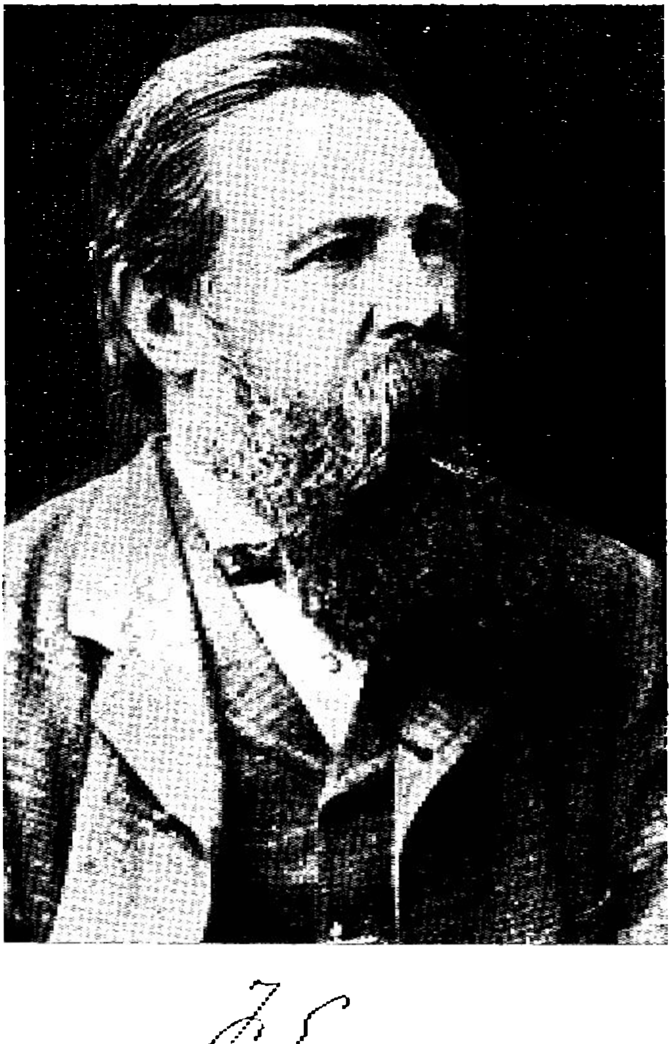
ভলিউম-১

খণ্ড -১, ২, ৩

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো



Karl Marx



কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড
১

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো · ১৯৭৯

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том I

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}672}{014(01)\text{-}79}$ 737-79 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ (১)

১

ফয়েরবাখের বস্তুবাদ সমেত পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের প্রধান দোষ এই যে, তাতে বস্তুকে [Gegenstand], বাস্তবতাকে, সংবেদ্যতাকে কেবল **বিষয়** [Objekt] রূপে বা **ধ্যান** রূপে ধরা হয়েছে, **মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া** হিসেবে, **ব্যবহারিক কর্ম** হিসেবে দেখা হয় নি, বিষয়ীগতভাবে [subjectively] দেখা হয় নি। ফলে বস্তুবাদের বিপরীতে **সক্রিয়** দিকটি বিকশিত হয়েছে ভাববাদ দিয়ে, কিন্তু তা কেবল বিমূর্তভাবে, কেননা ভাববাদ অবশ্য সংবেদনগত ক্রিয়া ঠিক যা সেইভাবে সেটাকে জানে না। ফয়েরবাখ চান সংবেদনগত বিষয়কে চিন্তাগত বিষয় থেকে সত্যই পৃথক করতে, কিন্তু খোদ মানবিক ক্রিয়াটাকে তিনি **বিষয়গত** [gegenständliche] ক্রিয়া হিসেবে ধরেন না। অতএব, 'খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম' গ্রন্থে তিনি তাত্ত্বিক ধারণাকেই একমাত্র খাঁটি মানবিক ধারণা বলে গ্রহণ করেন; অপরপক্ষে ব্যবহারিক কর্মকে তিনি তার নোংরা-দোকানদারী চেহারায় কল্পনা করেন এবং সেইভাবেই সেটাকে স্থিরবদ্ধ করে রাখেন। তাই 'বৈপ্লবিক', 'ব্যবহারিক-পরীক্ষামূলক' ক্রিয়ার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন না।

২

মানব চিন্তার বিষয়গত সত্য আছে কিনা, এ প্রশ্ন তত্ত্বগত নয়, **ব্যবহারিক**। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ বাস্তবতা আর শক্তিকে, ইহমুখিতাকে প্রমাণ করতে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তার বাস্তবতা বা অবাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক নিছক **পাণ্ডিতী** প্রশ্ন।

মানুষ পরিবেশ এবং পরিপালনের ফল, অতএব পরিবর্তিত মানুষ হল অন্য পরিবেশ এবং পরিবর্তিত পরিপালনেরই ফল, এই বস্তুবাদী মতবাদ ভুলে যায় যে, মানুষই পরিবেশকে পরিবর্তিত করে, এবং স্বয়ং পরিপালককেই পরিপালন করা প্রয়োজন। অতএব, এই মতবাদ অনিবার্যভাবেই সমাজকে দুই অংশে ভাগ করে, তার মধ্যে একাংশ সমাজের ঊর্ধ্বে (যথা, রবার্ট ওয়েনের ক্ষেত্রে)।

পরিবেশের পরিবর্তন এবং মানব ক্রিয়ার পরিবর্তনের মধ্যে মিলটাকে ধারণা করা এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা সম্ভব একমাত্র **বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধক ব্যবহারিক কর্ম** হিসেবে।

৪

ফয়েরবাখ শুরু করেন ধর্মমূলক আত্ম-অন্যীভবন — জগৎকে একটা ধর্মীয় কল্পিত জগৎ এবং একটা বাস্তব জগৎ রূপে দ্বিগুণিত করার ঘটনাটা থেকে। ধর্মীয় জগৎকে সেটার ঐহলৌকিক ভিত্তিতে পর্যবসিত করাই তাঁর কাজ। তিনি এইটে উপেক্ষা করেন যে, উক্ত কার্য সমাধার পর প্রধানতম কাজটিই বাকি থেকে যায়; কেননা, ঐহলৌকিক ভিত্তিটি যে নিজের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল এই ঐহলৌকিক ভিত্তিটিরই স্ববিভাগ এবং স্ববিরোধ। অতএব, শেষোক্তটাকে প্রথমে তার স্ববিরোধের দিক থেকে বুঝতে হবে, তারপর এই বিরোধ দূর করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ফলে, যেমন ধরা যাক, ঐশ পরিবারের রহস্য হিসেবে পার্থিব পরিবার আবিষ্কৃত হয়ে গেলেই, পার্থিব পরিবারটিকেই তত্ত্বগতভাবে সমালোচনা করা এবং সেটার ব্যবহারিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান প্রয়োজন।

৫

বিমূর্ত চিন্তায় অতৃপ্ত হয়ে ফয়েরবাখ **সংবেদনগত ধ্যানের** দ্বারস্থ হন, কিন্তু সংবেদ্যতাকে তিনি **ব্যবহারিক,** মানবিক-সংবেদনগত ক্রিয়া রূপে দেখেন না।

৬

ধর্মীয় সারমর্মকে ফয়েরবাখ **মানবীয়** সারমর্মে পর্যবসিত করেন। কিন্তু মানবীয় সারমর্ম এমন একটা বিমূর্তায়ন নয় যা প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নিহিত। বাস্তবে সেটা হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের যোগফল।

এই আসল সারমর্মের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন নি বলেই ফয়েরবাখ বাধ্য হন:

১) ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মীয় অনুভূতিকে [Gemüt] আপনাতে একটা কিছু হিসেবে স্থিরবদ্ধ করে তুলতে এবং একটা বিমূর্ত — **বিচ্ছিন্ন** — ব্যক্তি-মানুষকে ধরে নিতে।

২) তাই মানবিক সারমর্মকে তাঁর পক্ষে কেবল একটা 'গণ' ['genus'] হিসেবে, একটি অভ্যন্তরীণ মূক সাধারণ গণ হিসেবে গ্রহণ করাই সম্ভব, যা বহু ব্যক্তি-মানুষকে মেলায় কেবল **স্বাভাবিকভাবে।**

৭

তাই ফয়েরবাখ দেখতে পান না যে, 'ধর্মীয় অনুভূতি' নিজেই একটা **সামাজিক ফল** এবং যে বিমূর্ত ব্যক্তিটির বিশ্লেষণ তিনি করেন সেও প্রকৃতপক্ষে কোন একটা নির্দিষ্ট রূপের সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

৮

সামাজিক জীবন মূলতই **ব্যবহারিক।** যেসব রহস্য তত্ত্বকে বিপথচালিত করে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয়বাদে, সেই সমস্ত রহস্যেরই যুক্তিসিদ্ধ সমাধান

পাওয়া যায় মানবিক ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে এবং সেটা উপলব্ধি করার মধ্যে।

৯

মননসর্বস্ব বস্তুবাদ, অর্থাৎ যে বস্তুবাদ সংবেদ্যতাকে ব্যবহারিক কর্ম হিসেবে বোঝে না, সেটার অর্জিত **সর্বোচ্চ** শিখর হল 'নাগরিক **সমাজের**' পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে ধ্যান।

১০

পুরন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল **'নাগরিক'** সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল **মানব**-সমাজ বা সমাজীকৃত মানবজাতি।

১১

দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে **ব্যাখ্যা করেছেন,** কিন্তু আসল কথা হল সেটাকে **পরিবর্তিত করা।**

১৮৪৫ সালের বসন্তকালে মার্কসের লেখা

১৮৮৮ সালে এঙ্গেলসের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণে পরিশিষ্ট হিসেবে প্রথম প্রকাশিত

কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফয়েরবাখ। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ

('জার্মান ভাবাদর্শ'-এর ১ম পরিচ্ছেদ) (২)

১

[১ বিভাগ] জার্মান ভাবাদর্শবিদদের কাছ থেকে আমরা যা শুনছি, গত কয়েক বছরে জার্মানি চলেছে একটা তুলনাহীন বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। স্ট্রাউস (৩) থেকে যা শুরু হয়, হেগেলীয় দর্শনের সেই বিয়োজন একটা সর্বব্যাপী গাজনে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে পাতিত হয়েছে সমস্ত 'অতীতের শক্তি'। সার্ব বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিভিন্ন পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু সেগুলির পতনই হয়েছে অবিলম্বে ; ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বীরপুরুষ, কিন্তু আরও দুঃসাহসী এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে তারা নিক্ষিপ্তই হয়েছে তমসাচ্ছন্নতার মাঝে। এটা ছিল এমন বিপ্লব যার পাশে ফরাসী বিপ্লব (৪) একটা ছেলে-খেলা, এটা এমন একটা বিশ্ব-সংগ্রাম যার পাশে দিয়াদোচিদের (৫) সংগ্রামগুলো তুচ্ছ প্রতীয়মান হয়। অশ্রুতপূর্ব দ্রুত পরস্পরকে উচ্ছেদ করেছে বিভিন্ন নীতি, পরস্পরকে পরাস্ত করেছে বিভিন্ন মনন-বীর, আর ১৮৪২—১৮৪৫ সালের তিন বছরে জার্মানিতে অতীতের বস্তু ঝেঁটিয়ে দূর হয়েছে অন্যান্য সময়ে তিন শতাব্দীতে যা হয় তার চেয়ে বেশি।

ধরে নিতে হবে এই সবকিছু ঘটেছে নাকি বিশুদ্ধ চিন্তনের রাজ্যে।

যে-ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা নিশ্চয়ই কৌতূহলজনক : পরম ভাবের শটন। সেটার প্রাণের শেষ ঝলকগুলো যখন নিবে গিয়েছিল তখন এই caput mortuum*-এর বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানের বিয়োজন শুরু হয়েছিল,

---

* আক্ষরিক অর্থে: মরা মাথা; পাতনের পরে পড়ে থাকা অবশেষের জন্যে অভিধাটা ব্যবহৃত হয়; এখানে — অবশিষ্টাংশ, অবশেষ। — সম্পাঃ

সেগুলি নতুন নতুন সমবায়ের অংশভুক্ত হয়েছিল এবং সেগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন পদার্থ। দর্শনের শিল্পপতিরা, যাদের তখন অবধি চলছিল পরম ভাব শোষণের উপর, তারা তখন নতুন সমবায়গুলোকে হস্তগত করেছিল। প্রত্যেকে সম্ভাব্য সমগ্র উৎসাহভরে খুচরো বিক্রি করতে লেগেছিল নিজ ভাগে পাওয়া অংশটাকে। এর ফলে স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল প্রতিযোগিতা, সেটা শুরুতে চালান হয়েছিল মোটামুটি রাশভারী বুর্জোয়া চালে। পরে, জার্মান বাজারে যোগান যখন অত্যধিক হয়ে গেল, এবং সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পণ্যটা বিশ্ব-বাজারে কোন সাড়া পেল না, তখন জাল আর ভুয়ো উৎপাদ, উৎকর্ষের অবনতি, কাঁচামালে ভেজাল, লেবেলের মিথ্যাকরণ, ভুয়ো ক্রয়, বিল্-এর দালালি এবং কোন প্রকৃত ভিত্তি ছাড়া ক্রেডিট ব্যবস্থার ফলে কারবারটা মাটি হয়ে গিয়েছিল সচরাচরের জার্মান ধরনে। প্রতিযোগিতাটা পরিণত হয়েছিল উগ্র লড়াইয়ে, যেটাকে এখন পৃথিবীজোড়া তাৎপর্যসম্পন্ন বিপ্লব, অতি বিস্ময়কর ফল আর সাধনসাফল্যের পয়দাকারী বলে উচ্চ প্রশংসা এবং ব্যাখ্যা করা হচ্ছে আমাদের কাছে।

এই যে দার্শনিক ভন্ডামি এমনকি সৎ জার্মান নাগরিকদেরও অন্তরে জাতীয় গর্ববোধের আবেগ জাগিয়ে তোলে, এটার আসল মূল্য আমরা যদি হিসাব করতে চাই, আমরা যদি স্পষ্ট প্রকটিত করতে চাই সমগ্র নবীন-হেগেলীয় আন্দোলনের তুচ্ছতাটাকে, চিন্তার সংকীর্ণতাটাকে এবং বিশেষত নিজেদের সাধনসাফল্য সম্বন্ধে এইসব বীরপুরুষের বিভ্রান্তি এবং খোদ প্রকৃত সাধনসাফল্যের মধ্যকার ট্র্যাজিকমিক বৈসাদৃশ্যটাকে, তাহলে সমগ্র দৃশ্যটার উপর আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে জার্মানির সীমান্ত পেরিয়ে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে।*

---

* [প্রথম আকারের পরিচ্ছন্ন কপিতে এই জায়গায় নিম্নলিখিত অংশটা কেটে দেওয়া আছে:]

[২ পৃঃ] কাজেই এই আন্দোলনের পৃথক পৃথক প্রতিনিধিদের বিশেষ, নির্দিষ্ট সমালোচনার ভূমিকাস্বরূপ আমরা অল্প কয়েকটা সাধারণ মন্তব্য করছি, তাতে তাঁদের সবার পক্ষে অভিন্ন ভাবাদর্শগত সিদ্ধান্তসূত্র [premise] বিশদ করা হচ্ছে। পরবর্তী পৃথক পৃথক সমালোচনাগুলির বুঝ-সমঝ আর প্রেষণার জন্যে যতখানি আবশ্যক সেই পরিমাণে আমাদের সমালোচনার দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করতে এই মন্তব্যগুলি যথেষ্ট হবে।

[১।] সাধারণভাবে ভাবাদর্শ, বিশেষভাবে জার্মান ভাবাদর্শ

[২ বিভাগ] একেবারে সেটার সর্বসাম্প্রতিক প্রচেষ্টা অবধি জার্মান সমালোচনা কখনও দর্শনের রাজ্য ছাড়ে নি। এটার সাধারণ দার্শনিক সিদ্ধান্তসূত্রগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা দূরের কথা, এর সমগ্র জিজ্ঞাসা-সমষ্টি প্রকৃতপক্ষে উদ্ভূত হয়েছে একটা নির্দিষ্ট দর্শনতন্ত্রের জমিন থেকে — সেটা হেগেলের। তাদের উত্তরগুলিতেই শুধু নয়, তাদের একেবারে প্রশ্নগুলিতেই ছিল একটা দুর্জ্ঞেয়করণের উপাদান। হেগেলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন বলে এই আধুনিক সমালোচকদের প্রত্যেকেই যত জোর গলায় বলুন না কেন, তাঁদের একজনও হেগেলীয় তন্ত্রের একটা সর্বাত্মক সমালোচনার এমনকি চেষ্টাও করেন নি, তার কারণ হল হেগেলের উপর এই নির্ভর। হেগেলের বিরুদ্ধে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তাঁদের তর্কযুদ্ধটা গণ্ডিবদ্ধ এতে — প্রত্যেকে হেগেলীয় তন্ত্রের একটা দিক বেছে নিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ধরেন সমগ্র তন্ত্রটার বিরুদ্ধে এবং অন্যান্যের বেছে-নেওয়া দিকগুলোরও

এই মন্তব্যগুলিকে [৩ পৃঃ] আমরা উপস্থিত করছি বিশেষত **ফয়েরবাখ-এর** বিরুদ্ধে, কেননা তিনিই একমাত্র জন যিনি অন্তত কিছুটা অগ্রগতি করেছেন এবং যাঁর রচনাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে de bonne foi.

১। সাধারণভাবে ভাবাদর্শ এবং বিশেষভাবে জার্মান ভাবাদর্শ

ক। আমরা জানি একটিমাত্র বিজ্ঞান, ইতিহাস-বিজ্ঞান। ইতিহাসের দিকে দুটো দিক থেকে তাকিয়ে সেটাকে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসে ভাগ করা যায়। দিক-দুটো কিন্তু অবিচ্ছেদ্য; যতকাল মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে ততে প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস পরস্পরের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির ইতিহাস, যাকে বলা হয় প্রকৃতিবিজ্ঞান, সেটার সঙ্গে আমরা এখানে সংশ্লিষ্ট নই; কিন্তু মানুষের ইতিহাস নিয়ে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, যেহেতু প্রায় সমগ্র ভাবাদর্শ বলতে বোঝায় হয় এই ইতিহাসের একটা বিকৃত ব্যাখ্যা, নইলে এর থেকে একটা পরিপূর্ণ বিমূর্তন। ভাবাদর্শ নিজেই হল এই ইতিহাসের একটা দিক মাত্র।

[প্রথম আকারের পরিচ্ছন্ন কপিতে পরে একটা রচনাংশ রয়েছে, যেটাকে কেটে দেওয়া হয় নি, সেটা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার সিদ্ধান্তসূত্র সম্বন্ধে। এই পুস্তকখণ্ডে এই রচনাংশটাকে প্রধান (দ্বিতীয়) আকারের পরিচ্ছন্ন কপির বয়ানে ২য় বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হল (১৮-২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ]

বিরুদ্ধে। শুরুতে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন 'পদার্থ' আর 'আত্মচেতনার'* মতো বিশুদ্ধ না-মিথ্যাকৃত হেগেলীয় ধারণামৌল [category], পরে তাঁরা 'প্রজাতি,' 'সেই অদ্বিতীয়,' 'মানুষ',** ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত লোকায়ত অভিধা দিয়ে ঐসব ধারণামৌল অপবিত্র করেন।

স্ট্রাউস থেকে স্টির্নার অবধি জর্মান দার্শনিক সমালোচনার সমগ্র বিন্যাসটা **ধর্মীয়** ধারণাসমূহের*** সমালোচনায় গণ্ডিবদ্ধ। সমালোচকেরা শুরু করেছিলেন আসল ধর্ম এবং প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা থেকে। ধর্মীয় চেতনা এবং ধর্মীয় ধারণা বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা তাঁরা চলবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রকারে। তাঁদের অগ্রগতিটা ছিল এই যে, কর্তৃত্বশালী বলে কথিত আধিবিদ্যক, রাজনীতিক, আইনগত, নৈতিক এবং অন্যান্য ধারণাকে তাঁরা ধর্মীয় কিংবা ব্রহ্মবিদ্যাগত ধারণার শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন; আর তেমনি সেটা ছিল এই যে, তাঁরা রাজনীতিক, আইনগত, নৈতিক চেতনাকে ধর্মীয় কিংবা ব্রহ্মবিদ্যাগত বলে, এবং রাজনীতিক, আইনগত, নীতিগত মানুষকে — শেষ উপায় হিসেবে 'মানুষকে' — ধর্মনিষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মের আধিপত্যটাকে বাস্তব বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটা প্রাধান্যশালী সম্পর্ককে এক-একটা ধর্মীয় সম্পর্ক বলে ঘোষণা করে এক-একটা আচারতন্ত্রে পরিণত করা হয়েছিল — আইনের আচারতন্ত্র, রাষ্ট্রের আচারতন্ত্র, ইত্যাদি। চারদিকে প্রশ্নটা ছিল কেবল বিভিন্ন আপ্তবাক্য নিয়ে এবং বিভিন্ন আপ্তবাক্যে বিশ্বাস নিয়ে। জগৎটাকে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় পবিত্রীকৃত করতে করতে শেষে আমাদের ভেনারেব্‌ল সেন্ট মাক্স**** সেটাকে একযোগে মাহাত্ম্য প্রদান করে উঠতে এবং চূড়ান্তভাবে এটার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেন।

---

* ডাভিড স্ট্রাউস এবং ব্রুনো বাউয়েরের বুনিয়াদী ধারণামৌল। — সম্পাঃ

** লুডভিগ ফয়েরবাখ এবং মাক্স স্টির্নারের বুনিয়াদী ধারণামৌল। — সম্পাঃ

*** [নিম্নলিখিত রচনাংশ পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] ...যেটাকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে জগতের পরম ত্রাণকর্তা বলে দাবি করা হয়েছিল। ধর্মকে প্রধান শত্রু হিসেবে, এইসব দার্শনিকের পক্ষে বিতৃষ্ণাকর সমস্ত সম্পর্কের চূড়ান্ত কারণ বলে ক্রমাগত গণ্য করা এবং সেইভাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

**** মাক্স স্টির্নার। — সম্পাঃ

যেকোন জিনিসকে যেইমাত্র কোন হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যাঘটিত ধারণামৌলে পরিণত করা হত অমনি সাবেকী হেগেলপন্থীরা সেটাকে **উপলব্ধি করতেন।** নবীন হেগেলপন্থীরা যেকোন জিনিসে ধর্মীয় ধারণা আরোপ করে কিংবা সেটাকে ব্রহ্মবিদ্যাগত বিষয় বলে দিয়ে সেটার **সমালোচনা করেন।** ধর্মের, বিভিন্ন ধারণার, বিদ্যমান জগতে একটা সর্বব্যাপী মূলনীতির নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসের ব্যাপারে নবীন হেগেলপন্থীরা সাবেকী হেগেলপন্থীদের সঙ্গে একমত। শুধু, একপক্ষ এই রাজ্যটাকে আক্রমণ করে অন্যায়-দখল বলে, আর ন্যায়সম্মত বলে সেটার স্তুতিবাদ করে অপর পক্ষ।

যেহেতু নবীন হেগেলপন্থীরা বিভিন্ন ধারণা, চিন্তন, ভাবকে, প্রকৃতপক্ষে চেতনার সমস্ত উৎপাদকে — তাঁরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করেন যেগুলিতে — বিবেচনা করেন মানুষের আসল শৃঙ্খল বলে (ঠিক যেমন সাবেকী হেগেলপন্থীরা সেগুলিকে ঘোষণা করেছিলেন মানব-সমাজের আসল বন্ধনী বলে), তাই এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, নবীন হেগেলপন্থীদের লড়তে হবে কেবল চেতনার এইসব অধ্যাসের বিরুদ্ধে। যেহেতু, নবীন হেগেলপন্থীদের উদ্ভট কল্পনা অনুসারে, মনুষ্যগণের সম্পর্কগুলো, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, তাদের শৃঙ্খলগুলো এবং তাদের অসামর্থ্যগুলো তাদের চেতনার জাতফল, তাই তাঁরা মানুষের বর্তমান চেতনার বদলে মানবিক, বৈচারিক কিংবা অহমিকার চেতনা* লাভের এবং এইভাবে তাদের অসামর্থ্যগুলো দূর করার নৈতিক স্বীকার্য যৌক্তিক প্রণালীতে আরোপ করেন মানুষে। চেতনা বদলের এই দাবিটা হল বাস্তবতাকে অন্য উপায়ে ব্যাখ্যা করার, অর্থাৎ অন্য একটা ব্যাখ্যার সাহায্যে বাস্তবতাকে চেনার দাবির সমতুল। 'জগৎবিদারক' (৬) বলে কথিত তাঁদের চিন্তনগুলো সত্ত্বেও নবীন-হেগেলীয় ভাবাদর্শবিদেরা অতি কট্টর রক্ষণশীল। সর্বসাম্প্রতিক নবীন হেগেলপন্থীরা বলেছেন, তাঁরা লড়ছেন কেবল **'বিভিন্ন চিন্তনের'** বিরুদ্ধে — এতে তাঁরা পেয়েছেন নিজেদের ক্রিয়াকলাপের সঠিক বাচনটি। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, ঐসব চিন্তনের বিপরীতে তাঁরা নিজেরাই শুধু দাঁড় করাচ্ছেন অন্যান্য চিন্তন, আর এই জগতের নিছক চিন্তনগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে থেকে তাঁরা আসল বিদ্যমান জগৎটার

* লুডভিগ ফয়েরবাখ, ব্রুনো বাউয়ের এবং মাক্স স্টির্নার-এর কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

বিরুদ্ধে লড়ছেন না কোনক্রমেই। এই দার্শনিক সমালোচনা একমাত্র যে ফল লাভ করতে পেরেছে সেটা হল ধর্মীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টধর্মের অল্প কয়েকটা (তাও আবার একেবারেই একপেশে) বিশদীকরণ; এইসব গুরুত্বহীন বিশদীকরণে তাঁরা সর্বব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন আবিষ্কার করেছেন বলে যে-দাবি করেন তারই শুধু আরও অলঙ্করণ হল তাঁদের বাদবাকি যাবতীয় দৃঢ়োক্তি।

জার্মান বাস্তবতার সঙ্গে জার্মান দর্শনের সংযোগের ব্যাপারে, তাঁদের নিজেদের ভৌত পরিপার্শ্বের সঙ্গে তাঁদের সমালোচনার সম্পর্কের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার কথাটা এইসব দার্শনিকের কারও মনে পড়ে নি।*

[২ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার বিভিন্ন সিদ্ধান্তসূত্র]**

[৩ পৃঃ] যেসব সিদ্ধান্তসূত্র থেকে আমরা শুরু করছি সেগুলি খামখেয়ালী নয়, আপ্তবাক্য নয়, সেগুলি হল বাস্তব সিদ্ধান্তসূত্র, যার থেকে বিমূর্তন করা যেতে পারে কেবল কল্পনায়। সেগুলি হল বাস্তব ব্যক্তিগণ, তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং তারা জীবনযাপন করে যে বৈষয়িক পরিবেশে, যে-পরিবেশ তারা পায় ইতঃপূর্বে বিদ্যমান, আর যে-পরিবেশ তারা পয়দা করে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে, উভয়ই। এইভাবে, এইসব সিদ্ধান্তসূত্র [৪ পৃঃ] যাচাই করা যেতে পারে নিছক প্রায়োগিক উপায়ে।

সমগ্র মানব-ইতিহাসের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্র নিশ্চয়ই জীবন্ত ব্যক্তি মনুষ্যগণের অস্তিত্ব।*** এইভাবে, প্রথম যে-তথ্যটা প্রতিপাদন করতে হবে সেটা

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান আকারের পাণ্ডুলিপিতে এর পরে পৃষ্ঠাটার বাদবাকি অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। তার পরের পৃষ্ঠায় যে-বয়ান আছে সেটাকে এই খণ্ডে ছাপা হল ৩ বিভাগ হিসেবে। — সম্পাঃ

** এই বিভাগটার বয়ান নেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন কপির প্রথম আকার থেকে। — সম্পাঃ

*** [পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত রচনাংশটা কেটে দেওয়া আছে:] এসব ব্যক্তিকে প্রাণী থেকে যা পৃথক করে ফেলে তাদের সেই প্রথম **ঐতিহাসিক** কৃতি এই নয় যে, তারা চিন্তা করে, সেটা এই যে, তারা **তাদের জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করতে শুরু করে।**

হল এইসব ব্যক্তির ভৌত সংগঠন এবং বাদবাকি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অনুবর্তী সম্পর্ক। আমরা অবশ্য এখানে মানুষের প্রকৃত ভৌত প্রকৃতি কিংবা মানুষ যে-প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হয় — ভূতাত্ত্বিক, পর্বত-জলভাগ সংক্রান্ত, জলবায়ুঘটিত, ইত্যাদি — এর কোনটা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হতে পারি নে।* ইতিহাস লিখন সবসময়েই শুরু হওয়া চাই এইসব প্রাকৃতিক বনিয়াদ এবং মানুষের কার্যকরণের ফলে ইতিহাসের ধারায় সেগুলির পরিবর্তিত অবস্থা থেকে।

প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করে দেখা যেতে পারে চেতনা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে কিংবা ইচ্ছামতো অন্য যেকোন কিছু দিয়ে। তারা নিজেরা প্রাণী থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখতে শুরু করে যেইমাত্র তারা তাদের জীবনধারণের উপকরণ **উৎপাদন করতে** শুরু করে — যে-পদক্ষেপটা নির্ধারিত হয় তাদের ভৌত সংগঠন দিয়ে। জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ক'রে মানুষ পরোক্ষে উৎপন্ন করছে তাদের প্রকৃত বৈষয়িক জীবন।

মানুষ যে-উপায়ে তাদের জীবনধারণের উপকরণ উৎপন্ন করে সেটা সর্বপ্রথমে নির্ভর করে প্রকৃত যে জীবনধারণের উপকরণ তারা বিদ্যমান অবস্থায় পায় এবং যা তাদের পুনরুৎপাদন করতে হয় তার প্রকৃতির উপর।

[৫ পৃঃ] এই উৎপাদন-প্রণালীটাকে স্রেফ ব্যক্তির ভৌত অস্তিত্বের পুনরুৎপাদন বলে গণ্য করা চলবে না। এটা বরং এইসব ব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট রূপের সক্রিয়তা, তাদের জীবনের অভিব্যক্তির একটা নির্দিষ্ট রূপ, তাদের দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট **জীবনযাত্রার প্রণালী**। ব্যক্তিগণ যেভাবে জীবন অভিব্যক্ত করে, তারা তেমনই। কাজেই, তারা যা সেটা তাদের উৎপাদনের সঙ্গে মিলে যায় — তারা **কি উৎপাদন** করে, আর **কিভাবে** উৎপাদন করে উভয়ত। এইভাবে ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে তার উৎপাদনের নির্ধারক বৈষয়িক পরিবেশের উপর।

---

* [পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত রচনাংশটা কেটে দেওয়া আছে:] এইসব পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষের আদি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন, বিশেষত নৃকুলগত পার্থক্যই শুধু নয়, আরও নির্ভর করে বর্তমান কাল অবধি মানুষের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ কিংবা বিকাশের ঊনতা।

এই উৎপাদন দেখা দেয় শুধু **জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে**। সেটা বলতে আবার বোঝায় তার আগে ব্যক্তিগণের মধ্যে **পারস্পরিক সংসর্গ** [Verkehr] (৭)। এই সংসর্গের ধরনটাও আবার নির্ধারিত হয় উৎপাদন দিয়ে।*

[৩। উৎপাদন এবং সংসর্গ। শ্রমবিভাগ এবং মালিকানার বিভিন্ন আকার: গোষ্ঠীগত, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক]

[৩ বিভাগ] বিভিন্ন জাতির মধ্যকার সম্পর্ক নির্ভর করে তাদের প্রত্যেকটার উৎপাদন-শক্তি, শ্রমবিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সংসর্গ বিকাশের পরিসরের উপর। এই উক্তিটা সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এক-জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির সম্পর্কই শুধু নয়, খোদ জাতিটারই সমগ্র অভ্যন্তরীণ গঠনও নির্ভর করে সেটার উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ আর বহিস্থ সংসর্গের বিকাশ যে-পর্বে পৌঁছেছে তার উপর। কোন জাতির উৎপাদন-শক্তিসমূহ কতদূর বিকশিত সেটা সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকটিত হয় শ্রমবিভাগ যেখানে পৌঁছেছে তার মাত্রা দিয়ে। প্রত্যেকটা নতুন উৎপাদন-শক্তি, যে-পরিমাণে সেটা ইতঃপূর্বে জানা উৎপাদন-শক্তিসমূহের পরিমাণগত প্রসারমাত্র নয় (যেমন নতুন নতুন জমি আবাদ করা), শ্রমবিভাগের আরও বিকাশ ঘটায়।

কোন একটা জাতির অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ থেকে প্রথমে ঘটে কৃষি-শ্রম থেকে শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের শ্রমের বিচ্ছেদ, আর তার থেকে **শহর** আর **গ্রামাঞ্চলের** মধ্যে বিচ্ছেদ এবং এদের স্বার্থ-সংঘাত। সেটার আরও বিকাশের ফলে ঘটে শিল্প-শ্রম থেকে বাণিজ্য-শ্রমের বিচ্ছেদ। তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিভিন্ন শাখার ভিতরে শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমে সহযোগী ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিভাগ। এইসব পৃথক পৃথক বর্গের আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারিত হয় কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্যে প্রযুক্ত প্রণালী দিয়ে (গোষ্ঠীপতিতন্ত্র, দাসপ্রথা, বিভিন্ন সামাজিক বর্গ, বিভিন্ন

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রথম আকার এখানে শেষ। পরে এই খণ্ডে রয়েছে পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান আকারের বয়ান। — সম্পাঃ

শ্রেণী)। এইসব একই অবস্থা দেখা যায় (অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সংসর্গ থাকলে) বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

শ্রমবিভাগের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব হল মালিকানার ততগুলো ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র, অর্থাৎ শ্রমবিভাগের বিদ্যমান পর্বটা আরও নির্ধারণ করে শ্রমের মালমশলা, সাধিত্র এবং উৎপাদের প্রসঙ্গে ব্যক্তিগণের সম্পর্ক।

প্রথম আকারের মালিকানা হল গোষ্ঠীগত [Stammeigentum] মালিকানা (৮)। এটা উৎপাদনের অবিকশিত পর্বের প্রতিষঙ্গী, সেই পর্বে কোন লোকসমষ্টি জীবনধারণ করে শিকার করে আর মাছ ধরে, পশুপালন করে কিংবা, সর্বোচ্চ পর্বে, কৃষিকাজে। বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি থাকে, এটা বোঝায় শেষোক্ত ক্ষেত্রে। এই পর্বে শ্রমবিভাগ তখনও নিতান্ত প্রাথমিক, সেটা পরিবারে বিদ্যমান স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের আরও প্রসারে গণ্ডিবদ্ধ। কাজেই সামাজিক গঠনটা পরিবারের কিছু প্রসারে সীমাবদ্ধ; গোষ্ঠীগত পারিবারিক গোষ্ঠীপতিরা, তাদের নিচে গোষ্ঠীর সদস্যরা, শেষে দাসেরা। পরিবারে অন্তর্নিহিত দাসত্ব সম্প্রসারিত হয় শুধু ক্রমে ক্রমে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এবং যুদ্ধ আর বিনিময় উভয় রকমের বহিঃসম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় আকারটা হল প্রাচীন সম্প্রদায়গত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যেটা আসে বিশেষত চুক্তি কিংবা যুদ্ধজয়ের ফলে কয়েকটা গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে **নগরী** স্থাপন করা থেকে, তখনও সেটার সঙ্গে সঙ্গে থাকে দাসত্ব। সম্প্রদায়গত মালিকানার পাশাপাশি তখনই অস্থাবর এবং পরে স্থাবর ব্যক্তিগত সম্পত্তিও গড়ে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু সেটা সম্প্রদায়গত মালিকানার অধীন একটা অস্বাভাবিক আকার হিসেবে। নাগরিকেরা তাদের মেহনতী দাসদের উপর আয়ত্তি খাটায় কেবল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কাজেই একমাত্র এইজন্যেই তারা সম্প্রদায়গত আকারের মালিকানার সঙ্গে আবদ্ধ। তাদের দাসদের বিপরীতে, সক্রিয় নাগরিকদের এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত আকারের পরিমেলে থেকে যেতে বাধ্য করে সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগত মালিকানাই। এই কারণে, সম্প্রদায়গত মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজের সমগ্র গঠন এবং তার সঙ্গে লোকসমষ্টির ক্ষমতা বিশেষত যে-পরিমাণে ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তি গড়ে ওঠে সেই একই পরিমাণে ক্ষয়ে যায়। শ্রমবিভাগ ইতোমধ্যে

অপেক্ষাকৃত প্রসারিত। ইতোমধ্যে তখনই দেখা যায় শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ; পরে, যেসব রাষ্ট্র শহরের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ আর যেসব রাষ্ট্র গ্রামাঞ্চলের স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ সেগুলির মধ্যে বিরোধ, আর খাস শহরগুলিরই ভিতরে শিল্প এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের মধ্যে বিরোধ। নাগরিকদের এবং দাসদের মধ্যে শ্রেণীগত সম্পর্ক তখন পূর্ণবিকশিত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে প্রথম বার দেখতে পাই সেই একই পরিবেশ, যা আমরা আবার দেখতে পাব — শুধু অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে — আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে। একদিকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাহরণ, যা শুরু হয়েছিল বহু প্রাচীনকালে রোমে [লিসিনাসের ভূমি-আইন (৯) যার প্রমাণ] এবং দ্রুত এগিয়ে চলেছিল গৃহযুদ্ধগুলোর সময় থেকে এবং বিশেষত সম্রাটদের আমলে; অন্যদিকে, প্লিবিয়ান ছোট কৃষকদের প্রলেতারিয়েতে রূপান্তর, সেটা অবশ্য সম্পত্তিবান নাগরিক আর দাসদের মধ্যবর্তী অবস্থানের দরুন কখনও স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারে নি।

তৃতীয় আকারের মালিকানা হল সামন্ততান্ত্রিক বা সামাজিক-বর্গগত মালিকানা। যেক্ষেত্রে প্রাচীন কালের যাত্রা শুরু হয়েছিল **শহর** এবং তার ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে, মধ্যযুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল **গ্রামাঞ্চল** থেকে। এই ভিন্ন ভিন্ন যাত্রারম্ভস্থল নির্ধারিত হয়েছিল তখনকার জনসমষ্টির অনিবিড়তা দিয়ে, জনসমষ্টি তখন ছড়ান ছিল বিশাল এলাকায়, সেটা বিজেতাদের কাছ থেকে কোন বড়রকমের বৃদ্ধি লাভ করে নি। কাজেই, গ্রীস আর রোম থেকে খুবই ভিন্ন প্রকারে, সামন্ততান্ত্রিক বিকাশ শুরুতে থাকে ঢের বেশি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে, যেটার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় রোমক রাজ্যজয় এবং প্রথমে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষির প্রসার দিয়ে। ক্ষীয়মাণ রোম-সাম্রাজ্যের শেষের শতাব্দীগুলি এবং বিজাতীয়দের [barbarians] রোম-সাম্রাজ্য জয় কতকগুলো উৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট করেছিল; কৃষির অবনতি ঘটছিল, বাজারের অভাবে শিল্পের অধঃপাত ঘটছিল, বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা জোর করে বন্ধ করা হচ্ছিল, গ্রামীণ আর শহুরে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এইসব অবস্থা এবং সেগুলো দিয়ে নির্ধারিত রাজ্যজয়ের সংগঠন-প্রণালী থেকে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা গড়ে উঠেছিল জার্মানিক সামরিক সংবিধানের প্রভাবে। গোষ্ঠীগত এবং সম্প্রদায়গত

মালিকানার মতো এটার আবার ভিত্তি হল একটা সম্প্রদায়; কিন্তু এটার বিপরীতে স্থাপিত সরাসর উৎপাদক শ্রেণী নয় দাসেরা, যেমনটা ছিল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, সেটা হল ভূমিদাসে পরিণত করা ছোট কৃষককুল। সামন্ততন্ত্র যেইমাত্র পূর্ণবিকশিত হল, অমনি আরও দেখা দিল শহরের প্রতি বৈরিতা। ভূমি-মালিকানার স্তরবিভক্ত গঠন এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র অনুচরবর্গগুলো ভূমিদাসদের উপর অভিজাতকুলের আয়ত্তি যোগাল। প্রাচীন সম্প্রদায়গত মালিকানাটা যতখানি ঠিক সেই পরিমাণেই এই সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন হল একটা বশীভূত উৎপাদক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা পরিমেল; কিন্তু উৎপাদনের পৃথক পরিবেশের দরুন এটার পরিমেলের আকার এবং সরাসর উৎপাদকদের সঙ্গে সম্পর্ক অন্য রকম।

শহরগুলিতে, ভূমি-মালিকানার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্থানীয় হল নিগমবদ্ধ রূপের মালিকানা, বৃত্তিসমূহের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন। এতে সম্পত্তি হল [৪ বিভাগ] প্রধানত প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের শ্রম। সংগঠিত দস্যু-অভিজাতকুলের বিরুদ্ধে পরিমেলের আবশ্যকতা, যখন শিল্পপতি ছিল আবার ব্যাপারীও সেই যুগে সাধারণী রক্ষিত বাজারের প্রয়োজন, উঠতি শহরগুলিতে দলে-দলে চলে-আসা পলাতক ভূমিদাসদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, সমগ্র দেশের সামন্ততান্ত্রিক গঠন: এই সবকিছু **গিল্ডগুলির** উদ্ভব ঘটিয়েছিল। পৃথক পৃথক কারিগরদের ক্রমে-ক্রমে জমান ক্ষুদ্র পুঁজি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় তাদের সুস্থিত সংখ্যা থেকে উদ্ভূত হয় দিনমজুর [journeyman] আর শিক্ষানবিসের সম্পর্ক, যেটা শহরগুলিতে গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ স্তরবিভক্ত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়।

এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তির প্রধান আকার হল একদিকে ভূমি-সম্পত্তি আর তার সঙ্গে শৃঙ্খলিত ভূমিদাস-শ্রম, আর অন্যদিকে দিনমজুরদের শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্র পুঁজিওয়ালা ব্যক্তি-মানুষের শ্রম নিয়ে। উভয়ের সংগঠন নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদনের সীমাবদ্ধ পরিবেশ দিয়ে — ভূমিতে ক্ষুদ্রায়তনের এবং আদিম ধরনের চাষাবাদ, আর কারিগরি ধরনের শিল্প। সামন্ততন্ত্রের পরম শ্রীবৃদ্ধির সময়ে শ্রমবিভাগ ছিল যৎসামান্যই। প্রত্যেকটা দেশ নিজের মধ্যে ধারণ করত শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিরোধ; বিভিন্ন সামাজিক বর্গে বিভাগ অবশ্যই ছিল প্রবলভাবে লক্ষণীয়;

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রিন্স, অভিজাত, যাজক এবং কৃষকেরা, আর শহরগুলিতে মনিব, দিনমজুর, শিক্ষানবিস এবং অচিরেই আরও ঠিকা মজুরের ভিড় ছেড়ে দিলে গুরুত্বসম্পন্ন কোন শ্রমবিভাগ ঘটে নি। কৃষিতে সেটাতে কঠিন করে ফেলেছিল ফালি ফালি জমিতে চাষাবাদ, তার পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল কৃষকদের নিজেদেরই কুটিরশিল্প। শিল্পক্ষেত্রে, খাস পৃথক পৃথক বৃত্তিতে আদৌ কোন শ্রমবিভাগ ছিল না, আর সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে ছিল যৎসামান্যই। অপেক্ষাকৃত পুরন শহরগুলিতে শিল্প আর বাণিজ্যের বিচ্ছেদ আগে থেকেই বিদ্যমান পাওয়া গিয়েছিল; অপেক্ষাকৃত নতুন শহরগুলিতে সেটা গড়ে উঠেছিল শুধু পরে, যখন শহরগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

অপেক্ষাকৃত বড় বড় অঞ্চল একত্রে মিলিয়ে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য গড়াটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল ভূমিসম্পত্তিবান অভিজাতকুলের জন্যে, যেমন শহরগুলির জন্যে। শাসক শ্রেণী অভিজাতকুলের সংগঠনের শীর্ষে তাই সর্বত্রই ছিল একজন রাজা।*

[৪। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সারমর্ম। সামাজিক সত্তা এবং সামাজিক চেতনা]

[৫ বিভাগ] কাজেই প্রকৃত অবস্থাটা হল এই যে, কোন নির্দিষ্ট ধরনে উৎপাদনকরভাবে সক্রিয় বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ** নির্দিষ্ট সামাজিক আর রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণকে প্রত্যেকটা পৃথক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক উপায়ে, কিছু রহস্যাচ্ছন্ন না করে এবং কোন দূরকল্পনা

---

* পাণ্ডুলিপিতে এর পরে পৃষ্ঠাটার বাদবাকি অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় আরম্ভ হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সংক্ষিপ্তসার। চতুর্থ, বুর্জোয়া আকারের মালিকানা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ২-৪ বিভাগ পরিচ্ছেদের ৪র্থ ভাগে। — সম্পাঃ

** [মূল পাঠ:] বিভিন্ন নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের অধীন বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

ছাড়াই স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে সামাজিক আর রাজনীতিক গঠনের সংযোগটাকে। সামাজিক গঠন আর রাষ্ট্র ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জীবন-প্রক্রিয়ার ভিতর থেকে, কিন্তু সেইসব ব্যক্তি তাদের নিজেদের কিংবা অন্যান্য জনের কল্পনায় যেমনটা প্রতীয়মান হতে পারে তেমনসব ব্যক্তির নয়, তারা **বাস্তবিকই** যা তেমনটা, অর্থাৎ যেভাবে তারা সক্রিয় হয়, বৈষয়িকভাবে উৎপাদন করে, এবং তাই তাদের ইচ্ছা থেকে স্বতন্ত্র যেসব নির্দিষ্ট বৈষয়িক সীমাবদ্ধতা, পূর্বস্বীকার্য আর পরিবেশে তারা যেভাবে কাজ করে তেমনি সব ব্যক্তির।*

বিভিন্ন ভাবের, ধারণার, চেতনার পয়দা হওয়াটা প্রথমে সরাসরি বিজড়িত থাকে মানুষের বৈষয়িক সক্রিয়তা এবং বৈষয়িক সংসর্গের সঙ্গে, যেটা হল বাস্তব জীবনের ভাষা। মানুষের ধারণা করা, চিন্তন, মানসিক সংসর্গ এই পর্বে তাদের বৈষয়িক আচরণের সরাসর নিঃসরণ বলে প্রতীয়মান হয়। কোন লোকসমষ্টির রাজনীতি, আইন, নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা, ইত্যাদির ভাষায় যেমনটা প্রকাশ পায় সেই মানসিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ হল তাদের ধারণা, ভাব-ভাবনা, ইত্যাদির উৎপাদক — বাস্তব, সক্রিয় মানুষ, যেভাবে তারা রূপায়িত-অভ্যস্ত হয় তাদের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সুদূরবর্তী আকারগুলি অবধি সেগুলির প্রতিষঙ্গী সংসর্গের

---

* [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] এইসব ব্যক্তি যেসব ভাব-ভাবনা গড়ে তোলে সেগুলি হল হয় প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে, নইলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে, নইলে তাদের নিজেদের প্রকৃতি বিষয়ে ভাব-ভাবনা। এটা স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের ভাব-ভাবনা হল তাদের প্রকৃত সম্পর্ক আর ক্রিয়াকলাপের, তাদের উৎপাদন আর সংসর্গের এবং তাদের সামাজিক আর রাজনীতিক সংগঠনের সচেতন প্রকাশ — বাস্তব কিংবা অলীক। এর বিপরীত অঙ্গীকারটা সম্ভব একমাত্র যদি বাস্তব, বৈষয়িকভাবে অভিব্যক্ত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের মননের উপর ধরে নেওয়া হয় একটা অতিরিক্ত পৃথক মনন। এইসব ব্যক্তির বাস্তব সম্পর্কগুলির সচেতন অভিব্যক্তি যদি হয় অলীক, কল্পনায় তারা যদি উলটে-পালটে দেয় বাস্তবতাকে, তাহলে সেটা হল আবার তাদের সীমাবদ্ধ বৈষয়িক সক্রিয়তা-প্রণালীর এবং সেই থেকে উদ্ভূত তাদের সীমাবদ্ধ সামাজিক সম্পর্কের ফল।

একটা নির্দিষ্ট বিকাশ দিয়ে।* চেতনা কখনও সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া কিছু হতে পারে না, আর মানুষের অস্তিত্ব হল তাদের প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া। সমস্ত ভাবাদর্শে মানুষ এবং তাদের পরিবেশ যে ক্যামেরা অবস্কিউরায় যেমন সেইভাবে উলটে-পালটে প্রতীয়মান হয়, এই ব্যাপারটা দেখা দেয় ঠিক সেই পরিমাণে তাদের ইতিহাসক্রমিক জীবন-প্রক্রিয়া থেকে যে-পরিমাণে অক্ষিপটে বিভিন্ন বস্তু ওলটান অবস্থায় দেখা দেয় সেগুলির ভৌত জীবন-প্রক্রিয়া থেকে।

জার্মান দর্শন অবতরণ করে আকাশ থেকে মাটিতে, স্বর্গ থেকে মর্তে, তার সরাসর বিপরীতে এক্ষেত্রে আমরা আরোহণ করছি মাটি থেকে আকাশে, মর্ত থেকে স্বর্গে। অর্থাৎ কিনা, বাস্তব রক্ত-মাংসের মানুষে পেশছবার জন্যে আমরা মানুষ যা বলে, কল্পনা করে, ধারণা করে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করছি নে, কিংবা মানুষ সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা করা, ভাবা, কল্পনা করা, ধারণা করা হয় সেখান থেকেও না। আমরা যাত্রা শুরু করছি বাস্তব, সক্রিয় মানুষ থেকে, আর তাদের বাস্তব জীবন-প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে আমরা প্রদর্শন করছি বিভিন্ন ভাবাদর্শগত প্রতিবর্তের বিকাশ এবং এই জীবন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রতিধ্বনি। মানুষের মস্তিষ্কে গঠিত অপচ্ছায়াগুলিও অবশ্যই সেগুলির ভৌত জীবন-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত শোধিত রূপ, যে-জীবন-প্রক্রিয়াটার সত্যাখ্যান করা যায় প্রায়োগিক উপায়ে, যে-প্রক্রিয়াটা বিভিন্ন ভৌত সিদ্ধান্তসূত্রের সঙ্গে আবদ্ধ। এইভাবে নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিদ্যা, ভাবাদর্শের বাদবাকি সবটা এবং সেগুলির প্রতিষঙ্গী বিভিন্ন রূপের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের চেহারাটা আর বজায় থাকে না। সেগুলির নেই কোন ইতিহাস, নেই বিকাশ; কিন্তু মানুষ তাদের বৈষয়িক উৎপাদন আর তাদের বৈষয়িক সংসর্গ সম্প্রসারিত ক'রে বদলে ফেলে এটার সঙ্গে তাদের আসল অস্তিত্ব, তাদের চিন্তন এবং তাদের চিন্তনের উৎপাদ। জীবন চেতনা দিয়ে নির্ধারিত নয়, চেতনাই নির্ধারিত হয় জীবন দিয়ে। সমীপবর্তী হবার প্রথম প্রণালীতে যাত্রারম্ভস্থলটা হল জীবন্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত চেতনা; বাস্তব জীবনের সঙ্গে যেটা মেলে সেই দ্বিতীয় প্রণালীতে সেটা

* [মূল পাঠে:] মানুষ তাদের বিভিন্ন ধারণা, ভাব-ভাবনা, ইত্যাদি পয়দা করে, আর সেটা ঠিক এমন মানুষ যারা তাদের বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-প্রণালী, তাদের বৈষয়িক সংসর্গ এবং সামাজিক আর রাজনীতিক গঠনে সেটার আরও বিকাশ দিয়ে রূপায়িত-অভ্যস্ত।

হল বাস্তব জীবন্ত ব্যক্তিগণ নিজেরাই, আর চেতনা কেবল **তাদের** চেতনা বলে বিবেচিত।

সমীপবর্তী হবার এই প্রণালীটা সিদ্ধান্তসূত্রবিহীন নয়। এটা যাত্রারম্ভ করে বিভিন্ন বাস্তব সিদ্ধান্তসূত্র থেকে এবং মুহূর্তের জন্যেও সেগুলিকে ছাড়ে না। এটার সিদ্ধান্তসূত্র হল মানুষ, কোন উদ্ভট বিচ্ছিন্নতা আর ধরাবাঁধার মাঝে মানুষ নয়, নির্দিষ্ট পরিবেশের আওতায় তাদের প্রকৃত, প্রায়োগিক উপায়ে জ্ঞাতব্য বিকাশ-প্রক্রিয়ার মাঝে মানুষ। যেইমাত্র এই সক্রিয় জীবন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয় অমনি ইতিহাস আর নয় বিভিন্ন নিষ্প্রাণ তথ্যের সংগ্রহ, যা সেটা প্রয়োগবাদীদের কাছে যারা নিজেরা তখনও বিমূর্ত, কিংবা আর নয় ভাববাদীদের কাছে যেমন সেইভাবের কল্পিত বিষয়ীদের কল্পিত সক্রিয়তা।

যেখানে দূরকল্পনা শেষ হয় — বাস্তব জীবনে — সেখানে বাস্তব, প্রয়োগজ বিজ্ঞানের শুরু: মানুষের ব্যবহারিক সক্রিয়তার, বিকাশের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার প্রতিরূপায়ণ। চেতনা সম্বন্ধে ফাঁকা কথা ক্ষান্ত হয়, আর সেটার জায়গায় আসা চাই আদত জ্ঞান। বাস্তবতা চিত্রিত হলে জ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দর্শন তার অস্তিত্বের মাধ্যম খুইয়ে বসে। বড়জোর, সেটার জায়গা নিতে পারে শুধু সবচেয়ে সাধারণ ফলাফলের একটা সংক্ষিপ্তসার, যে-ফলাফল হল মানুষের ইতিহাসক্রমিক বিকাশ পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত বিমূর্তন। আদত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এইসব বিমূর্তনের আপনাতে একেবারে কোন মূল্যই নেই। সেগুলো শুধু ঐতিহাসিক মালমশলার বিন্যাস সহজ করে দেবার, সেটার পৃথক পৃথক স্তরের পারম্পর্য নির্দেশ করার উপযোগী হতে পারে। কিন্তু দর্শন যেমনটা করে সেইভাবে ইতিহাসের যুগগুলিকে পরিপাটি করে সাজাবার কোন ব্যবস্থাপত্র কিংবা ছক সেটা যোগাতে পারে না কোনক্রমেই। বরং তার উলটোটা, কোন অতীত যুগই হোক কিংবা বর্তমান যুগই হোক, সেটা সম্বন্ধে আমাদের ঐতিহাসিক মালমশলার পর্যবেক্ষণ আর বিন্যাস — প্রকৃত চিত্রণ — করতে আমরা যখন আরম্ভ করি তখনই শুরু হয় আমাদের দুষ্করতা। এইসব দুষ্করতা দূরীকরণ নিয়ন্ত্রিত হয় এমনসব সিদ্ধান্তসূত্র দিয়ে যেগুলিকে এখানে বিবৃত করা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু সেগুলিকে স্পষ্টপ্রতীয়মান করে তুলবে শুধু প্রত্যেকটা যুগের প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তি মনুষ্যগণের সক্রিয়তা

সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ। এইসব বিমূর্তনের কোন-কোনটাকে এখানে আমরা বেছে নেব, যেগুলিকে আমরা ব্যবহার করব ভাবাদর্শবিদদের থেকে বিষমবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, আর সেগুলিকে আমরা বিশদ করে তুলব বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে।*

২

[১। মানুষের আদত মুক্তির পরিবেশ]

[১] দর্শন, ব্রহ্মবিদ্যা, সারমর্ম এবং তাবৎ বাজে জিনিসকে 'আত্মচেতনায়' পর্যবসিত করে এবং এই যেসব বুলি মানুষকে কখনও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে নি সেগুলোর আধিপত্য থেকে তাকে মুক্ত করে 'মানুষের' 'মুক্তি' এক-পাও এগোয় না, এটা আমাদের বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে ব্যাখ্যা করে তাঁদের বিদিত করার কষ্টস্বীকার আমরা অবশ্য এখানে করব না।** এটাও তাঁদের কাছে আমরা ব্যাখ্যা করব না যে, আদত মুক্তি লাভ করা সম্ভব একমাত্র বাস্তব জগতে এবং বাস্তব উপায় প্রয়োগ করে, স্টিম-ইঞ্জিন এবং মিউল আর স্পিনিং-জেনি ছাড়া দাসপ্রথা লোপ করা যায় না, উন্নীত কৃষিকাজ ছাড়া লোপ করা যায় না ভূমিদাসপ্রথা, সাধারণভাবে আর লোকে যতকাল গুণে আর পরিমাণে যথেষ্ট মাত্রায় খাদ্য আর পানীয়, বাসস্থান আর পোশাক পেতে অপারক ততকাল তারা মুক্ত হতে পারে না। 'মুক্তি' একটা ঐতিহাসিক কৃতি, মানসিক কৃতি নয়, আর সেটা ঘটে ঐতিহাসিক পরিবেশ দিয়ে, শিল্প, বাণিজ্য, [কৃষি] কৃষ্টি, [সংসর্গের পরিবেশ]-এর [বিকাশ] দিয়ে*** [২] তার পরে,

* পরিচ্ছন্ন কপির প্রধান (দ্বিতীয়) পাঠ এখানে শেষ। এর পরে এই খণ্ডে রয়েছে মূল পাণ্ডুলিপির তিনটে ভাগ। — সম্পাঃ

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] দার্শনিক মুক্তি এবং আদত মুক্তি; মানুষ। অদ্বিতীয় জন। ব্যক্তি-মানুষ; ভূতাত্ত্বিক, জলভাগ-সংক্রান্ত, ইত্যাদি পরিবেশ। মানব-দেহ। চাহিদা এবং শ্রম।

*** এখানে পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গেছে: পাতাটার নিচের অংশ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে; বয়ানের একটা ছত্র নেই। — সম্পাঃ

সেগুলোর বিকাশের বিভিন্ন পর্ব অনুসারে, ধর্মীয় আর ব্রহ্মবিদ্যাগত বাজে জিনিস যেমন তেমনি সারমর্ম, বিষয়ী, আত্মচেতনা সংক্রান্ত বাজে জিনিসগুলো, আর পরে সেটা অপসারিত হয় আবার যখন সেগুলোর বিকাশ যথেষ্ট দূর এগিয়ে গেছে।* যে-দেশটায় ঘটছে শুধু একটা নগণ্য ঐতিহাসিক বিকাশ সেই জার্মানিতে এইসব মানসিক ঘটন, এইসব মহিমান্বিত করা আর অকার্যকর তুচ্ছ বস্তুগুলো স্বভাবতই ঐতিহাসিক বিকাশের ঊনতার বদলি হিসেবে কাজ দেয়, আর সেগুলো শিকড় গাড়ে, সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়া আবশ্যক। কিন্তু এই লড়াইটা স্থানীয় গুরুত্বসম্পন্ন।**

[২। ফয়েরবাখের পরিচিন্তনগত এবং সংগতিহীন বস্তুবাদের সমালোচনা]

[...]*** [৮] বাস্তবে এবং **কেজো** বস্তুবাদী অর্থাৎ **কমিউনিস্টদের** পক্ষে এটা হল বিদ্যমান জগৎটাকে আমূল পরিবর্তিত করার, বিদ্যমান অবস্থাগুলোকে কার্যক্ষেত্রে আক্রমণ করে বদলাবার প্রশ্ন। সময়ে-সময়ে আমরা যখন ফয়েরবাখের এমন অভিমত দেখতে পাই, সেটা কখনও বিচ্ছিন্ন আন্দাজের চেয়ে বেশি কিছু নয়, আর তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উপর সেটার প্রভাব এতই যৎসামান্য যাতে এখানে সেটা বিকাশের যোগ্য ভ্রূণ ছাড়া কিছু বলে গণ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ফয়েরবাখের 'ধারণা' একদিকে সে-সম্বন্ধে নিছক পরিচিন্তনে এবং অন্যদিকে নিছক অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ; 'বাস্তব ঐতিহাসিক মানুষ'-এর বদলে তিনি বলেন 'মানুষ'। 'মানুষ' হল আসলে 'জার্মানরা'। প্রথম ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে **পরিচিন্তনে**, তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবেই নেমে পড়েন এমনসব বস্তুর উপর যেগুলো তাঁর চেতনা আর অনুভূতির বিরুদ্ধে, যেগুলো তাঁর আগে থেকে ধরে নেওয়া সমন্বয়টাকে বিশৃঙ্খল করে দেয়, সেটা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত অংশের এবং বিশেষত মানুষ আর প্রকৃতির

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] বিভিন্ন উক্তি এবং বাস্তব বিচলন। জার্মানিতে উক্তিগুলোর গুরুত্ব।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ভাষা হল বাস্তবতার ভাষা।

*** পাণ্ডুলিপিতে এখানে পাঁচটা ছত্র নেই। — সম্পাঃ

সমন্বয়।* এই বিশৃঙ্খলাটাকে দূর করার জন্যে তাঁকে দ্বিগুণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকরণের শরণ নিতে হয়, একটা সাধারণ্য, তাতে প্রত্যক্ষ হয় শুধু যা 'একেবারেই স্পষ্টপ্রতীয়মান,' আর অন্যটা উচ্চতর, দার্শনিক, তাতে প্রত্যক্ষ হয় সবকিছুর 'আসল সারমর্ম'। তিনি এটা দেখতে পান না যে, তার চারদিককার জগৎটা কেমন সরাসর নিত্যকাল থেকে প্রদত্ত এমন বস্তু নয় যা চিরকাল একই থেকে যায়, সেটা হল শিল্প এবং সমাজের অবস্থা থেকে একটা উৎপাদ, আর বাস্তবিকই সেটা এই অর্থে যে, এটা ইতিহাসের উৎপাদ, সমগ্র পুরুষানুক্রমের সক্রিয়তার ফল, তার প্রত্যেকটা পুরুষপর্যায় পূর্ববর্তীটার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে তুলেছে তার শিল্প আর তার সংসর্গ, সমাজব্যবস্থার অদলবদল ঘটিয়েছে পরিবর্তিত প্রয়োজন অনুসারে। এমনকি সবচেয়ে সহজ-সরল 'ইন্দ্রিয়গত নিশ্চয়তা' আছে যেসব বস্তুর সেগুলিও তিনি পেয়েছেন কেবল সামাজিক বিকাশ, শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংসর্গের সাহায্যে। যা সুবিদিত, প্রায় সমস্ত ফলগাছের মতো, চেরিগাছ অল্প কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের মণ্ডলে পরিবাহিত হয়েছিল **বাণিজ্যের** দ্বারা, কাজেই কেবল [৯] একটা নির্দিষ্ট যুগে একটা নির্দিষ্ট সমাজের এই কৃতি **দ্বারা** সেটা ফয়েরবাখের পক্ষে একটা 'ইন্দ্রিয়গত নিশ্চয়তা' হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত বলি, যখন আমরা সবকিছুকে এইভাবে ধারণা করি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যা এবং যেভাবে ঘটেছিল, তখন প্রত্যেকটা প্রগাঢ় দার্শনিক সমস্যা একেবারে সহজ-সরলভাবেই একটা প্রয়োগজ তথ্যে রূপান্তরিত হয়, যা আরও স্পষ্ট দেখা যাবে পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (ব্রুনো তো অনেকখানি এগিয়ে 'প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে অ্যান্টিথিসিসের' কথা অবধি বলেছেন (১১০ পৃঃ) (১০), যেন এরা হল দুটো পৃথক 'বস্তু', আর মানুষের সামনে যেন সব সময়ে ছিল না

---

* দ্রষ্টব্য। ফয়েরবাখের ত্রুটিটা এই নয় যে, যা একেবারেই স্পষ্ট-প্রতীয়মান, ইন্দ্রিয়লব্ধ **বাহ্যরূপ**, সেটাকে তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলো সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত যথাযথ পরীক্ষা দিয়ে সাব্যস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবতার সাপেক্ষ করেন, সেটা হল এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দিকে দার্শনিকের 'চোখ' দিয়ে, অর্থাৎ **দার্শনিকের** 'চশমার' ভিতর দিয়ে তাকানর শরণ নিয়ে ছাড়া তিনি শেষ পর্যন্ত সেটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না।

একটা ঐতিহাসিক প্রকৃতি এবং একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস [জীববৃত্তান্ত]), যার থেকে পয়দা হয়েছে 'সারমর্ম' আর 'আত্মচেতনা' সম্বন্ধে তাবৎ 'অগাধীয় সমুন্নত রচনা'।* সেটা আপনা থেকেই টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে যখন আমরা বুঝতে পারি যে, প্রসিদ্ধ 'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একত্ব' বরাবরই বিদ্যমান থেকেছে শিল্পে, আর শিল্পের অপেক্ষাকৃত কম কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশি বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন আকারে প্রত্যেকটা যুগে বিদ্যমান থেকেছে — ঠিক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 'সংগ্রামের'ই মতো — প্রতিযঙ্গী ভিত্তিতে মানুষের উৎপাদন-শক্তি গড়ে ওঠা অবধি একেবারে। শিল্প আর বাণিজ্য, উৎপাদন আর জীবনীয়-বিনিয়ম নিজেরাই নির্ধারণ করে বণ্টন, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গঠন, আর সেগুলো আবার এটা দিয়ে নির্ধারিত হয় সেগুলো চালিয়ে যাবার প্রণালীর ব্যাপারে; এইভাবে এমনটা হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাঞ্চেস্টারে ফয়েরবাখ দেখেন শুধু কল-কারখানা আর যন্ত্রপাতি, সেখানে এক-শ' বছর আগে দেখা যেত কেবল চরকা আর বুনন-তাঁত, কিংবা রোমের চারদিককার কাম্পানিয়ায় [সমভূমিতে] তিনি দেখতে পান কেবল পশুচারণ ভূমি আর জলা, যেখানে অগস্তাসের আমলে হলে তিনি রোমক পুঁজিপতিদের ভিলাগুলো আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেতেন না। বিশেষত প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষকরণগুলির কথা বলেন ফয়েরবাখ; যেসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয় কেবল পদার্থবিজ্ঞানী আর রসায়নীদের দৃষ্টিতে সেগুলোর কথা তিনি উল্লেখ করেন; কিন্তু কোথায় থাকত প্রকৃতিবিজ্ঞান শিল্প আর বাণিজ্য ছাড়া? এমনকি এই 'বিশুদ্ধ' প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও, সেটার মালমশলার ব্যাপারেও, একটা লক্ষ্য স্থাপিত হয় কেবল বাণিজ্য আর শিল্পের ভিতর দিয়ে, মানুষের ইন্দ্রিয়গত সক্রিয়তার ভিতর দিয়ে। এই কর্মবৃত্তি, এই অবিরাম ইন্দ্রিয়গত শ্রম আর সৃষ্টি, এই উৎপাদন এমনই পরিমাণে সমগ্র ইন্দ্রিয়গত জগৎ এখন যেমনটা বিদ্যমান সেটার ভিত্তি, যাতে মাত্র এক-বছরের ছেদ পড়লে ফয়েরবাখ প্রাকৃতিক জগতে একটা বিপুল পরিবর্তন দেখতে পেতেন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু অচিরেই তিনি দেখতে পেতেন মানুষের সমগ্র কর্মক্ষেত্র এবং তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকরণ ক্ষমতা, না, তাঁর নিজ অস্তিত্বই খোয়া গেছে। অবশ্য এই সবকিছুতে বহিঃপ্রকৃতির পূর্বতা অক্ষুণ্ণই

* গ্যেটে, 'ফাউস্ট', 'Prolog im Himmel' ('স্বর্গে প্রস্তাবনা')। — সম্পাঃ

থেকে যায়, আর generatio aequivoca* থেকে জাত আদি মনুষ্যগণের ক্ষেত্রে এটা কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়; কিন্তু কেবল যে-পরিমাণে মানুষকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচনা করা হয় তাতে এই পৃথককরণের অর্থ আছে। সেদিক থেকে দেখলে, প্রকৃতি, যে-প্রকৃতি মানব-ইতিহাসের পূর্ববর্তী, সেটা কোনক্রমেই নয় সেই প্রকৃতি যেখানে ফয়েরবাখ জীবনযাপন করেন, সে প্রকৃতি আজ আর নেই কোথাও (হয়ত অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি উদ্ভূত অল্প কয়েকটা প্রবাল-দ্বীপে ছাড়া), কাজেই ফয়েরবাখের পক্ষে সেটার অস্তিত্ব নেই।

'বিশুদ্ধ' বস্তুবাদীদের সঙ্গে তুলনায় ফয়েরবাখের [১০] একটা মস্ত সুবিধে নিশ্চয়ই এই যে, মানুষও কেমন একটা 'ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়' সেটা তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু তার সম্বন্ধে তিনি ধারণা করেন শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয় হিসেবে, 'ইন্দ্রিয়গম্য কর্মবৃত্তি' হিসেবে নয়, এটা ছেড়ে দিলে যেহেতু তিনি তবু থেকে যান তত্ত্বের রাজ্যে এবং মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করেন তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক সংযোগের মাঝে নয়, তারা যা তেমনটা তাদের যেটা করেছে তাদের জীবনযাত্রার সেই বিদ্যমান পরিবেশে নয়, তাই তিনি যথার্থই বিদ্যমান সক্রিয় মানুষে পেঁছতে পারেন না কখনও, তিনি বিমূর্ত 'মানুষে' থেমে যান, 'আসল, ব্যক্তি, দেহী' মানুষকে অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার পরে আর এগোতে পারেন না, অর্থাৎ 'মানুষের সঙ্গে মানুষের' প্রেম আর বন্ধুত্ব ছাড়া কোন 'মানবীয় সম্পর্ক' তিনি জানেন না, আর সেটাও আদর্শরূপায়িত। জীবনযাত্রার বর্তমান পরিবেশের কোন সমালোচনা তিনি দেন না। এইভাবে, ইন্দ্রিয়গম্য জগৎটাকে তিনি কখনও সেটা যাদের নিয়ে গড়া সেই ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জীবন্ত ইন্দ্রিয়গত **কর্মবৃত্তির** সাকল্য হিসেবে ধারণা করে উঠতে পারেন না; কাজেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন তিনি সুস্থ লোকদের বদলে দেখতে পান গন্ডমালা-রোগগ্রস্ত, অতি-খাটা এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত অনাহারক্লিষ্ট লোকের ভিড় তখন তিনি 'উচ্চতর প্রত্যক্ষকরণে' আর 'প্রজাতির মধ্যে' আদর্শ 'ক্ষতিপূরণের' মাঝে আশ্রয় নিতে এবং এইভাবে ভাববাদে পুনঃপতিত হতে বাধ্য হন, ঠিক যে-সন্ধিক্ষণে কমিউনিস্ট বস্তুবাদী উপলব্ধি

---

* স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব। — সম্পাঃ

করেন শিল্প আর সামাজিক কাঠাম উভয়ের একটা রূপান্তরের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেটার জন্যে আবশ্যক অবস্থার আবশ্যকতা।

ফয়েরবাখ যে-মাত্রায় বস্তুবাদী তাতে ইতিহাস তাঁর বিষয়ীভূত নয়, আর যে-মাত্রায় তিনি ইতিহাস নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেন তাতে তিনি বস্তুবাদী নন। তাঁর বিবেচনায় বস্তুবাদ আর ইতিহাস একেবারেই ভিন্নমুখী, যে-ব্যাপারটা, প্রসঙ্গত, যা বলা হয়েছে তার থেকে ইতোমধ্যেই স্পষ্টপ্রতীয়মান।*

[৩। প্রাথমিক ঐতিহাসিক সম্পর্কসমূহ, বা সামাজিক কর্মবৃত্তির বুনিয়াদী দিকগুলি: জীবনোপায় উৎপাদন, নতুন নতুন চাহিদা উৎপাদন, লোকসমষ্টির পুনরুৎপাদন (পরিবার), সামাজিক আদান-প্রদান, চেতনা]

[১১]** যেহেতু আমরা বিচার-বিবেচনা করছি জার্মানদের নিয়ে, যারা সিদ্ধান্তসূত্রবিহীন, তাই আমাদের শুরু করতে হচ্ছে মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের এবং কাজেই সমগ্র ইতিহাসের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্রটা বিবৃত ক'রে, সেই সিদ্ধান্তসূত্রটা হল এই যে, 'ইতিহাস সৃষ্টি করতে'*** সমর্থ হতে হলে মানুষকে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় থাকা চাই। কিন্তু বেঁচে থাকা বলতে বোঝায় অন্য সবকিছুর আগে খাওয়া আর পান করা, বাসস্থান, কাপড়চোপড় এবং আরও অনেক কিছু।**** এইভাবে, প্রথম ঐতিহাসিক কৃতি হল এইসব চাহিদা মেটাবার উপকরণগুলি উৎপাদন, খাস বৈষয়িক জীবনেরই উৎপাদন। আর বাস্তবিকই এটা একটা ঐতিহাসিক কৃতি, সমগ্র ইতিহাসের জন্যে আবশ্যক একটা বুনিয়াদী শর্ত, যা হাজার হাজার বছর আগেকার মতো আজও

* [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] তবু আমরা এখানে আরও বিস্তারিতভাবে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি তার কারণ এই যে, 'ইতিহাস' আর 'ঐতিহাসিক' এই শব্দ-দুটো জার্মানদের কাছে সাধারণত বাস্তবতা ছাড়া সম্ভাব্য সবকিছুই বোঝায়, এর একটা দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত হল বিশেষত তার 'প্রচারবেদীর বাকপটুতা' নিয়ে সেন্ট ব্রুনো।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **ইতিহাস।**

*** তু. এই খণ্ডের ৫৪ পৃঃ। — সম্পাঃ

**** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **হেগেল** (১১)। ভূতাত্ত্বিক, জলভাগ-সংক্রান্ত, ইত্যাদি পরিবেশ। মানব-দেহ। চাহিদা এবং শ্রম।

প্রতিদিন প্রতি-ঘণ্টায় পূরণ হওয়া চাই শুধু মানুষের জীবন বজায় রাখার জন্যে। ইন্দ্রিয়গম্য জগৎটাকে এমনকি যখন লঘিষ্ঠ মাত্রায়, যেমন সেন্ট ব্রুনোর বেলায়, একখানা যষ্টিতে পরিণত করা হয় (১২), তখনও যষ্টিখানা উৎপন্ন করার কৃতি সেটার পূর্বশর্ত। কাজেই, ইতিহাসের যেকোন ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথমে এই বুনিয়াদী সত্যটাকে তার সমগ্র তাৎপর্য এবং তার সমগ্র ভাবার্থের মাঝে লক্ষ্য করা এবং সেটাকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া চাই। এটা সুবিদিত যে, জার্মানরা কখনও এটা করে নি, কাজেই ইতিহাসের জন্যে কোন পার্থিব ভিত্তি তাদের ছিল না কখনও, ফলস্বরূপে তাদের কখনও ছিল না কোন ইতিহাসকার। ফরাসীরা আর ইংরেজরা বিশেষত যতকাল রাজনীতিক ভাবাদর্শের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তথাকথিত ইতিহাসের সঙ্গে এই অবস্থাটার সম্পর্কটাকে শুধু অতি একপেশেভাবে ধারণা করলেও, তা সত্ত্বেও নাগরিক সমাজের, বাণিজ্য আর শিল্পের ইতিহাস প্রথমে লিখে সেইভাবে ইতিহাস-লিখনকে বস্তুবাদী ভিত্তি দেবার প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছে তারাই।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টা হল এই [১২] যে, প্রথম চাহিদাটা মেটান থেকে (মেটাবার কার্যকরণটা এবং মেটাবার হাতিয়ারটা যা আয়ত্ত হয়েছে) এসে পড়ে নতুন নতুন চাহিদা; আর এই নতুন নতুন চাহিদার উৎপাদনটা হল প্রথম ঐতিহাসিক কৃতি। এখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারি জার্মানদের মস্ত ঐতিহাসিক বিজ্ঞতার আধ্যাত্মিক কুলপরিচয়, যে-জার্মানরা যখন তাদের প্রয়োগজ মালমশলা ফুরিয়ে যায় এবং যখন তারা কি ব্রহ্মবিদ্যাগত, কি রাজনীতিক, কি সাহিত্যঘটিত কোন রাবিশই পরিবেশন করতে পারে না, তখন তারা দৃঢ়োক্তি করে যে, এটা আদৌ ইতিহাস নয়, এটা 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ'। এই অর্থহীন 'প্রাক্‌ইতিহাস' থেকে এগিয়ে খাস ইতিহাসে যেতে হবে কেমন করে, সে-বিষয়ে তারা কিন্তু আমাদের জ্ঞানালোকিত করে না; যদিও, অন্যদিকে, তাদের ইতিহাসঘটিত দূরকল্পনায় তারা এই 'প্রাক্‌ইতিহাস'টাকে আঁকড়ে ধরে সবিশেষ আগ্রহসহকারে, তার কারণ সেখানে তারা 'স্থূল তথ্যগুলোর' দিক থেকে হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কারণ এই যে, সেখানে তারা তাদের দূরকল্পী আবেগের রাশ একেবারেই ঢিলা করে দিয়ে প্রকল্প গড়তে আর ভাঙতে পারে হাজারে-হাজারে।

তৃতীয় পরিস্থিতি, যা একেবারে শুরু থেকেই ঐতিহাসিক বিকাশের একটা অঙ্গ-উপাদান, সেটা হল এই যে, মানুষ, যারা নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে প্রতিদিন, তারা অন্যান্য মানুষ পয়দা করতে, নিজেদের বংশবিস্তার করতে শুরু করে: পুরুষ আর নারীর মধ্যে সম্পর্ক, মাতাপিতা আর সন্তানসন্ততি, **পরিবার**। শুরুতে যা একমাত্র সামাজিক সম্পর্ক সেই পরিবার পরে, যখন বর্ধিত চাহিদাগুলো নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, আর বর্ধিত জনসংখ্যা সৃষ্টি করে নতুন নতুন চাহিদা, হয়ে দাঁড়ায় একটা অধস্তন সম্পর্ক (জার্মানিতে ছাড়া), তখন সেটাকে নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা আবশ্যক বিদ্যমান প্রয়োগজ উপাত্ত অনুসারে, জার্মানিতে যা রীতি সেইভাবে 'পরিবার সংক্রান্ত ধারণা' অনুসারে নয়। সামাজিক কর্মবৃত্তির এই তিনটে দিককে অবশ্য তিনটে পৃথক পর্ব হিসেবে ধরা চলবে না, ধরতে হবে শুধু তিনটে দিক হিসেবেই কিংবা, জার্মানদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে, 'অঙ্গ-উপাদান' তিনটে হিসেবে, যেগুলি ইতিহাস আর প্রথম প্রথম মনুষ্যগণের আরম্ভ থেকে যুগপৎ বিদ্যমান এবং অদ্যাবধি ইতিহাসে বলবৎ।

শ্রমের মাঝে কারও নিজ জীবন এবং জননক্রিয়ায় নতুন জীবন উভয়ত নতুন জীবনের উৎপাদন এখন প্রতীয়মান হয় দ্বিবিধ [১৩] সম্পর্ক হিসেবে: একদিকে স্বাভাবিক, অন্যদিকে সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে। সামাজিক বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ব্যক্তি-মনুষ্যগণের সহযোগ, সেটা কোন্ পরিবেশে, কোন্ ধরনে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে, তাতে কিছু এসে যায় না। এর থেকে এটা আসে যে, কোন একটা উৎপাদন-প্রণালী কিংবা শিল্প-পর্ব সবসময়েই কোন একটা সহযোগ-প্রণালী কিংবা সামাজিক পর্বের সঙ্গে সংযুক্ত, আর এই সহযোগ-প্রণালীটা নিজেই একটা 'উৎপাদন-শক্তি'। অধিকন্তু, মানুষের প্রাপ্তিসাধ্য উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাকল্য যে সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তার থেকে এটা আসে যে, 'মানবজাতির ইতিহাস' নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ আর আলোচনা সবসময়ে করতে হবে শিল্প আর বিনিময়ের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। কিন্তু জার্মানিতে এইরকমের ইতিহাস লেখা কিভাবে অসম্ভব সেটাও স্পষ্ট, তার কারণ আবশ্যক উপলব্ধির ক্ষমতা আর মালমশলারই শুধু নয়, 'তাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের নিদর্শনের'ও ঊনতা আছে জার্মানদের, কেননা রাইন্

নদীর পারে এইসব ব্যাপারের কোন অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না যেহেতু ইতিহাসের ঘটন থেমে গেছে। এইভাবে শুরু থেকেই এটা একেবারেই স্পষ্টপ্রতীয়মান যে, মনুষ্যগণের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈষয়িক সংযোগ আছে, যেটা নির্ধারিত হয় তাদের চাহিদাগুলো আর উৎপাদন-প্রণালী দিয়ে, এবং যেটা মানুষের নিজেদেরই সমান প্রাচীন। এই সংযোগটা ক্রমাগত নতুন নতুন রূপ ধরছে, আর এইভাবে সেটা কোন রাজনীতিক কিংবা ধর্মীয় প্রলাপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে হাজির করে একটা 'ইতিহাস', যা বিশেষত একত্র করে রাখতে পারে মনুষ্যগণকে।

শুধু এখন, প্রাথমিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের চারটে অঙ্গ-উপাদান, চারটে দিক নিয়ে বিবেচনা করার পরে আমরা দেখতে পাই মানুষের আছে 'চেতনা'ও*; কিন্তু যদিও সেটা নয় অধিষ্ঠিত, 'বিশুদ্ধ' চেতনা। শুরু থেকেই 'সত্ত্ব' ('spirit') ক্লিষ্ট [১৪] বস্তুর 'ভারাক্রান্ত' হবার অভিশাপ দিয়ে — বস্তু এখানে দেখা দেয় বিভিন্ন আলোড়িত বায়ু-স্তর, বিভিন্ন শব্দ রূপে, এককথায় ভাষা রূপে। ভাষা চেতনার সমান প্রাচীন, ভাষা **হল** ব্যবহারিক চেতনা, যেটা থাকে অন্যান্য মানুষের জন্যেও, আর শুধু সেই কারণেই এটা যথার্থই থাকে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যেও; চেতনার মতো ভাষাও দেখা দেয় শুধু অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংসর্গের চাহিদা, আবশ্যকতা থেকে।** যেখানে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান, সেটা বিদ্যমান আমার জন্যে: প্রাণী কোনকিছুর সঙ্গে **'সম্পর্ক'** স্থাপন করে না, প্রাণী আদৌ কোন সম্পর্কই স্থাপন করে না। অন্যান্যের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক প্রাণীর পক্ষে সম্পর্ক হিসেবে থাকে না। কাজেই, একেবারে শুরু থেকেই চেতনা একটা সামাজিক উৎপাদ, আর তেমনই সেটা থেকে যায় যতকাল মানুষের অস্তিত্ব থাকে আদৌ। চেতনা অবশ্য প্রথমে নিছক **অব্যবহিত** ইন্দ্রিয়গম্য প্রতিবেশ সংক্রান্ত চেতনা এবং যে-ব্যক্তি-মানুষ আত্মসচেতন হয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মানুষের ইতিহাস আছে তার কারণ তাদের জীবন তাদের **উৎপন্ন করা** চাই, আর কারণ এই যে, অধিকন্তু সেটা তাদের উৎপাদন করতে হয় **কোন-একটা ধরনে:** এটা নির্ধারিত হয় ভৌত সংগঠন দিয়ে, তাদের চেতনা নির্ধারিত হয় ঠিক ঐ একই ধরনে।

** [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] আমার প্রতিবেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল আমার চেতনা।

উঠছে তার বাইরেকার অন্যান্য ব্যক্তি আর বস্তুসমূহের সঙ্গে সীমাবদ্ধ সংযোগ সম্বন্ধে চেতনা। তার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনা, যে প্রকৃতি মানুষের কাছে প্রথমে প্রতীয়মান হয় সম্পূর্ণভাবে পরক, সর্বশক্তিমান এবং অনাক্রম্য একটা শক্তি হিসেবে, যেটার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল একেবারেই পাশব, আর যেটা মানুষকে জন্তুর মতো ভয়ে অভিভূত করে; এইভাবে এটা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে নিছক পাশব চেতনা (প্রকৃতি-ধর্ম)।

এখানে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই: এই প্রকৃতি-ধর্ম বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই বিশেষ সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সমাজের আকার দিয়ে, আর তেমনি পালটাভাবে। যেমন সর্বত্র তেমনি এক্ষেত্রে প্রকৃতি আর মানুষের পরিচয় এমনভাবে প্রতীয়মান হয় যাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সীমাবদ্ধ সম্পর্ক তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কটাকে নির্ধারণ করে, আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পর্ক নির্ধারণ করে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সীমাবদ্ধ সম্পর্কটাকে, সেটা ঠিক এই কারণে যে, প্রকৃতি তখনও ইতিহাসক্রমে বড় একটা পরিবর্তিত নয়; আর অন্যদিকে, চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তি-মনুষ্যগণের সঙ্গে মেলামেশা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মানুষের চেতনা হল সে যে আদৌ সমাজে বাস করে সে-সম্বন্ধে তার চেতনার সূত্রপাত। এই পর্বে সামাজিক জীবন নিজেই যেমন তেমনই পাশব এই সূত্রপাতটা। এটা নিছক যূথ-চেতনা, আর এই সন্ধিক্ষণে ভেড়া থেকে মানুষকে আলাদা করে চেনা যায় শুধু এটা দিয়ে যে, মানুষের বেলায় চেতনা আসে সহজপ্রবৃত্তির জায়গায় কিংবা তার সহজপ্রবৃত্তিটা সচেতন। ভেড়ার ধরনের বা গোষ্ঠীগত চেতনার আরও বিকাশ এবং প্রসার ঘটে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা আর বর্ধিত চাহিদার ভিতর দিয়ে এবং এই দুইয়েরই বেলায় যা বুনিয়াদী [১৫] সেই জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে। এগুলির সঙ্গে ক্রমে গড়ে বেড়ে ওঠে শ্রমবিভাগ, যেটা গোড়ায় ছিল রতিক্রিয়ার শ্রমবিভাগ ছাড়া কিছু নয়, আর পরে হয়েছিল সেই শ্রমবিভাগ যা স্বাভাবিক অনুকূল অবস্থা (যেমন শারীরিক শক্তি), বিভিন্ন চাহিদা, আকস্মিক ঘটনা, ইত্যাদির দরুন গড়ে বেড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা 'স্বভাবত'। ভৌত আর মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগ যখন দেখা দেয় সেই ক্ষণ থেকে শ্রমবিভাগ হয়ে

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ভাবাদর্শবিদদের, যাজকদের প্রথম ধরনটা এই একই কালের সংঘটন।

ওঠে সত্যিকারের শ্রমবিভাগ।* তখন থেকে চেতনা যথার্থই এই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে **পারে** যে, সেটা বিদ্যমান চলিতকর্ম সম্বন্ধে চেতনা ছাড়া অন্যকিছু, সেটা বাস্তব কিছুর স্থানাপন্ন না হয়েও **বাস্তবিকই** একটাকিছুর স্থানাপন্ন হচ্ছে; তখন থেকে চেতনা এমন অবস্থায় আসে যাতে সেটা নিজেকে বহির্জগৎ থেকে মুক্ত করে নিয়ে 'বিশুদ্ধ' তত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি গড়তে এগোতে পারে। কিন্তু এমনকি এই তত্ত্ব, ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদিরও বিরোধ বাধে বিদ্যমান সম্পর্কগুলির সঙ্গে, এটা ঘটতে পারে কেবল এই কারণে যে, বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কগুলো বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়; অধিকন্তু এটা ঘটতে পারে সম্পর্কসমূহের কোন নির্দিষ্ট জাতীয় ক্ষেত্রেও, সেটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবার ফলে, সে-দ্বন্দ্ব জাতীয় চৌহদ্দির ভিতরে নয়, সে-দ্বন্দ্ব এই জাতীয় চেতনা এবং অন্যান্য জাতির চলিতকর্মের মধ্যে,* অর্থাৎ কোন একটা জাতির জাতীয় এবং সাধারণ চেতনার মধ্যে (যেমনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি জার্মানিতে); কিন্তু যেহেতু মনে হয় এই দ্বন্দ্বটা রয়েছে শুধু জাতীয় চেতনার ভিতরকার একটা দ্বন্দ্ব হিসেবে, তাই তখন এই জাতির মনে হয় সংগ্রামটাও এই জাতীয় ময়লাতেই গণ্ডিবদ্ধ।

[১৬] তাছাড়া, চেতনা নিজে-নিজেই কী করতে শুরু করে সেটা একেবারেই অকিঞ্চিৎ: এইরকমের সমস্ত ময়লার মধ্য থেকে আমরা শুধু এই একটা অনুমানই করতে পারি যে, উৎপাদন-শক্তি, সমাজের হাল আর চেতনা, এই তিনটে অঙ্গ-উপাদানের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধতে পারে এবং বাধবেই, কেননা **শ্রমবিভাগ** বলতে মানসিক আর বৈষয়িক সক্রিয়তা** ভোগসুখ আর শ্রম, উৎপাদন আর পরিভোগ — বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের উপর বর্তাবার সম্ভাবনা বোঝায়, কেবল সম্ভাবনাই নয়, বোঝায় সেই ঘটনাটাই; আরও এটা বোঝায় যে, শ্রমবিভাগ যদি বাতিল হয়ে যায়, একমাত্র সেক্ষেত্রেই সেগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব না-বাধার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু, এটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান যে, বিভিন্ন 'অপচ্ছায়া', 'বন্ধন', 'উন্নততর সত্তা', 'ধারণা', 'বিবেকের তাড়না' হল

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **ধর্ম**। জার্মানরা এবং আপনাতে **ভাবাদর্শ**।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা, যা কেটে দেওয়া হয়েছে:] কর্মবৃত্তি আর চিন্তন, অর্থাৎ চিন্তাবর্জিত কর্মবৃত্তি এবং নিষ্ক্রিয় চিন্তন।

স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের নিছক ভাববাদী, আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, অতিশয় প্রয়োগজ বন্ধন আর সীমাবদ্ধতার ভাবমূর্তি, যার ভিতরে চলে জীবন উৎপাদনের প্রণালী এবং সেটার সঙ্গে সংযুক্ত সংসর্গের ধরন।

[৪। সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং সেটার পরিণতি: ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্র, সামাজিক কর্মবৃত্তির 'পরকীকরণ']

শ্রমবিভাগে অন্তর্নিহিত থাকে এই সমস্ত দ্বন্দ্ব, শ্রমবিভাগের আবার ভিত্তি হল পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ পৃথক পৃথক পরিবার দিয়ে সমাজের বিভাগ — এই শ্রমবিভাগের সঙ্গে যুগপৎ থাকে শ্রম আর শ্রমফলের **বণ্টন**, বাস্তবিকপক্ষে সেটা গুণ আর পরিমাণ উভয়ত **অসম** বণ্টন, তার থেকে মালিকানা: [১৭] কেন্দ্রী উপাদানটা, যেটার প্রথম আকারটা থাকে পরিবারে, যেখানে স্ত্রী আর সন্তানসন্ততি হল স্বামীর দাস-দাসী। পরিবারে অন্তর্নিহিত দাসপ্রথাটা তখনও খুবই কাঁচা ধরনের হলেও, সেটাই প্রথম মালিকানা, কিন্তু এমনকি এই গোড়ার পর্বেও সেটা আধুনিক অর্থনীতিবিদদের সংজ্ঞার্থের সঙ্গে ঠিকভাবে মেলে, তাঁরা এটাকে বলেন অন্যান্যের শ্রমশক্তির বিলিবন্দেজ করার ক্ষমতা। তাছাড়া, শ্রমবিভাগ আর ব্যক্তিগত মালিকানা হল একই কথা: একটাতে কর্মবৃত্তি প্রসঙ্গে সেই একই জিনিস স্পষ্টবিবৃত হয়, যা অন্যটাতে স্পষ্টবিবৃত হয় কর্মবৃত্তির উৎপাদ প্রসঙ্গে।

তারপরে, শ্রমবিভাগ বলতে বোঝায় আলাদা আলাদা ব্যক্তি কিংবা পৃথক পৃথক পরিবারের স্বার্থ এবং যাদের পরস্পরের মধ্যে সংসর্গ থাকে সেই সমস্ত ব্যক্তির সম্প্রদায়গত স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বাস্তবিকপক্ষে এই সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব 'সাধারণী স্বার্থ' হিসেবে নিছক কল্পনায় নয়, যাদের মধ্যে শ্রম বিভক্ত হয় সেইসব ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক নির্ভর হিসেবে সর্বপ্রথমে বাস্তবে।

ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যকার ঠিক এই দ্বন্দ্ব থেকেই সম্প্রদায়টা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে **রাষ্ট্র** হিসেবে, যেটা ব্যক্তি-মানুষ আর সম্প্রদায়ের আসল স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যেমন রাষ্ট্র হিসেবে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিভ্রান্তিকর সাধারণী জীবন হিসেবে, তবু সবসময়েই সেটার ভিত্তি হল প্রত্যেকটা পরিবারে আর গোষ্ঠীগত সমবায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন বন্ধন — যেমন, জ্ঞাতিত্ব, ভাষা, বৃহত্তর পরিসরে শ্রমবিভাগ এবং অন্যান্য স্বার্থ, আর, যা আমরা পরে বিশদ করে দেখাব, সেটার ভিত্তি হল বিশেষত বিভিন্ন শ্রেণী, যা ইতঃপূর্বে শ্রেণীবিভাগ দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায়, এমন প্রত্যেকটা জনরাশিতে এইসব শ্রেণী পৃথক হয়ে যায়, এবং সেগুলোর মধ্যে একটা অন্য সবগুলোর উপর আধিপত্য করে। এর ফলস্বরূপ এটা আসে যে, রাষ্ট্রের ভিতরে সমস্ত সংগ্রাম — গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র আর রাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম, ভোটাধিকারের জন্যে সংগ্রাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি — হল বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তি অবধি যেসব আসল সংগ্রাম চালায় সেগুলোর নিছক বিভ্রান্তিকর আকার (এ সম্বন্ধে জর্মান তত্ত্ববিদদের ক্ষীণতম ধারণাও নেই, যদিও 'Deutsch-Französische Jahrbücher' (১৩) এবং 'Die heilige Familie'-তে তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট পূর্বাভাস পেয়েছেন)। এর ফলস্বরূপ আরও আসে এটা: কর্তৃত্বের জন্যে সংগ্রামরত প্রত্যেকটা শ্রেণীকে সর্বপ্রথমে রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করা চাই, সেটা তার বেলায় নিজ স্বার্থটাকে সাধারণী স্বার্থ হিসেবে প্রকাশ করার জন্যে, যা সেটা প্রথম ক্ষণে করতে বাধ্য হয়, এই ব্যাপারটা এমনকি সেক্ষেত্রেও ঘটে যখন শ্রেণীটার আধিপত্যের জন্যে — যেমনটা প্রলেতারিয়েতের বেলায় — সমগ্র পুরন আকারের সমাজটার এবং খাস আধিপত্যেরই লুপ্তি আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ **শুধু** তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে চেষ্টা করে, সেটা তাদের দিক থেকে তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায় না (প্রকৃতপক্ষে সাধারণটা হল সম্প্রদায়গত জীবনের বিভ্রান্তিকর আকার), ঠিক এই কারণে সম্প্রদায়গত স্বার্থটা তাদের উপর চেপে বসবে তাদের পক্ষে 'পরক' এবং তাদের থেকে [১৮] 'স্বতন্ত্র' একটা স্বার্থ হিসেবে, সেটার বেলায় আবার একটা নির্দিষ্ট, বিশেষ ধরনের 'সাধারণী' স্বার্থ হিসেবে; কিংবা তাদের নিজেদের থেকে যেতে হবে এই বৈসাদৃশ্যের ভিতরে, যেমনটা হয় গণতন্ত্রে।

তেমনি অন্যদিকেও, এই যেসব বিশেষ ধরনের স্বার্থ **বাস্তবিকই সর্বক্ষণ চলে** সম্প্রদায়গত এবং বিভ্রান্তিকর সম্প্রদায়গত স্বার্থের বিরুদ্ধে, এগুলোর **কার্যগত** সংগ্রামের ফলে রাষ্ট্রের আকারে বিভ্রান্তিকর 'সাধারণী' স্বার্থের মাধ্যমে **কার্যগত** হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয়ে ওঠে।*

[১৭] শেষে, মানুষ যতক্ষণ থাকে স্বাভাবিক সমাজে, অর্থাৎ বিশেষ আর সাধারণী স্বার্থের মধ্যে একটা ফাট যতক্ষণ থাকে, কাজেই যতক্ষণ কর্মবৃত্তি বিভক্ত থাকে ঐচ্ছিকভাবে নয়, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, ততক্ষণ মানুষের নিজ কৃতি কিভাবে হয়ে ওঠে তার বিরুদ্ধ একটা পরক শক্তি, যেটা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার বদলে তাকে দাসে পরিণত করে, তার প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পাই শ্রমবিভাগ। কেননা যেইমাত্র শ্রমের বণ্টন হয়ে যায়, অমনি প্রত্যেকটি মানুষের থাকে কর্মবৃত্তির একটা বিশেষ ধরনের একক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, যেটা তার উপর জোর করে চেপে বসে, যেটাকে সে এড়াতে পারে না। সে হতে পারে শিকারী, জেলে, মেষপালক কিংবা বৈচারিক সমালোচক, তাইই তার থেকে যেতে হবে, নইলে তার জীবিকানির্বাহের উপায় খোয়া যাবে; কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে কারও কর্মবৃত্তির কোন একটামাত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র থাকবে না, সেখানে প্রত্যেকে ইচ্ছামতো যেকোন শাখায় কুশলী হয়ে উঠতে পারবে, সমাজ সাধারণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, আমার পক্ষে আজ একটা এবং আগামী কাল অন্য একটা কিছু করা, সকালে শিকার করা, বিকেলে মাছধরা, সন্ধ্যায় পশুপালন করা, ডিনারের পরে সমালোচনা করা সম্ভব করে তোলে, ঠিক যেমনটা আমার মন চায়, তাতে আমার কখনও শিকারী, মেছুয়া, মেষপালক কিংবা সমালোচক হয়ে পড়া আবশ্যক নয়।

[১৮] সামাজিক কর্মবৃত্তির এই বাঁধাবাঁধি ঘটে, আমরা নিজেরাই যা উৎপন্ন করি সেটা আমাদের উপরে অবস্থিত একটা বাস্তব শক্তি রূপে সংহত হয়ে দাঁড়ায়, সেটা চলে যায় আমাদের আয়ত্তের বাইরে, আমাদের প্রত্যাশা ব্যাহত করে, আমাদের পরিকল্পন ব্যর্থ করে দেয়, সেটা হল এখন পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশের একটা মুখ্য উপাদান। শ্রমবিভাগ দিয়ে যেভাবে নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের সহযোগ, সেই সহযোগের ফলে উদ্ভূত

---

* এই দুটো অনুচ্ছেদ এঙ্গেলস ঢুকিয়েছেন মার্জিনে। — সম্পাঃ

সামাজিক ক্ষমতা, অর্থাৎ বহুলীকৃত উৎপাদন-শক্তি এইসব ব্যক্তি-মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয় তাদের নিজেদের সম্মিলিত ক্ষমতা হিসেবে নয় — যেহেতু তাদের সহযোগ ঐচ্ছিক নয়, সেটা ঘটে স্বাভাবিকভাবে — সেটা প্রতীয়মান হয় তাদের বহিস্থ একটা পরক শক্তি হিসেবে, সেটার উৎপত্তি আর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না, তাই সেটাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, বরং তার উলটো — সেটা চলে মানুষের ইচ্ছা আর কার্যকরণ থেকে স্বতন্ত্র বিশেষ ধরনের একগুচ্ছ ধাপ আর পর্বের ভিতর দিয়ে, না, শুধু তাই নয়, সেটা এমনকি হয়ে ওঠে এইসব ইচ্ছা আর কার্যকরণের মুখ্য নিয়ামক।* নইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মালিকানার আদৌ কোন ইতিহাস থাকতে পারত কিভাবে, মালিকানার বিভিন্ন আকার আসতে পারত কিভাবে? নইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমি-সম্পত্তি কিভাবে, বিবৃত বিভিন্ন সিদ্ধান্তসূত্র অনুসারে, ফ্রান্সে অংশন থেকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীকরণে পরিণত হতে পারত, আর কিভাবেই-বা সেটা ইংলন্ডে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীকরণ থেকে অংশনে পরিণত হতে পারত, যেমনটা এখন প্রকৃতপক্ষে রয়েছে? যা-ই হোক, বাণিজ্য তো বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ এবং বিভিন্ন দেশের জাতদ্রব্যের বিনিময়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়, সেই বাণিজ্য সারা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে যোগান আর চাহিদার সম্পর্ক দিয়ে, এমনটাই-বা ঘটে কেমন করে? — একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বলেছেন, এই সম্পর্কটা পৃথিবীর উপর ভেসে চলছে প্রাচীনকালের মনুষ্যগণের নিয়তির মতো, এই সম্পর্ক সেটার অদৃশ্য হাত দিয়ে মানুষের বরাতে বরাদ্দ করে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন সাম্রাজ্য স্থাপন করে [১৯] এবং উলটে ফেলে দেয় বিভিন্ন সাম্রাজ্য, ঘটায় বিভিন্ন জাতির উদ্ভব আর বিলোপ — যদিও ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি লোপ করা হলে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট ধাঁচের নিয়মন চালু হলে (এতে অন্তর্নিহিত থাকে মানুষ এবং তারা নিজেরা যা উৎপন্ন করে সেগুলোর

---

* এই অনুচ্ছেদটার ঠিক পরেই যে-বিভাগটা সেটার প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ হিসেবে এই খণ্ডে যে বয়ান ছাপা হল সেটা মার্কস মার্জিনে লিখেছিলেন এই রচনাংশটার জন্যে। — সম্পাঃ

মধ্যকার পরক সম্পর্কের লুপ্তি) যোগান আর চাহিদার সম্পর্কের ক্ষমতাটা কিছু-নাতে পর্যবসিত হয়, তখন মানুষ বিনিময়, উৎপাদন, তাদের পরস্পর সম্পর্কের প্রণালীটাকে আবার পায় নিজেদের আয়ত্তে।

[৫। কমিউনিজমের একটা বৈষয়িক পত্তন হিসেবে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ]

[১৮] দুটো **কার্যগত** পত্তন থাকলে, অবশ্য একমাত্র তবেই লোপ করা যেতে পারে এই **'পরকীকরণটাকে'** (দার্শনিকদের কাছে যা বোধগম্য হবে এমন একটা পদ ব্যবহার করা হল)। এটা তখনই হয়ে ওঠে একটা 'অসহনীয়' ক্ষমতা, অর্থাৎ যে-ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষ বিপ্লব করে, যখন সেটা অনিবার্যভাবেই মানবজাতির বিপুল ভাগকে 'নাস্তিমান' করে ফেলে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পয়দা করে ধনদৌলত আর সংস্কৃতির বিদ্যমান জগতের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, এই উভয় পরিবেশের জন্যে পূর্বশর্ত হল উৎপাদন-ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি, উচ্চ মাত্রায় সেটার বিকাশ। আর অন্যদিকে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের এই বিকাশ (যেটা আপনাতে বোঝায় মানুষের স্থানীয় সত্তা নয়, তার জায়গায় **বিশ্ব-ঐতিহাসিক** সত্তা হিসেবে মানুষের বাস্তবিক প্রায়োগিক অস্তিত্ব) হল একেবারেই অপরিহার্য একটা কার্যগত পত্তন, তার কারণ এটা না থাকলে **অভাব** শুধু হয়ে ওঠে সার্ব, আর **নিঃস্বতার দশার** সঙ্গে অনিবার্যভাবেই নতুন করে পয়দা হত জীবনীয়ের জন্যে সংগ্রাম এবং অন্যান্য যাবতীয় পুরন নোংরা ব্যাপার; আরও কারণ হল এই যে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের কেবল এই বিশ্বজনীন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষে-মানুষে **বিশ্বজনীন** সংসর্গ স্থাপিত হয়, যেটা সমস্ত জাতির মধ্যে যুগপৎ পয়দা করে 'নাস্তিমান' জনরাশির ব্যাপারটা (বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতা), প্রত্যেকটা জাতিকে নির্ভরশীল করে তোলে অন্যান্য জাতির বিভিন্ন বিপ্লবের উপর, আর শেষপর্যন্ত স্থানীয় ব্যক্তি-মনুষ্যগণের জায়গায় স্থাপন করেছে **বিশ্ব-ঐতিহাসিক**, প্রায়োগিকভাবে বিশ্বজনীন ব্যক্তি-মনুষ্যগণকে। এটা না হলে, (১) কমিউনিজমের অস্তিত্ব হতে পারত কেবল স্থানীয় ঘটন হিসেবে, (২) সংসর্গের **শক্তিগুলো** নিজেরাই

হয়ে উঠতে পারত না **বিশ্বজনীন** ক্ষমতা, কাজেই অসহনীয় ক্ষমতা: কুসংস্কারে ঘেরা দেশী পরিবেশ হয়েই থেকে যেত সেগুলো; আর (৩) সংসর্গের প্রত্যেকটা প্রসার স্থানীয় কমিউনিজমকে লোপ করত। প্রায়োগিক ধরনে দেখলে, কমিউনিজম সম্ভব একমাত্র সমস্ত প্রাধান্যশালী জাতির 'সহসা' এবং যুগপৎ (১৪) কৃতি হিসেবে, যাতে ধরেই নিতে হয় যে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিশ্বজনীন বিকাশ এবং কমিউনিজমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট পৃথিবীব্যাপী সংসর্গ ঘটে গেছে আগেই।*

[১৯] অধিকন্তু, **নাস্তিমান** শ্রমিক জনরাশি — শ্রমশক্তির ব্যাপক পরিসরে চূড়ান্ত অনিশ্চিত অবস্থা, যে-শ্রমশক্তি পুঁজি থেকে কিংবা এমনকি সীমাবদ্ধ চাহিদা মেটান থেকেও বিচ্ছিন্ন, কাজেই জীবনের নিশ্চিত উৎস হিসেবে একেবারে কাজ থেকেই সাময়িকভাবে বঞ্চিতই শুধু নয় — বলতে বোঝায় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে **বিশ্ব-বাজার** গড়ে ওঠে ইতঃপূর্বে। এইভাবে, ঠিক কমিউনিজমেরই মতো প্রলেতারিয়ানের অস্তিত্ব কেবল **বিশ্ব-ঐতিহাসিক**, প্রলেতারিয়ানের কর্মবৃত্তির অস্তিত্ব হতে পারে কেবল 'বিশ্ব-ঐতিহাসিক'। ব্যক্তি-মনুষ্যগণের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তি-মনুষ্যগণের যে-অস্তিত্ব বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট।

[১৮] আমাদের পক্ষে, কমিউনিজম নয় এমন একটা **পরিস্থিতি-হাল** যা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কমিউনিজম নয় এমন একটা **আদর্শ** যেটার সঙ্গে বাস্তবতাকে মানিয়ে নিতে হবে। কমিউনিজমকে আমরা বলি **আসল** আন্দোলন যা বর্তমান পরিস্থিতি-হালটাকে লোপ করে। এখন বিদ্যমান বিভিন্ন পত্তনের ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয় এই আন্দোলনের পরিবেশ।**

* * *

[১৯] পূর্ববর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক পর্বে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তি-সমূহের দ্বারা নির্ধারিত রূপের সংসর্গ, যেটা আবার উৎপাদন-শক্তিসমূহকে

---

* [বয়ানটা প্রসারিত করে পাণ্ডুলিপির পরবর্তী পৃষ্ঠার মাথায় মার্কসের মন্তব্য:] **কমিউনিজম।**

** পাণ্ডুলিপিতে মার্কস এই অনুচ্ছেদটাকে ঢুকিয়েছেন এই বিভাগের প্রথম অনুচ্ছেদের উপরে। — সম্পাঃ

নির্ধারণ করে, সেটা হল **নাগরিক সমাজ।** উপরে আমরা যা বলেছি তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, নাগরিক সমাজের পত্তন আর ভিত্তি হল অযৌগিক পরিবার এবং যৌগিক সংগঠন, যেটাকে বলা হয় গোষ্ঠী; এই সমাজের অপেক্ষাকৃত যথাযথ নির্ধারকগুলিকে উল্লিখিত মন্তব্যে বিবৃত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাই কিভাবে এই নাগরিক সমাজ হল সমস্ত ইতিহাসের আসল উৎস আর রঙ্গভূমি, আর ইতিহাস সম্বন্ধে এযাবত পোষিত ধারণা কতখানি আজগবি, সেই ধারণায় যথার্থ সম্পর্কগুলিকে অবহেলা করা হয়, সেই ধারণা গণ্ডিবদ্ধ থাকে রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ চমকপ্রদ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে।

এযাবত আমরা বিচার-বিবেচনা করেছি মানুষের কর্মবৃত্তির প্রধানত কেবল একটা দিক নিয়ে, সেটা হল মানুষের দ্বারা **প্রকৃতির নতুন আকার দেবার দিকটা**। অন্য দিকটা — **মানুষের দ্বারা মানুষের নতুন আকার দান**...*

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক।**

[৬। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা থেকে সিদ্ধান্তসমূহ: ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা, ইতিহাসের রূপান্তর বিশ্ব-ইতিহাসে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা।

[২০] পৃথক পৃথক পুরুষ-পর্যায়গুলির প্রত্যেকটা সমস্ত পূর্ববর্তী পুরুষ-পর্যায় থেকে রেখে-যাওয়া মালমশলা, পুঁজি তহবিল, উৎপাদন-শক্তিসমূহ কাজে লাগায়, এইভাবে প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায় একদিকে রেওয়াজী কর্মবৃত্তি চালিয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, আর অন্যদিকে, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত কর্মবৃত্তি দিয়ে পরিবর্তন ঘটায় পুরন পরিস্থিতিতে, এইসব পৃথক পৃথক পুরুষ-পর্যায়ের পারম্পর্য ছাড়া কিছু নয় ইতিহাস। এটার এমন দূরকল্পী বিকৃতি ঘটান যেতে পারে, যাতে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সংসর্গ এবং উৎপাদন-ক্ষমতা।

** পাণ্ডুলিপিতে এই পৃষ্ঠার শেষাংশটা ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় শুরু হয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা থেকে করা বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যান দিয়ে। — সম্পাঃ

পরবর্তী ইতিহাসকে করা হয় পূর্ববর্তী ইতিহাসের লক্ষ্য — যেমন, এমনটা আরোপ করা হয় যে, আমেরিকা আবিষ্কারের লক্ষ্য যেন ফরাসী বিপ্লবের বিস্ফোরণটার আনুকূল্য করা। তার ফলে ইতিহাস পায় সেটার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য, ইতিহাস হয়ে ওঠে 'অন্যান্য চরিত্রের পর্যায়ের একটি চরিত্র' (অর্থাৎ কিনা: 'আত্মচেতনা, সমালোচনা, সেই অদ্বিতীয়', ইত্যাদি), যদিও পূর্ববর্তী ইতিহাসের 'নিয়তি,' 'লক্ষ্য', 'বীজ', বা 'ভাব' এইসব শব্দ দিয়ে যা নির্দেশ করা হয় সেটা পরবর্তী ইতিহাস থেকে, পরবর্তী ইতিহাসের উপর পূর্ববর্তী ইতিহাস যে-সক্রিয় প্রভাব খাটায় তার থেকে গড়া একটা বিমূর্তনের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

পৃথক পৃথক ক্ষেত্রগুলোর ক্রিয়া ঘটে পরস্পরের উপর, সেইসব ক্ষেত্র এই বিকাশের ধারায় যত বেশি মাত্রায় প্রসারিত হয়, অগ্রসর উৎপাদন-প্রণালী আর সংসর্গ দিয়ে এবং সেগুলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পয়দা করে যে-শ্রমবিভাগ সেটা দিয়ে পৃথক পৃথক জাতিসত্তার গোড়ার বিচ্ছেদ যত বেশি পরিমাণে বিনষ্ট হয়, ততই বেশি পরিমাণে ইতিহাস হয়ে ওঠে বিশ্ব-ইতিহাস। এইভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে যদি এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় যেটা ভারতে আর চীনে অসংখ্য শ্রমিকের অন্ন কেড়ে নেয় এবং এইসব সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সমগ্র ধরনটাকে উলটে ফেলে দেয়, সেক্ষেত্রে এই উদ্ভাবনটা হয়ে ওঠে একটা বিশ্ব-ঐতিহাসিক তথ্য। কিংবা পক্ষান্তরে ধরা যাক চিনি আর কফির ব্যাপারটা, উনিশ শতকে এই দুটো জিনিসের বিশ্ব-ঐতিহাসিক গুরুত্ব সপ্রমাণ হয়েছে এই ঘটনাটা দিয়ে: 'নেপোলিয়নীয় মহাদেশীয় ব্যবস্থার' (১৫) দরুন এই জিনিস-দুটোর অভাব ঘটেছিল, তার ফলে জার্মানদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং এইভাবে সেটা হয়ে উঠেছিল ১৮১৩ সালের গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধগুলির আসল ভিত্তি। তার থেকে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের এই বিশ্ব-ইতিহাসে রূপান্তরিত হওয়াটা বাস্তবিকপক্ষে 'আত্মচেতনা', বিশ্ব-জীবাত্মা কিংবা অন্য কোন আধ্যাত্মিক অপচ্ছায়ার দিক থেকে একটা নিছক বিমূর্ত কৃতি নয়, এটা হল সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক এবং যা প্রায়োগিক উপায়ে যাচাই করা যায় এমন একটা কৃতি, যেটার প্রমাণ প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ তার যাওয়া-আসা, খাওয়া, পান করা এবং কাপড়-জামা পরার ভিতর দিয়ে যোগায়।

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাসে প্রায়োগিক উপায়ে লব্ধ একটা তথ্য নিশ্চয়ই এই যে, পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মানুষের কর্মবৃত্তি বিস্তারিত হয়ে বিশ্ব-ঐতিহাসিক কর্মবৃত্তিতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে তাদের দিক থেকে পরক একটা শক্তির দাসে পরিণত হয়েছে (সেই শক্তিটা হল একটা চাপ, যেটাকে তারা ধারণা করেছে তথাকথিত সর্বব্যাপী জীবাত্মা, ইত্যাদির পক্ষ থেকে একটা নোংরা ছলনা বলে), সেই শক্তিটা হয়ে উঠেছে ক্রমাগত বেশি বিপুল, আর শেষপর্যন্ত দেখা যায় সেটা হল **বিশ্ব-বাজার**। কিন্তু সমানই প্রায়োগিক উপায়ে এটা সপ্রমাণ হয়েছে যে, কমিউনিস্ট বিপ্লবে (সে-সম্বন্ধে আরও বলা হবে পরে) সমাজের বিদ্যমান অবস্থা উচ্ছেদ হলে, এবং এই অবস্থার সঙ্গে যা অভিন্ন সেই ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ হলে, জার্মান তত্ত্ববিদদের এত হতবুদ্ধি করে এই যে-শক্তিটা এটা মিলিয়ে যাবে; আরও সপ্রমাণ হয়েছে যে, ইতিহাস যে-পরিমাণে বিশ্ব-ইতিহাসে রূপান্তরিত হবে সেই পরিমাণেই তখন হাসিল হবে প্রত্যেকটি একক ব্যক্তি-মানুষের মুক্তি।* উপরে যা বলা হল তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তি-মানুষের সত্যিকারের মনোজাগতিক সম্পদ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে তার সত্যিকারের সংযোগ সম্পদের উপর। একমাত্র তখনই পৃথক পৃথক ব্যক্তি-মনুষ্যগণ বিভিন্ন জাতীয় আর স্থানীয় প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত হবে, সারা পৃথিবীর বৈষয়িক আর মনোজাগতিক উৎপাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক সংযোগ স্থাপিত হবে, আর তারা এমন অবস্থায় আসবে যাতে তারা সারা পৃথিবীর এই সর্বতোমুখী উৎপাদগুলির (মানুষের সমস্ত সৃষ্টির) অধিকারী হতে সমর্থ হবে। **সর্বাঙ্গীণ** নির্ভর হল ব্যক্তি-মনুষ্যগণের **বিশ্ব-ঐতিহাসিক** সহযোগের স্বাভাবিক আকার, এটা এই [২২] কমিউনিস্ট বিপ্লব দিয়ে রূপান্তরিত হবে এইসব শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতন কর্তৃত্বে, এই যেসব শক্তি মানুষের পরস্পরের উপর ক্রিয়া থেকে পয়দা হয়ে এযাবত তাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই পরক শক্তি হিসেবে তাদের অভিভূত করে এসেছে, তাদের উপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। এই অভিমতটাকে আবার দূরকল্পী-ভাববাদী অর্থাৎ উদ্ভট পরিভাষায় 'প্রজাতির স্বয়ং-উদ্ভব' ('বিষয়ী

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **চেতনা পয়দা হওয়া সম্বন্ধে।**

হিসেবে সমাজ') বলে প্রকাশ করা যেতে পারে, আর পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ধারাবাহিক শ্রেণীটাকে সেইভাবে ধারণা করা যেতে পারে একক ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে, যেটা নিজের উদ্ভব ঘটাবার অলৌকিক কান্ডটা করে ফেলে। এখানে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তি-মনুষ্যগণ নিশ্চয়ই **পরস্পরকে** গড়ে তোলে — শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে — কিন্তু তারা নিজেদের গড়ে তোলে সেন্ট ব্রুনোর প্রলাপ অনুসারেও নয়, কিংবা 'সেই অদ্বিতীয়, 'গড়া' মানুষের অর্থেও না।

শেষে, ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটার যে-নকশাটা আমরা দিলাম তার থেকে আমরা পাই আরও এইসব সিদ্ধান্ত: (১) উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের ধারায় একটা পর্ব আসে যখন এমনসব উৎপাদন-শক্তি আর সংসর্গের উপকরণ পয়দা হয় যেগুলো বিদ্যমান সম্পর্কের অবস্থায় ঘটায় শুধু অনিষ্ট, সেগুলো আর উৎপাদনকর নয়, সেগুলো ধ্বংসকর শক্তি (যন্ত্রপাতি এবং অর্থ); এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দেয় একটা শ্রেণী, সেটা সমাজের সমস্ত বোঝা বয়, কিন্তু সমাজের সুবিধেগুলো পায় না, সমাজ থেকে উচ্ছেদ করে সেটাকে [২৩] অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অতি নিশ্চিত বৈরী অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়; সেই শ্রেণীটা হয় সমাজের সমস্ত মানুষের সংখ্যাধিক অংশ, সেই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয় একটা মূলগত বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে চেতনা, কমিউনিস্ট চেতনা, এই শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তার ফলে অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও অবশ্য দেখা দিতে পারে এই চেতনা। (২) যে-পরিবেশে বিভিন্ন নির্দিষ্ট উৎপাদন-শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে সেটা হল সমাজের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসনের পরিবেশ, সেই শ্রেণীর মালিকানা থেকে উদ্ভূত সামাজিক ক্ষমতার **ব্যবহারিক**-আদর্শগত অভিব্যক্তি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ঘটে রাষ্ট্রের আকারে: কাজেই তখন অবধি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লক্ষ্য করে চালিত হয় প্রত্যেকটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম।* (৩) এখন অবধি সংঘটিত সমস্ত বিপ্লবে কর্মবৃত্তি-প্রণালী সবসময়ে অক্ষত থেকে গেছে, সেগুলো ছিল এই কর্মবৃত্তির শুধু ভিন্ন রকমের বণ্টনের প্রশ্ন,

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] জনসাধারণ উৎপাদনের বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখতে আগ্রহান্বিত।

অন্যান্য লোকের কাছে নতুন করে শ্রম-বণ্টনের প্রশ্ন, যদিও কমিউনিস্ট বিপ্লব চালিত হয় পূর্ববর্তী কর্মবৃত্তি-**প্রণালীর** বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট বিপ্লব রেহাই দেয় **শ্রমকে**,* আর শ্রেণীগুলোকেই সমেত সমস্ত শ্রেণীর শাসন লোপ করে, কেননা যে-শ্রেণী এই বিপ্লব সম্পাদন করে সেটা সমাজে আর শ্রেণী হিসেবে গণ্য নয়, শ্রেণী হিসেবে পরিচিত নয়, সেটা আপনাতেই বর্তমান সমাজের ভিতরকার সমস্ত শ্রেণী, জাতিসত্তা, ইত্যাদির অবসানের অভিব্যক্তি; তাছাড়া, (৪) এই কমিউনিস্ট চেতনা ব্যাপক পরিসরে পয়দা হবার জন্যে, আর কর্মব্রতটার আপনারই সাফল্যের জন্যে, উভয় প্রয়োজনে আবশ্যক গণ পরিসরে মানুষের পরিবর্তনসাধন, যে-পরিবর্তন ঘটতে পারে কেবল কার্যগত আন্দোলনে, **বিপ্লবে**; কাজেই এই বিপ্লব আবশ্যক, সেটা **শাসক** শ্রেণীকে অন্য কোন উপায়ে উচ্ছেদ করা যায় না এই কারণেই শুধু নয়, সেটা আরও এই কারণে যে, শাসক শ্রেণীটাকে **উচ্ছেদ করে** যে-শ্রেণী সেটা যুগযুগান্তরের যাবতীয় জঞ্জালের ভারমুক্ত হতে কৃতকার্য হতে পারে এবং সমাজটাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত হতে পারে কেবল বিপ্লবেই।**

---

* [নিম্নলিখিত কথাগুলি পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] ...যে-ধরনের কর্মবৃত্তির অবস্থায় [অমুকের] শাসন...

** [নিম্নলিখিত রচনাংশটা পাণ্ডুলিপিতে কেটে দেওয়া আছে:] যখন যেমন ইংলন্ডে আর জার্মানিতে তেমনি ফ্রান্সে সমস্ত কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হল বিপ্লবটার অবশ্যম্ভাবিতার কথা মেনে নিয়েছেন, সেন্ট ব্রুনো অচঞ্চল থেকে স্বপ্ন দেখেই চলেছেন, আর তিনি মনে করেন, 'আদৃত মানবতাবাদ' অর্থাৎ কমিউনিজম 'আত্মিকবাদের স্থান' (সেটার কোন স্থান নেই) নেবে শুধু যাতে সেটা শ্রদ্ধাস্পদ হতে পারে: তিনি স্বপ্নে আরও বলে চলেছেন, তখন নিঃসন্দেহে 'মোক্ষলাভ হবে, মর্ত হয়ে উঠবে স্বর্গ, স্বর্গ হবে মর্ত'। (ব্রহ্মবিদ্যাবিদটি এখনও স্বর্গের কথা ভুলতে অপারক।) 'তখন অনন্ত কালের আনন্দ আর পরম সুখ অনুরণিত হবে স্বর্গীয় সমতানের মাঝে' (১৪০ পৃঃ)। চার্চের এই ধার্মিক ফাদারটি মহা-বিস্মিত হবেন যখন তাঁকে পাকড়াও করবে রোজ কেয়ামত, যেদিন এই সবকিছু ঘটে যাবার কথা — যেদিন আকাশে জ্বলন্ত নগরীগুলির প্রতিবিম্ব উষার সূচনা করবে, যখন 'স্বর্গীয় সমতানের' সঙ্গে একত্রে তাঁর কানে অনুরণিত হবে 'মার্সেলেজ' আর 'কার্মেনিওল'-এর সুর, তাতে সংগত করবে কামানের অপরিহার্য গর্জন, তাল ঠুকবে গিলোটিন; দুষ্ট 'জনগণ' যখন উচ্চঃস্বরে গাইবে সা ইরা, সা ইরা, আর 'আত্মচেতনাকে' ঝুলিয়ে দেবে ল্যাম্প-পোস্টে (১৬)। 'অনন্ত কালের আনন্দ আর পরম সুখের' নৈতিক-

[৭। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণার সংক্ষিপ্তসার]

[২৪] ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণাটা নির্ভর করে কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যের উপর, সেগুলি হল: জীবনের আপনারই ভৌত উৎপাদন থেকে শুরু করে আসল উৎপাদন-প্রক্রিয়াটাকে বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা; সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এই প্রক্রিয়া দিয়ে সৃষ্ট সংসর্গ-রূপটাকে (অর্থাৎ, বিভিন্ন পর্বে নাগরিক সমাজ) উপলব্ধি করা; রাষ্ট্র হিসেবে এটার কর্মের মাঝে এটাকে দেখান, চেতনার সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বগত উৎপাদ আর আকারগুলির — ধর্ম, দর্শন, নীতিবিদ্যা, ইত্যাদি, ইত্যাদির — ব্যাখ্যা করা এবং সেই ভিত্তি থেকে সেগুলির উৎপত্তি আর ক্রমবৃদ্ধি নির্ধারণ করা, সেই উপায়ে অবশ্য গোটা ব্যাপারটার বর্ণনা করা যায় সেটার সাকল্যের মাঝে (কাজেই এইসব বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়াটাকেও)। ইতিহাস সম্বন্ধে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যা হয় সেইভাবে এটাকে প্রত্যেকটা কালপর্যায়ে একটা ধারণামৌলের সন্ধান করতে হয় না, এটা সর্বদা থাকে ইতিহাসের আসল **জমিনে;** এটা ভাব থেকে চালিতকর্মের ব্যাখ্যা করে না, বিভিন্ন ভাব গড়ে ওঠার ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করে বৈষয়িক চালিতকর্ম থেকে; তদনুসারে এটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, মানসিক সমালোচনা দিয়ে, 'আত্মচেতনায়' পরিণত করে কিংবা বিভিন্ন 'অপচ্ছায়া', 'অশরীরী মূর্তি', 'কল্পনা' (১৭), ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করে চেতনার সমস্ত রূপ আর উৎপাদগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না, সেটা করা যায় শুধু যেসব প্রকৃত সামাজিক সম্পর্ক এই ভাববাদী দমবাজি পয়দা করেছে সেগুলোকে কার্যক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে; ইতিহাসের, আর ধর্ম, দর্শন এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের তত্ত্বেরও চালিকাশক্তি সমালোচনা নয়, সেটা হল বিপ্লব। এটা দেখিয়ে দেয়

উন্নতিসাধক চিত্র অঙ্কনের আদৌ কোন কারণই নেই সেন্ট ব্রুনোর। রোজ কেয়ামতে সেন্ট ব্রুনোর আচরণটার ধারণাগত বর্ণনা দিয়ে পুলকিত হবার বাসনাটা আমরা ছেড়েই দিলাম। Prolétaires en révolution-কে ধারণা করতে হবে সমালোচনাকে উচ্ছেদ করতে অভিলাষী 'সারমর্ম', 'জনগণ' হিসেবে, কিংবা যে-জীবাত্মার এখনও কিন্তু বাউয়েরের ধ্যান-ধারণা হজম করার জন্যে আবশ্যক সংগতির ঊনতা আছে সেটার একটা 'নিঃসরণ' হিসেবে, সেটাও আবার স্থির করা দুষ্কর।

যে, 'জীবাত্মার জীবাত্মা'* হিসেবে 'আত্মচেতনায়' পরিণত হয়ে ইতিহাসের অবসান ঘটে না, এতে প্রত্যেকটা পর্বে পাওয়া যায় বৈষয়িক ফল: উৎপাদন-শক্তিসমূহের সমষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ইতিহাসক্রমে গড়ে-ওঠা সম্পর্ক, যা প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায় পায় পূর্বপুরুষের কাছ থেকে; উৎপাদন-শক্তিসমূহ, পুঁজিতহবিল এবং পরিবেশের পুঞ্জ, যাতে একদিকে বাস্তবিকই অদলবদল ঘটায় নতুন পুরুষ-পর্যায়, কিন্তু অন্যদিকে আবার এর জীবনের পরিবেশ নির্দিষ্ট করে এবং এতে প্রদান করে একটা নির্দিষ্ট বিকাশ, বিশেষ চরিত্র। এটা দেখিয়ে দেয় যে, পরিস্থিতি মানুষকে গড়ে [২৫] ঠিক যে পরিমাণে মানুষ গড়ে পরিস্থিতিটাকে।

উৎপাদন-শক্তিসমূহ, পুঁজিতহবিল এবং সংসর্গের সামাজিক রূপগুলির এই সমষ্টি, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ আর পুরুষ-পর্যায় বিদ্যমান অবস্থায় পায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটাকিছু হিসেবে, সেটা হল, যাকে দার্শনিকেরা ধারণা করেছেন 'সত্ত্ব' এবং 'মানুষের সারমর্ম' হিসেবে, আর যেটাকে তাঁরা দেবতুল্য করেছেন এবং আক্রমণ করেছেন, তার বাস্তব ভিত্তি: একটা বাস্তব ভিত্তি, যেটাকে 'আত্মচেতনা' আর 'অদ্বিতীয়' হিসেবে ধরে এইসব দার্শনিক সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, এর দরুন মানুষের বিকাশের উপর সেটার ক্রিয়াফল আর প্রভাবের দিক থেকে সেটা একটুও বিপর্যস্ত হয় না। বিভিন্ন পুরুষ-পর্যায় বিদ্যমান অবস্থায় পায় জীবনের এই যেসব পরিবেশ এগুলি এটারও নিষ্পত্তি করে যে, মাঝে-মাঝে সংঘটিত বৈপ্লবিক আলোড়ন বিদ্যমান সমগ্র ব্যবস্থাটাকে উচ্ছেদ করার মতো যথেষ্ট প্রবল হবে কিনা। একটা পরিপূর্ণ বিপ্লবের এইসব উপাদান যদি বর্তমান না থাকে (যথা, একদিকে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ, এবং অন্যদিকে বৈপ্লবিক জনগণ গঠন, যে-জনগণ বিদ্রোহ করে তখন অবধি সমাজের পৃথক পৃথক পরিবেশের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, আরও বিদ্রোহ করে তখন অবধি 'জীবন উৎপাদনের'ই বিরুদ্ধে, সমাজটার যা ভিত্তি ছিল সেই 'সমগ্র কর্মবৃত্তির' বিরুদ্ধে), সেক্ষেত্রে, কার্যক্ষেত্রের বিকাশ যতখানি সংশ্লিষ্ট সেদিক থেকে, এই বিপ্লবের **ভাব-ধারণাটা** ইতঃপূর্বে এক-শ' বার প্রকাশ করা হয়েছে কিনা সেটা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, যা প্রমাণ করছে কমিউনিজমের ইতিহাস।

---

* কথাটা ব্রুনো বাউয়েরের। — সম্পাঃ

[৮। ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ববর্তী, ভাববাদী ধারণার, বিশেষত হেগেলোত্তর জার্মান দর্শনের ভিত্তিহীনতা]

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটায় ইতিহাসের এই বাস্তব ভিত্তিটাকে হয় একেবারেই তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, নইলে সেটাকে বিবেচনা করা হয়েছে ইতিহাসের ধারার পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অবান্তর একটা গৌণ বিষয় হিসেবে। কাজেই ইতিহাস সবসময়ে লিখিত হওয়া চাই একটা বহিস্থ মানদণ্ড অনুসারে; যথার্থ জীবন উৎপাদন মনে হয় যেন আদিযুগীয় ইতিহাস, আর যা যথার্থ ঐতিহাসিক সেটা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অধিপার্থিব-বহির্ভূত একটাকিছু বলে প্রতীয়মান হয়। এই মতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টাকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়, আর তার থেকে সৃষ্টি করা হয় প্রকৃতি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধতা (antithesis)। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণার প্রবক্তারা কাজে কাজেই ইতিহাসে দেখতে পেরে উঠেছেন শুধু রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিক কৃতিগুলো, ধর্মীয় এবং সবরকমের তত্ত্বগত সংগ্রামগুলো, আর বিশেষত প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক যুগে তাঁদের **সেই যুগের বিভ্রান্তিতে শরিক হতে হয়েছে।** যেমন, কোন-একটা যুগের যদি এমন ধারণা থাকে যে, সেটা চালিত হয়েছে নিছক 'রাজনীতিক' কিংবা 'ধর্মীয়' প্রেরণা অনুসারে যদিও 'ধর্ম' আর 'রাজনীতি' হল সেটার প্রকৃত প্রেরণার বিভিন্ন আকারমাত্র, তাহলে ইতিহাসকার এই মত মেনে নেন। 'ভাবটা' — বিষয়ীভূত লোকসমষ্টির প্রকৃত চালিতকর্ম সম্বন্ধে তাদের 'ধারণাটা' — একমাত্র নির্ধারক, সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যেটা তাদের চালিতকর্মকে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করে। ভারতীয় আর মিসরীদের মধ্যে অপরিণত আকারে শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সেটা থেকে যখন তাদের রাষ্ট্রে আর ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা উদ্ভূত হয়, ইতিহাসকার মনে করেন বর্ণভেদপ্রথাটাই [২৬] সেই শক্তি যেটা পয়দা করেছে এই অপরিণত সামাজিক আকারটাকে।

ফরাসীরা আর ইংরেজরা ধরে থাকে অন্তত রাজনীতিক বিভ্রান্তি, যেটা মাঝারি ধরনে বাস্তবতার কাছাকাছি, কিন্তু জার্মানরা চলে যায় 'বিশুদ্ধ জীবাত্মার' রাজ্যে, আর ধর্মীয় বিভ্রান্তিকে করে তোলে ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ইতিহাস সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শন 'সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিতে' যা দাঁড়ায় সেটা

হল এই **সমগ্র** জার্মান ইতিহাস-লিখনের আখেরি পরিণতি; এই জার্মান ইতিহাস-লিখনের বিবেচনায় বিষয়টা বাস্তব আগ্রহের, এমনকি রাজনীতিক আগ্রহেরও প্রশ্ন নয়, এটা হল বিভিন্ন বিশুদ্ধ চিন্তার প্রশ্ন, সেগুলো কাজেকাজেই সেন্ট ব্রুনোর কাছে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় একগুচ্ছ 'চিন্তা' হিসেবে, যেগুলো পরস্পরকে গিলে যায় এবং শেষে যায় 'আত্মচেতনার' গ্রাসে*; ইতিহাসের ধারাটা 'নাইট্', দস্যু আর প্রেতাত্মাদের কাহিনী হিসেবে আরও সংগতিপূর্ণ হয়ে প্রতীয়মান হয় 'মহিমান্বিত' মাক্স স্টির্নারের কাছে, যিনি সাচ্চা ইতিহাস সম্বন্ধে জানেন না একেবারে কিছুই, যিনি ঐসব অপচ্ছায়া থেকে রক্ষা পান অবশ্য শুধু 'অপবিত্রতা' দিয়ে। এই ধারণাটা খাঁটি ধর্মীয়: এতে আদিম মানুষ হিসেবে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষ হল ইতিহাসের আরম্ভস্থল; জীবনোপায়ের এবং জীবন আপনারই প্রকৃত উৎপাদনের জায়গায় নানা অসার কল্পনার ধর্মীয় উৎপাদন স্থাপন করা হয় এটার অলীক কল্পনায়।

ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণাটার অবসান এবং এর ফলস্বরূপ উদ্ভূত বিভিন্ন বিবেকগত সংকোচ আর বিবেকের তাড়নার সঙ্গে একত্রে এই **সমগ্র** ধারণাটা জার্মানদের নিছক **জাতিগত** ব্যাপার, এটা জার্মানদের পক্ষে শুধু **স্থানীয়** আগ্রহজনক; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইদানীং কয়েক বার আলোচিত হয়েছে এই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা: আমরা যথার্থই কিভাবে 'উত্তীর্ণ হই ঈশ্বরের রাজ্য থেকে মানুষের রাজ্যে' — ভঙ্গিটা এই যে, এই 'ঈশ্বরের রাজ্য' যেন অলীক কল্পনায় ছাড়া কোথাও ছিল কখনও, আর এই পণ্ডিত ভদ্রলোকেরা যেন সর্বক্ষণ বাস করছিলেন না 'মানুষের রাজ্যে', যেখানে যাবার পথ তাঁরা এখন খুঁজছেন; আর ভঙ্গিটা এই যে, এই তত্ত্বগত ভুড়ভুড়ি-ফাটাবার রহস্যটার ব্যাখ্যা করার পাণ্ডিতী আমোদপ্রমোদটা (এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়) যেন, বিপরীতে, প্রকৃত পার্থিব পরিবেশে এটার উৎপত্তি প্রদর্শন করার ব্যাপার নয়। এই জার্মানদের বেলায় এটা সবসময়েই পূর্ববর্তী লেখকদের প্রলাপকে

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] ঐতিহাসিক পরিবেশকে কর্মব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে ধরে সেটা নিয়ে আলোচনা করাটাই তথাকথিত **বিষয়গত** ইতিহাস-লিখন। প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি।

[২৭] স্রেফ অন্য কোন উদ্ভটকিছুতে পরিণত করার ব্যাপার, অর্থাৎ এই যাবতীয় প্রলাপের একটা বিশেষ **অর্থ** আছে, যা আবিষ্কার করা যায়, এমনটা আগেই ধরে নেবার ব্যাপার; যখন প্রকৃতপক্ষে এটা শুধু হল এই তত্ত্বগত প্রসঙ্গকে বাস্তবিক বিদ্যমান পরিবেশ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রশ্ন। এইসব উক্তির সত্যিকারের, ব্যবহারিক অবসান ঘটবে, মানুষের চেতনা থেকে এইসব ধারণা দূর হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি দিয়ে, কিন্তু কোন তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত দিয়ে নয়, যা আমরা আগেই বলেছি। জনগণের বেলায়, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বেলায় এইসব তত্ত্বগত ধারণার অস্তিত্ব নেই, কাজেই তার অবসান ঘটাবার আবশ্যকতা নেই, আর যদি এই জনগণের কখনও কোন তত্ত্বগত ধারণা — যেমন, ধর্ম ইত্যাদি থেকে থাকে, সেগুলোর অবসান বহুকাল আগে ঘটে গেছে পরিস্থিতি দিয়ে।

'ঈশ্বর-মানুষ' (খৃষ্ট), 'মানুষ', ইত্যাদির মতো অলীক কল্পনা ইতিহাসের পৃথক পৃথক যুগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে এইসব তত্ত্ববিদ যেভাবে পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বাস করেন (সেন্ট ব্রুনো তো এমনটা পর্যন্ত বলেছেন যে, 'ইতিহাস হয়েছে কেবল সমালোচনা আর সমালোচকদের কৃতি') (১৮), তার থেকেও আবার দেখা যায় এইসব প্রশ্ন আর মীমাংসার জাতিগত প্রকৃতি, আর তাঁরা নিজেরা বিভিন্ন ইতিহাসতন্ত্র গড়ে তোলার সময়ে পূর্ববর্তী সমস্ত কালপর্যায়কে ঝটিতি ডিঙ্গিয়ে যান এবং তৎক্ষণাৎ চলে যান 'মঙ্গোলিজ্‌ম' (১৯) থেকে 'অর্থপূর্ণ মর্মবস্তুযুক্ত' ইতিহাসে, অর্থাৎ কিনা, 'Hallische' আর 'Deutsche Jahrbücher'-এর (২০) ইতিহাসে, আর হেগেলীয় মত-সম্প্রদায়টাকে একটা সর্বাত্মক কোঁদলে পর্যবসিত করেন। তাঁরা ভুলে যান অন্যান্য সমস্ত জাতিকে, সমস্ত প্রকৃত ঘটনা তাঁরা ভুলে যান, আর theatrum mundi-টা গণ্ডিবদ্ধ থাকে 'লাইপজিগ পুস্তক মেলায়', এবং 'সমালোচনা', 'মানুষ' আর 'অদ্বিতীয়'-এর পারস্পরিক ঝগড়াঝাঁটিতে।* এইসব তত্ত্ববিদ যদি কোন যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, আঠার শতক নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা দেন শুধু সেই যুগের ভাব-ধারণার ইতিহাস, যেসব ভাব-ধারণাকে তাঁরা তথ্যাদি এবং ঐসব ভাব-ধারণার পক্ষে মূলগত বাস্তব

---

* অর্থাৎ, ব্রুনো বাউয়ের, ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ এবং মাক্স স্টির্নার। — সম্পাঃ

বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন; এমনকি সেটাও তাঁরা করেন সেই কালপর্যায়টাকে একটা অসম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্ব হিসেবে, আসল ঐতিহাসিক যুগের, অর্থাৎ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালে জার্মানির দার্শনিক সংগ্রামের কালপর্যায়ের তখনও সীমাবদ্ধ পূর্ববর্তী পর্ব হিসেবে চিত্রিত করার জন্যে। যেমনটা অনুমান করা যেতে পারে, কোন অনৈতিহাসিক ব্যক্তি এবং তার খোশ-খেয়ালগুলোর জমক বিশিষ্ট করে দেখাবার উদ্দেশ্যে কোন একটা পূর্ববর্তী কালপর্যায়ের ইতিহাস লেখার সময়ে সমস্ত যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনার, এমনকি ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনীতির বাস্তবিক অনধিকার প্রবেশের ঘটনার উল্লেখ করা হয় না। তার বদলে আমরা পাই কোন আখ্যান, যেটার ভিত্তি নয় গবেষণা, ভিত্তি হল কোন খামখেয়ালী ব্যাখ্যা এবং জল্পনা সাহিত্য, যেমন আখ্যান সেন্ট ব্রুনো যুগিয়েছেন আঠার শতক সম্বন্ধে তাঁর অধুনা-বিস্মৃত ইতিহাসে (২১)। ভাব-ধারণার এইসব গালভরা বাক্যবাগীশ অহঙ্কারী ফেরিওয়ালারা, যাঁরা সমস্ত জাতিগত বদ্ধধারণার বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত বলে নিজেদের সম্বন্ধে কল্পনা করেন, তাঁরা এইভাবে বাস্তবে ঢকঢক করে বীয়ার-গেলা যে-কূপমন্ডুকেরা সংযুক্ত জার্মানির স্বপ্ন দেখে তাদের চেয়ে ঢের বেশি জাতীয়। অন্যান্য জাতির কীর্তিগুলিকে ঐতিহাসিক বলে তাঁরা স্বীকার করেন না: তাঁরা বেঁচে থাকেন জার্মানিতে, জার্মানির উদ্দেশে [২৮], এবং জার্মানির জন্যে: তাঁরা রাইন-গীতটাকে (২২) একটা ধর্মীয় স্তোত্রে পরিণত করেন, তাঁরা অ্যালসেস-লরেন জয় করেন ফরাসী রাষ্ট্রের বদলে ফরাসী দর্শনের ক্ষেত্রে ডাকাতি ক'রে, কোন কোন ফরাসী প্রদেশের বদলে ফরাসী ভাব-ধারণাকে জার্মানায়িত ক'রে। সেন্টদ্বয় ব্রুনো আর মাক্স তত্ত্বের সর্বব্যাপী প্রাধান্যের ভিতর দিয়ে জার্মানির সর্বব্যাপী প্রাধান্যের ঘোষণা করেন — তাঁদের সঙ্গে তুলনায় হের ভেনেডে জাতীয়-সংস্কারমুক্ত মানুষ।

[৯। ফয়েরবাখ সম্বন্ধে, ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর ভাববাদী ধারণা সম্বন্ধে বাড়তি সমালোচনা]

ফয়েরবাখ যখন ('Wigand's Vierteljahrsschrift', 1845, Band 2) 'সাধারণ মানুষ' এই পরিমিতকরণের কারণে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে

ঘোষণা করেছেন, (২৩) শেষোক্ত কথাটাকে 'মানুষের' একটা গুণে রূপান্তরিত করেছেন, আর সেটা দিয়ে তিনি ভেবেছেন বাস্তবে যে 'কমিউনিস্ট' শব্দটার অর্থ হল একটা নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক পার্টির অনুগামী সেটাকে একটা নিছক ধারণামৌলে পরিবর্তিত করা সম্ভব তাতে তিনি স্পষ্টতই আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ব্যাপারে ফয়েরবাখের গোটা সিদ্ধান্তটা শুধু এইটুকু প্রমাণ করে যে, মানুষ পরস্পরের পক্ষে আবশ্যক এবং **বরাবরই আবশ্যক ছিল**। তিনি চান এই তথ্যটা সম্বন্ধে চেতনা প্রবর্তন করতে, অর্থাৎ কিনা, একটা **বিদ্যমান** তথ্য সম্বন্ধে শুধু একটা সঠিক চেতনা পয়দা করতে — অন্যান্য তত্ত্ববিদদেরই মতো; যেক্ষেত্রে সাচ্চা কমিউনিস্টের বেলায় এটা হল বিদ্যমান পরিস্থিতি-হাল উচ্ছেদ করার প্রশ্ন। অধিকন্তু, আমরা পুরোপুরিই উপলব্ধি করি যে, স্রেফ **এই** তথ্যটা সম্বন্ধে চেতনা পয়দা করার চেষ্টায় ফয়েরবাখ এগোচ্ছেন ততদূর যার পরে কোন তত্ত্ববিদের পক্ষে আর তত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক থাকা সম্ভব নয়। তবে এটা একটা বিশেষক উপাদান যে, সেন্ট ব্রুনো আর সেন্ট মাক্স কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে ফয়েরবাখের ধারণাটাকে লুফে নিয়ে সেটা স্থাপন করেন আসল কমিউনিস্টের জায়গায় — এটা ঘটে, অংশত, যাতে তাঁরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারেন সেটাকে 'জীবাত্মার জীবাত্মা' হিসেবে, একটা দার্শনিক ধারণামৌল হিসেবে, একটা সমান প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে, আর, সেন্ট ব্রুনোর বেলায়, অংশত প্রায়োগিক কারণেও।

বিদ্যমান বাস্তবতাটাকে মেনে নেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ভুল বোঝায় যে-ব্যাপারটায় ফয়েরবাখ এখনও আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের শরিক, তার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা স্মরণ করছি 'Philosophie der Zukunft'-এর সেই রচনাংশটা, যাতে তিনি প্রসারিত করেছেন এই বিবেচনাধারাটাকে: একটা জিনিস কিংবা একজন মানুষের অস্তিত্বটা হল একই সঙ্গে সেটার কিংবা তার সারমর্ম (২৪), একটা প্রাণীর কিংবা ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের পরিবেশ, জীবনযাত্রা আর কর্মবৃত্তির প্রণালী হল তেমনটা যেমনটাতে সেটার কিংবা তার 'সারমর্ম' পরিতৃপ্ত বোধ করে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যতিক্রমকে বিবেচনা করা হয় স্পষ্টতই দুর্ভাগ্যজনক আকস্মিক ঘটনা হিসেবে, অস্বাভাবিকতা হিসেবে, যা বদলান যায় না। এইভাবে, লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়ান যদি তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ সম্বন্ধে কোনক্রমেই পরিতৃপ্তি বোধ না করে,

তাদের 'অস্তিত্ব' যদি [২৯] তাদের 'সারমর্মের' সঙ্গে মোটেই মানানসই না হয়, তাহলে, উদ্ধৃতিটা অনুসারে, সেটা হল একটা অপরিহার্য দুর্ভাগ্য, যেটাকে শান্তভাবে সয়ে চলতে হবে। লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়ান আর কমিউনিস্টরা কিন্তু ভাবে অন্যভাবে, সেটা তারা প্রমাণ করবে যথাসময়ে, যখন তারা কার্যগত উপায়ে, বিপ্লবের সাহায্যে তাদের 'অস্তিত্বটাকে' তাদের 'সারমর্মের' সঙ্গে মিলিয়ে-মানিয়ে নেবে। কাজেই ফয়েরবাখ এমনসব ক্ষেত্রে মানুষের জগৎটার কথা বলেন না কখনও, সবসময়েই তিনি আশ্রয় নেন বহিঃপ্রকৃতিতে, তাও আবার **সেই** প্রকৃতি যেটাকে মানুষ এখনও বশে আনে নি। কিন্তু প্রত্যেকটা নতুন উদ্ভাবন, শিল্পের প্রত্যেকটা অগ্রগতি এই রাজ্য থেকে আর-একটা টুকরো খসিয়ে দেয়, যার ফলে যেখানে এমনসব ফয়েরবাখীয় উপস্থাপনা বিশদ করার দৃষ্টান্ত পয়দা হয় সেই জমিনটা সমানে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। মাছের 'সারমর্ম' হল সেটার 'অস্তিত্ব', জল — এই একটামাত্র উপস্থাপনা ছাড়িয়ে না গেলে। মিঠে জলের মাছের 'সারমর্ম' হল নদীর জল। কিন্তু যেইমাত্র শিল্পের কাজে নদী ব্যবহৃত হতে থাকে, যেইমাত্র নদী নোংরা হয় রঞ্জক পদার্থ দিয়ে, আর নদীতে স্টীম-পোত চলাচল শুরু হয়, কিংবা যেইমাত্র নদীর জল ভিন্নমুখ করে বইয়ে দেওয়া হয় খালে, যেখানে মামুলি জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা মাছের অস্তিত্বের মাধ্যম কেড়ে নিতে পারে, অমনি নদীর জল আর মাছের 'সারমর্ম' থাকে না, সেটা আর মাছের অস্তিত্বের উপযোগী মাধ্যম নয়। এইরকমের সমস্ত দ্বন্দ্ব-অসংগতি হল অবশ্যম্ভাবী অস্বাভাবিকতা এই মর্মে ব্যাখ্যাটা 'মহিমান্বিত' মাক্স স্টির্নার অসন্তুষ্ট মানুষকে যে-সান্ত্বনা দেন তার থেকে মূলত পৃথক নয়, ঐ সান্ত্বনাবাক্যে তিনি বলেন, এই দ্বন্দ্ব-অসংগতি তাদের নিজেদেরই দ্বন্দ্ব-অসংগতি, এই দুর্গতি তাদের নিজেদেরই দুর্গতি, যার ফলে হয় তাদের মন খারাপ করা চলবে না, তাদের বিরাগ চেপে রাখতে হবে, নইলে সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে কোন একটা উদ্ভট উপায়ে। সেন্ট ব্রুনো যা বলে দেন সেটা থেকেও উল্লিখিত ব্যাখ্যার পার্থক্য তেমনিই সামান্য -- তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট লোকেরা 'সত্ত্বের' কাদায় আটকে গেছে, তারা এগিয়ে 'পরম আত্মচেতনায়' পেঁছিয় নি, এইসব প্রতিকূল পরিবেশ হল তাদের জীবাত্মার জীবাত্মা এটা তারা উপলব্ধি করে না, তার দরুনই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি।

[৩]

[১। শাসক শ্রেণী এবং কর্তৃত্বশালী চেতনা। ইতিহাসে জীবাত্মার আধিপত্য সংক্রান্ত হেগেলীয় ধারণা গঠন]

[৩০] প্রত্যেকটা যুগে শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণাই কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা, অর্থাৎ কিনা, যে-শ্রেণীটা সমাজে শাসনকারী **বৈষয়িক** শক্তি, সেটা একই সঙ্গে কর্তৃত্বকর **বুদ্ধিবৃত্তিগত** শক্তিও বটে। বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণে যে-শ্রেণীর আয়ত্তি থাকে সেটাই একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, মোটামুটি বলা যায়, এইভাবে, মানসিক উৎপাদনের উপায়-উপকরণ যাদের নেই তাদের ভাব-ধারণা ঐ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কর্তৃত্বশীল ভাব-ধারণা প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের ভাবগত অভিব্যক্তির চেয়ে, ভাব-ধারণা হিসেবে উপলব্ধ প্রাধান্যশালী বৈষয়িক সম্পর্কতন্ত্রের চেয়ে, আর তার থেকে, যেসব সম্পর্ক একটা শ্রেণীকে করে তোলে শাসক সেগুলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়, কাজেই এই শ্রেণীর প্রাধান্যের ভাব-ধারণা। যেসব ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে শাসক শ্রেণী তাদের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে থাকে চেতনা, কাজেই তারা চিন্তা করে। কাজেই যে-পরিমাণে তারা শাসন করে একটা শ্রেণী হিসেবে, আর কোন একটা যুগের প্রসার আর পরিধি নির্ধারণ করে, তাতে এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, তারা সেটা করে গোটা পাল্লা জুড়ে, এই কারণে তারা শাসন করে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ভাবুক হিসেবেও, ভাব-ধারণা সৃষ্টিকারী হিসেবেও, আর তাদের যুগের ভাব-ধারণার উৎপত্তি আর বণ্টন তারা নিয়ামিত করে: এইভাবে তাদের ভাব-ধারণা হয় সংশ্লিষ্ট যুগের কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা। যেমন, কোন একটা যুগে এবং কোন একটা দেশে যেখানে রাজকীয় ক্ষমতা, অভিজাতকুল আর বুর্জোয়ারা প্রভুত্বের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কাজেই যেখানে প্রভুত্ব অংশবিভক্ত, সেখানে বিভিন্ন ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদটা প্রাধান্যশালী ভাব বলে প্রতিপন্ন হয়, সেটা প্রকাশ পায় একটা 'চিরন্তন বিধানের' আকারে।

আমরা আগেই দেখেছি (পৃঃ [১৫-১৮])* শ্রমবিভাগ হল এখন

* এই খণ্ডের ৩৭-৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অবধি ইতিহাসের একটা মুখ্য শক্তি, সেটা শাসক শ্রেণীতেও প্রকাশ পায় মানসিক আর [৩১] বৈষয়িক শ্রমের বিভাগ হিসেবে, তার ফলে এই শ্রেণীর ভিতরে একাংশ দেখা দেয় শ্রেণীটার ভাবুক হিসেবে (শ্রেণীটার সক্রিয়, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন ভাবাদর্শবিদেরা, যারা শ্রেণীটার নিজের সম্বন্ধে বিভ্রান্তিটাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার কাজটাকে ধরে জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হিসেবে), আর এইসব ভাব-ধারণা আর বিভ্রান্তির প্রতি অন্যান্যের মনোভাবটা হয় অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় আর ভাবগ্রাহী, তার কারণ তারা হল বাস্তব ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর সক্রিয় সদস্যারা, নিজেদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব-ধারণা আর বিভ্রান্তি গড়ে তোলার জন্যে সময় তাদের অপেক্ষাকৃত কম। এই শ্রেণীটার ভিতরে অংশ-দুটোর মধ্যকার ফাট এমনকি একটাকিছু বিরুদ্ধতা আর বৈরিতায়ও পরিণত হতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সংঘর্ষ বাধলে শ্রেণীটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ঐ বিরুদ্ধতা আর বৈরিতা আপনা থেকেই উবে যায়, আর সেক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস ঘটে: কর্তৃত্বশালী ভাব-ধারণা যেন শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণা নয়, সেগুলোর যেন এই শ্রেণীটা থেকে স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা থাকে, এমন আপাতদৃষ্ট ছাপটাও মিলিয়ে যায়। বিশেষ কোন কালপর্যায়ে বৈপ্লবিক ভাব-ধারণার অস্তিত্ব বলতে বোঝায় সেখানে আগে থেকে একটা বৈপ্লবিক শ্রেণীর অস্তিত্ব; বৈপ্লবিক শ্রেণীর বিভিন্ন পত্তন সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে যথেষ্টই (পৃঃ [১৮-১৯, ২২-২৩])।*

ইতিহাসের ধারা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা যদি শাসক শ্রেণীর ভাব-ধারণাকে খাস শাসক শ্রেণীটা থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেগুলোতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি, অমুক কিংবা তমুক ভাব-ধারণা পয়দা হবার পরিবেশ এবং সেগুলোর পয়দাকারীদের সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি সেগুলো কোন একটা নির্দিষ্ট কালপর্যায়ে প্রাধান্যশালী ছিল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হই, তাহলে আমরা বলতে পারি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিজাতকুলের প্রাধান্যের কালে প্রাধান্যশালী ছিল সম্মান, বিশ্বস্ততা, ইত্যাদি ধারণা, বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের কালে — মুক্তি, সমতা, ইত্যাদি ধারণা। শাসক শ্রেণী মোটের উপর মনে করে, এমনটাই

---

* এই খণ্ডের ৪৩-৪৪ এবং ৪৭-৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বটে। ইতিহাস সম্বন্ধে এই যে-ধারণাটা সমস্ত ইতিহাসকারের বেলায় অভিন্ন, বিশেষত আঠার শতক থেকে, সেটা অনিবার্যভাবেই এই ব্যাপারটার বিপরীতে [৩২] এসে পড়বে: ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় বিমূর্ত ভাব-ধারণাই আধিপত্য করে, অর্থাৎ সেইসব ভাব-ধারণা যেগুলো সর্বজনীনতার আকার ধারণ করে। কেননা প্রত্যেকটা শাসক শ্রেণী পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণীর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে শুধু নিজ লক্ষ্য হাসিল করার জন্যেই নিজ স্বার্থটাকে সমাজের সমস্ত মানুষের সাধারণী স্বার্থ হিসেবে তুলে ধরতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ কিনা, ভাবগত আকারে প্রকাশ করলে কথাটা এই যে, ঐ শাসক শ্রেণীকে সেটার ভাব-ধারণাকে সর্বজনীনতার আকার দিতে হয়, আর সেগুলোকে একমাত্র যুক্তিসম্মত, সর্বব্যাপী বলবৎ ভাব-ধারণা হিসেবে চিত্রিত করতে হয়। যে-শ্রেণী বিপ্লব করে সেটা, অন্যান্য দিক ছাড়াও, একটা **শ্রেণীর** বিরুদ্ধতা করে শুধু এই কারণেই সেটা একেবারে শুরু থেকেই একটা শ্রেণী হিসেবে নয়, সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান হয়; একক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান সমগ্র সমাজ হিসেবে সেটা প্রতীয়মান হয়।* সেটা এমনটা করতে পারে তার কারণ হল এই যে, শুরুতে সেটার স্বার্থ বাস্তবিকই যেগুলি শাসক নয় এমন সমস্ত শ্রেণীর সাধারণী স্বার্থের সঙ্গেই বেশি পরিমাণে সংশ্লিষ্ট, তার কারণ এই যে, তদবধি বিদ্যমান পরিবেশের চাপে সেটার স্বার্থ তখনও একটা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ একটা স্বার্থ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে নি। কাজেই, অন্যান্য শ্রেণীর যেসব ব্যক্তি-মানুষ প্রাধান্যের অবস্থান লাভ করছে না এমন অনেকে লাভবান হয় সেটার জয়ের ফলে, কিন্তু তা শুধু এই পরিমাণে যাতে সেটা ঐসব ব্যক্তিকে শাসক শ্রেণীর মধ্যে উন্নীত হবার অবস্থায় স্থাপন করে। ফরাসী বুর্জোয়ারা যখন অভিজাতকুলের ক্ষমতা উচ্ছেদ করেছিল, তার ভিতর দিয়ে তারা বহু প্রলেতারিয়ানের প্রলেতারিয়েতের উপরে উঠে যাওয়া সম্ভব করেছিল, কিন্তু সেটা শুধু এই পরিমাণে যে, ঐসব প্রলেতারিয়ান হয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সর্বজনীনতা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির প্রতিষঙ্গী হয়: (১) শ্রেণী বনাম রাষ্ট্র, (২) প্রতিযোগিতা, পৃথিবীজোড়া সংসর্গ, ইত্যাদি, (৩) শাসক শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাশক্তি, (৪) সাধারণী স্বার্থের বিভ্রম (গোড়ায় বিভ্রান্তিটা যথার্থভিত্তিক), (৫) ভাবাদর্শবিদদের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং শ্রমবিভাগ।

গিয়েছিল বুর্জোয়া। কাজেই, প্রত্যেকটা নতুন শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণীর চেয়ে শুধু বিস্তৃততর ভিত্তিতে, কিন্তু পক্ষান্তরে, নতুন শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে-শ্রেণী শাসক নয় সেটার প্রতিযোগ পরে আরও তীব্র এবং প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। উভয় ব্যাপার থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে, এই নতুন শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম পরিচালিত হয় সেটার বেলায় লক্ষ্যটা হয় [৩৩] পূর্ববর্তী সমস্ত শ্রেণী যারা শাসক হবার চেষ্টা করেছিল তারা যতটা পেরেছিল তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত এবং মূলগতভাবে সমাজের পূর্ববর্তী পরিবেশের নাস্তিকরণ।

কোন একটা শ্রেণীর শাসন যেন শুধু কোন কোন ভাব-ধারণার শাসন, এই গোটা ঢঙটা স্বাভাবিকভাবে খতম হয় অবশ্য যেইমাত্র যে-রূপে সমাজটা সংগঠিত সেটা সাধারণভাবে আর শ্রেণীগত শাসন থাকে না, অর্থাৎ কিনা, যেইমাত্র বিশেষ একটা স্বার্থকে সাধারণ হিসেবে কিংবা 'সাধারণী স্বার্থকে' শাসক হিসেবে জাহির করার আবশ্যকতা আর থাকে না।

শাসক ব্যক্তিদের থেকে এবং, সর্বোপরি, উৎপাদন-প্রণালীর কোন একটা নির্দিষ্ট পর্ব থেকে উদ্ভূত সম্পর্কতন্ত্র থেকে শাসক ভাব-ধারণাকে যেইমাত্র পৃথক করে ধরা হয়, আর এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ইতিহাস সবসময়েই ভাব-ধারণার প্রভাবাধীন, তখন এইসব বিভিন্ন ভাব-ধারণা থেকে 'অনন্য ভাব', ধারণা, ইত্যাদিকে ইতিহাসে প্রাধান্যশালী শক্তি হিসেবে পৃথক করে নেওয়া, এবং এইভাবে এই সমস্ত পৃথক পৃথক ভাব আর ধারণাকে ইতিহাসে উদ্ভূত-হতে-থাকা অনন্য ধারণার পক্ষে 'আত্মনির্ধারণের বিভিন্ন রূপ' হিসেবে ধরা খুবই সহজ। তখন স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তটাও আসে যে, মানুষের সমস্ত সম্পর্কের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় মানুষ সংক্রান্ত ধারণা থেকে — সে মানুষ হল যেমনটা কল্পিত, মানুষের সারমর্ম, **মানুষ**। এটা করেছেন দূরকল্পী দার্শনিকেরা। 'Geschichtsphilosophie'-এর শেষে হেগেল নিজেই কবুল করেছেন, 'বিবেচনা করেছি কেবল **ধারণার** অগ্রগতি', তিনি ইতিহাসে তুলে ধরেছেন 'সাচ্চা theodicy'* (৪৪৬ পৃঃ)। এই অবস্থায় ফেরা যায় 'ধারণা'

* [গ্রীক theos, ঈশ্বর + dikē, ন্যায়] অমঙ্গলের অস্তিত্ব থেকে ঐশ ন্যায়পরতা প্রতিপাদন। — অনুঃ

যারা পয়দা করে তাদের কাছে তত্ত্ববিদ, ভাবাদর্শবিদ আর দার্শনিকদের কাছে — আর তখন এই সিদ্ধান্ত হয় যে, দার্শনিকেরা, ভাবুকেরা সর্বকালে ইতিহাসে প্রাধান্যশালী: যে-সিদ্ধান্তটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতঃপূর্বে ব্যক্ত করেছেন হেগেল (২৫)।

ইতিহাসে জীবাত্মার প্রাধান্য (স্টির্নার এটাকে বলেন ক্রমবিভাগতন্ত্র, hierarchy) প্রমাণ করার গোটা কৌশলটা এইভাবে নিম্নলিখিত তিনটে প্রচেষ্টায় গণ্ডিবদ্ধ।

[৩৪] ১ নং। প্রায়োগিক কারণে, প্রায়োগিক পরিবেশে এবং প্রায়োগিক ব্যক্তি হিসেবে যারা শাসন করে তাদের ভাব-ধারণাকে পৃথক করে নিতে হবে এইসব বাস্তবিক শাসকদের থেকে, আর এইভাবে মেনে নিতে হবে ইতিহাসে ভাব-ধারণার বা বিভিন্ন বিভ্রান্তির শাসন।

২ নং। ভাব-ধারণার এই শাসনের মধ্যে একটা অনুযায়িতা স্থাপন করতে হবে, পরম্পরাগত শাসক ভাব-ধারণাগুলির মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় সংযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে, সেটা হাসিল করা হয় সেগুলিকে 'ধারণার পক্ষে আত্মনির্ধারণের কৃতি' হিসেবে উপলব্ধি ক'রে (এটা সম্ভব, তার কারণ এইসব ভাব-ধারণার প্রায়োগিক ভিত্তি থাকার দরুন সেগুলি বাস্তবিকই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, আরও কারণ এই যে, **নিছক** ভাব-ধারণা হিসেবে কল্পিত হওয়ায় সেগুলি হয়ে ওঠে বিভিন্ন আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, চিন্তনের সাহায্যে সৃষ্টি-করা স্বাতন্ত্র্য।

৩ নং। এই 'আত্মনির্ধারক ধারণাটার' অতীন্দ্রিয় চেহারাটা দূর করার জন্যে সেটাকে একটা সত্তায় — 'আত্মচেতনায়' — রূপান্তরিত করা হয়, কিংবা সম্যক ভৌতিক রূপ দেবার জন্যে সেটাকে রূপান্তরিত করা হয় একটা সত্তাশ্রেণীতে, যারা ইতিহাসে 'ধারণার' স্থানাপন্ন হয়, রূপান্তরিত করা হয় বিভিন্ন 'ভাবুকে', 'দার্শনিকে', ভাবাদর্শবিদে, যাদের আবার ধরা হয় ইতিহাসের কারিগর হিসেবে, 'অভিভাবক পরিষদ' হিসেবে, শাসকগণ হিসেবে।* এইভাবে ভৌতিক উপাদানগুলির সাকল্যটাকে ইতিহাস থেকে অপসারিত করা হয়, তখন দূরকল্পী ঘোড়াটার রাশ ঢিলে করে দেওয়া যায় পুরোপুরি।

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মানুষ= 'বিচারশক্তিসম্পন্ন মানব-জীবাত্মা'।

জার্মানিতে আধিপত্য করছিল এই যে ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী সেটাকে এবং বিশেষত সেটার কারণটাকে বুঝতে হবে সাধারণভাবে ভাবাদর্শবিদদের বিভ্রান্তির সঙ্গে, অর্থাৎ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, রাজনীতিকদের (তাদের মধ্যে কার্যক্ষেত্রের রাষ্ট্রনায়কদেরও) বিভ্রান্তিগুলোর সঙ্গে সেটার সংযোগ থেকে, এইসব লোকের মতান্ধ স্বপ্নচারণা আর বিকৃতিগুলো থেকে; জীবনে তাদের বাস্তব অবস্থান, তাদের কাজ এবং শ্রমবিভাগ থেকে এটার ব্যাখ্যা মেলে অতি সহজেই।

[৩৫] যেখানে গতানুগতিক জীবনে কেউ যেমনটা ব'লে ভান করে, আর সে আসলে যা, তার মধ্যে পার্থক্যটা প্রত্যেকটি দোকানদার বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে, আমাদের ইতিহাসকারেরা এমনকি এই মামুলি অন্তর্দৃষ্টিটাও এখনও লাভ করেন নি। প্রত্যেকটা যুগের বক্তব্যটাকে তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই মেনে নেন, আর সেটা যা বলে এবং কল্পনা করে নিজের সম্বন্ধে সেটাকে তাঁরা যথার্থ বলে বিশ্বাস করেন।

[৪]

[১। উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ এবং মালিকানার বিভিন্ন রূপ]

...|* [৪০] প্রথমটা থেকে উদ্ভূত হয় উঁচু মাত্রায় গড়ে-ওঠা শ্রমবিভাগ এবং ব্যাপক বাণিজ্যের পত্তন; দ্বিতীয়টা থেকে উদ্ভূত হয় স্থানীয়তা। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মনুষ্যগণকে একত্রে জড়ো করা চাই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — তারা উৎপাদনের নির্দিষ্ট হাতিয়ারখানার পাশাপাশি পড়ে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোরই মতো।

এখানে তাহলে উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ারগুলো এবং সভ্যতার সৃষ্টি করা হাতিয়ারগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। খেতকে (জল, ইত্যাদি) উৎপাদনের একটা স্বাভাবিক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে, উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মনুষ্যগণ প্রকৃতির

---

* এখানে পান্ডুলিপির চারটে পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। — সম্পাঃ

অধীন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — কোন একটা শ্রমফলের অধীন। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রে মালিকানা (ভূমি-সম্পত্তি) দেখা দেয় সরাসর প্রাকৃতিক আধিপত্য হিসেবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — শ্রমের, বিশেষত পুঞ্জিত শ্রমের, পুঁজির আধিপত্য হিসেবে। প্রথম ক্ষেত্রটায় ধরেই নিতে হয় যে, ব্যক্তি-মনুষ্যগণ সম্মিলিত থাকে কোন বন্ধনী দিয়ে: পরিবার, গোষ্ঠী, ভূমি আপনিই, ইত্যাদি; দ্বিতীয় ক্ষেত্রটায় ধরেই নিতে হয় যে, তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র, তারা একত্র থাকে শুধু বিনিময় দিয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে — প্রধানত যা সংশ্লিষ্ট সেটা হল মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে বিনিময়, যাতে মানুষের শ্রমের বিনিময় হয় প্রকৃতির উৎপাদের বাবত; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হল প্রধানত মানুষের নিজেদের মধ্যে বিনিময়। প্রথম ক্ষেত্রে গড়, মানবীয় কান্ডজ্ঞানই যথাপ্রয়োজনীয় — কায়িক কর্মবৃত্তি তখনও মানসিক কর্মবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কায়িক আর মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগ ইতঃপূর্বে কার্যত নিষ্পন্ন। প্রথম ক্ষেত্রে — নাস্তিমানদের উপর অস্তিমানদের আধিপত্যের ভিত্তি হতে পারে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্প্রদায় গোছের কিছু; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চয়ই একটা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ভৌত আকার ধারণ করে, সেটা হল অর্থ। প্রথম ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প থাকে, কিন্তু উৎপাদনের স্বাভাবিক হাতিয়ার কাজে লাগান দিয়ে সেটা নির্ধারিত হয়, কাজেই বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে শ্রম-বণ্টন ছাড়াই; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্প থাকে কেবল শ্রমবিভাগের মাঝে এবং সেটার মারফত।

[৪১] এযাবত আমাদের পরীক্ষা-অনুসন্ধান শুরু হয়েছে উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে, আর ইতোমধ্যে দেখান হয়েছে যে, কোন কোন শিল্প-পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অপরিহার্য। Industrie extractive-এ এখনও ব্যক্তিগত মালিকানা হল শ্রমের সমস্থানিক; ক্ষুদ্র শিল্পে এবং এখন অবধি সমস্ত কৃষিকাজে মালিকানা হল উৎপাদনের বিদ্যমান হাতিয়ারগুলির অপরিহার্য পরিণতি; বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনের হাতিয়ার এবং ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি দেখা দেয় প্রথম, আর সেটা হল বৃহৎ শিল্পের উৎপাদ; অধিকন্তু, এই দ্বন্দ্ব-অসংগতিটাকে পয়দা করতে হলে বৃহৎ শিল্প অগ্রসর হওয়া চাই উঁচু মাত্রায়। এইভাবে, বৃহৎ শিল্প হলে, একমাত্র তবেই ব্যক্তিগত মালিকানার লুপ্তি সম্ভব হয়ে ওঠে।

[২। ভৌত আর মানসিক শ্রমের বিভাগ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছেদ। গিল্ড-ব্যবস্থা]

ভৌত আর মানসিক শ্রমের সবচেয়ে মস্ত বিভাগ হল শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিভাগ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় আদিম অবস্থা থেকে সভ্যতায়, গোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রে, স্থানীয়তা থেকে জাতিতে উত্তরণ দিয়ে, আর সেটা চলে আসছে এখনকার দিন অবধি সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসের ভিতর দিয়ে [শস্য-আইনবিরোধী লীগ (২৬)]।

শহর থাকলে একই সঙ্গে বোঝায় সেটার বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অপরিহার্য উপাদান — প্রশাসন, পুলিস, কর, ইত্যাদি, এককথায়, পৌরসংঘ, এবং তার থেকে সাধারণভাবে রাজনীতি। এখানে প্রথম স্পষ্টপ্রতীয়মান হয় দুটো মস্ত শ্রেণীতে জনসমষ্টির বিভাগ, যেটার সরাসর ভিত্তি হল শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদনের হাতিয়ার। শহর হল ইতোমধ্যে বাস্তবিকপক্ষে জনসমষ্টি, উৎপাদনের হাতিয়ার, পুঁজি, আমোদপ্রমোদ, চাহিদার সমাহরণকেন্দ্র, আর গ্রামাঞ্চলে প্রকটিত হয় সেটার বিপরীত অবস্থাটা — বিচ্ছিন্নতা আর পৃথকীকরণ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বিরোধ থাকতে পারে কেবল ব্যক্তিগত মালিকানার কাঠামের ভিতরে। এটা হল শ্রমবিভাগের কাছে, ব্যক্তি-মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা ধরা-বাঁধা কর্মবৃত্তির কাছে তার অধীনতার অতি উৎকট অভিব্যক্তি — এই অধীনতা একজনকে গণ্ডিবদ্ধ শহুরে প্রাণীতে পরিণত করে, অন্য জনকে পরিণত করে গণ্ডিবদ্ধ গ্রামীণ প্রাণীতে, আর প্রতিদিন নতুন করে পয়দা করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত। শ্রমই এখানেও আবার মুখ্য বস্তুটা, ব্যক্তি-মানুষের **উপর** ক্ষমতা, শেষোক্তটা যতকাল বিদ্যমান ততকাল নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানা। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বিরোধের লুপ্তি হল [৪২] সাধারণী জীবনের প্রথম পূর্বশর্তগুলোর একটা, যে-পূর্বশর্তটা আবার নির্ভর করে একগাদা ভৌত পত্তনের উপর, সেটা মিটতে পারে না স্রেফ ইচ্ছা দিয়ে, যা যে-কেউ দেখতে পারে প্রথম নজরেই। (এইসব পূর্বশর্তের দফাওয়ারী বিবরণ এখনও দেওয়া হয় নি।) শহর আর গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছেদটাকে আরও ধরা যেতে পারে পুঁজি আর ভূমি-সম্পত্তির বিচ্ছেদ হিসেবে,

ভূমি-সম্পত্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পুঁজির অস্তিত্ব আর সম্প্রসারণের সূচনা হিসেবে — কেবল শ্রম আর বিনিময় যেটার ভিত্তি সেই মালিকানার সূচনা।

মধ্যযুগের শহরগুলি কোন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে তৈরি অবস্থায় আসে নি, সেগুলিকে নতুন করে গড়েছিল মুক্তি-পাওয়া ভূমিদাসেরা, সেইসব শহরে প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ ধরনের শ্রম ছিল তার একমাত্র সম্পত্তি, আর তাছাড়া ছিল তার সঙ্গে আনা সামান্য পুঁজি, যেটা প্রায় সম্পূর্ণতই ছিল তার বৃত্তির অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। অবিরাম শহরে পালিয়ে আসা ভূমিদাসদের প্রতিযোগিতা, শহরগুলোর বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলের অবিরাম যুদ্ধ এবং তার থেকে পৌরসংঘাধীন সংগঠিত সামরিক শক্তির আবশ্যকতা, কোন বিশেষ ধরনের শ্রমের ক্ষেত্রে এজমালি মালিকানার বন্ধনী, যখন কারিগররা ছিল আবার ব্যাপারীও সেই অবস্থায় তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্যে সাধারণী ঘর-বাড়ির আবশ্যকতা, আর তার ফলস্বরূপে এইসব ঘর-বাড়ি থেকে অনধিকারীদের বাদ দেওয়া, বিভিন্ন বৃত্তির স্বার্থের মধ্যে সংঘাত, তাদের কষ্টার্জিত দক্ষতা নিরাপদ করার আবশ্যকতা, এবং গোটা দেশের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন: এইগুলি ছিল প্রত্যেকটা বৃত্তির শ্রমিকদের গিল্ডে সম্মিলিত হবার কারণ। পরবর্তী ইতিহাসক্রমিক ঘটনাবলির ভিতর দিয়ে গিল্ড-ব্যবস্থায় যে বহুবিধ অদলবদল দেখা দেয় তা নিয়ে আমাদের এখানে আর আলোচনা করা আবশ্যক নয়। ভূমিদাসদের পালিয়ে শহরে চলে যাওয়াটা অবিরাম চলেছিল গোটা মধ্যযুগ জুড়ে। গ্রামাঞ্চলে মনিবদের হাতে নির্যাতিত এইসব ভূমিদাস শহরে গিয়েছিল আলাদা-আলাদা, শহরে তারা দেখতে পেয়েছিল সংগঠিত সম্প্রদায়, তার বিরুদ্ধে তারা ছিল ক্ষমতাধীন সেখানে তাদের শ্রমের জন্যে চাহিদা এবং তাদের সংগঠিত শহুরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থ অনুসারে যে-বৃত্তি নির্দেশ করা হয়েছিল সেটায় তাদের অধীন হতে হয়েছিল। আলাদা-আলাদা এসে এইসব শ্রমিক কখনও কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি, কেননা যা শিখে নিতে হয় এমন গিল্ড ধরনের যদি হত তাদের কাজ, সেক্ষেত্রে গিল্ডের কর্তারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে তাদের বশ্যতা স্বীকার করাত এবং তাদের সংগঠিত করত নিজেদের স্বার্থ অনুসারে; নইলে, যা শিখে নিতে হয় এমন যদি না হত তাদের কাজ, কাজেই তাদের কাজ যদি না হত গিল্ড ধরনের, তাহলে তারা হয়ে যেত দিনমজুর, তারা কখনও সংগঠিত হয়ে উঠতে

পারে নি, অসংগঠিত জনতা হয়েই থেকে গেছে। শহরগুলিতে দিনমজুরের প্রয়োজন ছিল, সেটাই সৃষ্টি করেছিল এই জনতা।

এইসব শহর ছিল যথাভিহিত 'পরিমেল' (২৭), সেগুলো পয়দা হয়েছিল সরাসর [৪৩] প্রয়োজন অনুসারে — সম্পত্তি নিরাপদ করার ব্যবস্থার জন্যে, আর উৎপাদনের উপকরণ বহুলীকরণ এবং পৃথক পৃথক সদস্যদের রক্ষাব্যবস্থার জন্যে উৎকণ্ঠা থেকে। এইসব শহরের এই জনতার কোন ক্ষমতা ছিল না; তারা ছিল পরস্পরের অচেনা, শহরে গিয়েছিল আলাদা-আলাদা; যুদ্ধের জন্যে সশস্ত্র এবং তাদের উপর সন্দিগ্ধভাবে নজর-রাখা একটা সংগঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তারা ছিল অসংগঠিত। জার্নিম্যান এবং শিক্ষানবিসরা প্রত্যেকটা বৃত্তিতে সংগঠিত হত যেমনটা কর্তাদের স্বার্থের দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী। তাদের এবং তাদের কর্তাদের মধ্যকার গোষ্ঠীপতিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে ঐ কর্তারা পেত দ্বিবিধ ক্ষমতা — একদিকে, জার্নিম্যানদের সমগ্র জীবনের উপর তাদের প্রভাবের কারণে, আর অন্যদিকে এই কারণে যে, একই কর্তার অধীনে কাজ করত যেসব জার্নিম্যান, তাদের পক্ষে সেটা ছিল একটা যথার্থ বন্ধনী, যেটা অন্যান্য কর্তাদের জার্নিম্যানদের বিরুদ্ধে তাদের একত্র করে রাখতে এবং এদের থেকে তাদের পৃথক করে ফেলত। শেষে, নিজেরাই কর্তা হয়ে উঠবে, স্রেফ এই আগ্রহটা দিয়ে জার্নিম্যানরা বাঁধা থাকত বিদ্যমান ব্যবস্থাটার সঙ্গে। কাজেই, সমগ্র পৌরসংঘ ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে জনতা অন্তত বিভিন্ন বিদ্রোহ করেছিল, তাদের ক্ষমতাহীনতার দরুন সেসব বিদ্রোহ একেবারেই অকার্যকর থেকে গিয়েছিল, জার্নিম্যানরা কিন্তু পৃথক পৃথক গিল্ডের ভিতরে বিভিন্ন ছোটখাটো অবাধ্যতার চেয়ে বেশি কিছু করে নি, তেমন অবাধ্যতা গিল্ড-ব্যবস্থার একেবারে প্রকৃতিরই অঙ্গ-উপাদান। মধ্যযুগের মস্ত মস্ত সমস্ত অভ্যুত্থানেরই উদ্ভবকেন্দ্র ছিল গ্রামাঞ্চল, কিন্তু কৃষকদের বিচ্ছিন্নতা এবং সেটা থেকে পয়দা-হওয়া তাদের আনাড়িপনার দরুন সেগুলি সমানই একেবারেই অকার্যকর থেকে গিয়েছিল।

এইসব শহরে পুঁজি ছিল স্বাভাবিকভাবে পাওয়া পুঁজি — একটা বাসস্থান, সংশ্লিষ্ট বৃত্তির হাতিয়ারগুলো আর স্বাভাবিক, বংশগত খদ্দেরদের নিয়ে ছিল সেই পুঁজি; বাণিজ্যের অনগ্রসরতা এবং প্রচলনের ঊনতার দরুন সেটাকে নগদ টাকায় পরিণত করা যেত না বলে সেটা বাপ থেকে বেটার

কাছে হস্তান্তরিত হত। আধুনিক পুঁজির মূল্য স্থির করা যায় টাকায়, সেটাকে বিনিয়োগ করা যায় এখানে কিংবা সেখানে, তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু ঐ পুঁজি তেমন নয়, ঐ পুঁজি সরাসরি সংযুক্ত ছিল মালিকের বিশেষ ধরনের কাজের সঙ্গে, ছিল সেটা থেকে অবিচ্ছেদ্য, আর সেই পরিমাণে সেটা ছিল **স্থাবর** পুঁজি।

শহরগুলিতে পৃথক পৃথক গিল্ডের মধ্যে [৪৪] শ্রমবিভাগ তখন অবধি ছিল [একেবারে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত],* আর গিল্ডগুলিতে সেটা পৃথক পৃথক শ্রমিকদের মধ্যে আদৌ গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি কারিগরকে গোটা একগুচ্ছ কাজে সুদক্ষ হতে হত, যাকিছু তৈরি করা দরকার ছিল সেইসবই তাকে তার হাতিয়ারগুলির দিয়ে তৈরি করতে সক্ষম হতে হত। গণ্ডিবদ্ধ বাণিজ্য এবং পৃথক পৃথক শহরের মধ্যে যৎসামান্য যোগাযোগ, জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং সীমাবদ্ধ চাহিদার দরুন উচ্চতর মাত্রায় শ্রমবিভাগ গড়ে উঠতে পারে নি, কাজেই যারা কর্তা হয়ে উঠতে চাইত তাদের প্রত্যেককে নিজ গোটা বৃত্তিতে সুদক্ষ হতে হত। এইভাবে, মধ্যযুগীয় কারিগরদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বিশেষ ধরনের কাজ এবং তাতে সুদক্ষতার প্রতি আগ্রহ, যেটা একটা সীমাবদ্ধ কলাবিদ্যাবোধে উন্নীত হতে পারত। ঠিক এই কারণেই কিন্তু মধ্যযুগের প্রত্যেকটি কারিগর একেবারেই ডুবে থাকত নিজের কাজে, এই কাজের সঙ্গে তার ছিল একটা বশংবদ দাসসুলভ সম্পর্ক, সেই কাজের অধীন থাকত আধুনিক শ্রমিকের চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে, আধুনিক শ্রমিকের কাজটা কী তাতে তার বড় একটা এসে যায় না।

[৩। আরও শ্রমবিভাগ। বাণিজ্য আর শিল্পের বিচ্ছেদ। বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগ। ম্যানুফ্যাকচার**]

শ্রমবিভাগের পরবর্তী সম্প্রসারণ হল উৎপাদন আর বাণিজ্যের বিচ্ছেদ, একটা বিশেষ ব্যাপারী শ্রেণী গঠন; কোন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে চলে-

* এখানে পাণ্ডুলিপি খারাপ। — সম্পাঃ

** ম্যানুফ্যাকচার — শ্রমবিভাগ আর হাতে কাজের ভিত্তিতে সংগঠিত পুঁজিতান্ত্রিক কর্পোরেশন। পুঁজিতন্ত্রের আমলে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাথমিক রূপ। — সম্পাঃ

আসা শহরগুলিতে এই বিচ্ছেদ এসেছিল উত্তরাধিকারসূত্রে (অন্যান্যের মধ্যে ইহুদিদের ক্ষেত্রে), আর সেটা শিগগিরই দেখা দিয়েছিল নতুন গড়া শহরগুলিতে। লাগাও অঞ্চলগুলি ছাড়িয়ে বাণিজ্যিক যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখা দিল তার সঙ্গে সঙ্গে; এই সম্ভাবনাটাকে বাস্তবে পরিণত করা নির্ভর করত কয়েকটা বিষয়ের উপর: যোগাযোগের উপায়াদি যা ছিল; গ্রামাঞ্চলে জন-নিরাপত্তার অবস্থা, সেটা কতখানি তা নির্ভর করত রাজনৈতিক পরিবেশের উপর (এটা তো সুবিদিত যে, সমগ্র মধ্যযুগে ব্যাপারীরা যাতায়াত করত সশস্ত্র দলবদ্ধ হয়ে, ক্যারাভ্যানে); সংসর্গের পক্ষে অধিগম্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত স্থূল কিংবা অপেক্ষাকৃত মার্জিত চাহিদা (তা নির্ভর করত সেখানকার সাংস্কৃতিক মানের উপর)।

বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধা সৃষ্টি হয়, শহরের লাগাও অঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে ব্যাপারীদের মারফত বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় উৎপাদন আর বাণিজ্যের মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়া। শহরগুলোর **পরস্পরের মধ্যে** সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এক শহর থেকে অন্য শহরে যায় নতুন নতুন হাতিয়ার, আর উৎপাদন এবং বাণিজ্যের মধ্যে বিচ্ছেদের ফলে অচিরেই নতুন উৎপাদন-বিভাগ পয়দা হয় [৪৫] পৃথক পৃথক শহরগুলির মধ্যে, তার প্রত্যেকটা শহর শিগগিরই শিল্পের একটা প্রাধান্যশালী শাখা কাজে লাগাতে থাকে। পূর্ববর্তী কালপর্যায়গুলির স্থানীয় বাধানিষেধগুলো ক্রমে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

কোন একটা এলাকার উৎপাদন-শক্তিগুলো, বিশেষত উদ্ভাবনগুলো পরবর্তী বিকাশের বেলায় খোয়া যাবে কিনা সেটা নির্ভর করে স্রেফ বাণিজ্যের প্রসারের উপর। লাগাও অঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে বাণিজ্য যতকাল থাকে না, প্রত্যেকটা উদ্ভাবন প্রত্যেকটা এলাকায় করতে হয় আলাদা-আলাদা, কোন অসভ্য জাতির অতর্কিত আক্রমণ, এমনকি মামুলি যুদ্ধবিগ্রহের মতো স্রেফ আকস্মিক ঘটনার ফলেই অগ্রসর উৎপাদন-শক্তি আর চাহিদা যার আছে এমন একটা দেশকে আবার নতুন করে শুরু করতে হয় একেবারে শুরু থেকেই। আদিম ইতিহাসে প্রত্যেকটা এলাকাকে প্রত্যেকটা উদ্ভাবন নতুন করে করতে হয়েছিল প্রতিদিন এবং স্বতন্ত্রভাবে। এমনকি অপেক্ষাকৃতভাবে খুবই ব্যাপক বাণিজ্য থাকলেও, উঁচু মাত্রায় উন্নীত উৎপাদন-শক্তিসমূহ একেবারে

ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ থেকে কত সামান্যই নিরাপদ তার প্রমাণ হল ফিনিশীয়রা*, — বাণিজ্য থেকে এই জাতিটা উচ্ছেদ হবার ফলে, আলেক্‌জান্ডারের দখল এবং তার পরিণতিতে জাতিটার অবনতির দরুন তাদের উদ্ভাবনগুলোর বেশির ভাগই দীর্ঘকাল যাবত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তেমনি, দৃষ্টান্তস্বরূপ মধ্যযুগে কাচ-চিত্রণ। শুধু যখন বাণিজ্য হয়ে ওঠে বিশ্ব-বাণিজ্য এবং সেটার ভিত্তি হয় বৃহদায়তনের শিল্প, সমস্ত জাতি যখন গিয়ে পড়ে প্রতিযোগিতার সংগ্রামের মধ্যে, তখন আয়ত্ত-করা উৎপাদন-শক্তির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগের সরাসর ফল হল ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্যসমূহের উদ্ভব, গিল্ড-ব্যবস্থার পরিধি ছাপিয়ে বেড়ে-ওঠা উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা। বৈদেশিক জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পত্তনের আওতায় এইসব জাতদ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন হয়েছিল ইতালিতে এবং পরে ফ্ল্যান্ডার্সে। অন্যান্য দেশে, যেমন ইংলন্ডে আর ফ্রান্সে এইসব জাতদ্রব্য প্রথমে গণ্ডিবদ্ধ ছিল দেশীয় বাজারে। আগেই যা উল্লেখ করা হয়েছে সেইসব পত্তন ছাড়াও, এইসব জাতদ্রব্য নির্ভর করে জনসমষ্টির ইতোমধ্যে বর্ধিত সমাবেশের উপর, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, আর পুঁজি পুঞ্জিত হবার উপর, সেটা শুরু হয়েছিল বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে — গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও অংশত গিল্ডগুলিতে, আর অংশত ব্যাপারীদের মধ্যে।

[৪৬] যে-শ্রমে প্রথম থেকেই বোঝায় অতি আনাড়ি ধরনের হলেও যন্ত্রের আবশ্যকতা, সেটা অচিরেই দেখা গেল বিকশিত হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। আগে কৃষকেরা গ্রামাঞ্চলে কাপড় বুনত নিজেদের পোশাক জোটাবার জন্যে একটা আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসেবে — বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সর্বপ্রথমে তৎপরতা সৃষ্টি হল সেই শ্রমে, সেটা আরও সম্প্রসারিত হল। কাপড়বোনা ছিল এবং রয়ে গেল প্রধান ম্যানুফ্যাকচার। জনসংখ্যা বাড়ল; ত্বরিত প্রচলনের ফলে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পুঞ্জিত এবং চলিত হল স্বাভাবিক পুঁজি; তার থেকে পয়দা হল বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, সাধারণভাবে বাণিজ্যের ক্রমপ্রসার হল সেই চাহিদার পক্ষে অনুকূল — এই সবকিছুর ফলে পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্যে কাপড়ের চাহিদা বেড়ে চলল, সেটা কাপড়বোনাতে জোগাল

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] মধ্যযুগে কাচ ম্যানুফ্যাকচার।

পরিমাণগত এবং গুণগত প্রোৎসাহন, যেটা কাপড়বোনার কাজটাকে সেটার তদবধি প্রচলিত ধরন থেকে টেনে বের করে নিল। কৃষকেরা কাপড় বুনত নিজেদের ব্যবহারের জন্যে, তারা সেই ধরনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, এখনও চালায়, শহরগুলিতে তাদের পাশাপাশি দেখা দিল একটা নতুন শ্রেণীর তাঁতিরা, তাদের বোনা কাপড় হল গোটা দেশীয় বাজারের জন্যে, আর সাধারণত বৈদেশিক বাজারের জন্যেও।

কাপড়বোনার কাজটায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দক্ষতা আবশ্যক হয় সামান্যই, এই বৃত্তিটা অচিরেই অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র প্রকৃতিটাই যা তাতে গিল্ডের বাধা-নিষেধগুলো এক্ষেত্রে ঢুকতে পারে নি। কাজেই কাপড়বোনা বেশির ভাগই চলত বিভিন্ন গ্রামে এবং বাজার-কেন্দ্রে, গিল্ড সংগঠন ছাড়াই, আর ঐসব গ্রাম আর বাজার-কেন্দ্র ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শহর — বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা দেশে সবচেয়ে বাড়-বাড়ন্তের শহর।

গিল্ড থেকে মুক্ত ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানার সম্পর্কও দ্রুত বদলে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত স্থাবর পুঁজির পরিধি ছাড়িয়ে প্রথম অগ্রগতিটা ছিল এই যে, এমনসব ব্যাপারীরা দেখা দিল যাদের পুঁজি শুরু থেকেই ছিল অস্থাবর, আধুনিক অর্থের পুঁজি — অবশ্য তখনকার কালের পরিস্থিতি অনুসারে যতখানি বলা যেতে পারে সেই পরিমাণে আধুনিক অর্থের পুঁজি। দ্বিতীয় অগ্রগতি ঘটল ম্যানুফ্যাকচারের সঙ্গে সঙ্গে, তাতেও আবার এক-রাশ পুঁজি চলতি হয়ে উঠল, আর সব মিলিয়ে অস্থাবর পুঁজির রাশিটা হয়ে দাঁড়াল স্বাভাবিক পুঁজিরাশির চেয়ে বেশি।

সেই একসঙ্গেই ম্যানুফ্যাকচার হল গিল্ড থেকে বাদ-পড়া কিংবা অল্প পারিশ্রমিক-পাওয়া কৃষকদের আশ্রয়স্থল, ঠিক যেমন আগে গিল্ড শহরগুলি আশ্রয়স্থল [হয়েছিল] [৪৭] [ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের পীড়ন থেকে পলাতক]* কৃষকদের জন্যে।

ম্যানুফ্যাকচারের সূত্রপাতের একসঙ্গেই এসেছিল একটা ভবঘুরেমির কালপর্যায়, সেটা ঘটেছিল এইসব কারণে: সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার চাকর-

---

* এখানে পান্ডুলিপি খারাপ। — সম্পাঃ

বাকর-পোষ্যদের দলগুলোকে লোপ করা হয়েছিল; ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে রাজাদের পক্ষে লড়ার যে-বাহিনীগুলো দলে-দলে লোকের ভিড়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল সেগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল; কৃষির উন্নতি ঘটেছিল, মস্ত মস্ত চাষের জমিকে করে ফেলা হয়েছিল পশুচারণভূমি। এই ভবঘুরেমি যে কতখানি নির্দিষ্টভাবেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেবল এই ব্যাপারটা থেকেও। অনেক আগে, সেই তের শতকেই দেখা যায় এইরকমের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যুগ, তবে এই ভবঘুরেমি বহুবিস্তৃত এবং স্থায়ী হয়ে দেখা দিয়েছিল শুধু পনর শতকের শেষ আর ষোল শতকের গোড়ার দিকে। ভবঘুরেরা সংখ্যায় এতই বেশি ছিল যাতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডের ৮ম হেনরি তাদের ৭২০০০ জনকে ফাঁসি দিয়েছিল, তাদের কাজ করতে রাজি করানটা ছিল অত্যন্ত কঠিন, তা করা হত যখন সেটা ছাড়া কিছুতেই চলত না, আর সেক্ষেত্রেও তারা গোঁ ধরে বেয়াড়াপনা করত বিস্তর, তবে রাজি হত। ম্যানুফ্যাকচারের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে, বিশেষত ইংলন্ডে তারা ক্রমে কাজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল।

ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্য দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক — বাণিজ্যের জন্যে কাড়াকাড়ি, যার নিষ্পত্তি হত যুদ্ধে এবং বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্ক আর বাধা-নিষেধ দিয়ে — কিন্তু পক্ষান্তরে, আগে বিভিন্ন জাতি, যে-পরিমাণে তারা আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিল তাতে, পরস্পরের সঙ্গে চালাত নিরীহ বিনিময়। তখন থেকে বাণিজ্যের একটা রাজনীতিক তাৎপর্য দেখা দিল।

ম্যানুফ্যাকচার দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আর মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক বদলে গেল। গিল্ডগুলোতে জার্নিম্যান আর কর্তার মধ্যে গোষ্ঠীগত ধরনের সম্পর্ক বজায় রইল; ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে সেটার জায়গায় এল শ্রমিক আর পুঁজিপতির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক — গ্রামাঞ্চলে আর ছোট ছোট শহরে সেই সম্পর্কে গোষ্ঠীগত ধরনের একটা ছোপ বজায় রইল, কিন্তু বড়, আসল ম্যানুফ্যাকচারের শহরগুলিতে বেশ গোড়ার দিকেই সেটাতে গোষ্ঠীগত ধাঁচের প্রায় সবটাই ঘুচে গিয়েছিল।

বাণিজ্যের প্রসার বিপুল বেগ সঞ্চারিত করল ম্যানুফ্যাকচারে এবং সাধারণভাবে উৎপাদনের ধারায় — বাণিজ্যের এই প্রসার ঘটেছিল আমেরিকা

আবিষ্কার এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। সেখান থেকে আমদানি-করা নতুন নতুন জিনিস, বিশেষত রাশি-রাশি সোনা আর রুপো চলতি হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই বদলে গেল, একটা প্রচন্ড আঘাত পড়ল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পত্তি-মালিকানা এবং শ্রমিকদের উপর; এল ভাগ্যান্বেষীদের অভিযানগুলো, উপনিবেশ করা; আর, সর্বোপরি, বাজারগুলো সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্ব-বাজারে পরিণত হওয়া তখন সম্ভব হয়ে উঠল এবং প্রতিদিনই সেটা অধিকতর পরিমাণে বাস্তব অবস্থা হয়ে উঠতে থাকল, পয়দা হল ইতিহাসক্রমিক বিকাশের [৪৮] একটা নতুন পর্ব, যেটা নিয়ে এখানে আমরা সাধারণভাবে আরও আলোচনা করতে পারি নে। সদ্য-আবিষ্কৃত দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করা হল, সেটা জাতিগুলির পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে কাড়াকাড়িতে নতুন ইন্ধন যোগাল, তদনুসারে সেই কাড়াকাড়ি আরও সম্প্রসারিত হল, সেক্ষেত্রে শত্রুতা বাড়ল।

বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার সম্প্রসারিত হবার ফলে অস্থাবর পুঁজির সঞ্চয়ন ত্বরিত হল, কিন্তু পক্ষান্তরে, গিল্ডগুলিতে উৎপাদন প্রসারের প্রোৎসাহন ছিল না, সেগুলিতে স্বাভাবিক পুঁজি অপরিবর্তিত থেকে গেল কিংবা কমেই গেল। বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার পয়দা করল বৃহৎ বুর্জোয়াদের; গিল্ডগুলিতে জড়ো হয়েছিল পেটি বুর্জোয়ারা, তারা শহরগুলিতে আগের মতো আর প্রাধান্যশালী রইল না, মস্ত মস্ত ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রবল ক্ষমতার কাছে তাদের নতিস্বীকার করতে হল।* এইভাবে, ম্যানুফ্যাকচারের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে গিল্ডগুলির অবনতি ঘটল।

যে-যুগের কথা আমরা বলছি তখন জাতিগুলির মধ্যে সংসর্গের দুটো ধরন দেখা দিয়েছিল। প্রথমে চলতি সোনা আর রুপোর পরিমাণ কম ছিল বলে এই দুটো ধাতুর রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়েছিল; আর শিল্প ছিল প্রধানত আমদানি-করা, শহরের জনসংখ্যা বেড়ে চলছিল, তাদের কাজ দেবার জন্যে শিল্প হয়ে পড়েছিল অত্যাবশ্যক, সেটা অবশ্য কেবল দেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেই নয়, প্রধানত বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যেসব বিশেষ

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] পেটি বুর্জোয়ারা — মধ্য শ্রেণী — বৃহৎ বুর্জোয়ারা।

সুবিধা মঞ্জুর করা চলত সেগুলো ছাড়া শিল্পের চলছিল না। গিল্ডের স্থানীয় বিশেষ সুবিধাগুলো এইসব মৌলিক নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রসারিত সারা দেশ জুড়ে। সামন্ততান্ত্রিক মনিবদের রাজ্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যেত যেসব ব্যাপারী তাদের কাছ থেকে ডাকাতির বিরুদ্ধে রক্ষণ-লেভি হিসেবে আদায়-করা নজরানা, যা পরে শহরগুলিতেও ধার্য হয়েছিল, সেটা থেকে কাস্টম্স শুল্কের উৎপত্তি — আধুনিক রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হল কোষাগারে অর্থাগমের সবচেয়ে সিধে-সহজ উপায়।

ইউরোপীয় বাজারগুলিতে মার্কিন সোনা আর রুপো উঠল, শিল্পের ক্রমপ্রসার ঘটল, বাণিজ্য সম্প্রসারিত হল দ্রুত, তার ফলে দেখা দিল গিল্ডের বাইরেকার বুর্জোয়ারা আর অর্থ — এই সবকিছুর ফলে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির অন্য একটা তাৎপর্য দেখা দিল। অর্থ ছাড়া রাজকার্য চালান প্রতিদিনই আরও দুষ্কর হয়ে উঠছিল — রাষ্ট্র তখন রাজস্বঘটিত বিবেচনা অনুসারে সোনা আর রুপো রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখল; এই যে অর্থরাশি বাজারে ছাড়া হল বুর্জোয়াদের পক্ষে ফটকায় খরিদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু — তারা পরম তুষ্ট হল এতে; আরও আগে চালু করা বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠল সরকারের আয়ের একটা উপায়, সেগুলোকে বিক্রি করে টাকা করা হতে থাকল; কাস্টম্সের আইন-কানুনের মধ্যে দেখা দিল রপ্তানি শুল্ক — সেটা শিল্পের পক্ষে শুধু বাধাদায়ক [হল] — সেটার [৪৯] উদ্দেশ্য ছিল নিছক রাজস্বঘটিত।

দ্বিতীয় কালপর্যায়টা সতর শতকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়ে চলেছিল আঠার শতকের প্রায় শেষ অবধি। বাণিজ্য আর নৌচালনের প্রসার ঘটল ম্যানুফ্যাকচারের চেয়ে বেশি, ম্যানুফ্যাকচারের ভূমিকাটা হল গৌণ; ব্যবহারক হিসেবে উপনিবেশগুলি নগণ্য ছিল না; তখন বিশ্ব-বাজারের সূত্রপাত হচ্ছিল — সেটা বিভিন্ন দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। নৌচালনের নিয়ম-কানুন আর ঔপনিবেশিক একচেটেগুলো দিয়ে এই কালপর্যায়ের শুরু। বিভিন্ন শুল্ক, নিষেধ আর সন্ধিচুক্তি দিয়ে জাতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিত করা হল যতখানি সম্ভব; প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর কাড়াকাড়ি চালান হত এবং সেগুলোর ফয়সালা হত শেষ উপায় হিসেবে যুদ্ধ (বিশেষত নৌযুদ্ধ) দিয়ে। বাণিজ্যে আর

ম্যানুফ্যাকচারে প্রাধান্য বজায় রইল সবচেয়ে পরাক্রমশালী সামুদ্র জাতি ইংরেজদের। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে একটা দেশে সমাহরণ দেখা যায়।

দেশীয় বাজারে বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্ক দিয়ে, একচেটেগুলো দিয়ে ঔপনিবেশিক বাজারে, আর বিদেশে যথাসম্ভব বিভিন্ন প্রভেদক শুল্ক দিয়ে ম্যানুফ্যাকচারকে সবসময়ে নিরাপদ রাখা হত। দেশী মালমশলার আকারণে উৎসাহ দেওয়া হত (ইংলন্ডে পশম আর শণ, ফ্রান্সে রেশম), দেশী কাঁচামাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হত (ইংলন্ডে পশম), আর আমদানি-করা মালমশলার [আকারণ] অযত্ন করা হত কিংবা ঠেকান হত (ইংলন্ডে তুলো)। সাগরপথে বাণিজ্যে এবং ঔপনিবেশিক ক্ষমতায় প্রাধান্যশালী জাতিটার স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি পরিমাণগত আর গুণগত প্রসার ঘটেছিল ম্যানুফ্যাকচারেও। রক্ষণ-ব্যবস্থা ছাড়া ম্যানুফ্যাকচার চালান যেত না, কেননা অন্যান্য দেশে অতি সামান্য পরিবর্তন ঘটলেও সেটার বাজার খোয়া যেতে পারত, সেটা জেরবার হতে পারত; মোটামুটি অনুকূল পরিবেশে সেটাকে কোন দেশে চালু করা যেত, কিন্তু ঠিক এই কারণেই সেটা ধ্বংসও হয়ে যেতে পারত সহজেই। তার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামাঞ্চলে সেটাকে যে-প্রণালীতে চালান হত, বিশেষত আঠার শতকে, তাতে সেটা বিপুল ব্যক্তিসমষ্টির অত্যাবশ্যক সম্পর্কতন্ত্রের সঙ্গে এতই পরিমাণে বিজড়িত যে, কোন দেশ অবাধ প্রতিযোগিতা চলতে দিয়ে নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন করতে সাহস করত না। যে-পরিমাণে সেটা রপ্তানি করে উঠতে পারত তাতে কাজেই সেটা ষোল-আনাই নির্ভর করত বাণিজ্যের প্রসার কিংবা গণ্ডিবদ্ধতার উপর, আর অপেক্ষাকৃত সামান্য প্রতিক্রিয়াই খাটাত [বাণিজ্যের উপর]। আঠার শতকে তার থেকে আসে এটার গৌণ [গুরুত্ব] এবং [ব্যাপারীদের] প্রভাব। [৫০] রাষ্ট্রীয় রক্ষণ আর একেচেটের জন্যে অন্য কারও চেয়ে বেশি জিদ করত ব্যাপারীরা এবং বিশেষত জাহাজে চালানের কারবারীরাই; ম্যানুফ্যাকচার মালিকেরাও রক্ষণ দাবি করত এবং তা পেতও বটে, কিন্তু রাজনীতিক গুরুত্বে তারা সবসময়েই ব্যাপারীদের চেয়ে খাটো ছিল। বাণিজ্যিক শহরগুলি, বিশেষত উপকূলবর্তী শহরগুলি কিছু পরিমাণে সভ্য হয়ে উঠেছিল, সেগুলি পেয়েছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু কারখানা শহরগুলিতে চালু ছিল চূড়ান্ত পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। তু. আইকিন (২৮) ইত্যাদি। আঠার

শতকটা ছিল বাণিজ্যের শতক। পিন্টো সেটা বলেছেন স্পষ্ট-নির্দিষ্টভাবে: 'Le commerce fait la marotte du siècle'*; আর: 'Depuis quelque temps il n'est plus question que de commerce, de navigation et de marine.'** (২৯)

পুঁজির চলন বেশকিছু পরিমাণে ত্বরিত হলেও সেটা তখনও কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীর থেকে গিয়েছিল। বিশ্ব-বাজার পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এক-একটা ভাগকে কাজে লাগাচ্ছিল এক-একটা জাতি; জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিত করা হয়েছিল; খাস উৎপাদনই ছিল আনাড়ি ধরনের, আর অর্থব্যবস্থা গোড়ার পর্বগুলো থেকে উদ্ভূত সবেমাত্র -- এই সবকিছুর দরুন চলন ব্যাহত হচ্ছিল খুবই। সমস্ত ব্যাপারীদের আচরণে এবং বাণিজ্য চালাবার গোটা প্রণালীটাতে তখনও জড়িয়ে থাকা দরকষাকষি, ইতরামি আর ব্যয়কুণ্ঠা হল সেটার পরিণতি। ম্যানুফ্যাকচার মালিকদের সঙ্গে তুলনায়, এবং সর্বোপরি কারিগরদের সঙ্গে তুলনায় তারাই নিঃসন্দেহে ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া; পরবর্তী কালপর্যায়ের ব্যাপারী আর শিল্পপতিদের সঙ্গে তুলনায় তারা পেটি বুর্জোয়া। তু. অ্যাডাম স্মিথ (৩০)।

এই কালপর্যায়ের আরও কয়েকটা বিশেষত্ব হল: সোনা আর রুপো রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা রদ এবং অর্থের মাধ্যমে বাণিজ্যের সূত্রপাত; ব্যাঙ্ক, জাতীয় ঋণ, কাগজী মুদ্রা; স্টক আর শেয়ারের ফটকাবাজি এবং সমস্ত জিনিসে ফটকা-ব্যবসা; সাধারণভাবে অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন। পুঁজিতে তখনও এ'টে ছিল যে স্বাভাবিক প্রকৃতি তার অনেকটা আবার নষ্ট হল।

[৪। সবচেয়ে জটিল শ্রমবিভাগ। বৃহৎ শিল্প]

একটা দেশে, ইংলন্ডে বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচারের সমাহরণ সতর শতকে দুর্নিবারভাবে সম্প্রসারিত হয়ে এই দেশটির জন্যে ক্রমে সৃষ্টি হল

---

* 'বাণিজ্য হল এই শতাব্দীর প্রচণ্ড বাতিক।' — সম্পাঃ

** 'কিছুকাল হল লোকে বলছে শুধু বাণিজ্য, নৌচলন আর নৌবাহিনী সম্বন্ধে।' — সম্পাঃ

একটা অপেক্ষাকৃত বিশ্ব-বাজার এবং তার ফলে এই দেশের ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্যের জন্যে এমন চাহিদা যা তখন অবধি বর্তমান শিল্পোৎপাদন-শক্তি দিয়ে আর মেটান যায় না। উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি ছাপিয়ে এই চাহিদাবৃদ্ধির ফলে পয়দা হল বৃহৎ শিল্প — শিল্পের কাজে কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগ, যন্ত্রপাতি এবং অতি জটিল শ্রমবিভাগ — আর দেখা দিল মধ্যযুগের পরে [৫১] ব্যক্তিগত মালিকানার তৃতীয় কালপর্যায়। এই নতুন পর্বের অন্যান্য পূর্বশর্ত ইংলন্ডে ছিল আগে থেকেই: জাতীয় পরিধির ভিতরে অবাধ প্রতিযোগিতা, তত্ত্বগত বলবিদ্যার উন্নয়ন, ইত্যাদি। (প্রকৃতপক্ষে, নিউটনের পূর্ণাঙ্গ করা বলবিদ্যা ছিল আঠার শতকের ফ্রান্সে আর ইংলন্ডে জনসাধারণে একেবারে সবচেয়ে প্রচলিত বিজ্ঞান।) (জাতীয় পরিধির ভিতরে অবাধ প্রতিযোগিতা জিতে নিতে হয়েছিল বিপ্লবের সাহায্যে — ১৬৪০ আর ১৬৮৮ সালে ইংলন্ডে, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে।)

যারা নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বজায় রাখতে চেয়েছিল এমন প্রত্যেকটা দেশ প্রতিযোগিতার ফলে ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্য রক্ষণের জন্যে নতুন নতুন কাস্টম্‌সের নিয়ম-কানুন চালু করতে (বৃহৎ শিল্পের বিরুদ্ধে পুরন শুল্কগুলো আর কার্যকর ছিল না) এবং একটু পরেই বিভিন্ন রক্ষণ-শুল্কের আওতায় বৃহৎ শিল্প চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। বৃহৎ শিল্প প্রতিযোগিতাকে পৃথিবীব্যাপী করে তুলল এইসব রক্ষণ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও (এটা হল কার্যক্ষেত্রের অবাধ বাণিজ্য; রক্ষণ-শুল্ক হল একটা উপশমক-মাত্র, অবাধ বাণিজ্যের **ভিতরে** একটা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা), স্থাপন করল যোগাযোগের উপায়াদি এবং আধুনিক বিশ্ব-বাজার, বাণিজ্যকে করল সেই বাজারের অধীন, সমস্ত পুঁজিকে শিল্পগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করল, আর এইভাবে ঘটাল পুঁজির দ্রুত চলন (আর্থ ব্যবস্থার উন্নয়ন) এবং কেন্দ্রীকরণ। পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা দিয়ে বৃহৎ শিল্প সমস্ত ব্যক্তিকে তাদের কর্মশক্তি চরম মাত্রায় খাটাতে বাধ্য করল। বৃহৎ শিল্প যতখানি সম্ভব বিনষ্ট করল ভাবাদর্শ, ধর্ম, নৈতিকতা, ইত্যাদি, আর যেসব ক্ষেত্রে তা করতে পারল না সেগুলোকে করে তুলল প্রতীয়মান মিথ্যাধারণা। সমস্ত সভ্য জাতি এবং সেগুলির প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষকে তাদের চাহিদাগুলো মেটাবার জন্যে সারা পৃথিবীর মুখাপেক্ষী করে তুলল বৃহৎ শিল্প, এইভাবে খতম করল পৃথক পৃথক

জাতির আগেকার স্বাভাবিক একক-স্বাতন্ত্র্যটাকে — সেই পরিসরে সেটা বিশ্ব-ইতিহাস পয়দা করল সেই প্রথম। বৃহৎ পুঁজি প্রকৃতিবিজ্ঞানকে করল পুঁজির সেবক, আর শ্রমবিভাগের স্বাভাবিক প্রকৃতির শেষ ধাঁচটাকে ঘুচিয়ে দিল। শ্রমের অস্তিত্ব থাকতে যতখানি সম্ভব সেই পরিমাণে বৃহৎ শিল্প সাধারণভাবে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি খতম করে দিল, আর সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা শহরগুলির জায়গায় বৃহৎ শিল্প আনল রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা বড় বড় আধুনিক নগরী। যেখানেই ঢুকল সেখানে সেটা বিভিন্ন কারিগরি এবং শিল্পের সমস্ত আগেকার পর্ব ধ্বংস করল। গ্রামাঞ্চলের উপর বাণিজ্যিক শহরগুলির চূড়ান্ত প্রাধান্য হাসিল করল বৃহৎ শিল্প। [এটার প্রথম পত্তন] হল স্বয়ংক্রিয় প্রণালী। [এটার উন্নয়ন] পয়দা করল এক-রাশ উৎপাদন-শক্তি, যেটার পক্ষে ব্যক্তিগত [মালিকানা]* হল ঠিক সেই পরিমাণে একটা বেড়ি [৫২] যে-পরিমাণে ম্যানুফ্যাকচারের বেলায় গিল্ড এবং উন্নতিশীল কারিগরির বেলায় ক্ষুদ্র গ্রামীণ কর্মশালা ছিল বেড়ি। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার মধ্যে এইসব উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন হয়েছিল শুধু এক-পেশে, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো হয়ে পড়েছিল নাশক শক্তি; অধিকন্তু, এই ব্যবস্থার ভিতরে বহুসংখ্যক উৎপাদন-শক্তি প্রয়োগ করার আদৌ কোন স্থানই ছিল না। সাধারণভাবে বললে, বৃহৎ শিল্প সমাজে শ্রেণীগুলির মধ্যে একই সম্পর্ক পয়দা করল সর্বত্র, আর এইভাবে খতম করল বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আর শেষে, যেখানে প্রত্যেকটা জাতির বুর্জোয়াদের পৃথক পৃথক জাতীয় স্বার্থ তখনও বজায় রইল, বৃহৎ শিল্প কিন্তু সৃষ্টি করল এমন একটা শ্রেণী যেটার স্বার্থ সব জাতিতে একই, আর যেটার পক্ষে জাতিসত্তা গেছে খতম হয়ে; যে-শ্রেণী পুরন দুনিয়ার ভারমুক্ত হয়ে গেছে যথার্থই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেটা রয়েছে ঐ দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবস্থানে। পুঁজিপতির সঙ্গে সম্পর্কটাকেই শুধু নয়, খাস শ্রমকেই শ্রমিকের পক্ষে অসহনীয় করে তোলে বৃহৎ শিল্প।

বৃহৎ শিল্প কোন একটা দেশের সমস্ত এলাকায় উন্নয়নের একই মাত্রায়

---

* পাণ্ডুলিপি খরাপ। — সম্পাঃ

ওঠে না, সেটা স্পষ্ট-প্রতীয়মান। এর ফলে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত আন্দোলন কিন্তু মন্দা হয়ে যায় না, তার কারণ বৃহৎ শিল্পের সৃষ্টি-করা প্রলেতারিয়ানরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে সমগ্র জনগণকে নিয়ে চলে তাদের সঙ্গে, মন্দা হয়ে যায় না তার আরও কারণ এই যে, বৃহৎ শিল্প থেকে বাদ-পড়া শ্রমিকদেরকে সেটা বৃহৎ শিল্পের আপনার শ্রমিকদের চেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলে দেয়। যেসব দেশে বৃহৎ শিল্প উন্নত সেগুলি কমবেশি না-শিল্পোন্নত দেশগুলির উপর অনুরূপ ক্রিয়া ঘটায়, সেটা এইদিক দিয়ে যে, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য শেষোক্ত দেশগুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় পৃথিবীজোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ের মধ্যে।

* * *

[উৎপাদনের] এইসব বিভিন্ন ধরন হল শ্রম-সংগঠনের, তাই মালিকানার বিভিন্ন ধরন মাত্র। প্রত্যেকটা কালপর্যায়ে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের একটা সমন্বয় ঘটে — যে-পরিমাণে সেটা চাহিদার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

[৫। সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি]

আমরা দেখেছি, উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি অতীত ইতিহাসে ঘটেছে কয়েক বার, যদিও ভিত্তিটা তাতে বিপন্ন হয় নি, সেই দ্বন্দ্ব-অসংগতি প্রত্যেক বার বিপ্লব হয়ে ফেটে পড়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধারণ করেছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক রূপ, যেমন সর্বাত্মক সংঘর্ষ, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ, চেতনার দ্বন্দ্ব-অসংগতি, ভাব-ধারণার লড়াই, ইত্যাদি, রাজনীতিক সংঘাত, ইত্যাদি। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ এইসব আনুষঙ্গিক রূপের একটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেটাকে ঐসব বিপ্লবের ভিত্তি বলে ধরতে পারে, সেটা খুব সহজই, কেননা যেসব লোক ঐসব বিপ্লব শুরু করেছিল তাদের সংস্কৃতির মাত্রা এবং ইতিহাসক্রমিক বিকাশের পর্ব অনুসারে ছিল নিজেদের কর্মবৃত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রান্তি।

এইভাবে, আমাদের মতে, ইতিহাসে সমস্ত সংঘর্ষের উৎপত্তিস্থল হল উৎপাদন-শক্তি এবং [৫৩] সংসর্গের ধরনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি। প্রসঙ্গত বলি, কোন একটা দেশে এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতি একেবারে চরমে পেঁছিলে তবেই তার থেকে দেশটিতে সংঘর্ষ লাগে, এমনটা হতেই হবে তা নয়। আন্তর্জাতিক সংসর্গের প্রসারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে যে-প্রতিযোগিতা বাধে সেটাই শিল্পে-অনগ্রসর দেশগুলিতে অনুরূপ দ্বন্দ্ব-অসংগতি পয়দা করার পক্ষে যথেষ্ট (যেমন, জার্মানিতে অস্ফুট প্রলেতারিয়েতকে দৃষ্টিগোচর করল ইংরেজদের শিল্পের প্রতিযোগিতা)।

[৬। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষে প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী গঠন। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির উদ্ভব। বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভ্রমজনক সম্মিলনী এবং কমিউনিজমের আমলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যথার্থ একত্ব। সম্মিলিত ব্যক্তিগণের ক্ষমতার কাছে সমাজের জীবনযাত্রার পরিবেশের বশবর্তিতা]

প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বুর্জোয়াদেরই শুধু নয়, বরং আরও বেশি পরিমাণে শ্রমিকদের — প্রতিযোগিতা তাদের একত্রিত করে, তা সত্ত্বেও। কাজেই এইসব ব্যক্তির সম্মিলিত হতে অনেক সময় লাগে, সেটা কেবল এই কারণে নয় যে, এই সম্মিলন শুধু স্থানীয় হতে না হলে, এজন্যে প্রথমে বৃহৎ শিল্পের পয়দা করা চাই আবশ্যক উপায়াদি, মস্ত মস্ত শিল্প-নগরী এবং সুলভ আর দ্রুত যোগাযোগ। কাজেই, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এই যেসব ব্যক্তি জীবনযাপন করে এই বিচ্ছিন্নতা যাতে প্রতিদিন পুনরুৎপন্ন হয় এমন সম্পর্কতন্ত্রের মাঝে, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থিত প্রত্যেকটা সংগঠিত শক্তিকে পরাস্ত করা যায় শুধু দীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। তার উলটোটা দাবি করার অর্থ হল ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট যুগে প্রতিযোগিতা থাকবে না বলে দাবি করার শামিল, কিংবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অবস্থায় যে-সম্পর্কতন্ত্রের

উপর ব্যক্তি-মানুষের কর্তৃত্ব নেই সেটাকে তাদের মন থেকে বিতাড়িত করার দাবি করার শামিল।

ঘর-বাড়ি তৈরি করা। বর্বর অবস্থার মানুষের প্রত্যেকটা পরিবারের স্বভাবতই থাকে যাযাবরদের পৃথক পৃথক পারিবারিক তাঁবুর মতো নিজ স্বাভাবিক গুহা কিংবা কুঁড়েঘর। ব্যক্তিগত মালিকানার আরও প্রসারের ফলে এই পৃথক পৃথক পারিবারিক গৃহস্থালি আরও বেশি অপরিহার্য হয়েই পড়ে। কৃষিজীবী লোক-সমাজগুলির পক্ষে সাধারণ গৃহস্থালি হল জমিতে সাধারণী চাষ-বাসের মতো সমানই অসম্ভব। শহরগুলো গড়ে উঠল — সেটা হল একটা মস্ত অগ্রগতি। তবে, পৃথক পৃথক গৃহস্থালি অর্থনীতি লোপ করাটা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা থেকে অবিচ্ছেদ্য — সমস্ত পূর্ববর্তী কালপর্যায়ে এইসব পৃথক পৃথক গৃহস্থালি অর্থনীতি লোপ করা অসম্ভব ছিল, সেটা স্রেফ এই কারণে যে, তার নিয়ামক বৈষয়িক পরিবেশ ছিল না। সাধারণী গৃহস্থালি অর্থনীতি স্থাপনের পূর্বশর্ত হল যন্ত্রপাতির উদ্ভব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি এবং অন্যান্য বহু উৎপাদন-শক্তির প্রয়োগ — যেমন, জল-সরবরাহ, [৫৪] গ্যাসের আলো, স্টীমে তাপন, ইত্যাদি — তাছাড়া, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার [বিরোধ] দূর করা। এইসব অবস্থা না থাকলে কোন সাধারণী অর্থনীতি আপনাতেই একটা নতুন উৎপাদন-শক্তি হত না; কোন বৈষয়িক ভিত্তি ছাড়াই নিছক তত্ত্বগত বনিয়াদে স্থাপিত সেই অর্থনীতি হত শুধু উদ্ভট একটা কিছু, সেটা শেষে হয়ে দাঁড়াত মঠীয় গোছের অর্থনীতির চেয়ে বেশি কিছু না। — যা সম্ভব ছিল সেটা দেখা যেতে পারে শহরগুলিতে যা ঘটেছিল ঘনবসতি এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজের জন্যে নানা সাধারণী ঘরবাড়ি তৈরি করার ভিতর দিয়ে (জেলখানা, ব্যারাক, ইত্যাদি)। পৃথক পৃথক গৃহস্থালী অর্থনীতি লোপ করাটা যে পরিবার লোপ করা থেকে অবিচ্ছেদ্য, সেটা তো স্বতঃপ্রতীয়মান।

(প্রত্যেকে যা সে মোট তাইই হয়েছে রাষ্ট্রের দ্বারা, এই মর্মে সেন্ট মাক্সের বারংবার উক্তিটা, এবং বুর্জোয়া হল বুর্জোয়া প্রজাতির একটা

নমুনামাত্র, এই মর্মে উক্তিটা মূলত একই; বুর্জোয়া **শ্রেণীটা** যেন বিদ্যমান ছিল সেটা যেসব ব্যক্তিকে নিয়ে গড়া তাদের আগেই, এমনটাই ধরে নেওয়া হয় এই উক্তিতে*।)

মধ্যযুগে প্রত্যেকটা শহরে নাগরিকেরা ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হতে বাধ্য হত নিজেদের গা বাঁচাবার জন্যে। বাণিজ্যের প্রসার এবং যোগাযোগ স্থাপিত হবার ফলে পৃথক পৃথক শহর অন্যান্য শহরকে চিনতে-জানতে পেরেছিল, এইসব শহরও একই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করছিল একই স্বার্থ। বার্গারদের বহু স্থানীয় সম্মিলনী থেকে শুধু ক্রমে ক্রমেই দেখা দিয়েছিল বার্গার **শ্রেণী**। বিদ্যমান সম্পর্কগুলোর সঙ্গে বার্গারদের দ্বন্দ্ব এবং ঐসব সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত শ্রম-প্রণালীর দরুন পৃথক পৃথক বার্গারের জীবনযাত্রার পরিবেশ হয়ে উঠেছিল তাদের সবার বেলায় অভিন্ন এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তি থেকে অনপেক্ষ পরিবেশ। বার্গাররা যে-পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতে তারা সৃষ্টি করেছিল ঐ পরিবেশ, তারা সেটা সৃষ্টি করেছিল সেই পরিমাণে যতখানি সেটা নির্ধারিত হয়েছিল আগে থেকে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের বৈরিতা দিয়ে। পৃথক পৃথক শহরগুলো বিভিন্ন পরিমেল স্থাপন করতে শুরু করলে এই সাধারণী পরিবেশ শ্রেণীগত পরিবেশে পরিণত হয়েছিল। একই পরিবেশ, একই দ্বন্দ্ব-অসংগতি, একই স্বার্থ থেকে সর্বত্র পয়দা হয়েছিল মোটের উপর একই রকমের রীত-রেওয়াজ। বুর্জোয়াদের যা পরিবেশ তাতে সেটা আপনিই গড়ে ওঠে শুধু ক্রমে ক্রমে, শ্রমবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিদ্যমান সমস্ত অস্তিমান শ্রেণীকে শেষপর্যন্ত আত্মভূত করে** (তার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আগেকার নাস্তিমান শ্রেণীর অধিকাংশকে এবং তদবধি অস্তিমান শ্রেণীর একাংশকে একটা নতুন শ্রেণী প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে), আত্মভূত করে এই ব্যাপারে যে, সেটা বিদ্যমান সমস্ত সম্পত্তিকে শিল্পক্ষেত্রের কিংবা বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করে।

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] দার্শনিকদের বেলায় শ্রেণীর **পূর্বকালীন অস্তিত্ব**।

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] শুরুতে সেটা আত্মভূত করে শ্রমের সেইসব শাখা যেগুলো রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত, আর তারপরে সমস্ত ± [কমবেশি] ভাবাদর্শগত বর্গ।

পৃথক পৃথক ব্যক্তি নিয়ে গড়ে ওঠে একটা শ্রেণী, সেটা শুধু এই ব্যাপারে যে, [৫৫] তাদের সবার একই লড়াই চালাতে হয় আর-একটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে; অন্য ব্যাপারে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরস্পরের প্রতি বৈরভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনায় শ্রেণীটার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখা দেয়, যাতে ব্যক্তিরা পড়ে যায় অস্তিত্বের পূর্বনির্দিষ্ট পরিবেশের মাঝে, এইভাবে জীবনে তাদের অবস্থান এবং তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ নির্দেশ করে দেয় তাদের শ্রেণী, তারা তাদের শ্রেণীর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটা হল শ্রমবিভাগের কাছে পৃথক পৃথক ব্যক্তির অধীনতার মতো একই ব্যাপার, সেটা দূর হতে পারে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমের আপনারই লোপের ফলে।* শ্রেণীর অধীনে ব্যক্তির এই অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে হরেক রকমের ভাব-ধারণা, ইত্যাদির কাছে ব্যক্তির অধীনতা ঘটে সেটা আমরা আগেই কয়েক বার নির্দেশ করেছি।

ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশটাকে একটার পরে একটা আগত বিভিন্ন সামাজিক বর্গ আর শ্রেণীর অস্তিত্বের সাধারণ পরিবেশের মাঝে এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন সহ-বর্তমান সাধারণ ধারণার মাঝে **দার্শনিক** দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ বিবেচনা করলে এমনটা নিশ্চয়ই খুব সহজেই মনে করা যায় যে, এইসব ব্যক্তির মাঝে উদ্ভূত হয়েছে প্রজাতিটা বা 'মানুষ' কিংবা তারা 'মানুষের' উদ্ভব ঘটিয়েছে — আর এইভাবে কেউ কষে ইতিহাসের কান মলে দিতে পারে কয়েক বার। কারও কল্পনায় এইসব বিভিন্ন সামাজিক বর্গ আর শ্রেণী হতে পারে সাধারণ কথাটার বিভিন্ন বিশেষ-নির্দিষ্ট অভিধা, প্রজাতিটার বিভিন্ন অধস্তন রকম, কিংবা 'মানুষের' অভিব্যক্তির বিভিন্ন পর্ব।

শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যা রক্ষা করতে হয় এমন কোন বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ যেটার আর থাকবে না এমন একটা শ্রেণী গড়ে ওঠার আগে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শ্রেণীর অধীনে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি লোপ পেতে পারে না।

* 'শ্রমের লোপ' (Aufhebung der Arbeit) কথাটার অর্থের জন্যে এই খণ্ডের ৩৮-৪৯, ৮৬-৮৭, ৯৪-৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

শ্রমবিভাগের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতার (সম্পর্ক) বৈষয়িক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হওয়া সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ঐ রূপান্তরটাকে দূর করা যায় না; ব্যক্তি এইসব বৈষয়িক ক্ষমতাকে আবার নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং শ্রমবিভাগ লোপ করেই শুধু সেটাকে লোপ করা যায়।* সম্প্রদায় ছাড়া এটা সম্ভব নয়। [অন্যান্যের সঙ্গে প্রত্যেকটি] ব্যক্তি-মানুষের সম্প্রদায়বদ্ধতার মাঝেই [৫৬] শুধু সে তার স্বাভাবিক গুণাবলির সর্বতোমুখী অনুশীলনের উপায়াদি পেতে পারে; কাজেই ব্যক্তির স্বকীয় স্বাধীনতা সম্ভব কেবল সম্প্রদায়ের মাঝেই। সম্প্রদায়ের জায়গায় পূর্ববর্তী বদলিগুলোয় — রাষ্ট্র, ইত্যাদিতে — যেসব ব্যক্তি গড়ে উঠেছে শাসক শ্রেণীর সম্পর্কতন্ত্রের ভিতরে কেবল তাদেরই থেকেছে স্বকীয় স্বাধীনতা, আর সেটা কেবল তারা এই শ্রেণীর মধ্যকার ব্যক্তি হিসেবে। যে বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ে ব্যক্তিরা এখন অবধি একত্রিত হয়েছে সেটা সবসময়েই তাদের ব্যাপারে একটা স্বতন্ত্র সত্তা হয়ে উঠেছে, আর যেহেতু সেটা ছিল অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা শ্রেণীর সম্প্রদায়, তাই সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিল একেবারে বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ই শুধু নয়, অধিকন্তু একটা নতুন বেড়িও বটে। সত্যিকারের সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা পায় তাদের সম্মিলনীর মাঝে এবং সেটার সাহায্যে।

ব্যক্তিরা সবসময়েই গড়েছে নিজেদের ভিত্তি ক'রে, কিন্তু স্বভাবতই তাদের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং সম্পর্কতন্ত্রের ভিতরে নিজেদের ভিত্তি ক'রে — ভাবাদর্শবিদদের অর্থে 'বিশুদ্ধ' ব্যক্তিকে ভিত্তি করে নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায়, এবং শ্রমবিভাগের ভিতরে সামাজিক সম্পর্কের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘটে, ঠিক এই অনিবার্য ব্যাপারটার ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনের মাঝে দেখা দেয় একটা বিভাগ — যে-পরিমাণে সেটা নিজস্ব, আর যে-পরিমাণে সেটা নির্ধারিত হয় শ্রমের কোন শাখা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ দিয়ে। (এর থেকে আমরা এমনটা বোঝাতে চাইছি নে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, লভ্যাংশজীবী, পুঁজিপতি, ইত্যাদিরা আর মনুষ্য থাকে না; কিন্তু তাদের ব্যক্তিসত্তা রূপায়িত এবং নির্ধারিত হয়

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] (ফয়েরবাখ: সত্তা এবং সারমর্ম)। দ্র. এই খণ্ডের ৫৬-৫৭ পৃঃ। — সম্পাঃ

খুবই নির্দিষ্ট শ্রেণীগত সম্পর্কতন্ত্র দিয়ে, আর বিভাগটা দেখা দেয় শুধু অন্য একটা শ্রেণীর প্রতি তাদের বিরোধিতার মাঝে, আর তাদের নিজেদের বেলায় সেটা দেখা দেয় শুধু যখন তারা দেউলিয়া হয়ে যায়।) সামাজিক বর্গের মাঝে (এবং গোষ্ঠীর মাঝে আরও বেশি পরিমাণে) সেটা তখনও প্রচ্ছন্ন: যেমন, একজন অভিজাত সবসময়েই থেকে যায় একজন অভিজাত, সাধারণ মানুষ সবসময়ে থেকে যায় সাধারণ মানুষ, সেটা তার অন্যান্য সম্পর্ক ছেড়ে দিলে, তার ব্যক্তিতা থেকে অবিচ্ছেদ্য চরিত্র হিসেবে। ব্যক্তি-মানুষ এবং শ্রেণীগত ব্যক্তির মধ্যে বিভাগ, ব্যক্তির পক্ষে জীবনের পরিবেশের আপতিক প্রকৃতি দেখা দেয় শুধু শ্রেণীটার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে, যে-শ্রেণীটা আপনিই হল বুর্জোয়াদের একটা উৎপাদ। এই আপতিক প্রকৃতিটার উদ্ভব ঘটে এবং সেটা সম্প্রসারিত হয় শুধু [৫৭] ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রাম দিয়ে। এইভাবে, কল্পনায়, আগের চেয়ে বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের আমলে ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত মনে হয়, তার কারণ তার জীবনের পরিবেশটাকে আপতিক মনে হয়; বাস্তবে অবশ্য সে অপেক্ষাকৃত কম মুক্ত, কেননা তাদের উপর জিনিসের নিগ্রহ-বল খাটে আরও বেশি। সামাজিক বর্গ থেকে উদ্ভূত পার্থক্যটা প্রকাশ পায় বিশেষত বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে বৈরিতার মাঝে। শহুরে বার্গারদের সামাজিক বর্গ, বিভিন্ন সম্মিলনী, ইত্যাদির যখন উদ্ভব ঘটেছিল ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের প্রতিযোগে, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ — অস্থাবর সম্পত্তি আর কারিগরি শ্রম, যা তাদের সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আগেই অন্তর্নিহিত অবস্থায় ছিল — প্রতীয়মান হয়েছিল নির্দিষ্টরূপে, যেটাকে বজায় রাখা হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পত্তি মালিকানার বিরুদ্ধে, যেটা তার নিজস্ব ধরনে প্রথমে সামন্ততান্ত্রিক রূপ ধারণ করেছিল। পলাতক ভূমিদাসেরা তাদের পূর্ববর্তী গোলামিটাকে নিশ্চয়ই তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের পক্ষে আপতিক বলে বিবেচনা করেছিল। তবে প্রত্যেকটা শ্রেণী শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করার সময়ে যা করে শুধু তাইই ভূমিদাসেরা করছিল এক্ষেত্রে; আর তারা নিজেদের মুক্ত করেছিল শ্রেণী হিসেবে নয়, আলাদা-আলাদা। অধিকন্তু, সামাজিক বর্গবিভাগ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তারা ওঠে নি, তারা হয়েছিল শুধু একটা নতুন সামাজিক বর্গ, তাদের নতুন অবস্থায়ও

তারা বজায় রেখেছিল তাদের পুরন শ্রম-প্রণালী, আর ইতোমধ্যে সম্পাদিত উন্নয়নের সঙ্গে যা আর মানানসই ছিল না সেই পূর্ববর্তী বেড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই শ্রম-প্রণালীটার আরও উৎকর্ষ ঘটিয়েছিল।

পক্ষান্তরে, প্রলেতারিয়ানদের বেলায়, তাদের জীবনযাত্রার পরিবেশ, শ্রম, আর তার সঙ্গে জীবনযাত্রার যে-সমগ্র পরিবেশ আধুনিক সমাজের নিয়ামক সেটা হয়ে উঠেছে আপতিক একটাকিছু, এমন একটাকিছু যার উপর পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে তাদের আয়ত্তি নেই, কোন **সামাজিক** সংগঠন যার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে না। আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি প্রলেতারিয়ানের ব্যক্তি-অস্তিত্ব আর শ্রমের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-অসংগতি, তার উপর চাপিয়ে দেওয়া জীবনযাত্রার পরিবেশ সে নিজেই স্পষ্ট দেখতে পায়, কেননা তরুণ-বয়স থেকেই সে শিকার, আর যেটা তাকে অন্য শ্রেণীতে স্থাপন করতে পারে এমন পরিবেশ হাজির হবার কোন সম্ভাবনা তার নেই নিজ শ্রেণীর ভিতরে।

[৫৮] দ্রষ্টব্য। ভূমিদাসদের একেবারে বেঁচে থাকার তাগিদটাই এবং ভূমিদাসদের মধ্যে ভূমি আবণ্টন যাতে সংশ্লিষ্ট এমন বৃহদায়তনের অর্থনীতির অসম্ভাবনা অচিরেই মনিবের জন্যে ভূমিদাসের কাজটাকে গড় পরিমাণে বস্তুশোধ এবং বিধিবদ্ধ শ্রমে পরিণত করেছিল — এটা ভোলা চলে না। এর ফলে ভূমিদাসের অস্থাবর সম্পত্তি জমান সম্ভব হয়ে উঠেছিল, কাজেই মনিবের দখল থেকে তার নিষ্কৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছিল, তার শহরে নাগরিক হতে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল; এর ফলে ভূমিদাসদের মধ্যে পর্যায়ভেদও পয়দা হয়েছিল, যাতে পলাতক ভূমিদাসেরা তখনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আধা-বার্গার। যেসব ভূমিদাস ছিল কোন কারিগরিতে ওস্তাদ তাদের অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি, এটাও স্পষ্ট।

এইভাবে, পলাতক ভূমিদাসেরা মুক্ত হতে চেয়েছিল শুধু ইতঃপূর্বে বর্তমান জীবনযাত্রার পরিবেশটাকে সম্প্রসারিত এবং রক্ষা করার জন্যে, কাজেই শেষে তারা পেঁছেছিল শুধু মুক্ত শ্রমে, পক্ষান্তরে, প্রলেতারিয়ানদের ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে লোপ করতে হবে এযাবত যা রয়েছে জীবনযাত্রার সেই পরিবেশটাকেই (অধিকন্তু সেটা হল বর্তমান সময় অবধি

সমগ্র সমাজেরই পরিবেশ) — সেটা শ্রম। এইভাবে, সমাজটা যাদের নিয়ে সেই ব্যক্তি-মানুষেরা এযাবত যে-আকারে নিজেদের সমষ্টিগত অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে সেটার সরাসর বিরুদ্ধে পড়ে যায় প্রলেতারিয়ানরা — সেটা হল রাষ্ট্র। কাজেই, ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হলে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে রাষ্ট্রটাকে।

এখন অবধি আমরা যাকিছু বলেছি তার থেকে দেখা যাচ্ছে, কোন একটা শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষেরা নিজেদের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সেটা নির্ধারিত হয়েছে একটা তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে তাদের সমস্বার্থ দিয়ে আর সম্প্রদায়টা সবসময়েই ছিল এমন যাতে এইসব ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শুধু গড় ধরনের ব্যক্তি হিসেবে, সেটা শুধু সেই পরিমাণে যাতে তারা জীবনযাত্রা চালায় তাদের শ্রেণীর জীবনের পরিবেশের ভিতরে — ঐ সম্পর্কে তারা শামিল হয়েছে ব্যক্তি হিসেবে নয়, একটা শ্রেণীর সদস্য হিসেবে। পক্ষান্তরে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানরা [৫৯] তাদের এবং সমাজের সমস্ত সদস্যের জীবনযাত্রার পরিবেশ নেয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে, তাদের সম্প্রদায়ের বেলায় ব্যাপারটা ঠিক উলটো: এতে ব্যক্তি-মানুষেরা শামিল হয় ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেই। ব্যক্তি-মানুষদের ঠিক এই সম্মিলনী থেকেই (অবশ্য, আধুনিক উৎপাদন-শক্তিসমূহ উন্নত পর্বে বলে ধরে নিয়ে) ব্যক্তি-মানুষের অবাধ বিকাশ এবং গতিবিধির পরিবেশ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় — এই পরিবেশটা আগে পড়ে ছিল আপতিকতার অধীনে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করেছিল এই পরিবেশ, সেটা হয়েছিল ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে, আর তাছাড়া, শ্রমবিভাগ থেকে নির্ধারিত যে-সম্মিলনী তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সেটা তাদের বিচ্ছিন্নতার দরুন তাদের পক্ষে বিজাতীয় একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়াবার কারণে। তখন অবধি সম্মিলনী [সেটা দৃষ্টান্তস্বরূপ 'Contract social' (৩১) [social contract]-এ যেমনটা বিবৃত হয়েছে তেমনি এলোবিলি নয় কোনক্রমেই, সেটা অনিবার্য] ছিল পরিবেশের উপর একটা অন্বয়, যেটার ভিতরে ব্যক্তি-মানুষ বরাতের জোরে অদ্ভুত কিছু উপভোগ করতে পারে অবাধে (দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলনীয় — উত্তর আমেরিকান রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ

আমেরিকান প্রজাতন্ত্রগুলি গঠন)। কোন কোন শর্তাধীনে আপতিকতা আর অদৃষ্ট থেকে নিরুপদ্রবে সুখ পাবার এই অধিকারটাকে এখন অবধি বলে আসা হচ্ছে নিজস্ব স্বাধীনতা। জীবনের এই পরিবেশ অবশ্য কোন একটা নির্দিষ্ট কালের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সংসর্গের আকার ছাড়া কিছু নয়।

পূর্ববর্তী সমস্ত আন্দোলন থেকে কমিউনিজমের পার্থক্যটা হল এই যে, এটা উৎপাদন আর সংসর্গের পূর্ববর্তী সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তিটাকে উলটে দেয়, আর এই প্রথম সমস্ত স্বাভাবিক পত্তনকে সচেতনভাবে ধরে এতদবধি বিদ্যমান মানুষের সৃষ্টি হিসেবে, সেগুলোর স্বাভাবিক প্রকৃতিটাকে ঘুচিয়ে দেয়, এবং সম্মিলিত ব্যক্তি-মনুষ্যগণের ক্ষমতাধীন করে সেগুলোকে। কাজেই, কমিউনিজমের সংগঠন হল মূলত আর্থনীতিক, এই সম্মিলনের পরিবেশের বৈষয়িক উৎপাদন; বিদ্যমান পরিবেশকে কমিউনিজম সম্মিলনের পরিবেশে পরিণত করে। যে বাস্তবতাটাকে কমিউনিজম সৃষ্টি করছে সেটাই হল যথার্থ ভিত্তি যাতে ব্যক্তি-মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেটা এই দিক থেকে যে, বাস্তবতা হল ব্যক্তি-মানুষদের নিজেদেরই পূর্ববর্তী সংসর্গের ফল। এইভাবে, এখন অবধি উৎপাদন এবং সংসর্গ দিয়ে পয়দা-করা পরিবেশকে কমিউনিস্টরা কার্যক্ষেত্রে ধরে অজৈব বলে; তবে সেটা করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা এমনটা ধারণা করে না যে, তাদের মালমশলা যোগানটা ছিল পূর্ববর্তী পুরুষ-পর্যায়গুলির পরিকল্পনা কিংবা নিয়তি, তেমনি, যেসব ব্যক্তি এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাদের পক্ষে সেটা অজৈব ছিল, এমনটাও মনে করে না কমিউনিস্টরা।

[৭। বিভিন্ন ব্যক্তি-মানুষ এবং তাদের জীবনের পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতি — উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-অসংগতি। উৎপাদন-শক্তির উন্নয়ন এবং সংসর্গের ধরন পরিবর্তন]

[৬০] মানুষ হিসেবে ব্যক্তি, আর তার মাঝে যা আপতিক, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা মনগড়া নয়; এটা ইতিহাস-অনুযায়ী প্রকৃত অবস্থা।

এই পার্থক্যটার তাৎপর্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন — যেমন, আঠার শতকে সামাজিক বর্গ হল ব্যক্তির পক্ষে আপতিক একটাকিছু, পরিবারও কমবেশি তাইই। যা প্রত্যেকটা যুগের বেলায় আমাদের করতে হবে এমন প্রভেদ এটা নয়, প্রত্যেকটা যুগে আগে থেকে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে এই প্রভেদ করে যুগটা আপনিই, সেটা বাস্তবিকপক্ষে কোন তত্ত্ব অনুসারে নয়, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ভৌত সংঘাতের চাপের জোরে সেটা ঘটে।

কোন একটা পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে প্রতীপ-তুলনায় পরবর্তী যুগের কাছে যেটা আপতিক বলে প্রতীয়মান হয় — কোন একটা পূর্ববর্তী যুগ থেকে বর্তান বিভিন্ন উপাদানের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য — সেটা হল উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্বের সঙ্গে যেটা মানানসই ছিল এখন একটা ধরনের সংসর্গ। সংসর্গের ধরনের সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির সম্পর্ক হল ব্যক্তিদের বৃত্তি কিংবা সক্রিয়তার সঙ্গে সংসর্গের ধরনের সম্পর্ক। [এই সক্রিয়তার মৌলিক ধরন অবশ্য ভৌত, যেটার উপর নির্ভর করে অন্যান্য ধরন — মানসিক, রাজনীতিক, ধর্মীয়, ইত্যাদি। বৈষয়িক জীবনের বিভিন্ন মূর্তায়ন অবশ্য প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইতঃপূর্বে গড়ে-ওঠা চাহিদাগুলোর উপর নির্ভর করে, আর এইসব চাহিদা মেটাও যেমন তেমনি পয়দা হওয়াও একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যেটা ভেড়ায় কিংবা কুকুরে দেখা যায় না [স্টির্নারের জেদী যুক্তি (৩২) adversus hominem*], যদিও বর্তমান রূপের ভেড়া আর কুকুর নিশ্চয়ই, কিন্তু malgré eux**, একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উৎপাদ।] উল্লিখিত দ্বন্দ্ব-অসংগতি না থাকলে, ব্যক্তিরা যে-পরিবেশে পরস্পরের সংসর্গে আসে সেটা তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, সেটা কোনক্রমেই তাদের বহিস্থ নয়; নির্দিষ্ট সম্পর্কের মাঝে জীবনযাপন করে এই যেসব নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এরা একমাত্র যে-পরিবেশে পয়দা করতে পারে তাদের বৈষয়িক জীবন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু, সেটা হল এইভাবে তাদের আত্মসক্রিয়তার পরিবেশ, আর সেটাকে পয়দা করে এই আত্মসক্রিয়তা।*** ইতোমধ্যে [৬১] দ্বন্দ্ব-অসংগতিটা এসে না গেলে, তারা

* মানুষের বিরুদ্ধে। — সম্পাঃ

** তাদের ইচ্ছে ছাড়াই। — সম্পাঃ

*** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] সংসর্গের আকারটারই উৎপাদন।

যে-পরিবেশে উৎপাদন করে সেটা এইভাবে তাদের সাপেক্ষ প্রকৃতির বাস্তবতার সঙ্গে, তাদের একপেশে জীবনের সঙ্গে মানানসই হয় — জীবনের একপেশে অবস্থাটা স্পষ্ট-প্রতীয়মান হয় শুধু যখন দ্বন্দ্ব-অসংগতিটা সেখানে দেখা দেয় এবং এইভাবে পরবর্তী ব্যক্তিদের বেলায় বর্তমান থাকে। তখন এই পরিবেশটা প্রতীয়মান হয় একটা আপাতিক বেড়ির মতো, আর এটা-যে একটা বেড়ি এই চেতনাটাকে আরোপ করা হয় পূর্ববর্তী যুগের ক্ষেত্রেও।

এই যেসব বিভিন্ন পরিবেশ প্রতীয়মান হয় প্রথমে আত্মসক্রিয়তার পরিবেশের মতো, পরে সেটায় লাগান বেড়ির মতো, এগুলো নিয়ে ইতিহাসের সমগ্র ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে সংসর্গের বিভিন্ন ধরনের একটা সম্বদ্ধ শ্রেণী, সেটার সম্বদ্ধতা হল এতে: সংসর্গের যে পূর্ববর্তী ধরনটা বেড়ি হয়ে দাঁড়ায় সেটার জায়গায় আসে একটা নতুন ধরন, যেটা অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে, তাই ব্যক্তিদের আত্মসক্রিয়তার উন্নত প্রণালীর সঙ্গে মানানসই — এই ধরনটা আবার বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেটার জায়গায় আসে আর-একটা ধরন। যেহেতু এইসব পরিবেশ প্রত্যেকটা পর্বে উৎপাদন-শক্তিসমূহের যুগপৎ উন্নয়নের সঙ্গে মানানসই, তাই সেগুলির ইতিহাস একসঙ্গে প্রত্যেকটা পুরুষ-পর্যায়ের হাতে নেওয়া উন্নয়নশীল উৎপাদন-শক্তিসমূহের ইতিহাস এবং কাজেই ব্যক্তিদের নিজেদেরই শক্তিসমূহের বিকাশের ইতিহাস।

যেহেতু এই ক্রমবিকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অর্থাৎ সেটা অবাধে সম্মিলিত ব্যক্তিদের কোন সাধারণ পরিকল্পনার সাপেক্ষ নয়, তাই সেটা উদ্ভূত হয় বিভিন্ন এলাকা, গোষ্ঠী, জাতি, শ্রমের শাখা, ইত্যাদি থেকে, যেগুলোর প্রত্যেকটা শুরুতে বিকশিত হয় অন্যান্যের থেকে স্বতন্ত্রভাবে, এবং অন্যান্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় শুধু ক্রমে ক্রমে। অধিকন্তু, এটা ঘটে শুধু খুবই ধীরে; বিভিন্ন পর্ব আর স্বার্থ কখনও পুরোপুরি দমিত হয় না, সেটা প্রাধান্যশালী স্বার্থের শুধু অধীন হয়ে পরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সঙ্গে হেঁচড়ে চলতে থাকে। এর থেকে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায় তাতে এক-একটা জাতির ভিতরে ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থার কথাটা ছেড়ে দিলেও তাদের বিকাশ হয় একেবারেই পৃথক পৃথক ধরনে, আর কোন একটা পূর্ববর্তী স্বার্থ, যেটার সংসর্গের বিশেষ ধরনটাকে একটা

পরবর্তী স্বার্থের সংসর্গের ধরন এসে হটিয়ে দেয়, সেটা পরে দীর্ঘকাল যাবত থেকে যায় বিভ্রমজনক সম্প্রদায়ের (রাষ্ট্র, আইন) রেওয়াজ ক্ষমতার অধীনে, যেটা ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব লাভ করে; ঐ ক্ষমতাটাকে শেষপর্যন্ত চূর্ণ করতে পারে শুধু বিপ্লব। এর থেকে বোঝা যায় কেন এমনটা হয় যে, যেসব পৃথক পৃথক বিষয় [৬২] থেকে অপেক্ষাকৃত সাধারণ সংক্ষিপ্তসার করা চলে সেগুলোর প্রসঙ্গে চেতনা কখনও-কখনও সমসাময়িক প্রয়োগজ সম্পর্কের চেয়ে উন্নত প্রতীয়মান হয়, যাতে কোন একটা পরবর্তী যুগের বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে কেউ পূর্ববর্তী তত্ত্ববিদদের প্রামাণ্য বলে উল্লেখ করতে পারে।

পক্ষান্তরে, উত্তর আমেরিকার মতো যেসব দেশ শুরু করে ইতঃপূর্বে উন্নত ইতিহাসক্রমিক যুগে সেগুলিতে বিকাশ ঘটে খুবই দ্রুত। ব্যক্তি-মানুষেরা ছাড়া কোন স্বাভাবিক পত্তন থাকে না এইসব দেশের — সেইসব ব্যক্তি সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং সেটা করতে প্রণোদিত হয়, তার কারণ পুরন দেশগুলিতে সংসর্গের ধরন তাদের বিভিন্ন চাহিদার অনুযায়ী নয়। এইভাবে, সেইসব দেশ শুরু করে পুরন দেশগুলির সবচেয়ে উন্নত ব্যক্তিদের নিয়ে, কাজেই তদনুযায়ী সবচেয়ে উন্নত ধরনের সংসর্গ নিয়ে — সংসর্গের এই ধরনটা পুরন দেশগুলিতে চালু হতে পারার আগে। এমনটা ঘটে সমস্ত উপনিবেশের বেলায় — যেক্ষেত্রে সেগুলি সামরিক কিংবা বাণিজ্যিক কেন্দ্রমাত্র নয়। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত হল — কার্থেজ, গ্রীক উপনিবেশগুলি, এবং এগার আর বার শতকের আইসল্যান্ড। অনুরূপ সম্পর্ক পয়দা হয় দেশজয় থেকে, সেক্ষেত্রে অন্য দেশে গড়ে-ওঠা সংসর্গের ধরনটাকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এনে ফেলা হয় বিজিত দেশে: স্বদেশে সেটা বিভিন্ন পূর্ববর্তী কালপর্যায় থেকে চলে-আসা বিভিন্ন স্বার্থ আর সম্পর্কের ভারাক্রান্ত থাকে, কিন্তু এখানে সেটাকে চালু করা যায় এবং তা করা চাইই সম্পূর্ণভাবে এবং প্রতিবন্ধ ছাড়াই, আর কিছু না হলেও বিজেতার সুস্থিত ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্যে। [নর্ম্যান বিজয়ের পরে (৩৩) ইংলন্ড এবং নেপল্‌স, তখন তারা পেয়েছিল সবচেয়ে নিখুঁত ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন।]

[৮। ইতিহাসে বলপ্রয়োগের (দেশজয়ের) ভূমিকা]

দেশজয়ের ব্যাপারটা যেন ইতিহাস সম্বন্ধে এই সমগ্র ব্যাখ্যাটাকে বেঠিক প্রতিপন্ন করে। বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ, লুটতরাজ, হত্যা আর দস্যুতা, ইত্যাদি এযাবত ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে গণ্য হয়ে আসছে। এখানে আমাদের প্রধান বিষয়ে গণ্ডিবদ্ধ থাকতে হবে, কাজেই ধরতে হবে শুধু সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত — কোন বর্বর জাতির হাতে কেন প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস এবং তার ফলস্বরূপে সমাজের সম্পূর্ণ নতুন সংগঠনের উদ্ভব। [রোম এবং বারবারিয়ানরা; সামন্ততন্ত্র এবং গল্; বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য এবং তুর্কীরা। (৩৪)]

[৬৩] বিজেতা বর্বরদের কাছে যুদ্ধ তখনও সংসর্গের একটা নিয়মিত ধরন, যা আগে নির্দেশ করা হয়েছে; রেওয়াজী এবং একমাত্র সম্ভাব্য আনাড়ি উৎপাদন-প্রণালীর সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি মিলে উৎপাদনের নতুন নতুন উপকরণের আবশ্যকতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আরও বেশি সাগ্রহে কাজে লাগান হয়। পক্ষান্তরে, ইতালিতে ভূমি-সম্পত্তির সমাহরণ এবং সেগুলিকে পশুচারণভূমিতে পরিণত করার ফলে মুক্ত জনসমষ্টি প্রায় তামাম-উজাড় হয়ে গিয়েছিল। (ভূমি-সম্পত্তি সমাহরণ ঘটেছিল তামাম-ক্রয় আর ঋণগ্রস্ততার দরুন ছাড়াও উত্তরলব্ধির ফলেও; উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন ছিল ব্যাপক, বিবাহ ছিল বিরল, তাই পুরন পরিবারগুলো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিষয়-সম্পত্তি পড়েছিল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। অদ্যাবধি প্রচলিত রেওয়াজী আর্থনীতিক শক্তিগুলোর ক্রিয়াফলেই শুধু নয়, লুঠ-করা আর নজরানার শস্যের আমদানি এবং তার পরিণতিতে ইতালীয় শস্যের জন্যে চাহিদার অভাবের ফলেও ভূমি-সম্পত্তি পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল।) দাসেরাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বারবার, তাদের জায়গায় নতুন নতুন দাস আনতে হত অবিরাম। দাসপ্রথাই থেকে গিয়েছিল সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তি। মুক্তি-পাওয়া দাস আর দাসদের মাঝামাঝি ছিল প্লিবিয়ানরা -- তারা প্রলেতারিয়ান জনতার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে নি কখনও। রোম বাস্তবিকপক্ষে কখনও একটা নগরীর চেয়ে বেশি কিছু হয় নি; প্রদেশগুলোর সঙ্গে সেটার সংযোগ ছিল প্রায় পুরোপুরিই

রাজনীতিক, কাজেই আবার রাজনীতিক ঘটনাবলির ফলেও সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারত সহজেই।

এযাবত ইতিহাসে সবকিছু হল **হস্তগত করার** ব্যাপার, এই মর্মে ধারণাটার চেয়ে আকছার চালু নয় আর কিছুই। বারবারিয়ানেরা রোম-সাম্রাজ্য **হস্তগত করল,** এই হস্তগতকরণের ঘটনাটাকে দিয়ে প্রাচীন দুনিয়া থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের ব্যাখ্যা করান হয়। তবে বারবারিয়ানদের এই হস্তগতকরণের ব্যাপারে প্রশ্নটা হল, বিজিত জাতিটা শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন-শক্তিসমূহ গড়ে তুলেছে (আধুনিক জাতিগুলির বেলায় যেমনটা), না, তাদের উৎপাদন-শক্তিসমূহের ভিত্তি হল প্রধানত শুধু তাদের সম্মিলনী আর সম্প্রদায়। হস্তগতকরণটা আরও নির্ধারিত হয় হস্তগত বস্তুটাকে দিয়ে। কোন ব্যাংকারের ধন-ঐশ্বর্য কাগজী, — হস্তগত দেশটির উৎপাদন আর সংসর্গের প্রণালীর কাছে বশ্যতাস্বীকার না করে হস্তগতকারী সেই ধন আদৌ হস্তগত করতে পারে না। কোন আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশের সমগ্র শিল্পগত পুঁজির বেলায়ও সেই একই কথা। শেষে, সর্বত্রই হস্তগত করার সমাপ্তি ঘটে অচিরে, হস্তগত করার মতো আর কিছু না থাকলে তখন উৎপাদনের কাজে লাগতে হয়। উৎপাদন করার এই অপরিহার্যতা বলবৎ হয় অচিরে, এই অপরিহার্যতা থেকে উদ্ভূত হয় [৬৪] এই অবস্থাটা: ঔপনিবেশিক বিজেতাদের অবলম্বিত সম্প্রদায়বদ্ধতার ধরনটা হওয়া চাই উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের যে-পর্বটা তারা বিদ্যমান দেখতে পায় তদনুযায়ী; কিংবা, শুরু থেকেই ব্যাপারটা তেমন না হলে, উৎপাদন-শক্তিসমূহ অনুসারে সেটা পরিবর্তিত হওয়া চাই। এর থেকে আরও একটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, সেটা হল, বিভিন্ন জাতির প্রবসনের পরবর্তী কালপর্যায়ে সর্বত্র যা লোকে লক্ষ্য করেছে বলে: চাকর হল মনিব, আর বিজেতারা অচিরেই গ্রহণ করল বিজিতদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে কোনক্রমেই জার্মানি থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আনা হয় নি; বিজেতারা যতখানি সংশ্লিষ্ট তাতে এটার উৎপত্তিস্থল হল ফৌজে ঠিক দেশজয়ের সময়কার সামরিক সংগঠন, আর সেটা ক্রমে খাস সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল শুধু দেশজয়ের

পরে — বিজিত দেশে বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের ক্রিয়াফলের ভিতর দিয়ে। প্রাচীন রোমের অবশেষগুলো থেকে নেওয়া অন্যান্য ধরন বাস্তবায়িত করার ব্যর্থ চেষ্টাগুলো (শার্লেমেন, ইত্যাদি) থেকে দেখা যায় এই ধরনটা কী পরিমাণে নির্ধারিত হয়েছিল উৎপাদন-শক্তিসমূহ দিয়ে।

[৯। বৃহৎ শিল্প আর অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশে উৎপাদন-শক্তি এবং সংসর্গের ধরনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-অসংগতির বিকাশ। শ্রম আর পুঁজির মধ্যে বৈপরীত্য]

ব্যক্তি-মানুষের জীবনযাত্রার পরিবেশ, বিভিন্ন ঊনতা আর বদ্ধধারণার সমগ্র সাকল্যটা বৃহৎ শিল্প আর প্রতিযোগিতার ভিতরে একত্রে মিলেমিশে গিয়ে দুটো অতি সরল রূপ ধারণ করে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রম। অর্থ দেখা দিলে সংসর্গের প্রত্যেকটা ধরন এবং সংসর্গ আপনিই ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে আপতিক বিবেচিত হয়। এইভাবে অর্থ দেখিয়ে দেয় যে, পূর্ববর্তী সমস্ত সংসর্গ ছিল শুধু বিশেষ বিশেষ পরিবেশের আওতায় ব্যক্তি-মানুষদের সংসর্গ, ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিদের সংসর্গ নয়। এইসব পরিবেশ দুটো উপাদানে পরিণত হয়: পুঞ্জিত শ্রম বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সাক্ষাৎ শ্রম। উভয়ই কিংবা এর একটা ক্ষান্ত হলে সংসর্গ অচল অবস্থায় পড়ে যায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদেরাই — যেমন সিসমন্দি, শেরবুলিয়ে, ইত্যাদি — 'ব্যক্তিদের সম্মিলনীকে' স্থাপন করেন 'পুঁজির সম্মিলনীর' বিপরীতে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিরা নিজেরাই পুরোপুরি শ্রমবিভাগের অধীন, তাই তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে একেবারে পুরোপুরি। ব্যক্তিগত মালিকানা যে-পরিমাণে শ্রমের ভিতরেই শ্রমের বিপরীতে তাতে সেটা গড়ে ওঠে সঞ্চয়নের আবশ্যকতা থেকে, গোড়ায় সেটাতে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার আকার থাকে; কিন্তু পরবর্তী বিকাশের ধারায় সেটা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত মালিকানার আধুনিক আকারের কাছাকাছি এসে যায়। শ্রমবিভাগের মধ্যে শুরু থেকেই নিহিত থাকে শ্রমের **পরিবেশের,** হাতিয়ার আর মালমশলার

বিভাগ, তার থেকে বিভিন্ন মালিকের মধ্যে সঞ্চিত পুঁজির বিভাগ, আর তার থেকে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে এবং মালিকানার নিজেরই বিভিন্ন আকারের বিভাগ। শ্রমবিভাগ যত বেশি অগ্রসর হয় [৬৫] এবং সঞ্চয় বাড়ে, ততই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই প্রভেদনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ। খাস শ্রমেরই অস্তিত্ব সম্ভব কেবল এই বিভক্ত অবস্থার ভিত্তিতে।

(বিভিন্ন জাতির — জার্মানরা এবং আমেরিকানরা — ব্যক্তিদের স্বকীয় কর্মশক্তি — এমনকি সংকর-প্রজননের সাহায্যেও কর্মশক্তি — তার থেকে জার্মানদের বামনত্ব; বিদেশীদের পরিবাপন — ফ্রান্স, ইংলন্ড, ইত্যাদি দেশে ইতঃপূর্বে উন্নয়ন-করা জমিনে, আমেরিকায় একেবারেই নতুন জমিনে; জার্মানিতে দেশজ জনসমষ্টি নির্ঝঞ্ঝাটে থেকে গেল যেখানে ছিল।)

এইভাবে এখানে প্রকাশ পেল দুটো তথ্য।* এক, উৎপাদন-শক্তিসমূহ প্রতীয়মান হয় ব্যক্তিদের পাশাপাশি আপনাতেই একটা জগৎ, যা ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন: তার কারণটা এই যে, সেগুলো যাদের শক্তি সেই ব্যক্তিরা থাকে পৃথক পৃথক হয়ে এবং পরস্পরের প্রতিযোগে, যদিও পক্ষান্তরে, এইসব শক্তি কেবল এইসব ব্যক্তির সংসর্গ এবং সম্মিলনীর মাঝেই বাস্তব শক্তি। এইভাবে, একদিকে রয়েছে উৎপাদন-শক্তিসমূহের একটা সাকল্য, সেগুলো যেন বৈষয়িক আকার পেয়ে ব্যক্তিদের পক্ষে আর ব্যক্তিদের শক্তি নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির শক্তি, আর তাই সেগুলো ব্যক্তিদের শক্তি কেবল এই দিক থেকে যে, তারা নিজেরাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক। পূর্ববর্তী কোন কালপর্যায়ে উৎপাদন-শক্তিসমূহ কখনও **ব্যক্তিগণ হিসেবে** ব্যক্তিগণের সংসর্গ থেকে এমনটা অনপেক্ষ আকার ধারণ করে নি, কেননা তাদের সংসর্গটাই আগে ছিল সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, এইসব উৎপাদন-শক্তির বিপরীতে রয়েছে ব্যক্তিদের অধিকাংশ, যাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] সিস্‌মঁদি।

হয়েছে এইসব শক্তি, যারা এইভাবে সমস্ত সত্যিকারের সঞ্জীবন-মর্মবস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে বিমূর্ত ব্যক্তি হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু কেবল এই ব্যাপারটার ফলেই তারা **ব্যক্তিগণ হিসেবে** পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবার মতো অবস্থায় এসেছে।

উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে এবং তাদের নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গে তাদের এখনও সংযুক্ত রেখেছে একটামাত্র গ্রন্থি, সেটা হল শ্রম; এই শ্রমের আত্মসক্রিয়তার কোন উপাদানই আর নেই, সেটা তাদের জীবন [৬৬] বজায় রাখে শুধু সেটাকে খর্ব ক'রে। যদিও একদিকে, পূর্ববর্তী কালপর্যায়গুলিতে আত্মসক্রিয়তা এবং বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন ছিল সংযোগচ্যুত, কেননা সে-দুটো থাকত পৃথক পৃথক লোকের হাতে, আর যদিও ব্যক্তিদের নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন আত্মসক্রিয়তার একটা নিকৃষ্ট প্রণালী বলে বিবেচিত হত, এখন সে-দুটো এতই ভিন্নমুখী যাতে বৈষয়িক জীবন প্রতীয়মান হয় একেবারেই পরিণতি বলে, আর এই বৈষয়িক জীবনটাকে যা পয়দা করে সেই শ্রম (যা এখন একমাত্র সম্ভাব্য কিন্তু, আমরা যেমনটা দেখি, আত্মসক্রিয়তার নঞর্থক রূপ) প্রতীয়মান হয় উপায় হিসেবে।

[১০। ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের অপরিহার্যতা, পরিবেশ এবং পরিণতি]

এইভাবে ব্যাপারটা এখন এমন অবস্থায় এসেছে, যাতে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিদ্যমান সাকল্যটাকে ব্যক্তিদের ভোগ-দখল করা চাই, সেটা আত্মসক্রিয়তা লাভ করার জন্যেই শুধু নয়, অধিকন্তু তাদের অস্তিত্বটাকেই স্রেফ রক্ষা করার জন্যেও।

এই ভোগ-দখল প্রথমে নির্ধারিত হয় যা ভোগ-দখল করতে হবে সেই বস্তুটা দিয়ে, সেটা হল উৎপাদন-শক্তিসমূহ, যা একটা সাকল্যের মাত্রায় উন্নত হয়েছে, যেটার অস্তিত্ব শুধু একটা সর্বব্যাপী সংসর্গের মাঝে। কাজেই কেবল এই দিকটা থেকেই, উৎপাদন-শক্তিসমূহের এবং সংসর্গের সঙ্গে মানানসই সর্বব্যাপী প্রকৃতি থাকা চাই এই ভোগ-দখলের। এইসব শক্তির ভোগ-দখল আপনাতে উৎপাদনের বৈষয়িক হাতিয়ারগুলির সঙ্গে মানানসই

বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যের বিকাশের চেয়ে বেশি কিছু নয়। ঠিক এই কারণেই উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহের সাকল্যটার ভোগ-দখল হল ব্যক্তিদের নিজেদের মাঝে সামর্থ্যসমূহের একটা সাকল্যের বিকাশ।

যেসব লোকে ভোগ-দখল করে তাদের দিয়েও নির্ধারিত হয় এই ভোগ-দখল। এখনকার দিনের প্রলেতারিয়ানরা, যারা সমস্ত আত্মসক্রিয়তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত, কেবল তারাই যা পূর্ণাঙ্গ এবং আর সীমাবদ্ধ নয় এমন আত্মসক্রিয়তা লাভ করার মতো অবস্থায় আছে, সেই আত্মসক্রিয়তা নিহিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাকল্যটাকে ভোগ-দখলের মাঝে এবং সামর্থ্যসমূহের সাকল্যের এইভাবে নির্দিষ্ট বিকাশের মাঝে। পূর্ববর্তী সমস্ত বৈপ্লবিক ভোগ-দখল ছিল সীমাবদ্ধ; উৎপাদনের আনাড়ি হাতিয়ার এবং গণ্ডিবদ্ধ সংসর্গ দিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল যাদের আত্মসক্রিয়তা এমনসব ব্যক্তি ভোগ-দখল করেছিল উৎপাদনের [৬৭] এই আনাড়ি হাতিয়ার, এই কারণে তারা পেঁছেছিল শুধু একটা নতুন সীমাবদ্ধাবস্থায়। তাদের উৎপাদনের হাতিয়ার হয়েছিল তাদের সম্পত্তি, কিন্তু তারা নিজেরা থেকে গিয়েছিল শ্রমবিভাগ এবং তাদের নিজেদের উৎপাদনের হাতিয়ারের অধীন। এখন অবধি সমস্ত ভোগ-দখলে বিপুল ব্যক্তিরাশি থেকে গিয়েছিল উৎপাদনের একটামাত্র হাতিয়ারের বশবর্তী; প্রলেতারিয়ানদের ভোগ-দখলের বেলায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে উৎপাদনের একগাদা হাতিয়ার, আর সেগুলো হবে সবার সম্পত্তি। কাজেই, আধুনিক সর্বব্যাপী সংসর্গকে যখন নিয়ন্ত্রণ করবে সবাই, একমাত্র তখনই সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ব্যক্তিরা।

এই ভোগ-দখল কিভাবে বলবৎ হবে তা দিয়েও সেটা নির্ধারিত হবে। এটা বলবৎ হতে পারে কেবল সম্মিলনীর দ্বারা, প্রলেতারিয়েতের আপনারই যা প্রকৃতি তাতে এই সম্মিলনীও হতে পারে কেবল সর্বব্যাপী, আর বলবৎ হতে পারে বিপ্লবের সাহায্যে, যে বিপ্লবে, একদিকে, পূর্ববর্তী উৎপাদন আর সংসর্গের প্রণালী এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষমতা উচ্ছেদ হবে, আর অন্যদিকে গড়ে ওঠে প্রলেতারিয়েতের সর্বব্যাপী প্রকৃতি আর কর্মশক্তি, যেটা ছাড়া বিপ্লব সম্পাদিত হতে পারে না; সে-বিপ্লবে আরও ঘটবে এটা: সমাজে প্রলেতারিয়েতের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে তখনও তাতে যাকিছু জড়িয়ে থাকে সেগুলোর ভারমুক্ত হবে প্রলেতারিয়েত।

শুধু এই পর্বে আত্মসক্রিয়তা হয় বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যেটা ব্যক্তির পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া এবং সমস্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধাবস্থা ঝেড়ে ফেলার জন্যে উপযুক্ত। আত্মসক্রিয়তায় শ্রমের রূপান্তরটা পূর্ববর্তী সীমাবদ্ধ সংসর্গের ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিদের মধ্যে সংসর্গে রূপান্তরিত হবার প্রতিষঙ্গী হয়। সম্মিলিত ব্যক্তিগণের মারফত সমগ্র উৎপাদন-শক্তি ভোগ-দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটে। ইতিহাসে আগে কোন একটা বিশেষ পরিবেশ আপতিক বলে প্রতীয়মান হত, কিন্তু এখন ব্যক্তিদের বিচ্ছিন্নতা এবং প্রত্যেকটি মানুষের বিশেষ নিজস্ব লাভ নিজেরাই হয়ে পড়ে আপতিক।

যারা আর [৬৮] শ্রমবিভাগের অধীন নয় সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দার্শনিকেরা ধারণা করেছেন 'মানুষ' বলে অভিহিত একটা আদর্শ হিসেবে। আমরা যে সমগ্র প্রক্রিয়াটার রূপরেখা দিয়েছি সেটাকে তাঁরা ধারণা করেছেন 'মানুষের' ক্রম-অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে, যাতে প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক পর্বে ব্যক্তিদের বদলি 'মানুষ' স্থাপন ক'রে সেটাকে দেখান হয়েছে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে। এইভাবে সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে ধারণা করা হয়েছে 'মানুষের' আত্ম-পরকীকরণ* প্রক্রিয়া হিসেবে, সেটা মূলত এই কারণে যে, কোন পরবর্তী পর্বের গড়পড়তা ব্যক্তিকে পূর্ববর্তী পর্বের উপর এবং কোন পরবর্তী যুগের চেতনাকে পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তিদের উপর প্রক্ষেপ করা হয়েছে সবসময়ে। এই ওলটান অবস্থাটা গোড়া থেকেই যথার্থ পরিবেশের একটা বিমূর্ত প্রতিমূর্তি — এটার সাহায্যে সমগ্র ইতিহাসকে চেতনার একটা অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল।

* * *

উৎপাদন-শক্তিসমূহের উন্নয়নের কোন নির্দিষ্ট পর্বের ভিতরে ব্যক্তিদের সমগ্র বৈষয়িক সংসর্গ জুড়ে থাকে নাগরিক সমাজ। কোন নির্দিষ্ট পর্বের বাণিজ্যিক আর শিল্প জীবন জুড়ে এটা থাকে এবং সেই পরিমাণে ছাড়িয়ে

---

* [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] আত্ম-পরকীকরণ।

যায় রাষ্ট্র আর জাতির পরিধি, যদিও অন্যদিকে এটাকে আবার বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই জাতিসত্তা হিসেবে, আর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংগঠিত হওয়া চাই রাষ্ট্র হিসেবে। 'নাগরিক সমাজ' (সিভিল সোসাইটি) ['bürgerliche Gesellschaft']* অভিধাটা দেখা দিয়েছিল আঠার শতকে, যখন মালিকানা সম্পর্ক ইতঃপূর্বে প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়িক সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নাগরিক সমাজ বলতে ঠিক যা বোঝায় সেটা গড়ে ওঠে শুধু বুর্জোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে; সরাসরি উৎপাদন আর বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত যে-সামাজিক সংগঠন সর্বকালে রাষ্ট্র এবং বাদবাকি আদর্শগত** উপরকাঠামের ভিত্তি, সেটাকে কিন্তু বরাবর ঐ একই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[১১।] সম্পত্তির সঙ্গে রাষ্ট্র আর আইনের সম্পর্ক

যেমন মধ্যযুগে তেমনি প্রাচীন দুনিয়ায় প্রথম আকারের সম্পত্তি হল গোষ্ঠীগত সম্পত্তি, যেটা নির্ধারিত হয় রোমকদের বেলায় প্রধানত যুদ্ধ দিয়ে, আর পশুপালন দিয়ে [৬৯] জার্মানদের বেলায়। প্রাচীন জাতিগুলির ক্ষেত্রে, কয়েকটা গোষ্ঠী এক শহরে একত্রে বসবাস করে ব'লে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে, আর তাতে ব্যক্তির অধিকার নিছক 'ভোগ-অধিকার' হিসেবে প্রতীয়মান হয়, সেটা কিন্তু সমগ্রভাবে গোষ্ঠীগত সম্পত্তির মতো গণ্ডিবদ্ধ থাকে কেবল ভূমি-সম্পত্তিতেই। যেমন আধুনিক জাতিগুলি তেমনি প্রাচীনদের বেলায় সত্যিকারের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূত্রপাত হয় অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে। — (দাসপ্রথা আর সম্প্রদায়) (dominium ex jure Quiritum)***। মধ্যযুগে গড়ে-ওঠা জাতিগুলির ক্ষেত্রে, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পত্তি, সংস্থাভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি আর ম্যানুফ্যাকচারে বিনিয়োজিত

---

* 'Bürgerliche Gesellschaft'-এর অর্থ হতে পারে 'বুর্জোয়া সমাজ' কিংবা 'নাগরিক সমাজ'। — সম্পাঃ

** অর্থাৎ, ভাবগত, ভাবাদর্শগত। — সম্পাঃ

*** পূর্ণ রোমক নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী মালিকানা। — সম্পাঃ

পুঁজি, এইসব বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে গিয়ে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক পুঁজি, বৃহৎ শিল্প আর প্রতিযোগিতা দিয়ে নির্ধারিত আধুনিক পুঁজি, অর্থাৎ অবিমিশ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত লক্ষণ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, আর সম্পত্তির বিকাশের উপর যেকোন প্রভাব ফেলা থেকে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়েছে। এই আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র মানানসই; ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা কর দিয়ে-দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে ক্রমে ক্রমে কিনে ফেলেছে, জাতীয় ঋণের কারণে সেটা সম্পূর্ণভাবেই চলে গেছে তাদের হাতে; সম্পত্তির মালিকেরা, বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রকে যে কারবারী ক্রেডিট দেয় তার উপর সেটার অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে, সেটা প্রকাশ পায় স্টক এক্সচেঞ্জে কম্পানির কাগজের ওঠা-নামাতে। বুর্জোয়ারা আর নয় একটা **সামাজিক বর্গ**, তারা তখন একটা **শ্রেণী**, কেবল এরই দরুন তারা স্থানীয়ভাবে আর নয়, দেশজোড়া পরিসরে সংগঠিত হতে, আর নিজ গড়-অনুযায়ী স্বার্থের একটা সাধারণ আকার দিতে বাধ্য হয়। সম্প্রদায় থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মুক্তির ফলে রাষ্ট্র হয়ে উঠল নাগরিক সমাজের পাশাপাশি এবং সেটার বাইরে একটা পৃথক সত্তা; কিন্তু অভ্যন্তরীণ আর বহিস্থ উভয় প্রয়োজনে, তাদের সম্পত্তি আর স্বার্থের পারস্পরিক নিশ্চয়তার জন্যে অপরিহার্য বলে বুর্জোয়ারা সংগঠনের এই আকারটাকে অবলম্বন করল, এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যেখানে সামাজিক বর্গগুলো এখনও পুরোপুরি শ্রেণীতে পরিণত হয় নি, অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিতে যার পাট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সামাজিক বর্গগুলোর একটা ভূমিকা যেখানে এখনও রয়েছে, আর যেখানে রয়েছে একটা মিশ্রণ, অর্থাৎ কিনা, যেখানে জনসমষ্টির কোন একটা অংশ অন্যান্যের উপর আধিপত্য কায়েম করতে পারে নি, কেবল সেইসব দেশেই আজকাল দেখা যায় রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য। অবস্থাটা তেমনিই বিশেষত জার্মানিতে। আধুনিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে নিখুঁত দৃষ্টান্ত হল উত্তর [৭০] আমেরিকা। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যে, এই মত প্রকাশ করেন সমস্ত আধুনিক ফরাসী, ইংরেজ এবং মার্কিন গ্রন্থকারেরা, যাতে সাধারণ মানুষের চেতনায় ঢুকে গেছে এই তথ্যটা।

যেহেতু কোন একটা শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের সমস্বার্থ জাহির

করে রাষ্ট্র এই আকারটা দিয়ে, এই আকারটায় চুম্বকে মূর্ত হয় কোন যুগের সমগ্র নাগরিক সমাজটা, তার থেকে আসে এই অবস্থাটা: সমস্ত সাধারণী প্রতিষ্ঠানাদি গঠিত হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে, আর এইসব প্রতিষ্ঠানাদি রাজনীতিক রূপ ধারণ করে। তার থেকে উদ্ভূত হয় এই বিভ্রমটা: বিধি-বিধানের ভিত্তি হল ইচ্ছা, সেটার বাস্তব ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ইচ্ছাই — **স্বাধীন** ইচ্ছা। তেমনি আবার ন্যায়ের বেলায় — সেটাকে বিদ্যমান আইন-কানুনে পর্যবসিত করা হয়।

স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রদায় ভেঙে পড়লে, তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে দেওয়ানী আইন। রোমকদের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর দেওয়ানী আইনের বিকাশের দরুন আর কোন শিল্পগত আর বাণিজ্যিক পরিণতি ঘটে নি, কেননা তাদের সমগ্র উৎপাদন-প্রণালী বদলায় নি।* শিল্প আর বাণিজ্যের ফলে যেখানে সামন্ততান্ত্রিক সম্প্রদায় ভেঙে পড়েছিল সেইসব আধুনিক জাতির বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর দেওয়ানী আইন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন পর্বের সূত্রপাত হয়, সেটার আরও বিকাশ ঘটতে পারে। মধ্যযুগে সর্বপ্রথমে ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য করেছিল আমাল্‌ফি নামে শহর, সেখানে সামুদ্র আইনও গড়ে উঠেছিল (৩৫)। শিল্প আর বাণিজ্যের কল্যাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে খুবই উন্নত রোমক দেওয়ানী আইন আবার অবিলম্বে অবলম্বিত এবং কর্তৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল — প্রথমে ইতালিতে, পরে অন্যান্য দেশে। পরে বুর্জোয়ারা এতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল যাতে রাজ-রাজড়ারা বুর্জোয়াদের সাহায্যে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুলকে উচ্ছেদ করার জন্যে বুর্জোয়াদের স্বার্থের জিম্মাদার হয়েছিল, তখন সমস্ত দেশে শুরু হয়েছিল — ফ্রান্সে ষোল শতকে — আইনের সত্যিকারের বিকাশ, সেটা ইংলন্ড ছাড়া সমস্ত দেশে ঘটেছিল [৭১] রোমক আইন-সংহিতার ভিত্তিতে। ইংলন্ডেও দেওয়ানী আইনের বিকাশে আনুকূল্য করার জন্যে রোমক আইনের মূল উপাদানগুলি চালু করতে হয়েছিল (বিশেষত অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)। (আইনের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে ধর্মেরই মতো সামানাই, এটা ভোলা চলে না।)

* [মার্জিনে এঙ্গেলসের টীকা:] (ভোটা!)

দেওয়ানী আইনে বলা হয়, বিদ্যমান মালিকানা সম্পর্ক হল সাধারণ ইচ্ছার ফল। Jus utendi et abutendi* আপনিই সপ্রমাণ করে একদিকে এই তথ্যটা যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবেই সম্প্রদায় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে, আর অন্যদিকে এই বিভ্রমটা: ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপনারই একমাত্র ভিত্তি হল স্বেচ্ছা, ইচ্ছামতো জিনিসের বিলি-বন্দেজ। কার্যক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক যদি তার সম্পত্তি, কাজেই, তার jus abutendi** অন্যান্য হাতে চলে যায় এমনটা না চায়, তাহলে abuti'-র*** বিভিন্ন নির্দিষ্ট আর্থনীতিক সীমাবদ্ধতা থাকে মালিকের পক্ষে, কেননা প্রকৃতপক্ষে, শুধু তার ইচ্ছার দিক থেকে দেখলে, জিনিসটা আদৌ কোন জিনিস নয়, সেটা জিনিস হয়ে ওঠে, সত্যিকারের সম্পত্তি হয়ে ওঠে শুধু সংসর্গের মাঝে এবং আইনের থেকে অনপেক্ষভাবে (যেটা হল একটা **সম্পর্ক**, যেটাকে দার্শনিকেরা বলেন একটা ভাব****)। এই আইনগত বিভ্রমটা আইনকে নিছক পর্যবসিত করে, — মালিকানা সম্পর্কের আরও বিকাশের ধারায় এই বিভ্রমটা অনিবার্যভাবেই পৌঁছে যায় এই মতাবস্থানে: একজনের কোন একটা জিনিস প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও সেটাতে তার আইনগত স্বত্ব থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা জমি-বন্দ থেকে আয় প্রতিযোগিতার দরুন খোয়া গেলে জমিটাতে jus utendi et abutendi সহ আইনগত স্বত্ব মালিকের নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু সেটা দিয়ে সে করতে পারে না কিছুই: জমিটা ছাড়াও তদুপরি সেটায় চাষবাস করার মতো যথেষ্ট পুঁজি না থাকলে ভূমি-মালিক হিসেবে সে কিছুরই অধিকারী নয়। ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে (যেমন চুক্তি), এটা ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞদের কাছে, যেমন প্রত্যেকটা সংহিতার কাছে একেবারেই আপতিক, এই তথ্যটারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাদের ঐ বিভ্রমটা থেকে; এইসব সম্পর্ক স্থাপিত হতে [পারে] কিংবা নাও পারে

---

* কোন জিনিস ব্যবহার করার এবং পরিভোগ করার (অপব্যবহার করারও), অর্থাৎ ইচ্ছামতো বিলি-বন্দেজ করার অধিকার। — সম্পাঃ

** অপব্যবহারের অধিকার। — সম্পাঃ

*** পরিভোগ করা কিংবা অপব্যবহার করা। — সম্পাঃ

**** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] **দার্শনিকদের পক্ষে সম্পর্ক=ভাব।** তাঁরা জানেন শুধু 'মানুষের' নিজের সঙ্গে সম্পর্ক, কাজেই তাঁদের কাছে সমস্ত হয়ে দাঁড়ায় ভাব।

ইচ্ছামতো, [৭২] আর সেগ্নলোর মর্মবস্তুর অবলম্বন হল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগ্নলির স্রেফ [স্বাধীন] ইচ্ছা, এমনটা তারা কেন বিবেচনা করে তা বোঝা যায় তাদের ঐ বিভ্রমটা থেকে।

শিল্প আর বাণিজ্যের প্রসারের কল্যাণে যখনই নতুন নতুন ধরনের সংসর্গ দেখা দিয়েছে (যেমন, বিমা কম্পানি, ইত্যাদি), তেমন সমস্ত ক্ষেত্রে আইন সেগ্নলোকে সম্পত্তি অর্জনের উপায়গ্নলোর মধ্যে ধরতে বাধ্য হয়েছে।*

[১২। সামাজিক চেতনার বিভিন্ন আকার]

বিজ্ঞানের উপর শ্রমবিভাগের প্রভাব।

রাষ্ট্র, অধিকার, নৈতিকতা, ইত্যাদি ব্যাপারে **নিগ্রহের** ভূমিকা।

আইনে ব্র্জোয়াদের নিজেদের একটা সাধারণ অভিব্যক্তি দিতে হয়, সেটা ঠিক এই কারণে যে, তারা শাসন চালায় একটা শ্রেণী হিসেবে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং ইতিহাস।

রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, ইত্যাদির, কলাবিদ্যা, ধর্ম, ইত্যাদির কোন ইতিহাস নেই।**

ভাবাদর্শীবিদেরা সবকিছ্নকে উলটে-পালটে ধরেন কেন।

ধর্মওয়ালারা, ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা, রাজনীতিকরা।

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞরা, রাজনীতিকরা (সাধারণভাবে রাষ্ট্রনায়কেরা), নীতিবাদীরা, ধর্মওয়ালারা।

---

* পরে, পান্ডুলিপির শেষে মার্কসের হাতে লেখা বিভিন্ন টীকা আছে, সেগ্নলিকে তিনি আরও বিশদ করতে মনস্থ করেছিলেন। — সম্পাঃ

** [মার্জিনে মার্কসের টীকা:] প্রচীন রাষ্ট্রে, সামন্ততন্ত্রে এবং নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে 'সম্প্রদায়' যেমনটা প্রতীয়মান হয় তার, এই বন্ধনের প্রতিষঙ্গী হল বিশেষত বিভিন্ন (আধ্যাত্মিক) ধর্মীয় ধারণা।

একটা শ্রেণীর ভিতরে এই ভাবাদর্শগত শাখা-বিভাগের জন্যে, ১) **শ্রমবিভাগের দরুন বৃত্তি একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করে;** প্রত্যেকে মনে করে, তার বৃত্তিটাই আসল বৃত্তি। তাদের বৃত্তি এবং বাস্তবতার মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রমের কাছে তাদের আরও সহজে বশীভূত করায় তাদের বৃত্তির প্রকৃতিটাই। তাদের চেতনায়, ব্যবহারসংহিতায়, রাজনীতিতে, এবং এইরকমের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলো হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধারণা; তারা এইসব সম্পর্ক ছাড়িয়ে যায় না বলে সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে ধারণাও তাদের মনে হয়ে দাঁড়ায় বদ্ধ ধারণা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারক সংহিতা প্রয়োগ করে, কাজেই আইনগুলোকে সে আসল, সক্রিয় চালিকাশক্তি বলে বিবেচনা করে। মালের প্রতি তাদের সমীহ, কেননা তাদের বৃত্তির কাজকর্ম সাধারণ বিষয়াবলি নিয়ে।

ন্যায় সম্বন্ধে ধারণা। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা। **প্রচলিত** চেতনায় ব্যাপারটা উলটে-পালটে দাঁড়ায়।

একেবারে শুরু থেকেই ধর্ম হল যা **অতিপ্রাকৃত** সে-সম্বন্ধে **সত্যিকারের** অপরিহার্যতা থেকে উদ্ভূত চেতনা।

এটা অপেক্ষাকৃত জন-প্রচলিত।

আইন, ধর্ম, ইত্যাদি প্রসঙ্গে ঐতিহ্য।

* * *

[৭৩]* ব্যক্তিরা সবসময়ে শুরু করেছে এবং সবসময়ে শুরু করে নিজেদের থেকে। তাদের সম্পর্কগুলো তাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক।

---

* পাণ্ডুলিপিতে এই শেষ পৃষ্ঠাটা সংখ্যাচিহ্নিত নয়। ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয়ের ব্যাখ্যানের সূচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন টীকা এতে রয়েছে। এখানে ব্যক্ত ভাব-ধারণাগুলিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে পরিচ্ছেদটার ১ম ভাগের ৩য় বিভাগে। — সম্পাঃ

তাদের সম্পর্কগুলো তাদের বিপরীতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে, এমনটা হয় কেমন করে? আর কেমন করে এমনটা হয় যে, তাদের নিজেদেরই জীবনের বলগুলো তাদের অভিভূত করে?

সংক্ষেপে: **শ্রমবিভাগ,** যেটার মাত্রা যেকোন বিশেষ সময়ে নির্ভর করে উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশের উপর।

ভূমি-সম্পত্তি। সম্প্রদায়গত সম্পত্তি। সামন্ততান্ত্রিক। আধুনিক।

সামাজিক-বর্গীয় সম্পত্তি। ম্যানুফ্যাকচারের সম্পত্তি। শিল্পক্ষেত্রের পুঁজি।

১৮৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের অগস্ট মাসের মধ্যে ব্রাসেলসে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ছাপা হল জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ (৩৬)

১ নং প্রশ্ন: কমিউনিজম কি?

উত্তর: কমিউনিজম হল প্রলেতারিয়েতের মুক্তির জন্যে আবশ্যক পরিবেশ সংক্রান্ত মতবাদ।

২ নং প্র: প্রলেতারিয়েত কি?

উ: প্রলেতারিয়েত হল সমাজের সেই শ্রেণী যেটা জীবনোপায় যোগাড় করে সম্পূর্ণভাবে এবং শুধু শ্রম বিক্রি ক'রে, কোন পুঁজি থেকে পাওয়া লাভ দিয়ে নয়; যেটার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জীবন-মরণ, সমগ্র অস্তিত্ব নির্ভর করে শ্রমের জন্যে চাহিদার উপর, কাজেই, ব্যবস্থা-বাণিজ্যের ভাল আর খারাপ দিনকালের পালা-বদলের উপর, লাগামছাড়া প্রতিযোগিতার ওঠা-পড়ার উপর। এককথায়, প্রলেতারিয়েত, বা প্রলেতারিয়ানদের শ্রেণী হল উনিশ শতকের শ্রমিক শ্রেণী।

৩ নং প্র: তাহলে, প্রলেতারিয়ানরা সবসময়েই ছিল না কি?

উ: না। গরিব লোক আর মেহনতী শ্রেণী সবসময়েই থেকেছে; মেহনতী শ্রেণীগুলির বেশির ভাগই ছিল গরিব। কিন্তু এখুনই যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে থেকেছে যেসব গরিব লোক, যেসব মেহনতী মানুষ, অর্থাৎ প্রলেতারিয়ানরা তারা সবসময়ে ছিল না, যেমন কিনা প্রতিযোগিতাও সবসময়ে ছিল না অবাধ আর লাগামছাড়া।

৪ নং প্র: প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব হল কিভাবে?

উ: গত শতকের শেষার্ধে ইংলন্ডে উদ্ভূত হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব, তার পর থেকে সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশে — সেই শিল্প-

বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব। স্টীম ইঞ্জিন, বিভিন্ন সুতা-কাটার যন্ত্র, যান্ত্রিক তাঁত এবং বহুসংখ্যক অন্যান্য কল-কব্জা উদ্ভাবনের ফলে ঘটেছিল এই শিল্প-বিপ্লব। এইসব যন্ত্রপাতি ছিল খুবই ব্যয়বহুল, কাজেই সেগুলো কিনতে পারত কেবল বড় বড় পুঁজিপতিরাই, সেগুলো তদবধি বর্তমান সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে বদলে দিল এবং তদবধি বর্তমান শ্রমিকদের হটিয়ে দিল, কেননা আনাড়ি চরকা আর হাতে চালান তাঁতে শ্রমিকেরা যা করত তার চেয়ে সস্তা আর সরেস পণ্য উৎপন্ন হল যন্ত্রে। এইভাবে এইসব যন্ত্র প্রচলনের ফলে শিল্প পুরোপুরি চলে গেল বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে, শ্রমিকদের সামান্য সম্পত্তি (হাতিয়ার, হাতে চালান তাঁত, ইত্যাদি) হয়ে পড়ল অকেজো, এইভাবে অচিরেই পুঁজিপতিরা হয়ে গেল সবকিছুর মালিক, শ্রমিকদের হাতে থাকল না কিছু। এইভাবে বোনা জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে চালু হয়েছিল কারখানা প্রণালী। — যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করায় এবং কারখানা প্রণালীতে যেই বেগ সঞ্চারিত হল অমনি কারখানা প্রণালী দ্রুত ঢুকে পড়ল অন্যান্য সমস্ত শাখায়, বিশেষত কাপড় বোনা আর বই-ছাপার বৃত্তিতে, মৃৎশিল্পে এবং লোহালক্কড় শিল্পে। কাজ ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে ভাগ-ভাগ হয়ে পড়তে থাকল বহু শ্রমিকের মধ্যে, তাতে যে-শ্রমিক আগে তৈরি করত গোটা জিনিসটা সে পয়দা করতে থাকল জিনিসটার একটা অংশ। এই শ্রমবিভাগের ফলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং কাজেই অপেক্ষাকৃত সস্তায় জাতদ্রব্যের যোগান সম্ভব হয়ে উঠল। এর ফলে প্রত্যেকটি শ্রমিকের কাজ খুবই সরল, অনবরত পুনরাবৃত্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াপ্রণালীতে পরিণত হল, তাতে কাজটা যন্ত্র করতে পারে সমানই ভালভাবেই শুধু নয়, ঢের বেশি ভালভাবেই। এইভাবে, ঠিক সুতা-কাটা আর কাপড়-বোনা শিল্পেরই মতো শিল্পের ঐ সমস্ত শাখা একটার পরে একটা পড়ে গেল স্টীম-শক্তি, যন্ত্রপাতি আর কারখানা প্রণালীর দখলে। কিন্তু ঐ সমস্ত শিল্প বড় বড় পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেল তার ফলে, আর এক্ষেত্রেও শ্রমিকদের স্বাধীনতার লেশমাত্রও অবশিষ্ট রইল না। যথার্থ ম্যানুফ্যাকচার ছাড়াও তেমনিভাবে হস্তশিল্পও ক্রমাগত বেশি পরিমাণে চলে গেল কারখানা প্রণালীর দখলে, কেননা এক্ষেত্রেও বড় বড় পুঁজিপতিরা বড় বড় কর্মশালা বসিয়ে খুদে মালিকদের ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ঠেলে

দিয়েছিল একধারে। ঐসব কর্মশালায় অনেকটা সাশ্রয় হত, আর কাজও সুবিধাজনকভাবে ভাগ করে দেওয়া যেত শ্রমিকদের মধ্যে। এইভাবে অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সমস্ত সভ্য দেশে শ্রমের প্রায় সমস্ত শাখায়ই কাজ চলে কারখানা প্রণালীতে, এগুলির প্রায় সমস্ত শাখায় হস্তশিল্প আর ম্যানুফ্যাকচারকে উচ্ছেদ করেছে বৃহদায়তনের শিল্প। — ফলে, আগেকার মধ্যশ্রেণীগুলি, বিশেষত অপেক্ষাকৃত খুদে মালিক হস্তশিল্পীরা ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে জেরবার হয়ে গেছে, শ্রমিকদের আগেকার অবস্থান বদলে গেছে একেবারেই, আর দেখা দিয়েছে দুটো নতুন শ্রেণী, যারা অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীকে ক্রমে ক্রমে আত্মভূত করছে, এই শ্রেণী-দুটো হল:

এক। বড় বড় পুঁজিপতিদের শ্রেণী; সেটা সমস্ত সভ্য দেশে ইতোমধ্যে প্রায় সমগ্রভাবেই সমস্ত জীবনোপায়ের এবং এইসব জীবনোপায় উৎপাদনের জন্যে আবশ্যক কাঁচামাল আর সাধিত্রের (যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, ইত্যাদির) মালিক। এটা হল বুর্জোয়া শ্রেণী বা বুর্জোয়ারা (bourgeoisie)।

দুই। সেই শ্রেণীটা যারা একেবারে কিছুরই মালিক নয়, যারা কাজে-কাজেই বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য সেটার বিনিময়ে অত্যাবশ্যক জীবনোপায় জোটাবার জন্যে। এই শ্রেণীটাকে বলা হয় প্রলেতারিয়ান শ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত।

৫ নং প্র: বুর্জোয়াদের কাছে প্রলেতারিয়ানদের এই শ্রম-বেচা চলে কোন্ পরিবেশে?

উ: অন্য যেকোন পণ্যের মতো শ্রমও একটা পণ্য; অন্য যেকোন পণ্যের মতো একই নিয়মে এটার দাম স্থির হয়। আমরা পরে দেখতে পাব বৃহদায়তনের শিল্প আর অবাধ প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় একই জিনিস — এটার কিংবা ওটার দখলে পণ্যের গড় দাম সবসময়েই পণ্যটার উৎপাদন পরিব্যয়ের সমান। কাজেই, তেমনি শ্রমের দামও শ্রম উৎপাদনের পরিব্যয়ের সমান। শ্রমিকটি যাতে লুপ্ত হয়ে না যায়, সেজন্যে যে-পরিমাণ জীবনোপায় আবশ্যক সেটাই শ্রম উৎপাদনের পরিব্যয়। এইভাবে, ঐজন্যে যা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি শ্রমিক পাবে না তার শ্রম বাবত; জীবিকানির্বাহের জন্যে আবশ্যক সবচেয়ে কম, ন্যূনকল্প পরিমাণ হবে শ্রমের দাম বা মজুরি। যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কখনও একটু মন্দ, কখনও একটু ভাল, তাই শ্রমিক পায় কখনও

একটু বেশি, কখনও একটু কম, ঠিক যেমন কারখানার মালিক তার পণ্য বাবত পায় কখনও একটু বেশি, কখনও একটু কম। কিন্তু ঠিক যেমন, দিনকাল ভালই হোক আর খারাপই হোক, কারখানা মালিক তার পণ্য বাবত গড়ে পায় সেটার উৎপাদন পরিব্যয়ের চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়, তেমনি শ্রমিকও গড়ে পাবে সেই ন্যূনকল্প পরিমাণের চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। শ্রমের সমস্ত শাখা যত বেশি পরিমাণে চলে যাবে বৃহদায়তনের শিল্পের হাতে ততই বেশি কড়াকড়ি করে প্রযুক্ত হতে থাকবে মজুরি সংক্রান্ত এই আর্থনীতিক নিয়ম।

৬ নং প্র: শিল্প-বিপ্লবের আগে কোন্ কোন্ মেহনতী শ্রেণী ছিল?

উ: সমাজের বিকাশের বিভিন্ন পর্ব অনুসারে মেহনতী শ্রেণীগুলির জীবনযাত্রার পরিবেশ ছিল বিভিন্ন, আর মনিব এবং শাসক শ্রেণীগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বিভিন্ন। প্রাচীনকালে মেহনতী জনগণ ছিল তাদের মালিকদের **দাস,** ঠিক যেমনটা এখনও তারা রয়েছে অনেক অনগ্রসর দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশেও। মধ্যযুগে তারা ছিল ভূস্বামী অভিজাতকুলের মালিকানাধীন **ভূমিদাস,** ঠিক যেমনটা তারা এখনও রয়েছে হাঙ্গেরিতে, পোল্যান্ডে আর রাশিয়ায়। মধ্যযুগে এবং শিল্প-বিপ্লব অবধি আরও ছিল পেটি-বুর্জোয়া মনিবদের কাজে নিযুক্ত হস্তশিল্পীরা, আর ম্যানুফ্যাকচারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটেছিল, এখন তাদের খাটায় কমবেশি বড় বড় পুঁজিপতিরা।

৭ নং প্র: দাস থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্যটা কোন্ দিক থেকে?

উ: দাস বিকিয়ে যায় সরাসরি পুরোপুরি, প্রলেতারিয়ান বিকোয় দিনে-দিনে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-দাস কোন **একক** মালিকের সম্পত্তি - আর কিছু না হলেও অন্তত মালিকের স্বার্থের খাতিরে এই দাসের জীবনোপায় নিশ্চিত থাকে, সেটা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক; ব্যক্তি-প্রলেতারিয়ান যেন গোটা বুর্জোয়া **শ্রেণীর** সম্পত্তি, যখন কারও প্রয়োজন হয় কেবল তখনই তার শ্রম কেনা হয়, তার জীবনোপায়ের কোন নিশ্চয়তা নেই। জীবনোপায় নিশ্চিত থাকে শুধু সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়ান **শ্রেণীর** জন্যে। দাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়ানের অবস্থান সেটার ভিতরে। সেটার যাবতীয় ওঠা-পড়া তাকে মালুম করতে হয়। নাগরিক

সমাজের একজন সদস্য হিসেবে নয় — দাস গণ্য হয় জিনিস হিসেবে; লোক হিসেবে, নাগরিক সমাজের সদস্য হিসেবে ধরা হয় প্রলেতারিয়ানকে। এইভাবে, দাসের জীবনযাত্রা প্রলেতারিয়ানের চেয়ে ভাল হতে পারে, কিন্তু প্রলেতারিয়ান হল সমাজ বিকাশের একটা উচ্চতর পর্বের মানুষ, তার অবস্থান দাসের চেয়ে উপরের স্তরে। কেবল দাসপ্রথার সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দাস মুক্তি লাভ করে, এবং সেইভাবে নিজে হয়ে যায় প্রলেতারিয়ান; প্রলেতারিয়ান মুক্তি লাভ করতে পারে শুধু সাধারণভাবে সমগ্র ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ ক'রে।

৮ নং প্র: ভূমিদাস থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্যটা কোন্ দিক থেকে?

উ: উৎপাদনের কোন সাধিত্র, একটা জমি-বন্দ থাকে ভূমিদাসের দখলে, তার ব্যবহারের জন্যে — সেটার বদলে সে উৎপাদের একটা অংশ দিয়ে দেয় কিংবা খাটে। প্রলেতারিয়ান উৎপাদনের যে-সাধিত্র দিয়ে কাজ করে সেটা অপরের, সে কাজ করে সেই লোকের জন্যে, আর তার বাবত সে পায় উৎপাদের একাংশ। ভূমিদাস দেয়, প্রলেতারিয়ানকে দেওয়া হয়। ভূমিদাসের জীবনোপায়ের নিশ্চয়তা থাকে, প্রলেতারিয়ানের তা থাকে না। ভূমিদাস থাকে প্রতিযোগিতার বাইরে, প্রলেতারিয়ানের অবস্থান সেটার মাঝে। ভূমিদাস মুক্ত হয় এইভাবে: হয় সে পালিয়ে শহরে গিয়ে সেখানে হয় হস্তশিল্পী, নইলে জমিদারকে শ্রম আর জাতদ্রব্যের বদলে টাকা দিয়ে হয় স্বাধীন পাট্টাদার, নইলে সামন্ত মালিককে তাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই হয়ে ওঠে মালিক, এককথায়, কোন-না-কোন উপায়ে সে এসে যায় মালিক শ্রেণী আর প্রতিযোগিতার কাতারে। প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সমস্ত শ্রেণীগত পার্থক্য লোপ করে মুক্ত হয় প্রলেতারিয়ান।

৯ নং প্র: হস্তশিল্পী থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্য কোন্ দিক থেকে?*

১০ নং প্র: ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিক থেকে প্রলেতারিয়ানের পার্থক্য কোন্ দিক থেকে?

উ: ষোল থেকে আঠার শতকে প্রায় সর্বত্রই ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকের

* এরপরে পাণ্ডুলিপিতে এঙ্গেলস উত্তরটা দেবার জন্যে একটা জায়গা খালি রেখেছেন। — সম্পাঃ

মালিকানায় থাকত তার উৎপাদনের হাতিয়ার, হাত-তাঁত, পারিবারিক চরকাগুলো, আর ছোট্ট জমি-বন্দ, যাতে সে অবসর-সময়ে চাষবাস করত। প্রলেতারিয়ানের নেই এর কিছুই। জমিদার কিংবা মালিকের সঙ্গে কমবেশি গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্কের মাঝে ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিক প্রায় সম্পূর্ণতই থাকে গ্রামাঞ্চলে; প্রলেতারিয়ানরা প্রায় সবাই থাকে বড় বড় শহরে, মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিছক আর্থিক সম্পর্ক। ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিককে তার গোষ্ঠীগত পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নেয় বৃহদায়তনের শিল্প, তখনও তার যা সম্পত্তি ছিল সেটা খোয়া গিয়ে সে হয়ে পড়ে প্রলেতারিয়ান।

১১ নং প্র: শিল্প-বিপ্লব, এবং বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সমাজের বিভাগের সরাসর ফলাফল হয়েছিল কী?

উ: প্রথমত, যন্ত্রে কাজের ফলে শিল্পজাতদ্রব্যের দাম সমানে কমে যাচ্ছিল ব'লে কায়িক শ্রমের ভিত্তিতে চালান ম্যানুফ্যাকচার কিংবা শিল্পের পুরন প্রণালীটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত আধা-বর্বর দেশ তদবধি ইতিহাসক্রমিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন অবধি ঐসব দেশের শিল্পের ভিত্তি ছিল ম্যানুফ্যাকচার, — ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে সেইসব দেশের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটেছিল। ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত সস্তা পণ্যদ্রব্য তারা কিনত, এবং নিজেদের ম্যানুফ্যাক্টরির শ্রমিকদের তারা ধ্বংস হয়ে যেতে দিয়েছিল। হাজার হাজার বছর ধরে বদ্ধতায় বিড়ম্বিত দেশগুলিতে আদ্যোপান্ত আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এইভাবে, যেমন ভারতে, এমনকি চীনও এখন এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের দিকে। আজ ইংলন্ডে উদ্ভাবিত একটা যন্ত্র বছরখানেকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের দৈনন্দিন অন্ন কেড়ে নেয় চীনে, এমনটা ঘটে ঐভাবেই। বৃহদায়তনের শিল্প এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছে, ছোট ছোট সমস্ত স্থানীয় বাজারকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছে বিশ্ব-বাজার, সভ্যতা আর প্রগতির পথ সুগম করেছে সর্বত্র, আর সবকিছু পেঁীছেছে এমন একটা মাত্রায় যেখানে সভ্য দেশগুলিতে যাকিছু ঘটে সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ঘটে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশে। এইভাবে, ইংলন্ডে কিংবা ফ্রান্সে শ্রমিকেরা এখন নিজেদের মুক্ত করে নিলে সেটা বিপ্লব ঘটাবেই অন্যান্য সমস্ত দেশে, সেই বিপ্লবের ফলে ঐসব দেশেও শ্রমিকদের মুক্তি আসবে আগেপিছে।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই ম্যান্যুফ্যাকচারের জায়গায় এসেছে বৃহদায়তনের শিল্প, সেখানে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়াদের, তাদের ধনদৌলত আর ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত ক'রে তাদের করে তুলেছে সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বপ্রথম শ্রেণী। তার ফল হয়েছে এই: যেখানেই সেটা ঘটেছে সেখানে বুর্জোয়ারা রাজনীতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে উচ্ছেদ করেছে তদবধি বিদ্যমান শাসক শ্রেণীগুলোকে — অভিজাতকুলকে, গিল্ডের মনিবদের এবং এই দুইয়ের প্রতিভূ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে। দায়াদী সম্পত্তি হস্তান্তরণ-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা বা ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং উচ্চ-খেতাবধারীদের বিশেষ অধিকার লোপ ক'রে বুর্জোয়ারা অভিজাতবর্গের, উচ্চ-খেতাবধারীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছিল। সমস্ত গিল্ড এবং বৃত্তিগত বিশেষ অধিকার লোপ ক'রে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করেছিল গিল্ড-বার্গারদের ক্ষমতা। ঐ দুইয়ের জায়গায় তারা এনেছিল অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ সমাজের এমন ব্যবস্থা যাতে প্রত্যেকে শিল্পের যেকোন শাখায় রত হবার অধিকারী, যাতে আবশ্যক পুঁজির অভাব ছাড়া কিছু তাতে কারও পক্ষে বাধা হতে পারে না। কাজেই, অবাধ প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের অর্থ হল এই প্রকাশ্য ঘোষণাটা যে, অতঃপর সমাজের সদস্যদের পুঁজি যে-পরিমাণে অসম কেবল সেই পরিমাণেই তারা অসম, আর পুঁজি হল চূড়ান্ত ক্ষমতা, আর তার থেকে, পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ারা হয়ে দাঁড়াল সমাজের সর্বপ্রধান শ্রেণী। কিন্তু বৃহদায়তনের শিল্পের শুরুতে অবাধ প্রতিযোগিতা আবশ্যক, কেননা সমাজের একমাত্র এই অবস্থায়ই বৃহদায়তনের শিল্প বাড়তে পারে। অভিজাতবর্গ আর গিল্ড-বার্গারদের সামাজিক ক্ষমতা চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা চূর্ণ করল তাদের রাজনীতিক ক্ষমতাও। সমাজে সর্বপ্রধান শ্রেণী হয়ে উঠে বুর্জোয়ারা নিজেদের সর্বপ্রধান শ্রেণী বলে ঘোষণা করল রাজনীতিক্ষেত্রেও। সেটা তারা করল প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে — এই ব্যবস্থাটার ভিত্তি হল আইনের কাছে বুর্জোয়া সমতা, এবং অবাধ প্রতিযোগিতাকে আইনগত স্বীকৃতিদান, সেটা ইউরোপীয় দেশগুলিতে চালু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রূপে। এইসব নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যাদের কিছু পরিমাণ পুঁজি থাকে কেবল তারাই, অর্থাৎ কিনা কেবল বুর্জোয়ারাই ভোটদাতা; এই বুর্জোয়ারা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে,

আর এই বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা যোগান দিতে অস্বীকার করার অধিকার অনুসারে নির্বাচিত করে বুর্জোয়া সরকার।

তৃতীয়ত, যে-পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সেই পরিমাণে প্রলেতারিয়েতকে গড়ে তুলল শিল্প-বিপ্লব। যে-মাত্রায় বুর্জোয়ারা ধনদৌলত লাভ করল, সেই মাত্রায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটল প্রলেতারিয়ানদের। যেহেতু প্রলেতারিয়ানদের কাজে নিয়োগ করতে পারে কেবল পুঁজি, আর যেহেতু পুঁজি বাড়তে পারে কেবল শ্রম নিযুক্ত করলে, তাই প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি ঘটে ঠিক পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে। তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব বুর্জোয়াদের আর প্রলেতারিয়ানদের জড়ো করে বড় শহরে, যেখানে শিল্প চালান সবচেয়ে লাভজনক; **একটা** জায়গায় এইভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনরাশির যূথবদ্ধতা প্রলেতারিয়ানদের তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া, শিল্প-বিপ্লব যত বেশি সম্প্রসারিত হয়, যত বেশি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়, যেগুলো উচ্ছেদ করে কায়িক শ্রমকে, বৃহদায়তনের শিল্প মজুরি নামিয়ে দেয় ততই ন্যূনকল্প মাত্রায়, যা আমরা আগেই বলেছি, এইভাবে প্রলেতারিয়েতের অবস্থা ক্রমাগত বেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে, একদিকে প্রলেতারিয়েতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দিয়ে এবং অন্যদিকে সেটার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দিয়ে শিল্প-বিপ্লব প্রলেতারিয়েতের সমাজ-বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে।

১২ নং প্র: শিল্প-বিপ্লবের অন্যান্য ফলাফল কি?

উ: যাতে অল্পকালের মধ্যে এবং সামান্য খরচায় অঢেল পরিমাণে শিল্পোৎপাদন বাড়ান সম্ভব তার উপায় শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টি করল স্টীম ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে। বৃহদায়তনের শিল্পের অপরিহার্য ফল হল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেটা উৎপাদনের স্বচ্ছন্দতার কল্যাণে চরম মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠল অচিরেই; বহুসংখ্যক পুঁজিপতি লেগে গেল শিল্পে, অচিরেই উৎপন্ন হল যা কাজে লাগান যেতে পারে তার চেয়ে বেশি। তার ফল ম্যানুফ্যাকচারের পণ্যদ্রব্যের কাটতি থাকল না, আর দেখা দিল তথাকথিত বাণিজ্যিক সংকট। কল-কারখানা অচল হয়ে থাকল, কল-কারখানার মালিকেরা হল দেউলিয়া, শ্রমিকদের অন্ন ঘুচল। শোচনীয় দুর্দশা লেগে গেল। কিছুকাল পরে উদ্বৃত্ত উৎপাদ বিক্রি হল। আবার চালু হল কল-কারখানা, মজুরি বাড়ল, ব্যবসা-

বাণিজ্য হল অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে তেজী। কিন্তু অনতিকাল পরেই আবার পণ্য উৎপন্ন হল বড় বেশি, লাগল আর-একটা সংকট, সেটারও গতিপথ হল আগেরটার মতো। এইভাবে, এই শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্পের হাল বিভিন্ন বাড়বাড়ন্তের কালপর্যায় এবং সংকটের কালপর্যায়ের মধ্যে ওঠা-পড়া করেছে অবিরাম, অনুরূপ সংকট পুনরাবৃত্ত হয়েছে প্রায় নিয়মিতভাবে পাঁচ থেকে সাত বছর অন্তর-অন্তর, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্রমিকদের যৎপরোনাস্তি অসহনীয় দুর্গতি, ব্যাপক বৈপ্লবিক আলোড়ন, আর সমগ্র বিদ্যমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপদ।

১৩ নং প্র: নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্ত এইসব বাণিজ্যিক সংকট থেকে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেতে পারে?

উ: **প্রথমত**, সিদ্ধান্ত হল, বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বগুলিতে বৃহদায়তনের শিল্প আপনিই অবাধ প্রতিযোগিতা পয়দা করলেও এই শিল্পের বৃদ্ধি এখন অবাধ প্রতিযোগিতার পরিধি ছাপিয়ে গেছে; প্রতিযোগিতা এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা শিল্পোৎপাদন চালানটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহদায়তনের শিল্পের পায়ে বেড়ির মতো, সেটাকে এই শিল্পের ভাঙা চাই এবং তা সে ভাঙবে; যতকাল সেটা চালান হবে এখনকার ভিত্তিতে, তাতে বৃহদায়তনের শিল্প টিকে থাকতে পারে শুধু সাত বছর অন্তর-অন্তর পুনরাবৃত্ত সাধারণ তালগোল পাকান অবস্থার ভিতর দিয়ে, সেটা প্রত্যেক বার প্রলেতারিয়ানদের ফেলে দেয় দুর্দশার গাড্ডায় শুধু তাই নয়, তেমনি আবার সর্বনাশ করে বহুসংখ্যক বুর্জোয়ার, এইভাবে সেটা প্রত্যেক বার বিপন্ন করে সমগ্র সভ্যতাকে; তার থেকে আসে এই অবস্থাটা: হয় বৃহদায়তনের শিল্প ছাড়তে হবে, যা একেবারেই অসম্ভব, নইলে এটা সম্পূর্ণভাবেই অপরিহার্য করে তোলে সমাজের একেবারে নতুন একটা সংগঠন, যেখানে কল-কারখানার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি-মালিকেরা আর নয়, সমগ্র সমাজ শিল্পোৎপাদন চালায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এবং সবার চাহিদা অনুসারে।

দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত হল, বৃহদায়তনের শিল্প, এবং সেটা যে অঢেল উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করেছে, এই দুইয়ে মিলে এমন একটা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে যেখানে জীবনীয়সমূহ এমন বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হবে যাতে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য পূর্ণতম মাত্রায় স্বাধীনভাবে তার অন্তর্নিহিত

শক্তি বিকশিত করতে এবং সমস্ত ক্ষমতা আর সামর্থ্য প্রয়োগ করতে পারবে। এইভাবে, বৃহদায়তনের শিল্পের ঠিক যে প্রকৃতিটা এখনকার দিনের সমাজে পয়দা করছে যাবতীয় দুর্দশা আর যাবতীয় বাণিজ্যিক সংকট, ঠিক সেটাই ভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অবস্থায় ঠিক সেই দুর্দশা এবং এইসব বিপর্যয়কর ওঠা-পড়া খতম করবে।

এইভাবে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে:

১) যে সমাজব্যবস্থা আর বিদ্যমান পরিবেশের সঙ্গে মানানসই নয়, সম্পূর্ণভাবে সেটারই ক্রিয়া বলে এখন থেকে গণ্য করা যেতে পারে এই সমস্ত অমঙ্গলকে;

২) একটা নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপন করে এইসব অমঙ্গল পুরোপুরি লোপ করার উপায়-উপকরণ হাতের কাছে প্রস্তুত রয়েছে।

১৪ নং প্র: সেটাকে হতে হবে কোন্ রকমের নতুন সমাজব্যবস্থা?

উ: সর্বপ্রথমে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতারত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে শিল্প এবং উৎপাদনের সমস্ত শাখার পরিচালনা সমগ্রভাবে নিজ হাতে নিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা তার বদলে উৎপাদনের এই সমস্ত শাখা চালাবে সমগ্র সমাজের তরফে, অর্থাৎ একটা সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে, তাতে অংশগ্রহণ করবে সমাজের সমস্ত সদস্য। এইভাবে, সেটা প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় আনবে সম্মিলনী। যেহেতু ব্যক্তিরা শিল্প পরিচালনা করলে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী, আর যেহেতু প্রতিযোগিতা হল ব্যক্তি-মালিকদের শিল্প চালাবার ধরন ছাড়া কিছু নয়, তাই শিল্পের ব্যক্তিগত পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা অবিচ্ছেদ্য। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানাও খতম করতে হবে, আর তার বদলে আসবে

...াধারণ। সম্মতি অনুসারে ... উৎপাদনের সমস্ত সামগ্রীর সাধারণ প্রয়োগ এবং স...

সমস্ত উৎপাদের বণ্টন, বা যাকে বলা যায় পণ্যদ্রব্যস-
মূহের সমবায়। শিল্পের
সম্প্রসারণ থেকে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভা-
বী রূপান্তরের সবচেয়ে
চাঁচাছোলা এবং সবচেয়ে বিশেষক চুম্বকের অ-
ভিব্যক্তি হল ব্যক্তিগত
মালিকানার লুপ্তি, কাজেই এটা-যে কমিউনিস্টদের
তোলা প্রধান দাবি, সেটা
সঠিক।

১৫ নং প্র: কাজেকাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা আগে অসম্ভব ছিল?

উ: ঠিক। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটা পরিবর্তন, মালিকানা সম্পর্কের প্রত্যেকটা আমূল পরিবর্তন হল নতুন নতুন উৎপাদন-শক্তি পয়দা হবার অপরিহার্য ফল, এইসব উৎপাদন-শক্তি পুরন মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে আর মানানসই নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপনিই দেখা দিয়েছিল এইভাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো বরাবর ছিল না, কিন্তু মধ্যযুগের শেষের দিকে চালু হয়েছিল একটা নতুন উৎপাদন-প্রণালী, সেটা হল ম্যানুফ্যাকচার, সেটা ছিল তখন বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক আর গিল্ডের সম্পত্তির সঙ্গে বেমানান, সেটা পুরন মালিকানা সম্পর্কের পরিধি ছাপিয়ে গিয়েছিল, সেই ম্যানুফ্যাকচার পয়দা করল নতুন ধরনের মালিকানা — ব্যক্তিগত মালিকানা। ম্যানুফ্যাকচারের কালপর্যায়ে এবং বৃহদায়তনের শিল্প গড়ে ওঠার প্রথম পর্বে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোন রূপের মালিকানা সম্ভব ছিল না, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থা ছাড়া সমাজের অন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। সবার চাহিদা অনুসারে যোগান দেবার জন্যে যা পর্যাপ্ত সেই পরিমাণ উৎপাদই শুধু নয়, অধিকন্তু সামাজিক পুঁজি বাড়াবার এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের আরও সম্প্রসারের জন্যে আবশ্যক উদ্বৃত্ত উৎপাদ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ সবসময়ে থাকেই একটা প্রাধান্যশালী শ্রেণী, যেটা সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহের পরিচালক, আর একটা গরিব উৎপীড়িত শ্রেণী। উৎপাদন বিকাশের পর্বের উপর নির্ভর করে শ্রেণী-দুটোর গড়নের ধরন। মধ্যযুগ ছিল কৃষির মুখাপেক্ষী, তখন ছিল ভূস্বামী আর ভূমিদাস; মধ্যযুগের শেষ ভাগের শহরগুলিতে আমরা দেখতে পাই গিল্ড-কর্তা এবং তার শিক্ষানবিস আর দিনমজুরদের; সতর শতকে — ম্যানুফ্যাকচারাররা এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা; উনিশ শতকে — বৃহৎ কারখানা মালিক আর প্রলেতারিয়ান। স্পষ্টই দেখা যায়, যাতে সবার জন্যে যা পর্যাপ্ত এমন পরিমাণে উৎপাদন হতে পারে, আর যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা হয়ে ওঠে উৎপাদন-শক্তিসমূহের পক্ষে বেড়ির মতো প্রতিবন্ধক, তদবধি উৎপাদন-শক্তিসমূহ তত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয় নি। কিন্তু বৃহদায়তনের শিল্পের সম্প্রসারের ফলে এখন, **প্রথমত**, পুঁজি আর উৎপাদন-শক্তি এমন পরিসরে পয়দা হয়েছে যেমনটা

এযাবত শোনা যায় নি, আর এইসব উৎপাদন-শক্তিকে অল্পকালের মধ্যে অশেষ মাত্রায় বাড়াবার উপায়-উপকরণ রয়েছে; **দ্বিতীয়ত,** এইসব উৎপাদন-শক্তি জড়ো হয়েছে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের হাতে, পক্ষান্তরে বিপুল জনরাশি ক্রমাগত বেশি পরিমাণে পড়ে যাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের কাতারে, আর যে-পরিমাণে বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বহুলীকৃত হচ্ছে সেই পরিমাণেই বিপুল জনরাশির অবস্থা হয়ে পড়ছে আরও দুর্দশাগ্রস্ত এবং দুর্বহ; **তৃতীয়ত,** এইসব উৎপাদন-শক্তি মহাশক্তিশালী, এগুলিকে বহুলীকৃত করা যায় সহজেই, এগুলির বৃদ্ধি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বুর্জোয়াদের পরিধি এতখানি ছাড়িয়ে গেছে যাতে সমাজব্যবস্থায় অবিরাম প্রচন্ড গোলযোগ ঘটছে -- শুধু এখনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা সম্ভব হয়ে উঠেছে শুধু তাই নয়, সেটা হয়ে উঠেছে এমনকি একেবারেই অপরিহার্য।

১৬ নং প্র: শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করা সম্ভব হবে কি?

উ: সেটা ঘটে, তাইই কাম্য, তাতে কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে না। কমিউনিস্টরা খুব ভালভাবেই জানে, সমস্ত ষড়যন্ত্রই অকার্যকরই শুধু নয়, অধিকন্তু হানিকর। তারা খুব ভালভাবেই জানে, পরিকল্পনা অনুসারে এবং মর্জিমাফিক বিপ্লব ঘটান হয় না, সর্বত্র এবং সর্বকালে বিপ্লবগুলি ছিল পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি, সেটা বিশেষ বিশেষ পার্টি এবং গোটা গোটা শ্রেণীর ইচ্ছা আর নেতৃত্বের সাপেক্ষ নয় একেবারেই। কিন্তু তারা তেমনি লক্ষ্য করছে, প্রায় প্রত্যেকটা সভ্য দেশে প্রলেতারিয়েতের বিকাশ বলপূর্বক দমন করা হচ্ছে, সেইভাবে কমিউনিস্টদের প্রতিপক্ষীয়রা বিপ্লব এগিয়ে আনছে। উৎপীড়িত প্রলেতারিয়েতকে শেষপর্যন্ত বিপ্লবের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলে আমরা কমিউনিস্টরা তখন প্রলেতারিয়ানদের কর্মব্রত টাকে সমর্থন করব কাজ দিয়ে, ঠিক যেমনটা এখন আমরা করছি কথা দিয়ে।

১৭ নং প্র: ব্যক্তিগত মালিকানা কি এক-ঘায়ে খতম করা সম্ভব হবে?

উ: না, সম্প্রদায় সৃষ্টি করার জন্যে আবশ্যক মাত্রায় বিদ্যমান উৎপাদন-শক্তিসমূহের বহুলীকরণ **এক-ঘায়ে** যেমন অসম্ভব, সেটাও তেমনিই এক-ঘায়ে অসম্ভব। কাজেই, যে-প্রলেতারিয়েত বিপ্লব খুব সম্ভবত কাছিয়ে আসছে সেটা বিদ্যমান সমাজটাকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে শুধু ক্রমে ক্রমে, আর

সেটা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করবে শুধু যখন আবশ্যক পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণ পয়দা হবে।

১৮ নং প্র: এই বিপ্লবের গতিপথটা কি হবে?

উ: প্রথমে সেটা চালু করবে একটা **গণতান্ত্রিক সংবিধান** এবং সেই সূত্রে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষে প্রলেতারিয়েতের রাজনীতিক শাসন। প্রত্যক্ষভাবে ইংলন্ডে, যেখানে প্রলেতারিয়েত ইতোমধ্যে জনগণের অধিকাংশ; ফ্রান্সে আর জার্মানিতে পরোক্ষে, এই দুই দেশে জনগণের অধিকাংশ হল প্রলেতারিয়ানরা ছাড়াও খুদে কৃষক আর বুর্জোয়াদের নিয়ে, এরা এখন প্রলেতারিয়ানে পরিণত হচ্ছে, আর রাজনীতিক স্বার্থের দিক থেকে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে প্রলেতারিয়েতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে, কাজেই প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ায় তাদের মত দিতে হবে শিগগিরই। এতে হয়ত লাগবে একটা দ্বিতীয় লড়াই, সে-লড়াইয়ে পরিণতি হতে পারে শুধু প্রলেতারিয়েতের বিজয়।

ব্যক্তিগত মালিকানার উপর সরাসরি আক্রমণের আরও ব্যবস্থাবলি অবলম্বন করার এবং প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব নিরাপদে প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় হিসেবে গণতন্ত্র অবিলম্বে প্রযুক্ত না হলে সেটা হবে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে অনাবশ্যক। বিদ্যমান সম্পর্কতন্ত্র থেকে ফলস্বরূপ যা উদ্ভূত সেইসব প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হবে নিম্নলিখিতরূপ:

১) বৃদ্ধিমূলক আয়-কর, চড়া হারে উত্তরলব্ধি-কর, জ্ঞাতিসূত্রে (ভাই, ভাইপো, ইত্যাদি) উত্তরলব্ধি লোপ করা, আবশ্যিক ঋণ, ইত্যাদি উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সীমাবদ্ধ করা।

২) অংশত রাষ্ট্রীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং অংশত সরাসরি পত্রমুদ্রায় খেসারত দিয়ে ভূমি-সম্পত্তির মালিক, কল-কারখানা মালিক এবং রেলওয়ে আর জাহাজী কারবারের রাঘববোয়ালদের ক্রমে ক্রমে বেদখল করা।

৩) সমস্ত প্রবসিত মানুষের সম্পত্তি এবং জনগণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

৪) প্রলেতারিয়ানদের শ্রম বা বৃত্তিকে জাতীয় ভূমি-সম্পত্তিতে, জাতীয় কল-কারখানা আর কর্মশালায় সংগঠিত করা, এবং সেটা দিয়ে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটান, আর রাষ্ট্র যা দেয় তেমনি চড়া হারে মজুরি দিতে তখনও বিদ্যমান কল-কারখানা মালিকদের বাধ্য করা।

৫) ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা সমাধা হবার সময় অবধি সমাজের সমস্ত সদস্যের কাজ করার সম-বাধ্যবাধকতা। শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে।

৬) রাষ্ট্রীয় পুঁজিওয়ালা জাতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে ক্রেডিট আর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করা এবং সমস্ত বেসরকারী ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্কারদের দমন করা।

৭) জাতীয় কল-কারখানা, কর্মশালা, রেলওয়ে এবং জাহাজ বাড়ান; সমস্ত অনাবাদী জমি আবাদ করা এবং জাতির হাতে পুঁজি আর কর্মী যে-পরিমাণে বাড়ে সেই একই অনুপাতে ইতোমধ্যে আবাদী জমির উন্নয়ন।

৮) মায়ের যত্ন-পরিচর্যা ছাড়াই যখন চলে তখনি বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে এবং জাতির খরচায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা।

৯) জাতীয় ভূমি-সম্পত্তিগুলিতে প্রকান্ড প্রকান্ড প্রাসাদ নির্মাণ, সেগুলি হবে শিল্পে এবং কৃষিকাজেও ব্যাপৃত নাগরিকদের সাধারণী বাসস্থান, সেগুলিতে শহরে আর গ্রামীণ জীবনের সুযোগ-সুবিধেগুলোকে এক করতে হবে, যাতে কোনটার একপেশেমি কিংবা অসুবিধে নাগরিকদের ভোগ করতে না হয়।

১০) সমস্ত অস্বাস্থ্যকর এবং খারাপভাবে তৈরি বাড়ি আর ফ্ল্যাটের ব্লক ভেঙে ফেলা।

১১) জারজ এবং না-জারজ সমস্ত সন্তানের সমান দায়াদী অধিকার।

১২) পরিবহনের সমস্ত উপায়-উপকরণ জাতির হাতে কেন্দ্রীভূতকরণ।

এই সমস্ত ব্যবস্থাই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চালু করা যায় না। কিন্তু সবসময়েই একটা থেকে আসবে অন্যটা। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রথম মূলগত আক্রমণটা সমাধা হয়ে গেলেই প্রলেতারিয়েত আরও এগিয়ে চলতে এবং সমস্ত পুঁজি, সমস্ত কৃষিকাজ, সমস্ত শিল্প, সমস্ত পরিবহন আর বিনিময়ের সমস্ত উপায় ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হবে। এই সমস্ত ব্যবস্থা থেকে আসবে ঐসব ফল; আর প্রলেতারিয়েতের শ্রমের কল্যাণে দেশের উৎপাদন-শক্তিসমূহ যে-পরিমাণে বেড়ে উঠবে সেই অনুপাতেই ঐসব ব্যবস্থা হাসিল করা যাবে এবং সেগুলির

কেন্দ্রীকরণ পরিণতি বাড়বে। শেষে, সমস্ত পুঁজি, সমস্ত উৎপাদন, আর সমস্ত বিনিময় জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেলে ব্যক্তিগত মালিকানা আপনা থেকেই খতম হয়ে যাবে, টাকা হয়ে পড়বে অনাবশ্যক, আর উৎপাদন এত বাড়বে, মানুষ এমনই বদলে যাবে, যাতে পুরন সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের অবশিষ্ট ধরনগুলোও ঝরে পড়ে যাবে।

১৯ নং প্র: শুধু কোন একটা দেশে এই বিপ্লব ঘটা সম্ভব হবে কি?

উ: না। বৃহদায়তনের শিল্প ইতোমধ্যে পয়দা করেছে বিশ্ব-বাজার, তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষত সভ্য জাতিগুলি এমনভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে যাতে অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে যা ঘটে সেটার উপর প্রত্যেকটা জাতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বৃহদায়তনের শিল্প সমস্ত সভ্য দেশের সামাজিক উন্নয়ন এতই সমান-সমান করে দিয়েছে যাতে এই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারিয়েত হয়ে উঠেছে সমাজের দুটো নিষ্পত্তিকর শ্রেণি, আর তাদের মধ্যে সংগ্রামটা হয়ে উঠেছে এখনকার দিনের মুখ্য সংগ্রাম। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবটা হবে শুধু জাতীয় বিপ্লব নয়; সেটা ঘটবে সমস্ত সভ্য দেশে, অর্থাৎ অন্তত ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স আর জার্মানিতে যুগপৎ। কোন্ দেশে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি বিকশিত শিল্প, অপেক্ষাকৃত বেশি ধনদৌলত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদন-শক্তিরাশি, তদনুসারে এর প্রত্যেকটা দেশে বিপ্লব বিকশিত হতে সময় লাগবে অপেক্ষাকৃত বেশি কিংবা কম। কাজেই, এই বিপ্লবের গতিবেগ সবচেয়ে ধীরি হবে এবং এই বিপ্লব সমাধা করা সবচেয়ে কঠিন হবে জার্মানিতে; এই বিপ্লব সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে সহজে সম্পাদিত হবে ইংলন্ডে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর এই বিপ্লবের বিস্তর প্রভাব পড়বে, সেগুলির বিকাশের এখন অবধি বিদ্যমান প্রণালীটাকে একেবারেই বদলে দেবে, আর প্রচুর পরিমাণে ত্বরিত করবে সেই বিকাশটাকে। এটা হতে হবে বিশ্ব-বিপ্লব, কাজেই এটার রঙ্গভূমি হবে সারা পৃথিবী।

২০ নং প্র: ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্তির চূড়ান্ত পরিণতিগুলো কি হবে?

উ: যেমন উৎপন্নের বিনিময় আর বন্টন থেকে, তেমনি সমস্ত উৎপাদন-শক্তি আর যোগাযোগের উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা থেকে, ব্যক্তি-পুঁজিপতিদের বেদখল ক'রে সমাজ প্রাপ্তিসাধ্য উপায়-উপকরণ আর সমগ্র

সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা অনুসারে সেগুলোর ব্যবস্থাপন করতে থাকলে বৃহদায়তনের শিল্পের সঙ্গে বর্তমানে যেসব কু-পরিণতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেগুলো সর্বপ্রথমে দূর হবে। সংকটগুলো আর থাকবে না; সমাজের বর্তমান ব্যবস্থায় অত্যুৎপাদন হল সম্প্রসারিত উৎপাদনের অনিবার্য ফল, সম্প্রসারিত উৎপাদন দুর্দশা-দুর্গতির একটা প্রবল কারণ, সেটা তখন পর্যাপ্তও হবে না, সেটাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। সমাজের সাক্ষাৎ চাহিদাগুলো ছাপিয়ে বাড়তি উৎপাদনের পায়ে-পায়ে আসবে না দুর্দশা-দুর্গতি, সেটা সবার চাহিদা মেটাবে, পয়দা করবে নতুন নতুন চাহিদা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও মেটাবার উপায়। সেটা হয়ে উঠবে আরও অগ্রগতির জন্যে আবশ্যক অবস্থা এবং উদ্দীপক; এযাবত সবসময়ে সেটা সমাজব্যবস্থাটাকে তালগোল পাকান অবস্থায় ফেলে দিয়ে আসছে, আর তখন তা না করে সেটা হাসিল করবে অগ্রগতি। ব্যক্তিগত মালিকানার জোয়াল থেকে মুক্তি পেলেই বৃহদায়তনের শিল্পের প্রসারের পরিধিটার কাছে সেটার উন্নয়নের এখনকার মাত্রা তুচ্ছ মনে হবে — আমাদের একালের বৃহদায়তনের শিল্পের সঙ্গে তুলনায় ম্যানুফ্যাকচার প্রণালীটাকে ঠিক যেমনটা তুচ্ছ মনে হয়। শিল্পের এই উন্নয়নের ফলে সমাজ সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদের যোগান পাবে। ভূমিতে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, ভূমি এখন টুকরো টুকরো, তার চাপে কৃষিও ব্যাহত, সেই কৃষিতে প্রাপ্তিসাধ্য উন্নতি আর বৈজ্ঞানিক সাধনসাফল্যগুলি চালু করা হলে সেটার নতুন অগ্রগতি ঘটবে, সমাজের হাতে আসবে অঢেল কৃষিজাতদ্রব্য। এইভাবে সমাজে এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে জাতদ্রব্য উৎপন্ন হবে, যাতে সমাজের সবার প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বণ্টনের বন্দোবস্ত হতে পারবে। শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগটা তার ফলে হয়ে পড়বে অনাবশ্যক। সেটা অনাবশ্যক হয়ে যাবে শুধু তাই নয়, অধিকন্তু নতুন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সেটা মোটেই খাপ খাবে না। বিভিন্ন শ্রেণী পয়দা হয়েছে শ্রমবিভাগের দরুন, আর সেই শ্রমবিভাগ এযাবত যে আকারে রয়েছে সেটা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। যেমনটা বলা হল তেমনি উঁচু মাত্রায় শিল্প আর কৃষির উৎপাদন বাড়াবার জন্যে কেবল যান্ত্রিক আর রাসায়নিক সহায়গুলোই যথেষ্ট নয়, যারা সেইসব সহায়ক চালু করে সেইসব মানুষের

সামর্থ্যও সেজন্যে তদনুসারে বিকশিত হওয়া চাই। কৃষক এবং ম্যানুফ্যাক্টরি শ্রমিকেরা গত শতকে বৃহদায়তনের শিল্পে শামিল হলে তাদের সমগ্র জীবনযাত্রাপ্রণালী যেমনটা বদলাতে হয়েছিল, আর তারা নিজেরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল একেবারে ভিন্ন মানুষ, ঠিক তেমনি উৎপাদনে সমগ্র সমাজের যৌথ ব্যবস্থাপন চালু হলে এবং তার ফলে উৎপাদনের নতুন প্রসার ঘটলে সেজন্যে আবশ্যক হবে একেবারে ভিন্ন মানুষ, সেটা গড়েও তুলবে তেমনি মানুষ। মানুষ এখন যেমনটা রয়েছে, যাতে প্রত্যেকের জন্যে উৎপাদনের একটামাত্র শাখা নির্দিষ্ট, সে সেটার সঙ্গে বাঁধা, সেটার দ্বারা শোষিত, প্রত্যেকে অন্যান্য সমস্ত সামর্থ্য খুইয়ে গড়ে তুলেছে তার **একটামাত্র** সামর্থ্য, সে জানে সমগ্র উৎপাদনের শুধু **একটা** শাখা কিংবা একটা শাখার শুধু একটা শাখা, এমন মানুষ দিয়ে উৎপাদনের যৌথ উৎপাদন চালান যায় না। এমনকি সমসাময়িক শিল্পেও এমন মানুষ ক্রমেই আরও কম কাজের হয়ে পড়ছে। যৌথভাবে এবং পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র সমাজের পরিচালিত শিল্পে এমন মানুষ অপরিহার্য যাদের সামর্থ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে, যারা সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে বিবেচনায় রাখতে সক্ষম। কাজেকাজেই, যে শ্রমবিভাগের অবস্থায় একজন হয়ে পড়ে কৃষক, আর একজন হয় চর্মকার, কারখানা শ্রমিক হয় অন্য কেউ, আবার কেউ হয় ফটকা-কারবারি, এই যে শ্রমবিভাগটাকে যন্ত্র-ব্যবস্থা ইতোমধ্যে ক্ষয়ে দিয়েছে, এটা ঐভাবে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। শিক্ষা পেয়ে নওজোয়ানেরা সমগ্র উৎপাদন-প্রণালীটাকে চটপট রপ্ত করে নিতে পারবে, তারা সামাজিক চাহিদা কিংবা নিজেদের ঝোঁক অনুসারে শিল্পের একটা থেকে অন্য শাখায় চলে যেতে পারবে। কাজেই, এখনকার শ্রমবিভাগের দরুন সবার উপর বিকাশের যে একপেশেমিটা চেপে রয়েছে সেটা তার ফলে লোপ পাবে। এইভাবে, কমিউনিজমের ধারায় সংগঠিত সমাজে সবাই তাদের সর্বতোভাবে বিকশিত সামর্থ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী লুপ্ত হবে, সেটা অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে, একদিকে কমিউনিজমের ধারায় সংগঠিত সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না, তেমনি পক্ষান্তরে, এই সমাজ গড়ে উঠলে সেটা আপনিই যোগায় এইসব শ্রেণীগত প্রভেদ ঘুচিয়ে দেবার উপায়।

এই সবকিছুর ফল হিসেবে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যও লোপ পেয়ে যাবে। দুটো পৃথক শ্রেণীর বদলে একই সব লোকের কৃষি আর শিল্পের উৎপাদন করাটা এমনকি নিছক বৈষয়িক কারণেও কমিউনিজমের ধারায় সম্মিলনীর একটা অপরিহার্য অবস্থা। শিল্পক্ষেত্রের জনসমষ্টি বড় বড় শহরে ভিড় করে থাকার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির সারা দেশে ছড়িয়ে থাকাটা কৃষি আর শিল্পের শুধু একটা অনুন্নত পর্বের পক্ষেই উপযোগী অবস্থা, সেটা সমস্ত পরবর্তী সম্প্রসারণের পথে একটা বাধা, যা এমনকি এখনও বোধ করা যাচ্ছে খুবই।

ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার প্রধান প্রধান ফলগুলি নিম্নলিখিতরূপে হবে বলে ধরা যায়: উৎপাদন-শক্তিসমূহের সাধারণী এবং পরিকল্পিত সদ্ব্যবহারের জন্য সমাজের সমস্ত মানুষের সর্বাত্মক সম্মিলনী; সবার চাহিদা মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত মাত্রায় উৎপাদন সম্প্রসারণ; যাতে কারও কারও চাহিদা মেটে অন্যান্যের ঘাড় ভেঙে সেই অবস্থাটার অবসান; বিভিন্ন শ্রেণী এবং সেগুলোর মধ্যকার বিরোধগুলোর পূর্ণ লুপ্তি; এযাবত প্রাধান্যশালী শ্রমবিভাগ লোপ করার কল্যাণে, শিল্প-শিক্ষার সাহায্যে, কর্মবৃত্তি বদল করার ফলে, সবার দ্বারা উৎপন্ন ভোগসুখের বস্তুগুলিতে সবার অংশভাগীদারির ভিতর দিয়ে, শহর আর গ্রামাঞ্চলের মিলেমিশে যাবার কল্যাণে সমাজের সমস্ত মানুষের সামর্থ্যগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

২১ নং প্র: কমিউনিজমের ধারার সমাজব্যবস্থার কোন্ প্রভাব পড়বে পরিবারের উপর?

উ: এই ধারার ব্যবস্থা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে করে দেবে নিছক একান্ত বিষয়, কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার, তাতে সমাজের কোন হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা থাকবে না। কমিউনিস্ট সমাজ সেটা করতে পারে, তার কারণ এই সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দেয় সাধারণী উপায়ে, এবং এইভাবে এযাবত বিদ্যমান বিবাহের ভিত্তি-প্রস্তর দুটোকে ভেঙে দেয় — এই দুটো হল ব্যক্তিগত মালিকানা দিয়ে যা ঘটিত সেই স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপ-মায়ের উপর ছেলেমেয়েদের নির্ভর। কমিউনিজমের ধারায় স্ত্রীদের নিয়ে সাধারণী সম্ভোগের কথা তুলে নৈতিকতাবাগীশ কূপমণ্ডূকেরা যে সোরগোল করে, এটা হল তার একটা

জবাব। স্ত্রীদের দিয়ে সাধারণী সম্ভোগ সংক্রান্ত সম্পর্কটা সম্পূর্ণত বুর্জোয়া সমাজেরই বস্তু, এখন সেটা রয়েছে নিখুঁত আকারে — বেশ্যাবৃত্তি। কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, এই মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যাবৃত্তি লোপ পাবে। এইভাবে, কমিউনিজমের ধারার সংগঠন নারীদের নিয়ে সাধারণী সম্ভোগ চালু না করে বরং সেটার অবসান ঘটাবে।

২২ নং প্র: বিদ্যমান জাতিসত্তাগুলি সম্বন্ধে কমিউনিজমের ধারার সংগঠনের মনোভাব কি হবে?

— রয়েছে (৩৭)।

২৩ নং প্র: বিদ্যমান ধর্মগুলি সম্বন্ধে সেটার মনোভাব কি হবে?

— রয়েছে।

২৪ নং প্র: সমাজতন্ত্রীদের থেকে কমিউনিস্টদের পার্থক্য কিসে?

উ: তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের তিনটে বর্গে ভাগ করা যায়।

প্রথম বর্গটা হল সামন্ততান্ত্রিক আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের অনুগামীদের নিয়ে, এই যে দুটো সমাজকে ধ্বংস করেছে কিংবা এখন প্রতিদিন ধ্বংস করছে বৃহদায়তনের শিল্প আর বিশ্ব-বাণিজ্য এবং ঐ দুটো সমাজের পয়দা-করা বুর্জোয়া সমাজ। এখনকার দিনের অকল্যাণগুলো থেকে এই বর্গটা সিদ্ধান্ত করে যে, সামন্ততান্ত্রিক আর গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, কেননা তাতে এইসব অকল্যাণ ছিল না। সরাসরি কিংবা পরোক্ষে তাদের সমস্ত প্রস্তাব এই লক্ষ্যটাই তুলে ধরে। প্রলেতারিয়েতের প্রতি তাদের তথাকথিত সহানুভূতি এবং প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা-দুর্গতির কথা নিয়ে তাদের তপ্ত অশ্রুবর্ষণ সত্ত্বেও **প্রতিক্রিয়াশীল** সমাজতন্ত্রীদের এই গ্রুপটার প্রবল বিরোধিতা করবে কমিউনিস্টরা, কেননা

১) তারা যেজন্যে চেষ্টা করছে সেটা স্রেফ অসম্ভব;

২) তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে অভিজাতবর্গ, গিল্ড কর্তা আর ম্যানুফ্যাকচারপতিদের কর্তৃত্ব, এদের সঙ্গে নিরঙ্কুশ বা সামন্ততান্ত্রিক রাজা, আমলা-ফয়লা, সৈনিকবর্গ এবং যাজকসম্প্রদায় নিয়ে এদের অনুচরবর্গ, তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এমন সমাজ যেখানে এখনকার দিনের সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলো না থাকলেও সেটার ছিল অন্তত সমসংখ্যক স্বকীয় দোষ-ত্রুটি,

আর তাছাড়া, কমিউনিজমের ধারায় সংগঠনের কল্যাণে উৎপীড়িত শ্রমিকদের মুক্তির সম্ভাবনাটাও সে-সমাজে থাকে না;

৩) প্রলেতারিয়েত যখনই বৈপ্লবিক এবং কমিউনিজমের ধারা ধরে তেমন সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় তাদের আসল মতলব, তেমনসব ক্ষেত্রে তারা সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বাঁধে প্রলেতারিয়ানদের বিরুদ্ধে।

এখনকার দিনের সমাজের অনুগামীদের নিয়ে দ্বিতীয় বর্গটা, — এই সমাজের অনিবার্য পরিণতি যেসব অমঙ্গল সেগুলো এই সমাজের অস্তিত্বের জন্যে তাদের মনে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। কাজেই, এখনকার দিনের সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমঙ্গলগুলোকে দূর ক'রে তারা এটাকে অক্ষত রাখতে চাইছে। এই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্থাপন করছে বিভিন্ন কল্যাণ-ব্যবস্থা, আর অন্যান্যেরা বিভিন্ন জমকাল সংস্কার-ব্যবস্থার ওকালতি করছে, সেগুলোতে রয়েছে সমাজটাকে পুনঃসংগঠিত করার ছুতো, সেগুলো চালু হলে আজকের দিনের সমাজের বনিয়াদগুলো বজায় থাকে, আর সেইভাবে বজায় থাকে আজকের দিনের সমাজটাই। কমিউনিস্টদের অধ্যবসায়ী বিরোধিতা করতে হবে এইসব **বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদেরও**, কেননা তারা সচেষ্ট রয়েছে কমিউনিস্টদের শত্রুদের পক্ষে, আর কমিউনিস্টরা যে-সমাজটাকে বিনষ্ট করতে চায় সেটাকে তারা সমর্থন করছে।

শেষে, তৃতীয় বর্গটা হল গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে, তারা কমিউনিস্টদের মতোই... নং প্রশ্নের* ব্যবস্থাবলির একাংশ চায়, কিন্তু সেটা কমিউনিজমে উত্তরণের উপায় হিসেবে নয়, সেটা হল এখনকার দিনের সমাজের দুর্দশা-দুর্গতি আর অমঙ্গলগুলো দূর করার উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে। এই **গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা** দু'রকমের: হয় নিজেদের শ্রেণীর মুক্তির উপযোগী পরিবেশ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অবহিত নয় এমনসব প্রলেতারিয়ান, নইলে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক, — গণতন্ত্র হাসিল হওয়া পর্যন্ত এবং তার থেকে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলি হাসিল হওয়া পর্যন্ত এই শ্রেণীটার স্বার্থ অনেক দিক থেকে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে অভিন্ন। কাজেই,

---

* পাণ্ডুলিপিতে এখানে একটু জায়গা খালি আছে। ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সংগ্রামের সময়ে গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সমঝতা করতে হবে এবং অন্তত সেই সময়ে যখন সম্ভব তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে সাধারণী কর্মনীতি অনুসারে চলতে হবে — যতক্ষণ না এই গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা শাসক বুর্জোয়াদের সেবায় লেগে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা এই সাধারণী সংগ্রামের দরুন রহিত হয় না, সেটা তো স্পষ্টই।

২৫ নং প্র: আমাদের একালের অন্যান্য রাজনীতিক পার্টি সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের মনোভাব কী?

উ: এই মনোভাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। — ইংলন্ড, ফ্রান্স আর বেলজিয়মে বুর্জোয়ারা শাসক পার্টি, এইসব দেশে আপাতত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে এখনও কমিউনিস্টদের বিভিন্ন সাধারণী স্বার্থ রয়েছে, এই স্বার্থের অভিন্নতা হবে ততই বেশি যে-পরিমাণে গণতন্ত্রীদের এখন সর্বত্র উপস্থাপিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলি কমিউনিস্টদের লক্ষ্যগুলির কাছাকাছি আসবে, অর্থাৎ যতই বেশি স্পষ্ট করে এবং নির্দিষ্টভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ সমর্থন করবে, আর যতই বেশি করে তারা নির্ভর করবে প্রলেতারিয়েতের উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলন্ডে — সেখানে চার্টিস্টরা (৩৮) সবাই শ্রমিক, তারা গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়া কিংবা তথাকথিত র‍্যাডিকালদের চেয়ে কমিউনিস্টদের এত বেশি কাছাকাছি যা অপরিমেয়।

আমেরিকায় প্রবর্তিত হয়েছে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান — সেখানে যে-পার্টি এই সংবিধানটাকে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে এবং প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে কাজে লাগাবে সেটার সঙ্গে, অর্থাৎ জাতীয় ভূমি-সংস্কারকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম-কর্মব্রতী হতে হবে।

সুইজারল্যান্ডে র‍্যাডিকালরা এখনও একটা খুবই মিশ্র পার্টি হলেও একমাত্র তাদের সঙ্গেই কমিউনিস্টদের কোন সম্পর্ক হতে পারে, আর এদের মধ্যে আবার ভাউড আর জেনেভার র‍্যাডিকালরা সবচেয়ে প্রগতিশীল।

শেষে, জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণী আর নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মধ্যে নিষ্পত্তিকর সংগ্রাম এখনও সবে সামান্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়ারা শাসক না হওয়া অবধি কমিউনিস্টরা তাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকর সংগ্রাম চালাতে পারে না, তাই যত শীঘ্র সম্ভব বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার

জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত তাদের শাসন-ক্ষমতা লাভ করতে সাহায্য করাই কমিউনিস্টদের স্বার্থের অনুযায়ী। কাজেই, কমিউনিস্টদের সবসময়ে সরকারের বিরুদ্ধে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যাতে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের আত্মপ্রবঞ্চনায় শরিক হয়ে না পড়ে, কিংবা বুর্জোয়াদের জয়ের ফলে প্রলেতারিয়েতের কল্যাণ হবে বুর্জোয়াদের এমনসব লোভনীয় কথায় কমিউনিস্টরা যাতে বিশ্বাস না করে। বুর্জোয়াদের জয়ের ফলে কমিউনিস্টদের যে একমাত্র সুবিধে হতে পারে তা হল: ১) যাতে কমিউনিস্টদের মূলনীতিগুলি সমর্থন করা, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সেগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, আর তার ফলে একটা নিবিড়, লড়িয়ে এবং সুসংগঠিত শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ঐক্য সাধিত হয়, এমনসব সুযোগ-সুবিধে, আর ২) যখন নিরঙ্কুশ সরকার উচ্ছেদ হবে সেইদিন থেকেই বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সংগ্রামের পালা আসবে এই নিশ্চয়তা। সেইদিন থেকে কমিউনিস্টদের পার্টি কর্মনীতি হবে বুর্জোয়ারা যেসব দেশে ইতোমধ্যে শাসক সেখানে যেমনটা তেমনিই।

১৮৪৭ সালে অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বর মাসে এঙ্গেলসের লেখা

পৃথক সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে

পান্ডুলিপি অনুসারে ছাপা হল

জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার (৩৯)

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

শ্রমিকদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট লীগ (৪০) তখনকার অবস্থায় গুপ্ত সমিতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডন কংগ্রেসে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয় পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্যে। নিম্নলিখিত 'ইশতেহার'টির উৎপত্তি হয় এইভাবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (৪১) অল্প কয়েক সপ্তাহ আগে এর পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হবার জন্যে যায় লন্ডনে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পরে জার্মানি, ইংলন্ড এবং আমেরিকায় এটি জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে এটা ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের 'Red Republican'-এ (৪২) ১৮৫০ সালে, এবং পরে ১৮৭১ সালে আমেরিকায় অন্তত তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদে এটা প্রকাশিত হয়। ফরাসী অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের (৪৩) সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের 'Socialiste' পত্রিকায় (৪৪)। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত এবার একটু পরেই লন্ডনে এটার পোলীয় অনুবাদ বের হয়েছিল। সপ্তম দশকে জেনেভা শহরে প্রকাশিত হয় এর রুশ অনুবাদ (৪৫)। প্রথম প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর অনুবাদ হয় ডেনিশ ভাষাতেও।

গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'-এ উপস্থাপিত সাধারণ মূলনীতিগুলি আজও মোটের ওপর আগের মতোই সঠিক। এখানে-ওখানে দু'একটি খুঁটিনাটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সর্বত্র এবং সবসময়ে মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ

নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'-এই যা বিবৃত হয়েছে, সেইজন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে প্রস্তাবিত বৈপ্লবিক ব্যবস্থাবলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে হলে ঐ অংশটা অনেক দিক থেকে খুবই অন্যভাবে লেখা হত। গত পঁচিশ বছরে আধুনিক শিল্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন যেভাবে উন্নত এবং প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে (৪৬), যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে
১ সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না'। ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ। আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতির সাধারণ পরিষদের বিবৃতি', জার্মান সংস্করণ, ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসেবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়) সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং ইতিহাসের অগ্রগতি উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে এ জগৎ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়েছে।

কিন্তু এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলবার কোন অধিকার আমাদের আর নেই। সম্ভবত পরবর্তী কোন সংস্করণ বার করা যাবে যাতে ১৮৪৭ থেকে আজ অবধি ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে; বর্তমান সংস্করণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার জন্যে সময় ছিল না।

কার্ল মার্কস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৪ জুন, ১৮৭২

১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা

বাকুনিনের অনুবাদে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে 'কলোকোল' পত্রিকার (৪৭) ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'-এর রুশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা সাহিত্যিক কৌতূহল-বস্তু মাত্র। আজ তেমনভাবে দেখা অসম্ভব।

তখনও পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সীমাবদ্ধ স্থান জুড়ে ছিল সেটা খুবই পরিষ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'-এর শেষ অধ্যায়টা: বিভিন্ন দেশে 'বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান'।* রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখই নেই তাতে। সে-যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরাট শেষ-নির্ভরস্থল, আর অভিবাসনের ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করছিল ইউরোপীয় প্রলেতারিয়ানদের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিল তার শিল্পজাত উৎপাদ বিক্রির বাজার। সে-যুগে তাই দুই দেশই কোন না কোন ভাবে ছিল ইউরোপের বিদ্যমান ব্যবস্থার অবলম্বন।

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপীয় অধিবাসীরাই উত্তর আমেরিকাকে বৃহৎ কৃষি-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র করে তোলে, তার প্রতিযোগিতা ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূমি-সম্পত্তির ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে এবং এমন আয়তনে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছে যাতে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের যে একচেটে আজও রয়েছে তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। উভয় পরিস্থিতি আবার আমেরিকার উপরেই বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। কৃষকের ছোট আর মাঝারি ভূমি-মালিকানা, যা গোটা রাজনীতিক গঠনের ভিত্তি, তা ক্রমে ক্রমে বৃহদায়তন খামারের প্রতিযোগিতায় অভিভূত হয়ে পড়ছে; তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলগুলিতে এই প্রথম গড়ে উঠছে ব্যাপক পরিসরে প্রলেতারিয়েত, এবং পুঁজি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অবিশ্বাস্য বিপুল পরিমাণে।

---

* এই খণ্ডের ১৭৯-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তারপর রাশিয়া! ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নয়, ইউরোপের বুর্জোয়ারাও সবে জেগে উঠতে থাকা প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে ঘোষণা করা হয়েছিল ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্দার হিসেবে। সেই জার আজ গাৎচিনায় বিপ্লবের হাতে যুদ্ধবন্দীর মতন (৪৮), আর ইউরোপে বৈপ্লবিক কার্যকরণের সেনামুখ হয়েছে রাশিয়া।

আধুনিক বুর্জোয়া মালিকানার অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখি দ্রুত বর্ধিষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক জুয়াচুরি, আর সবে বিকাশোন্মুখ বুর্জোয়া ভূমি-সম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের বেশি জমি জুড়ে কৃষকদের যৌথ মালিকানা। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জমিতে সাধারণের মালিকানার একটা আদি রূপ রুশ অব্‌শ্চিনা* কি সরাসরি উচ্চতর রূপের কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানায় রূপান্তরিত হতে পারে? নাকি উলটোটা — তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা?

এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে, যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাশিয়ায় ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসেবে।

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২১ জানুয়ারি, ১৮৮২

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ আর আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী যাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী সেই মার্কস হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে শান্তিলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর

* অব্‌শ্চিনা — গ্রাম-সম্প্রদায়। — সম্পাঃ

ইতোমধ্যে প্রথম তৃণরাজি মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইশতেহার'-এ সংশোধন বা সংযোজন আরও অভাবনীয়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি আরও বেশি প্রয়োজন মনে করি:

'ইশতেহার'-এ সর্বত্র প্রবহমান এই মূলচিন্তা — ইতিহাসের যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তার থেকে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত সামাজিক গঠন হল সেযুগের রাজনৈতিক এবং মানসিক ইতিহাসের ভিত্তি; সুতরাং (জমিতে আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষিত আর শোষক, অধীন আর অধিপতি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই সংগ্রাম আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে শোষিত এবং নিপীড়িত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে তার শোষক এবং নিপীড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া শ্রেণীর) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন আর শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিয়ে ছাড়া সেটা আর করতে পারে না — এই মূলচিন্তাটি পুরোপুরি এবং একমাত্র মার্ক্সেরই।*

একথা আমি বহু বার বলেছি। কিন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইশতেহার'-এরই পুরোভাগেও থাকা প্রয়োজন।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৮ জুন, ১৮৮৩

---

* ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম: 'ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই উপস্থাপনা ইতিহাসের বেলায় তাই করবে, সেটা অবধারিত। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধীরে ধীরে এই উপস্থাপনার দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার "ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা" বইখানি। কিন্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌স্ শহরে মার্ক্সের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, মার্ক্স ইতোমধ্যে এ উপস্থাপনাটা প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন এবং এখানে আমি যে-ভাষায় সেটা বিবৃত করলাম প্রায় তেমনি পরিষ্কারভাবেই তিনি তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ফ. এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে

'ইশতেহার'-এর একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এহেন অগ্রণীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ*), কিন্তু ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিস শ্রমিকদের পরাজয়ের পর যে-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তার চাপে এটা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে গিয়েছিল অচিরে, আর ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন কমিউনিস্টদের উপর দণ্ডাজ্ঞার (৪৯) পর শেষপর্যন্ত 'আইন অনুসারে' এটাকে সমাজচ্যুত করা হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা রঙ্গভূমি থেকে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইশতেহার'ও লোকচক্ষুর অন্তরালে যায়।

শাসক শ্রেণীগুলির ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন দেখা দেয় আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতি। ইউরোপ আর আমেরিকার সমগ্র সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীকে একটি গোটা বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা ছিল তার লক্ষ্য। সুতরাং 'ইশতেহার'-এ নির্দেশ করা নীতিগুলি থেকে সমিতি শুরু করতে পারে নি। সেটা এমন কর্মসূচি নিতে বাধ্য ছিল যা বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজিয়ান, ইতালীয় আর স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান লাসালপন্থীদের** সামনে দরজা বন্ধ করবে না। এই কর্মসূচি — আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলির মুখবন্ধ — মার্কস রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যা বাকুনিন এবং নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত স্বীকার করেন। 'ইশতেহার'-এ বিবৃত নীতিগুলির আখেরী বিজয়ের ব্যাপারে মার্কস পুরোপুরি এবং একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিগত

* এই খণ্ডের ১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের 'শিষ্য' এবং সেই হিসেবে অবশ্য তাঁর অবস্থান ছিল 'ইশতেহার'-এর জমিনে। তাঁর যে ভক্তরা রাষ্ট্রীয় ক্রেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায় সম্বন্ধে তাঁর দাবির চেয়ে এগিয়ে যেতে চায় নি, যারা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের সমর্থক এবং স্বাবলম্বনের সমর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করত, তাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। [এঙ্গেলসের টীকা।]

বিকাশের উপর, মিলিত লড়াই আর আলোচনা থেকে যার উদ্ভব অনিবার্য। পুঁজির সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনাবলি আর নানা উত্থান-পতন, সাফল্যের চেয়ে পরাজয়ই বেশি করে সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ করবেই যে, তাদের আগেকার সর্বরোগহর দাওয়াইগুলি অকেজো, আর শ্রমিকদের মুক্তির যথার্থ পরিবেশ সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাদের মনকে আরও ভাবগ্রাহী করবেই। মার্কস ঠিকই বুঝেছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক উঠে যাবার সময়কার শ্রমিক শ্রেণী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদ এবং জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল; এমনকি তদানীন্তন চরম রক্ষণশীল বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত ধীরে ধীরে পৌঁছাচ্ছিল এমন একটা পর্যায়ে যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানসি কংগ্রেসের সভাপতি* তাদের তরফে বলতে পারলেন: 'ইউরোপের মূলভূমির সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নয়।' অথচ ১৮৮৭ সাল নাগাত ইউরোপের মূলভূমির সমাজতন্ত্র প্রায় পুরোপুরিই ছিল 'ইশতেহার'-এ ঘোষিত তত্ত্ব। এইভাবে, ১৮৪৮ সালের পরবর্তী আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসটা কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত হয় 'ইশতেহার'-এর ইতিহাসে। বর্তমানে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশে বহু নিযুত নিযুত শ্রমিকের সাধারণ কর্মসূচি।

তবুও প্রথম প্রকাশের সময়ে আমরা একে **সমাজতান্ত্রিক** 'ইশতেহার' বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একদিকে ছিল বিভিন্ন ইউটোপীয় মতবাদের অনুগামীরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে ওয়েনপন্থী আর ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, অবশ্য ততদিনে উভয়েই নিছক সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল বহুবিধ সামাজিক হাতুড়ে যারা সামাজিক অবিচার দূর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই আর জোড়াতালি দিয়ে, পুঁজি আর লাভের উপর একটুও আঁচড় না দিয়ে: উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রমিক

* ডবলিউ. বিভেন। — সম্পাঃ

আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থন প্রত্যাশা করত বরং 'শিক্ষিত' শ্রেণীগুলির কাছ থেকে। নিছক রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় বলে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশটি সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, তারা সেসময়ে নিজেদের **কমিউনিস্ট** বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমার্জিত, নিছক সাহজিক, প্রায়শ অনেকটা স্থূল কমিউনিজম। তবুও ইউটোপীয় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম দেবার মতো শক্তি এর ছিল — ফ্রান্সে কাবে-র 'ইকেরীয়' (Icarian) কমিউনিজম এবং জার্মানিতে ভাইটলিং-এর কমিউনিজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। অন্তত ইউরোপের ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্র ছিল বেশ ভদ্রস্থ, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। যেহেতু সেই তত আগেই আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ' (৫০), তাই দুই নামের মধ্যে কোন্‌টি বেছে নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা থাকতে পারত না। পরেও কখনও নামটা বর্জন করার কথা আমাদের মনে আসে নি।

'দুনিয়ার মেহনতী জনগণ এক হও!' প্রথম প্যারিস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয়, তার ঠিক পূর্বক্ষণে, বেয়াল্লিশ বছর আগে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, অতি অল্প লোকেই তাতে গলা মিলিয়েছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের প্রলেতারিয়ানরা মিলে গড়েছিল গৌরবের স্মৃতিমণ্ডিত আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতি। আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর, তা ঠিক। কিন্তু সকল দেশের প্রলেতারিয়ানদের যে চিরন্তন ঐক্য এটা সৃষ্টি করেছিল সেটা যে আজও জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, আজকের দিনটি তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা ঠিক আজকের দিনে (৫১) যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখছি তখন ইউরোপ আর আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার বল পরিদর্শন করছে, সেটার এই সর্বপ্রথম সমাবেশ ঘটেছে, সমাবেশ ঘটেছে একটা গোটা বাহিনী রূপে, একই পতাকার নিচে, একই তার উপস্থিত লক্ষ্য: ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে এবং আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন করে যা বিধিবদ্ধ

করতে হবে — সাধারণ আট ঘণ্টার কর্মদিন। আজকের দিনটির দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি আর জমিদারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে আজ সকল দেশের মেহনতী জন বাস্তবিক এক হয়েছে।

মার্কস যদি এখনও আমার পাশে থেকে নিজের চোখে এটা দেখতেন!

লন্ডন, ১ মে, ১৮৯০

ফ. এঙ্গেলস

১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর একটি নতুন পোলীয় সংস্করণ আবশ্যক হল, এর থেকে নানা কথা মনে আসছে।

ইদানীং এই 'ইশতেহার' যেন ইউরোপ মহাদেশে বৃহদায়তনের শিল্প উন্নয়নের একটা নির্দেশক হয়ে উঠেছে, এটাই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। কোন একটা দেশে বৃহদায়তনের শিল্প যে পরিমাণে সম্প্রসারিত হয় সেই অনুপাতে সেদেশে অস্তিমান শ্রেণীগুলির প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান সম্বন্ধে জানার জন্যে শ্রমিকদের মধ্যে চাহিদা বাড়ে, তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং 'ইশতেহার'-এর জন্যে চাহিদা বাড়ে। এইভাবে, যেকোন দেশের ভাষায় 'ইশতেহার' কতখানা প্রচারিত হল সেটা দিয়ে দেশটিতে শ্রমিক আন্দোলনের হালই শুধু নয়, বৃহদায়তনের শিল্পের উন্নয়নের মাত্রাও বেশ যথাযথভাবে বিচার করা যায়।

তদনুসারে, পোল্যান্ডে শিল্পের একটা স্পষ্ট অগ্রগতি নির্দেশ করছে এই নতুন পোলীয় সংস্করণটা। এর আগেকার সংস্করণটা প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর আগে, তার পর থেকে ঐ অগ্রগতিটা যথার্থই ঘটেছে, তাতে একেবারে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। রুশ সাম্রাজ্যের মস্ত শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠেছে রুশী পোল্যান্ড, কংগ্রেসী পোল্যান্ড (৫২)। রুশী বৃহদায়তনের শিল্প ইতস্তত বিক্ষিপ্ত — একাংশ রয়েছে ফিন উপসাগরের চতুর্দিকে, আর-একটা অংশ কেন্দ্রে (মস্কোয় আর ভ্লাদিমিরে), কৃষ্ণ সাগর আর আজোভ

সাগরের উপকূল বরাবর রয়েছে আর-একটা অংশ, আরও অন্যান্য অংশ রয়েছে অন্যত্র, পক্ষান্তরে পোল্যান্ডের শিল্প ঠাসা রয়েছে একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকায়; এমনভাবে একত্র করার সুবিধে আর অসুবিধে দুইই আছে পোল্যান্ডের শিল্পের। প্রতিদ্বন্দ্বী রুশী শিল্পপতিরা ঐ সুবিধেগুলো লক্ষ্য ক'রে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্ক দাবি করেছিল — যদিও পোল্‌দের রুশী বনাবার প্রবল বাসনা ছিল তাদের। পোল্‌ শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারণার দ্রুত প্রসারে এবং 'ইশতেহার'-এর জন্যে বেড়ে-চলা চাহিদায় প্রকাশ পেয়েছে অসুবিধেগুলো — পোল্‌ শিল্পপতি এবং রুশ সরকারের অসুবিধেগুলো।

কিন্তু পোল্‌ জনগণের অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং তাদের জাতিগত পুনঃস্থাপনার আসন্নতার একটা নিশ্চায়ক হল রাশিয়ার শিল্পকে ছাড়িয়ে পোল্যান্ডের শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন। তাছাড়া, স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে গরজটা পোল্‌দেরই শুধু নয়, সেটা আমাদের সবারই। ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতি নিজ বাসভূমিতে পুরোপুরি স্বশাসিত হলে একমাত্র তবেই এই জাতিগুলির অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব তো সবকিছু সত্ত্বেও প্রলেতারিয়ান সংগ্রামীদের দিয়ে করিয়েছিল শুধু বুর্জোয়াদের কাজটা, আর তাছাড়া, সেটার দায়াদী নির্বাহক লুই বোনাপার্ত আর বিসমার্কের মারফত ইতালি, জার্মানি এবং হাঙ্গেরির স্বাধীনতা হাসিল করিয়েছিল, কিন্তু এই বিপ্লবের জন্যে ১৭৯২ সাল থেকে ঐ তিনটে দেশ একত্রে যা করেছিল তার চেয়ে বেশি করেছিল পোল্যান্ড, এই দেশটি ১৮৬৩ সালে (৫৩) দশগুণ বেশি রুশী বলের কাছে অভিভূত হয়েছিল, তখন দেশটিকে কেবল নিজ সহায়-সম্বলের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অভিজাতবর্গ পোল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রাখতেও পারে নি, পুনরুদ্ধার করতেও পারে নি; এখন বুর্জোয়াদের কাছে এই স্বাধীনতার কোন গুরুত্ব নেই — এটা তো ঊন উক্তি। তবু, ইউরোপীয় জাতিগুলির সমন্বিত সহযোগের জন্যে এটা অপরিহার্য।* এই স্বাধীনতা হাসিল করতে পারে কেবল পোল্যান্ডের নবীন প্রলেতারিয়েত, তাদের হাতে সেটা নিরাপদ।

---

* পোলীয় সংস্করণে এই বাক্যটি বাদ দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পোল্ শ্রমিকদের নিজেদের পক্ষে যতখানি আবশ্যক, ঠিক তেমনিই সেটা আবশ্যক বাদবাকি ইউরোপের শ্রমিকদের পক্ষেও।

ফ. এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২

১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইতালীয় পাঠকদের প্রতি

বলা যেতে পারে, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রকাশনা এবং মিলান আর বার্লিনের বিপ্লব সমকালীন — ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চ; ঐ দুই বিপ্লব ছিল কেন্দ্রে অবস্থিত দুটি জাতির সশস্ত্র অভ্যুত্থান, একটি ইউরোপ মহাদেশের কেন্দ্রে, অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত; জাতি-দুটি তখন অবধি বিভাগ আর অভ্যন্তরীণ বিবাদের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে বৈদেশিক আধিপত্যের অধীন হয়েছিল। ইতালি ছিল অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীন, আর জার্মানি পড়েছিল সারা রাশিয়ার জারের জোয়ালে, এটা অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ হলেও কিছু কম কার্যকর ছিল না। ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চের পরিণতিতে ইতালি আর জার্মানি উভয় দেশ এই অবমাননা থেকে মুক্ত হয়েছিল; ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সালে এই দুটি মহান জাতি পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং যেকোনভাবেই হোক আবার তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কারণ হল, যা কার্ল মার্কস বলতেন, যারা ১৮৪৮ সালের বিপ্লব দমন করেছিল তারা নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়েছিল সেটার দায়াদী নির্বাহক।

সর্বত্র সেই বিপ্লব ছিল শ্রমিক শ্রেণীর কর্মকাণ্ড; ব্যারিকেডগুলো তৈরি করেছিল এবং রক্ত ঢেলে মূল্য দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীই। সরকার উচ্ছেদ করায় বুর্জোয়া রাজটাকে উচ্ছেদ করার স্পষ্ট-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল কেবল প্যারিসের শ্রমিকদের। কিন্তু তাদের নিজেদের শ্রেণী এবং বুর্জোয়া

শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক বৈরিতা সম্বন্ধে তারা সচেতন থাকলেও, দেশটির আর্থনীতিক অগ্রগতি কিংবা ফরাসী শ্রমিকসাধারণের মানস বিকাশ কোনটাই তখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয় নি যাতে সামাজিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়। কাজেই, বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সুবিধা-সুযোগগুলো শেষপর্যন্ত তুলে নিয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। অন্যান্য দেশে — ইতালিতে, জার্মানিতে, অস্ট্রিয়ায় — শ্রমিকেরা একেবারে শুরু থেকেই করেছে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কাজ। তবে যেকোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন অসম্ভব। কাজেই, তখন অবধি যেসব দেশের একত্ব আর স্বশাসন ছিল না সেগুলিতে — ইতালিতে, জার্মানিতে, হাঙ্গেরিতে —১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পায়ে-পায়ে সেই একত্ব আর স্বশাসন এসেছিল, এটা ছিল অনিবার্য। ঐ তিন দেশের পরে পোল্যান্ডের পালা।

এইভাবে, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না, কিন্তু সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ করে দিয়েছিল, জমিন প্রস্তুত করেছিল। সমস্ত দেশে বৃহদায়তনের শিল্পে গতিশক্তি সঞ্চারিত হবার কল্যাণে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে বুর্জোয়া রাজগুলো সর্বত্র পয়দা করেছে সংখ্যাবহুল, একত্রে জড়ো করা এবং শক্তিশালী প্রলেতারিয়েত। এইভাবে বুর্জোয়া রাজ সৃষ্টি করেছে, 'ইশতেহার'-এর ভাষায় বললে, নিজ কবরখনকদের। প্রত্যেকটি জাতির স্বশাসন এবং অখন্ডতা পুনঃস্থাপিত না হলে প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক সম্মিলনী, কিংবা সাধারণ লক্ষ্য সাধনের জন্যে এইসব জাতির শান্তিপূর্ণ এবং সচেতন সহযোগিতা স্থাপন করা অসম্ভব হবে। ১৮৪৮ সালের আগেকার রাজনীতিক পরিবেশে ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, জার্মান, পোল্ এবং রুশ শ্রমিকদের যুক্ত আন্তর্জাতিক কার্যকরণের কথা কল্পনা করুন তো!

এইভাবে, ১৮৪৮ সালের লড়াইগুলো বিফলে যায় নি। সেই বৈপ্লবিক যুগ থেকে আমাদের সময় অবধি পঁয়তাল্লিশটা বছরও উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটে নি। ফলগুলি পেকে উঠছে; মূল 'ইশতেহার'-এর প্রকাশন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের পক্ষে যেমনটা শুভসূচক হয়েছিল, ইতালীয় বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে তেমনি শুভসূচক হোক এই ইতালীয় অনুবাদের প্রকাশন, এটাই আমি কামনা করি।

পুঁজিতন্ত্র অতীতে যে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেটাকে যথাযথভাবেই তুলে ধরা হয়েছে 'ইশতেহার'-এ। ইতালি হল প্রথম পুঁজিতান্ত্রিক জাতি। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সমাপ্তি আর আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক যুগের উদ্বোধনকে চিহ্নিত করছে একটি মহাকায় মানবমূর্তি: একজন ইতালীয়, দান্তে, যিনি হলেন একাধারে মধ্যযুগের শেষ কবি, আর আধুনিক যুগের প্রথম কবি। ১৩০০ সালেরই মতো আজও ঘনিয়ে আসছে একটা নতুন ঐতিহাসিক যুগ। ইতালি আমাদের দেবে কি এক নতুন দান্তে, যিনি চিহ্নিত করে দেবেন এই নতুন, প্রলেতারীয় যুগের উদ্ভব-মুহূর্তটাকে?

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার

ইউরোপ ভূত দেখছে — কমিউনিজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্যে একটা পবিত্র জোট বেঁধেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি — পোপ এবং জার, মেটেরনিখ আর গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা এবং জার্মান পুলিসগোয়েন্দারা।

এমন কোন্ প্রতিপক্ষ পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন তাদের বিরোধীরা যাকে কমিউনিস্টভাবাপন্ন বলে নিন্দা করে নি? এমন প্রতিপক্ষ পার্টিই-বা কোথায় যে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর প্রতিপক্ষ দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে পাল্টা ছুঁড়ে মারে নি কমিউনিজমের গালি?

এই তথ্য থেকে দুটি ব্যাপার বেরিয়ে আসে।

এক। ইউরোপের সকল শক্তি ইতোমধ্যে কমিউনিজমকে একটা শক্তি হিসেবে স্বীকার করেছে।

দুই। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সম্মুখে কমিউনিস্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন্ দিকে, এবং কমিউনিজমের ভূতের এই আষাঢ়ে গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা ইশতেহার দিয়েই।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কমিউনিস্টরা লন্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত 'ইশতেহার' প্রস্তুত করেছে; ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে।

রইল না। তার জায়গায় এল ম্যান্যুফ্যাকচার ব্যবস্থা। ম্যান্যুফ্যাকচারের মধ্য শ্রেণী ঠেলে সরিয়ে দিল গিল্ড-কর্তাদের। প্রত্যেকটা আলাদা কর্মশালার ভিতরকার শ্রমবিভাগের মুখে বিভিন্ন কর্পোরেট গিল্ডগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ মিলিয়ে গেল।

এদিকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাহিদা বাড়তে থাকে। ম্যান্যুফ্যাকচারেও আর কুলোয় না। অতঃপর স্টীম আর কল-কব্জা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল শিল্পোৎপাদনে। ম্যান্যুফ্যাকচারের জায়গা নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প, শিল্পক্ষেত্রের মধ্য শ্রেণীর জায়গা নিল শিল্পক্ষেত্রের লাখপতিরা, গোটা গোটা শিল্পবাহিনীর হর্তাকর্তারা, আধুনিক বুর্জোয়ারা।

তার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল আমেরিকা আবিষ্কার, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করল বিশ্ব-বাজার। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নৌবাহ আর স্থলপথে যোগাযোগের প্রভূত বিকাশ ঘটল। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করল শিল্পের প্রসারকে; যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌবাহ আর রেলপথের প্রসার ঘটল, সেই অনুপাতেই উন্নতি হল বুর্জোয়াদের, বেড়ে গেল তাদের পুঁজি, মধ্যযুগ থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকেই পেছনে ঠেলে দিল।

এইভাবে দেখা যায়, আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা আপনিই একটা দীর্ঘ বিকাশধারার ফল, উৎপাদন আর বিনিময়-প্রণালীর ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিপ্লবের পরিণতি।

বিকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল শ্রেণীটির তদনুযায়ী রাজনৈতিক অগ্রগতি। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের কর্তৃত্বাধীনে একটা নিষ্পেষিত শ্রেণী, মধ্যযুগের কমিউনে* একটা সশস্ত্র এবং স্বশাসিত সংঘ; কোথাও স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক নগর-রাষ্ট্র (যেমন ইতালি আর

---

* ফ্রান্সে গড়ে-উঠতে-থাকা শহরগুলি সামন্ততান্ত্রিক প্রভু আর মনিবদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে 'তৃতীয় বর্গ', (Third Estate) রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই 'কমিউন' নাম গ্রহণ করে। মোটামুটি বলা চলে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এখানে ইংলন্ডকে আদর্শ দেশ ধরা হয়েছে, আর রাজনৈতিক বিকাশের বেলায় ফ্রান্সকে। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

জার্মানিতে), আবার কোথাও-বা রাজতন্ত্রের করদাতা 'তৃতীয় বর্গ' (যেমন ফ্রান্সে); পরে, খাস ম্যান্যুফ্যাকচারের পর্বে অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে একটা পালটা ভার হিসেবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বা নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সেবক, এবং বস্তুত সাধারণভাবে বৃহৎ রাজতন্ত্রগুলির অবলম্বন — সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক শিল্প এবং বিশ্ব-বাজার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকালকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জিতে নিয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনের একটা কমিটি মাত্র।

ঐতিহাসিক বিচারে, বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং রাখালিয়া সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। বিবিধ সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত ঊর্ধ্বতনদের' কাছে, সেগুলোকে এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিগোচর স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় উদ্দীপনার অতি দিব্য ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ আর কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা বিনিময়-মূল্যে পরিণত করেছে, আর অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা খাড়া করেছে ওই **একটিমাত্র** স্বাধীনতা — অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই। এককথায়, ধর্মীয় আর রাজনৈতিক বিভ্রমে ঢাকা শোষণের বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশবিক শোষণ।

যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই সবগুলিরই মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, যাজক, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা নিজেদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবীতে পরিণত করেছে।

ইতালী আর ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে স্বশাসনের প্রাথমিক অধিকার কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সম্প্রদায়ের এই নাম দিয়েছিল। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবারপ্রথা থেকে ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

মধ্যযুগে শক্তির যে পাশবিক প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এতটা মাথায় তোলে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসেবে চূড়ান্ত অলসতার নিষ্ক্রিয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল তা বুর্জোয়া শ্রেণীই ফাঁস করে দিয়েছে। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী হতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত অভিযান অতীতের সকল জাতির অভিনিষ্ক্রমণ (Exoduses) এবং ধর্মযুদ্ধকে (৫৫) (crusades) ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের সাধিত্রে অবিরাম বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে, আর তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বৈপ্লবিক বদল না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী টিকে থাকতে পারে না। তার বিপরীতে অতীতে শিল্পক্ষেত্রের সকল শ্রেণীর টিকে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতিটাকে অপরিবর্তিত রূপে বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক পরিবেশের অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট-বাঁধা সব সম্পর্ক এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন পূর্বসংস্কার আর মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়, নবগঠিতগুলো পোক্ত হয়ে উঠবার আগেই সাবেকী হয়ে পড়ে। যাকিছু পাকাপোক্ত তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পূত তা অপবিত্র হয়ে যায়, শেষপর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্যে অবিরত বেড়ে-চলা বাজারের জন্যে তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।

বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব-বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদনের আর পরিভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। যে-জাতীয় ভূমিটার ওপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল সেটাকে শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়ে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করেছে। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্পকে

হয় ধ্বংস করা হয়েছে, নয় প্রত্যহ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই মরা-বাঁচা প্রশ্নের শামিল; যেসব শিল্পে কাজ চলে দেশজ কাঁচামাল নিয়ে আর নয় -- দূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামালে; যেসব শিল্পের উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরন চাহিদার বদলে দেখছি নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাকে দরকার দূর-দূর দেশের এবং আবহাওয়ার উৎপন্ন। আগেকার স্থানীয় আর জাতীয় বিচ্ছিন্নতা আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার জায়গায় দেখা যাচ্ছে সর্বতোমুখী আদান-প্রদান, জাতিসমূহের পৃথিবী-জোড়া পরস্পর নির্ভর। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মানস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও। এক-একটা জাতির মানসিক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একপেশেমি আর সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই আরও অসম্ভব হয়ে পড়ে; বহু জাতীয় আর স্থানীয় সাহিত্য থেকে দেখা দেয় বিশ্বসাহিত্য।

সকল উৎপাদন-যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতার মাঝে টেনে আনছে সমস্ত জাতিকে, এমনকি অতি অসভ্য জাতিকেও। যে কামান দেগে তারা সমস্ত চীনা-প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হল তাদের পণ্যের সস্তা দর। সকল জাতিকে তারা বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে; জাতিগুলিকে বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে তারা বলে সভ্যতা — অর্থাৎ বাধ্য করে তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎটাকে গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের কর্তৃত্বাধীন করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনসমষ্টির একটা বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই করেছে বর্বর আর অর্ধবর্বর দেশগুলিকে সভ্য দেশের, কৃষকবহুল জাতিকে বুর্জোয়া-বহুল জাতির, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী।

জনসমষ্টি, উৎপাদনের উপকরণ এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমাগত বেশি মাত্রায় ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপকরণগুলিকে করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পত্তি জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন স্বার্থ, আইনকানুন, শাসনযন্ত্র এবং করপ্রথা সম্বলিত স্বাধীন কিংবা শুধু শিথিলভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রদেশকে ঠেসে মেলানো হয় **এক-একটা** জাতিতে যার **একই** শাসনযন্ত্র, **একই** আইনসংহিতা, **একই** জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, **একই** সীমান্ত এবং **একই** বহিঃশুল্ক।

আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতেই বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন-শক্তি সৃষ্টি করেছে তা অতীতের সকল পুরুষ-পর্যায়ের মিলিত উৎপাদন-শক্তির চেয়েও বিশাল এবং অতিকায়। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের অধীন করা, যন্ত্রপাতি, শিল্প আর কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, স্টীম-নৌবাহ, রেলপথ, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ, গোটা গোটা মহাদেশে চাষবাসের প্রতিবন্ধ দূর করা, নদীর গতিপরিবর্তন, ভেলকিবাজির মতো যেন মাটি ফুঁড়ে জনসমষ্টির আবির্ভাব, — সামাজিক শ্রমের কোলে এতখানি উৎপাদন-শক্তি সুপ্ত ছিল তার পূর্ববোধটুকুও কি ছিল আগেকার কোন শতকের?

তাই দেখা যাচ্ছে যে-উৎপাদন আর বিনিময়ের উপকরণের ভিত্তিতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেকে গড়ে তুলেছে সেগুলির উৎপত্তি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে। উৎপাদন আর বিনিময়ের এইসব উপকরণ বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন আর বিনিময়ের পরিবেশ, কৃষি আর ম্যানুফ্যাকচারের সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন, এককথায় সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা-সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে খাপ খেল না। সেগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল, সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা ভেঙে ফেলা হল।

সেগুলির জায়গায় এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী করে নেওয়া সামাজিক আর রাজনীতিক গঠন, আর বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর একটা ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক এবং মালিকানা-সম্পর্ক সহ

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ — ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এমন বিপুল উপকরণসমূহ গড়ে তুলেছে যে-সমাজ — তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে সেগুলিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে শিল্প আর বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক পরিবেশের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং সেটার আধিপত্যের অস্তিত্বের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা-সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই আরও বেশি করে বিপন্ন করে ফেলে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এইসব সংকটে বিদ্যমান উৎপন্নের অনেকখানিই শুধু নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তিরও অনেকটা পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়। এইসব সংকটের ফলে এক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, সেটা অতীতের সকল যুগে অসম্ভব গণ্য হত — অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত জীবনোপায়ের যোগান, শিল্প আর বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেল; কিন্তু কী কারণে? কারণ, সভ্যতা হয়েছে বড্ড বেশি, জীবনোপায়ের পরিমাণ অত্যধিক, অনেক বেশি হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশি বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, তা বুর্জোয়া মালিকানার পরিবেশ বিকাশে আর সাহায্য করছে না; হচ্ছে বরং উলটোটা: যে-পরিবেশ দিয়ে সে-শক্তি শৃঙ্খলিত তার পক্ষে এই শক্তি বড্ড বেশি প্রবল; সেই শক্তি শৃঙ্খল অতিক্রম করা মাত্র তা সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে এনে ফেলে বিশৃঙ্খলতা, বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজের পরিবেশ যে-সম্পদ সৃষ্টি করে তা ধারণ করার পক্ষে ঐ পরিবেশ সংকীর্ণ। বুর্জোয়া শ্রেণী এইসব সংকট কাটিয়ে ওঠে কোন উপায়ে? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নষ্ট করে ফেলে; অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরন বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাৎ কিনা, আরও ব্যাপক, আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রস্তুত ক'রে, এবং সংকট রোধের উপায় কমিয়ে ফেলে।

যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভূমিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তারই বিরুদ্ধে উদ্যত।

যে অস্ত্রে তার মৃত্যু, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই অস্ত্রখানা গড়েছে শুধু তাই নয়; এমন লোকও তারা সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র চালনা করবে — আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, **প্রলেতারিয়েত।**

যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী, অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে, ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত, অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, — মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর তাদের কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের শ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের একটু একটু করে বেচতে হয়, এরা পণ্য বাণিজ্যের অন্য সমস্ত সামগ্রীর মতোই, আর কাজেই তারা প্রতিযোগিতার, সমস্ত উত্থান-পতনের বাজারের সবরকম ওঠানামার প্রভাবাধীন।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমবিভাগের ফলে প্রলেতারিয়ানদের কাজের কোন ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যই আর নেই, এবং সেইহেতু কাজে মজুরের আকর্ষণ লোপ পেয়েছে। সে হয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় শুধু সবচেয়ে সরল, অতি একঘেয়ে, অতি সহজে আয়ত্ত-করা দক্ষতাটুকু। সুতরাং মজুর উৎপাদনের খরচটা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে প্রায় তার বেঁচে থাকার এবং তার বংশরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য জীবনোপায়ের মধ্যেই। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম (৫৬) তার উৎপাদন খরচার সমান। সুতরাং কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা যত বাড়ে, মজুরি তত কমে। শুধু তাই নয়; যে পরিমাণে যন্ত্রের ব্যবহার আর শ্রমবিভাগ বাড়ে, সেই একই অনুপাতে বাড়ে খাটুনির চাপ — হয় কাজের সময় বাড়িয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি কাজ আদায় করে, অথবা যন্ত্রের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে, ইত্যাদি।

আধুনিক শ্রমশিল্প কুলপতি ধরনের মনিবের ছোট কর্মশালাকে শিল্প-পুঁজিপতির বিরাট কারখানায় পরিণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ভিড় করে কারখানায় ঢোকান হয়, তারা সংগঠিত হয় সৈনিকের ধরনে। শিল্পবাহিনীর সাধারণ সৈন্য হিসেবে তাদের রাখা হয় অফিসার আর সার্জেন্টদের একটা পূর্ণাঙ্গ স্তরবিভক্ত কর্তৃত্বাধীন। তারা কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীর আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হয় যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস। এই যথেচ্ছাচার যত খোলাখুলিভাবে মুনাফালাভকেই নিজের লক্ষ্য এবং

আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে, ততই তা হয়ে ওঠে আরও হীন, আরও ঘৃণ্য, আরও তিক্ত।

শারীরিক মেহনতে দক্ষতা ও শক্তি যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ আধুনিক শ্রমশিল্প যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই পুরুষের শ্রমের স্থান জুড়ে বসতে থাকে নারী আর শিশুর শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার এখন আর কোন বিশিষ্ট সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাটবার সাধিত্র -- বয়স অথবা স্ত্রী-পুরুষের তফাত অনুসারে তাদের কাজে লাগাতে খরচ কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের উপর শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র, এবং সে নগদ মজুরিটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অংশ — বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন, প্রভৃতি।

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তরগুলি — খুদে ম্যানুফ্যাকচারার, দোকানদার, সাধারণভাবে ভূতপূর্ব কারবারীরা, হস্তশিল্পী এবং কৃষকেরা — এরা সবাই ক্রমে ক্রমে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে যায়। তার এক কারণ হল, যে-আয়তনে আধুনিক শিল্প চালান হয়, এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা জেরবার হয়ে যায়; অপর কারণ হল, উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট দক্ষতা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে, প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নতুন নতুন লোক আসে জনসমষ্টির সমস্ত শ্রেণী থেকে।

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায় প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকেই। প্রথমটায় লড়াই চালায় পৃথক পৃথক মজুরেরা; তারপর লড়তে থাকে কোন একটা কর্মশালার মেহনতীরা; তারপর কোন একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকরা তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী ব্যক্তি-পুঁজিপতিটির বিরুদ্ধে লড়ে। উৎপাদনের বুর্জোয়া পরিবেশটা নয়, তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয় উৎপাদনের উপকরণই; যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের প্রতিযোগিতা করে সেগুলিকে তারা ধ্বংস করে, কল-কব্জা ভেঙে চুরমার করে, কারখানায় আগুন লাগায়, মধ্যযুগের মেহনতকারীর যে অবস্থা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তা ফিরিয়ে আনতে।

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামাত্র, তারা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ। কোথাও যদি তারা অধিকতর সংহত সংস্থায় একজোট হয়ও, সেটা তখনও তাদের নিজেদের সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলনের ফলমাত্র, এই শ্রেণী নিজের রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে গোটা প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, এবং তখনও কিছু দিনের জন্যে তা করতে পারেও। সুতরাং এই পর্যায়ে প্রলেতারিয়ানরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, কিন্তু শত্রুর শত্রুর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ — জমিদার, শিল্প-বহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইভাবে সমগ্র ঐতিহাসিক গতিটি কেন্দ্রীভূত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে; এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হয় বুর্জোয়ার জয়।

কিন্তু শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী বাড়ে কেবল সংখ্যায় নয়; সেটা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমষ্টিতে, সেটার শক্তি বাড়তে থাকে, আপন শক্তি সেটা আরও বেশি করে উপলব্ধি করে। কল-কব্জা যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য মুছে ফেলতে থাকে, আর প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নিচু মাত্রায়, সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েতের কাতারে বিভিন্ন স্বার্থ আর জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই আরও সমান হয়ে যেতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং তৎপ্রসূত বাণিজ্য-সংকটে শ্রমিকের মজুরি হয় আরও বেশি দোদুল্যমান। যন্ত্রের অবিরাম উন্নতি ক্রমেই আরও দ্রুততালে বাড়তে থাকে, তার ফলে মজুরের জীবিকা হয়ে পড়ে আরও অনিশ্চিত; এক-একজন মজুরের সঙ্গে এক-একজন বুর্জোয়ার সঙ্ঘর্ষ ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সমিতি গঠন শুরু করে (ট্রেড ইউনিয়ন) বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে; মজুরির হার বজায় রাখার জন্যে তারা জোট বাঁধে; মাঝে-মধ্যে ঘটা এইসব বিদ্রোহের ব্যাপারে আগে থাকতে ব্যবস্থা রাখার জন্যে তারা স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে-ওখানে লড়াইটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হয়।

মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পকালের জন্যে। তাদের সংগ্রামের আসল লাভটা আশু ফলাফলে নয়, সেটা শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান

সম্মিলনে। এই সম্মিলনে সহায় হয় আধুনিক শিল্পের সৃষ্টি-করা যোগাযোগের উন্নততর ব্যবস্থা, সেটার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। একই ধরনের অসংখ্য স্থানীয় লড়াইকে দেশব্যাপী শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে ঠিক এই সংযোগটারই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই রাজনীতিক সংগ্রাম। শোচনীয় রাস্তাঘাটের দরুন যে সম্মিলন ঘটাতে মধ্যযুগের বার্গারদের শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, আধুনিক শ্রমিকরা রেলপথের কল্যাণে তা হাসিল করে অল্প কয়েক বছরে।

শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়ানদের সংগঠিত হওয়া এবং তার ফলে এক রাজনীতিক পার্টিতে পরিণত হওয়াটাকে অবিরাম ব্যর্থ করে দেয় তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর, আরও শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। বুর্জোয়াদেরই মধ্যকার বিভেদ কাজে লাগিয়ে সেটা শ্রমিকদের এক-একটা স্বার্থকে আইনত মেনে নিতে বাধ্য করে। ইংলন্ডে দশ-ঘণ্টার বিল্ পাস হয়েছিল এইভাবে।

মোটের উপর, পুরন সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশের ধারাটাকে নানাভাবে এগিয়ে দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী অবিরাম লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। লড়াইটা প্রথমে হয় অভিজাতদের সঙ্গে; বুর্জোয়া শ্রেণীরই যে-যে অংশের স্বার্থ শিল্পে অগ্রগতির বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিরুদ্ধে পরে; আর সর্বদাই বিদেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে। সমস্ত সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে প্রলেতারিয়েতের কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয়, এবং এইভাবে তাদের টেনে আনতে হয় রাজনীতিক রঙ্গভূমিতে। সুতরাং বুর্জোয়ারা নিজেরাই প্রলেতারিয়েতকে তাদের নিজেদের রাজনীতিক এবং সাধারণ শিক্ষার কিছু কিছু যোগায়, অর্থাৎ কিনা, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়বার অস্ত্র প্রলেতারিয়েতকে তারাই যোগায়।

এছাড়া, আমরা আগেই দেখেছি, শিল্পের অগ্রগতির ফলে শাসক শ্রেণীগুলির গোটা-গোটা অংশ প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, কিংবা অন্তত তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারিয়েতকে যোগায় জ্ঞান আর প্রগতির নতুন নতুন উপাদান।

শেষপর্যন্ত, শ্রেণী-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণীর ভিতরে, বস্তুতপক্ষে পুরন সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে সক্রিয় ভাঙনের প্রক্রিয়াটা এমন উগ্র দগদগে হয়ে ওঠে যাতে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, যে-শ্রেণীর হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতরাং আগেকার একযুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের একটা ভাগ, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদদের একাংশ, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে।

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়ান সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েতই প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক শিল্পের মুখে ক্ষয় হতে হতে শেষে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল এই শিল্পের বিশিষ্ট এবং সারবান সৃষ্টি।

নিম্ন মধ্যশ্রেণী, খুদে ম্যানুফ্যাকচারার, দোকানদার, কারিগর, কৃষক — এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসেবে অস্তিত্বের লুপ্তি ঠেকাবার জন্যে। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। শুধু তাই নয় — তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা। আপতিকভাবে যদি এরা বিপ্লবী হয়, সেটা কেবল তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পড়ে যাওয়াটা আসন্ন, এই বিবেচনা থেকে; সুতরাং তারা সেক্ষেত্রে রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।

পুরন সমাজের নিম্নতম স্তরগুলো থেকে ছিটকে-পড়া নিষ্ক্রিয়ভাবে পচতে-থাকা জনতার সামাজিক আবর্জনাটা, 'বিপজ্জনক শ্রেণী'টা প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের তোড়ে এখানে-ওখানে আন্দোলনের ভিতরে এসে পড়তে পারে, কিন্তু এদের জীবনযাত্রায় ধরনটাই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যেই তাদের তৈরি করে তোলে অনেক বেশি পরিমাণে।

পুরন সমাজের সাধারণ পরিস্থিতিটা প্রলেতারিয়েতের জীবনে ইতোমধ্যে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারিয়ানের সম্পত্তি নেই; স্ত্রী-পুত্র-কন্যার

সঙ্গে তার সম্বন্ধের আর কোন মিল নেই বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সঙ্গে; আধুনিক শিল্প-শ্রম, পুঁজির কাছে আধুনিক ধরনের অধীনতা, যা ইংলন্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা জার্মানিতে একই প্রকার, সেটা তার জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের লেশমাত্রও অবশিষ্ট রাখে নি। তার কাছে আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হল কতকগুলো বুর্জোয়া পূর্বসংস্কার মাত্র, যার পিছনে ওঁৎ পেতে থাকে ততগুলোই বুর্জোয়া স্বার্থ।

অতীতে যেসব শ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে তারা সবাই গোটা সমাজকে নিজেদের ভোগ-দখলের উপযোগী অবস্থার অধীন করে নিরাপদ করতে চেয়েছে। প্রলেতারিয়ানরা নিজেদের পূর্বতন ভোগ-দখলের প্রণালী উচ্ছেদ করে ছাড়া, এবং তাতে করে ভোগ-দখলের আগেকার প্রত্যেকটি প্রণালীর অবসান ঘটিয়ে ছাড়া সমাজের উৎপাদন-শক্তির মালিক হতে পারে না। নিরাপদে রক্ষা করার মতো নিজস্ব কিছুই তাদের নেই; ব্যক্তিগত মালিকানার সমস্ত পূর্বতন নিরাপত্তা আর নিশ্চিতি নির্মূল করে দেওয়াই তাদের নির্দিষ্ট ব্রত।

অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিক্যের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত আজকের সমাজে নিম্নতম স্তর; তাকে নড়তে হলে, উঠে দাঁড়াতে হলে উপরে চাপানো সরকারী সমাজের গোটা স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করা ছাড়া তার উপায় নেই।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্য সর্বাগ্রে ফয়সালা করতে হবে দেশীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে।

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ পর্যায়গুলির বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি বিদ্যমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলে, সে-যুদ্ধ একটা সন্ধিক্ষণে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।

আমরা আগেই দেখেছি, আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী আর অত্যাচারিত শ্রেণীর বিরোধের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন শ্রেণীর উপর অত্যাচার করতে হলে সেটা যাতে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল, ঠিক যেমন সামন্ত-স্বৈরতন্ত্রের জোয়ালে পেটি বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল। তার বিপরীতে, আধুনিক শ্রমিক শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপরে ওঠে না, নিজ শ্রেণীর অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক অবস্থার নিচে, ক্রমাগত নিচে নেমে যেতে থাকে। সে হয়ে পড়ে নিঃস্ব আর নিঃস্বতা বেড়ে চলে জনসংখ্যা আর সম্পদের বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে। এই সূত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সমাজের শাসক হয়ে থাকার এবং নিজেদের অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থাটিকে চরম বিধান হিসেবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার যোগ্যতা আর নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ সেটা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, দাসকে এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার অধীনে সমাজ আর থাকতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে সেটার অস্তিত্ব সমাজের সঙ্গে আর খাপ খায় না।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং আধিপত্যের মূলশর্ত হল পুঁজির সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বৈপ্লবিক সংযুক্তি। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন ভোগ-দখল করে, সেই ভিত্তিটাকেই তার পায়ের তলা থেকে কেটে সরিয়ে দেয় আধুনিক শিল্পের বিকাশ। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করে সর্বোপরি তারই কবরখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।

২

প্রলেতারিয়ানরা এবং কমিউনিস্টরা

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়ানদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কী সম্বন্ধ?

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির বিরুদ্ধ পৃথক পার্টি কমিউনিস্টরা গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন কোন স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে-পিটে তোলার জন্যে তারা কোন নিজস্ব গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়ানদের জাতীয় সংগ্রামে তারা জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাতে তারা সর্বদা এবং সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থটাকে তুলে ধরে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল, একদিকে, কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং দৃঢ়চিত্ত অংশ -- যে-অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়; অপরদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে, প্রলেতারিয়েতের বিপুল অংশের সঙ্গে তুলনায় তাদের এই সুবিধেটা আছে যে, প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, পরিবেশ এবং আখেরী সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।

কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য প্রলেতারিয়ানদের অন্যান্য পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসেবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনীতিক ক্ষমতা জয়।

কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি মোটেই এমন কোন ধারণা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা অমুক কিংবা তমুক হবু বিশ্বসংস্কারকের উদ্ভাবন বা আবিষ্কার।

বিদ্যমান শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে, আমাদের চোখের সামনেই ঘটমান ঐতিহাসিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত বাস্তব সম্পর্কগুলি কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে সাধারণ অভিধায় প্রকাশ করা হয় মাত্র। প্রচলিত মালিকানা-সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের বিশেষত্ব নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অতীতের সমস্ত মালিকানা-সম্পর্কে ক্রমাগত ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

যেমন, ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত মালিকানা উচ্ছেদ করে।

সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন ভোগ-দখল ব্যবস্থার চূড়ান্ত এবং পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এই এককথায় চুম্বক করা যায়: ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে — কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে — অনুযোগ করা হয় যে, ব্যক্তির নিজ পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকার আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, বলা হয় যে, সকল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কর্ম আর স্বাবলম্বনের মূলভিত্তি হল এই সম্পত্তি।

কষ্টলব্ধ, নিজে সংগ্রহ-করা, স্বোপার্জিত সম্পত্তি! সামান্য কারিগর এবং খুদে কৃষকের সম্পত্তির কথাই কি বলা হচ্ছে, যে ধরনের সম্পত্তি ছিল বুর্জোয়া সম্পত্তির আগে? তা উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই; শিল্পের বিকাশ ইতোমধ্যে সেটাকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এখনও প্রতিদিন ধ্বংস করে চলছে।

নাকি বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা?

কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরদের জন্যে কোন সম্পত্তি সৃষ্টি করে? একটুও না। সেটা সৃষ্টি করে পুঁজি, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরি-শ্রমকে শোষণ করে, নিত্য নতুন শোষণের জন্যে মজুরি-শ্রমের নতুন নতুন সরবরাহ সৃষ্টির শর্তে ছাড়া যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই

সম্পত্তি পুঁজি এবং মজুরি-শ্রমের বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধের দুইটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদনক্ষেত্রে শুধু একটা নিছক ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠাও পাওয়া। পুঁজি একটা যৌথ উৎপাদ; সমাজের শুধু অনেক লোকের মিলিত কাজ দিয়ে, এমনকি শেষপর্যন্ত, সমাজের শুধু সকল লোকের মিলিত কর্ম দিয়েই পুঁজিকে চালু করা যায়।

পুঁজি তাই ব্যক্তিগত শক্তি নয়, একটা সামাজিক শক্তি।

কাজেই, পুঁজিকে সাধারণের সম্পত্তিতে, অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে তার দ্বারা নিজস্ব সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক প্রকৃতিটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।

এবার মজুরি-শ্রমের কথা ধরা যাক।

মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতী হিসেবে মেহনতীর মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্যে যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু উপকরণ। সুতরাং মজুরি-শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভোগ-দখল করে তাতে কেবল কোনক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া এবং পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই নিজস্ব ভোগ-দখল, যা কেবল মানুষের জীবন বজায় রাখা এবং পুনরুৎপাদনের কাজে লাগে এবং অপরের শ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোন উদ্বৃত্ত যার থেকে অবশিষ্ট থাকে না, সেটার উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ভোগ-দখলের এই শোচনীয় প্রকৃতিটা, যে-অবস্থায় শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়ানর জন্যে, আর তাকে বাঁচতে দেওয়া হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যতটা প্রয়োজন শুধু ততখানি পর্যন্ত, শুধু সেটাকেই আমরা খতম করতে চাই।

বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম হল সঞ্চিত শ্রম বাড়াবার উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে কিন্তু সঞ্চিত শ্রম হল মেহনতীর জীবনকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়মাত্র।

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া

সমাজে পুঁজি স্বাধীন, সেটার আছে ব্যক্তিতা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ পরাধীন, ব্যক্তিতাবিহীন।

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুর্জোয়ারা বলে ব্যক্তিতা আর স্বাধীনতা উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই। বুর্জোয়া ব্যক্তিতা, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার উচ্ছেদই যে লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া অবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধ বেচাকেনা।

কিন্তু যদি বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও অন্তর্ধান করে। এই অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্য সমস্ত 'বাক্য-বীরত্বের' যদি কোন অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ বেচাকেনার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়; কিন্তু কেনাবেচা, উৎপাদনের বুর্জোয়া পরিবেশ এবং খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীটারই কমিউনিস্ট ধরনের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হলে ওসব কথার কোন অর্থ হয় না।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের বেলায় ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতোমধ্যে লোপ করা হয়েছে; অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ঐ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে তা নেই বলে। সুতরাং, যে-ধরনের মালিকানার অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক লোকের কোন সম্পত্তি না থাকা, সেটা আমরা তুলে দিতে চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অনুযোগ।

এককথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অনুযোগ এই যে, আপনাদের মালিকানার উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক তাইই, আমাদের সংকল্প ঠিক তা-ই।

যখন থেকে মানুষের শ্রমকে আর পুঁজি, মুদ্রা অথবা খাজনাতে পরিণত করা চলে না, যাতে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করা যায় এমন একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা যায় না — অর্থাৎ যেই ব্যষ্টিগত সম্পত্তিকে আর বুর্জোয়া সম্পত্তিতে, পুঁজিতে রূপান্তরিত করা যায় না, আপনারা বলেন, তখন থেকে ব্যক্তিতা মিলিয়ে যায়।

তাহলে আপনাদের স্বীকার করতেই হবে যে, 'ব্যক্তি' বলতে

বুর্জোয়া ছাড়া, সম্পত্তির মধ্য-শ্রেণীর মালিক ছাড়া অন্য কাউকে আপনারা বোঝান না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে, তার অস্তিত্ব করে তুলতে হবে অসম্ভব।

সমাজের উৎপন্ন জিনিসে ভোগ-দখলের ক্ষমতা থেকে কমিউনিজম কাউকে বঞ্চিত করে না; এমন ভোগ-দখলের সাহায্যে অপরের শ্রম করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকেই শুধু কমিউনিজম তাকে বঞ্চিত করতে চায়।

আপত্তি উঠেছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে।

এই মত ঠিক হলে বহুপূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বুর্জোয়া সমাজের রসাতলে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, আর যারা কিছু অর্জন করে তারা খাটে না। গোটা আপত্তিটাই অন্য ভাষায় এই পুনরুক্তির শামিল: যখন পুঁজি আর থাকবে না তখন মজুরি-শ্রমও আর থাকতে পারে না।

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন আর ভোগ-দখল বিষয়ে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে যত আপত্তি আনা হয়, মানসিক সৃষ্টির উৎপাদন আর ভোগ-দখল সম্পর্কে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধেও ঠিক সেই আপত্তি তোলা হয়। বুর্জোয়াদের কাছে শ্রেণীগত মালিকানার উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমনি শ্রেণীগত সংস্কৃতির লোপ তাদের কাছে সকল সংস্কৃতি লোপ পাওয়ার সমার্থক।

যে সংস্কৃতির অবসানের ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, সেটা বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের কাছে যন্ত্র হিসেবে কাজ করার তালিম মাত্র।

কিন্তু বুর্জোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বেলায় যদি আপনারা স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন, ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার মানদণ্ড খাটান, তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগুলিই আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন আর বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা সকলের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেওয়াটাই আপনাদের ব্যবহারশাস্ত্র, আপনাদের এ ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি আর লক্ষ্য আবার নির্ধারিত হয় আপনাদের শ্রেণীর অস্তিত্বের আর্থনীতিক অবস্থা দিয়ে।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি আর মালিকানার ধরন থেকে যেসব সামাজিক রূপ মাথা তোলে — যেসব ঐতিহাসিক সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয় এবং লয় পায় — সেগুলিকে আত্মপরায়ণ বিভ্রান্তির ফলে আপনারা প্রকৃতি আর বিচারবুদ্ধির চিরন্তন নিয়মে রূপান্তরিত করতে চান; আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছে তাদের সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্তি। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে-কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, সেটাকে আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বীকার করা অবশ্য আপনাদের বারণ।

পরিবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গর্হিত প্রস্তাবে ক্ষেপে ওঠে।

এখনকার পরিবার, অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন্ ভিত্তির উপর? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। পূর্ণ বিকশিত রূপে এই পরিবার আছে শুধু বুর্জোয়াদের মধ্যেই। কিন্তু এই অবস্থার অনুপূরক দেখা যাবে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতিতে এবং প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তিতে।

বুর্জোয়া পরিবারের অনুপূরকটার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পরিবার লোপ পাবে স্বভাবতই, আর পুঁজি মিলিয়ে যাবার সঙ্গেই ঘটবে উভয়ের অন্তর্ধান।

আমাদের বিরুদ্ধে কি আপনাদের অভিযোগ এই যে, সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ আমরা বন্ধ করে দিতে চাই? এ দোষ আমরা অস্বীকার করব না।

কিন্তু আপনারা বলবেন, আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিই যখন আমরা গৃহ-শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষা।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? যে সামাজিক অবস্থার আওতায় আপনারা শিক্ষা দেন তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা

চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

আধুনিক শিল্পের ক্রিয়াফলে প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে মামুলি কেনাবেচার বস্তু এবং শ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার আর শিক্ষা বিষয়ে, বাপ-মা আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চীৎকার করে বলে — কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা যে নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কায়েম করতে চাও।

বুর্জোয়ারা নিজেদের স্ত্রীদের নিছক উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখে থাকে। আর তারা শোনে যে, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে যৌথভাবে ব্যবহার করা হবে, আর স্বভাবতই, সাধারণের ভোগ্য হবার নিয়তি ঘটবে নারীরও, এছাড়া কোন সিদ্ধান্তে তারা আসতে পারে না।

ঘুণাক্ষরেও তাদের মনে জাগে না যে, আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে নারীর মুক্তি।

বাদবাকিটা সম্বন্ধে কথা হল এই যে, নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে-নৈতিক ক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নেই। নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকার কায়েম করার প্রয়োজন কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকেই সেটার প্রচলন আছে।

মামুলি বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, তাদের মজুরদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যবহারের ক্ষমতা পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুসলে নেওয়াতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্জোয়া বিবাহ আসলে অনেকে মিলে সাধারণের স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড়জোর এই বলে অভিযোগ আনা সম্ভব যে, নারীর উপর যে যৌথ ভোগ-অধিকার ভণ্ডামির আড়ালে লুকানো রয়েছে সেটাকে তারা করতে চায় প্রকাশ্যে বিধিবদ্ধ। বাদবাকিটা সম্বন্ধে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত

নারীর উপর যৌথ ভোগ-অধিকারেরও অবসান ঘটবেই, অর্থাৎ প্রকাশ্য আর ঘরোয়া দুই ধরনেরই বেশ্যাবৃত্তি শেষ হয়ে যাবে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, তারা চায় দেশ আর জাতিসত্তার বিলোপ।

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনীতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির পরিচালক শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে, নিজেকেই হয়ে উঠতে হবে জাতি, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ব-বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতির একরূপতা এবং সেটার উপযুক্ত জীবনযাত্রার পরিবেশ — এইসবের জন্যে জাতিগত পার্থক্য এবং জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই আরও মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যে সেগুলোর আরও দ্রুত অবসান ঘটবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম সর্বপ্রথম শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির উপর অপর জাতির শোষণও শেষ হবে। যে পরিমাণে জাতির ভিতরকার শ্রেণীবিরোধ শেষ করা হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হয়ে যাবে।

ধর্ম, দর্শন এবং সাধারণভাবে ভাবাদর্শের দিক থেকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় সেগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবারও যোগ্য নয়।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের পরিবেশ, সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ-জীবনে প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাব-ভাবনা, মতামত আর ধারণা, এককথায় মানুষের চেতনা বদলে যায়, একথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মানসিক উৎপাদনের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে, এছাড়া আর কী প্রমাণ করে ভাব-

ধারণার ইতিহাস? প্রতি যুগেই যেসব ভাব-ধারণা আধিপত্য করেছে সেগুলি চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণীরই ভাব-ধারণা।

লোকে যখন এমন ভাব-ধারণার কথা বলে যা সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়, তারা শুধু এই সত্যই প্রকাশ করে যে, পুরন সমাজের ভিতরে নতুন এক সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, আর অস্তিত্বের পুরন পরিবেশের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরন ভাব-ধারণার বিলোপ সমান তাল রেখে চলেছে।

প্রাচীন জগতের যখন অন্তিম অবস্থা, তখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রাচীন ধর্মগুলিকে পরাস্ত করেছিল। খ্রীষ্টান ভাব-ধারণা যখন আঠার শতকে যুক্তিবাদী ভাব-ধারণার কাছে হার মানে তখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মৃত্যু-সংগ্রাম চলেছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিল।

বলা হবে যে, 'ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক এবং আইনগত ধারণাগুলিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি আর আইন।

'তাছাড়া, আছে স্বাধীনতা, ন্যায়, ইত্যাদি চিরন্তন সত্য, সেগুলি সমাজের সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান। কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্যগুলিকে উড়িয়ে দেয়, ধর্ম আর নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে স্থাপিত না করে সব ধর্ম এবং সব নৈতিকতাই উচ্ছেদ করে; তাই কমিউনিজম সক্রিয় হয় ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে।'

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীবিরোধের বিকাশ, যে-বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে বিভিন্ন যুগে।

কিন্তু যে রূপই নিক, একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান, যথা: সমাজের এক অংশের উপর অপর অংশের শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, অতীত যুগগুলির সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা আর বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ রূপ বা

সাধারণ ভাব-ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণীবিরোধের সম্পূর্ণ লুপ্তির সঙ্গে ছাড়া তা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না।

কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সঙ্গে সবচেয়ে আমূল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে জড়িত রয়েছে চিরাচরিত ভাব-ধারণাগুলির সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ, তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপত্তির প্রসঙ্গ এখানে শেষ করা যাক।

আগে আমরা দেখেছি, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জেতা।

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্যে, রাষ্ট্রের হাতে, অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত সাধিত্র কেন্দ্রীভূত করার জন্যে, এবং উৎপাদন-শক্তির সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়িয়ে তোলার জন্যে প্রলেতারিয়েত তার রাজনীতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

শুরুতে অবশ্য মালিকানা অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদনের পরিবেশের উপর জবরদস্তির হস্তক্ষেপের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না; সুতরাং সেগুলি এমন ব্যবস্থা যা অর্থনীতির দিক থেকে মনে হবে যথেষ্ট নয়, টেকে না, কিন্তু চলার পথে সেগুলো নিজেদের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং পুরন সমাজব্যবস্থার উপর আরও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সৃষ্টি করে, এবং উৎপাদন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপায় হিসেবে অপরিহার্য।

অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে এইসব ব্যবস্থা হবে বিভিন্ন।

তাসত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে।

১। ভূমিতে মালিকানার অবসান; ভূমির সমস্ত খাজনা সাধারণের হিতার্থে খাটান।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান কিংবা ক্রমবিভক্ত হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার লোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী এবং বিদ্রোহীদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি আর নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকারের জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ এবং পরিবহনের সমস্ত উপকরণ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কল-কারখানা এবং উৎপাদন-সাধিত্রের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত জমির উন্নয়ন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। বিভিন্ন শিল্প-বাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্যে।

৯। যন্ত্রশিল্পগুলির সঙ্গে কৃষিকার্যের সংযুক্তি; সারা দেশে জনসমষ্টির আরও বেশি সম-বণ্টন মারফত ক্রমে ক্রমে শহর আর গ্রামের মধ্যে প্রভেদ লোপ করা।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। কারখানায় বর্তমান ধরনের শিশু-শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিকাশের ধারায় যখন সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য দূর হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির একটা বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) ক্ষমতায় রাজনীতিক চরিত্র আর থাকবে না। যথাভিহিত রাজনীতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর অত্যাচার চালাবার সংগঠিত ক্ষমতা মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যে অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের সাহায্যে সেটা যদি নিজেকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে এবং শাসক শ্রেণী হিসেবে উৎপাদনের পুরন পরিবেশকে সেটা যদি জোর করে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে, তাহলে সেই পুরন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেটা শ্রেণীবিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বের পরিবেশ দূর করে দেবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসেবে তার স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

বিভিন্ন শ্রেণী আর শ্রেণীবিরোধ সংবলিত পুরন বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে একটা সমিতি, যেখানে প্রত্যেকের অবাধ বিকাশ হবে সবার অবাধ বিকাশের শর্ত।

৩

সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র

ক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে ফ্রান্স আর ইংলন্ডের অভিজাতদের পক্ষে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লেখা একটা পেশা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লবে এবং ইংলন্ডে সংস্কার আলোড়নে (৫৭) এই অভিজাতেরা আবার ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের বশীভূত হয়। এরপর এদের পক্ষে কোন গুরুতর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভব রইল একমাত্র মসিযুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার [restoration]* যুগের পুরন ধ্বনিগুলি অচল হয়ে পড়েছিল। লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্যে অভিজাতেরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খাড়া করতে। এইভাবে অভিজাতেরা প্রতিশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রভুদের নামে টিটকারি দিয়ে, এবং তাদের কানে-কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে।

এইভাবে দেখা দেয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক টিটকারি; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি এবং অর্ধেক ভবিষ্য ভীতিপ্রদর্শন; মাঝে মাঝে এদের মর্মভেদী, সব্যঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিঁধত; কিন্তু আধুনিক ইতিহাসের ধারা উপলব্ধি করতে একান্ত অক্ষমতার দরুন ক্রিয়াফলটা সবসময়েই হত হাস্যকর।

জনগণকে দলে টানার জন্যে অভিজাতবর্গ নিশান হিসেবে তুলে ধরত প্রলেতারিয়ানের ভিক্ষার ঝুলিটাকে। লোকেরা কিন্তু যতবারই তাদের দলে

---

* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংলন্ডের রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের ফরাসী রেস্টোরেশন। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।] (৫৮)

ভিড়েছে ততবারই তাদের পিছনদিকটায় সামন্ততান্ত্রিক দরবারী চাপরাস দেখে হো হো করে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে ভেগে গেছে।

এই দৃশ্যটা প্রদর্শন করে ফরাসী লেজিটিমিস্টদের (৫৯) একাংশ এবং 'নবীন ইংলন্ড' (৬০) গোষ্ঠী।

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণের পদ্ধতি অন্য ধরনের, এটা দেখাতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রীরা ভুলে যায় তাদের শোষণ চলত সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে আর অবস্থায়, যা আজকের দিনে অচল। তাদের আমলে আজকালকার প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল না দেখাতে গিয়ে তারা ভুলে যায় আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিজস্ব ধরনের সমাজেরই অবশ্যম্ভাবী সন্তান।

তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এতই কম ঢাকে যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অভিযোগটা দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া রাজত্বে এমন একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে, সমাজের পুরন ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া নির্মূল করাই যার নির্বন্ধ।

বুর্জোয়া শ্রেণীকে তারা ভর্ৎসনা করে প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করার জন্যে ততটা নয়, যতটা কিনা **বিপ্লবী** প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করার জন্যে। সুতরাং রাজনীতির কার্যক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিগ্রহের সকল ব্যবস্থায় এরা যোগ দেয়, আর সাধারণ জীবনযাত্রায় বড় বড় বুলি সত্ত্বেও শিল্পবৃক্ষ থেকে ঝরে-পড়া সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপত্তি নেই: পশম, বীটচিনি, অথবা আলুর কোহলের ব্যবসার জন্যে সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় না।*

জমিদারের সঙ্গে যাজক যেমন, তেমনি 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' সঙ্গে 'যাজকীয় সমাজতন্ত্র' সর্বদাই হাত মিলিয়ে চলেছে।

---

* কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে। সেখানে অভিজাত ভূস্বামী আর জাঙ্কাররা (৬১) জমিদারির বড় বড় মহল গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তাছাড়া ব্যাপকভাবে বীটচিনি আর আলুর কোহল তৈরি করে। এদের চেয়ে অবস্থাপন্ন ইংরেজ অভিজাতেরা এখনও ঠিক এতটা নামে নি; কিন্তু তারাও কমতি খাজনার ক্ষতিপূরণের জন্যে কমবেশি সন্দেহজনক জয়েন্ট-স্টক কম্পানি পত্তন করার কাজে নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

খ্রীষ্টানী কৃচ্ছ্রসাধনায় সমাজতান্ত্রিক ছোপ দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছু নেই। খ্রীষ্টধর্ম ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ এবং রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয় নি কি? সেগুলোর বদলে দান আর দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য আর ইন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা আর গির্জার প্রচার করে নি কি তারা? যে পুণ্যোদকে যাজকেরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালাকে পবিত্র করে থাকে তারই নাম 'খ্রীষ্টান সমাজতন্ত্র'।

খ। পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়াদের হাতে সর্বনাশ হয়েছে একমাত্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণীরই নয়, সেটাই নয় একমাত্র শ্রেণী আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ার যেটার অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক অবস্থা শুকিয়ে গিয়ে মরেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের বার্জিস এবং ছোট ছোট খোদকস্ত চাষী। শিল্পে আর বাণিজ্যে যেসব দেশের বিকাশ অতি সামান্য, সেখানে উঠন্ত বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এই দুই শ্রেণী এখনও দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আধুনিক সভ্যতা যেসব দেশে সম্পূর্ণ বিকশিত সেখানে একটা নতুন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মাঝখানে এটা দোলায়িত; বুর্জোয়া সমাজের একটা অনুপূরক অংশ হিসেবে বারবার নতুন হয়ে উঠছে এটা। এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের মধ্যে গিয়ে পড়ছে, আর আধুনিক শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরা এমনকি এটাও দেখছে যে, সময় এগিয়ে আসছে যখন আধুনিক সমাজের একটা স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে তাদের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে এবং শিল্প, কৃষি আর বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে তদারককারী কর্মচারী, গোমস্তা এবং দোকান কর্মচারীরা।

ফ্রান্সের মতো দেশগুলিতে, যেখানে চাষীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, সেখানে যে-লেখকেরা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পক্ষাবলম্বন করে তারা বুর্জোয়া রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক আর পেটি বুর্জোয়াদের মানদণ্ডের প্রয়োগ করবে, এবং এই মধ্যবর্তী শ্রেণীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে, তা স্বাভাবিক।

পেটি-বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্র' দেখা দেয় এইভাবে। এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন সিস্‌মন্দি — শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলন্ডেও।

আধুনিক উৎপাদনের পরিবেশের দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলির অতি প্রখর বিশ্লেষণ করেছে সমাজতন্ত্রের এই সম্প্রদায়টি। অর্থনীতিবিদদের ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করেছে এরা। এরা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করেছে যন্ত্র আর শ্রমবিভাগের মারাত্মক ক্রিয়াফল, অল্প কয়েকজনের হাতে পুঁজি আর জমির কেন্দ্রীভবন, অতি উৎপাদন আর সংকট, এরা নির্দেশ করেছে পেটি বুর্জোয়া আর কৃষকের অনিবার্য সর্বনাশ, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা, উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরকে ধ্বংস করার শিল্প-লড়াই আর সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরন পারিবারিক সম্বন্ধ এবং পুরন জাতিসত্তার ভাঙন।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু 'সমাজতন্ত্রের' এই রূপটি কামনা করে হয় উৎপাদন আর বিনিময়ের পুরন উপকরণ এবং তার সঙ্গে সাবেকী মালিকানা সম্পর্ক আর পুরন সমাজ ফিরিয়ে আনতে, নয় তো উৎপাদন আর বিনিময়ের আধুনিক উপকরণকে আড়ষ্ট করে আটকে রাখতে পুরন মালিকানা সম্পর্কের কাঠামোর ভিতরে, যা এইসব নতুন উপকরণের চাপে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, তা অনিবার্য ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই সেটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং ইউটোপীয়।

এটার শেষ কথা হল: শিল্পোৎপাদনের জন্যে সংঘবদ্ধ গিল্ড প্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্রে গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্ক।

শেষপর্যন্ত ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্মপ্রবঞ্চনার সমস্ত নেশা কেটে গেলে 'সমাজতন্ত্রের' এ রূপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।

গ। জার্মান, বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে, এটা ছিল এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি, এই সাহিত্য জার্মানিতে আমদানি হয় যখন সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা সবে লড়াই শুরু করে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা, শৌখিন ভাবুকেরা সাগ্রহে এ সাহিত্য নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল, তাতে তারা শুধু এই কথাটুকু ভুলে

গেল যে, ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সামাজিক পরিবেশও চলে আসে নি। জার্মানির সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্যের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, সেটার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক। তাই আঠার শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবিগুলি মনে হল সাধারণভাবে 'ব্যবহারিক বিচারশক্তির' দাবি মাত্র, এবং বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকল্প ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ সংকল্পের, যা অবধারিত ছিল সংকল্পের, সাধারণভাবে যথার্থ মানবিক সংকল্পের নিয়ম।

জার্মান বিদ্বানদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের প্রাচীন দার্শনিক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেভাবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

প্রাচীন পেগান জগতের চিরায়ত সাহিত্যের পুঁথিগুলির উপরে সন্ন্যাসীরা কীভাবে ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সেকথা সুবিদিত। ভক্তিহীন ফরাসী সাহিত্যের ব্যাপারে জার্মান বিদ্বানরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসীর নিচে তারা লিখল তাদের দার্শনিক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসী সমালোচনার নিচে তারা লিখল 'মানবতার পরকতা', বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার নিচে লিখে রাখল 'নির্বিশেষ এই ধারণামৌলের সিংহাসনচ্যুতি', ইত্যাদি।

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনাগুলির পিছনে এইসব দার্শনিক বুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম তারা দেয় 'কর্মযোগের দর্শন', 'খাঁটি সমাজতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি', ইত্যাদি।

ফরাসী সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্যকে এইভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে ফেলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল 'ফরাসী একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে; সত্যকার প্রয়োজন নয়, প্রকাশ করা গেছে সত্যের প্রয়োজনকে; প্রকাশ করা গেছে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ নয়, মানব প্রকৃতির স্বার্থ, সাধারণভাবে যে মানুষের শ্রেণী নেই, বাস্তবতা

নেই, যার অস্তিত্ব কেবল দার্শনিক জল্পনার কুয়াশাবৃত রাজ্যে তার স্বার্থ।

এই যে জার্মান সমাজতন্ত্র সেটার স্কুলছাত্রসুলভ কাজটাকেই অমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পসরাটা নিয়ে ক্যানভাসারের মতো গলাবাজি শুরু করেছিল, সেটার পান্ডিতি সারল্যটা কিন্তু ইতোমধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘুচে গেল।

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল আর নিরংকুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মান, বিশেষ করে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনীতিক আন্দোলন তখন স্থিরসংকল্প হয়ে ওঠে।

তাতে করে রাজনীতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার বহুবাঞ্ছিত সুযোগ 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের কাছে হাজির হয়; হাজির হয় উদারনীতি, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ হানবার সুযোগ, জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে তাদের লাভের কিছু নেই, সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময়টিতেই জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল সেটা যে-ফরাসী সমালোচনার মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র তাতে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, আর তার সঙ্গে ছিল অস্তিত্বের তদনুযায়ী আর্থনীতিক অবস্থা এবং তদুপযোগী রাজনীতিক সংবিধান, ঠিক যেগুলি হাসিল করাই ছিল জার্মানিতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্য।

যাজক, পন্ডিত, খুদে গ্রাম্য জমিদার, আমলা, ইত্যাদি অনুচর সহ স্বৈর সরকারগুলির পক্ষে সেটা আক্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু হিসেবে কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহগুলিকে চাবুক আর গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল এতে।

এই 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র এইভাবে যেমন সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসেবে, তার সঙ্গে সেটা ছিল একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের, জার্মানির কূপমন্ডূকদের স্বার্থের

প্রতিনিধি। জার্মানিতে প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি হল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী, ষোল শতকের এই ভগ্নাবশেষটি, যেটা তখন থেকে নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মানির বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে রাখা। বুর্জোয়া শ্রেণীর শিল্পগত আর রাজনীতিক আধিপত্য এ শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের বিপদ সৃষ্টি করে — একদিকে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরদিকে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল, যেন এই দুই পাখিকে এক ঢিলেই মারতে পারবে 'খাঁটি' সমাজতন্ত্র। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল সেটা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নক্সী ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে লোকোত্তর আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্যগুলিকে' সাজিয়ে দিল, তাতে এই ধরনের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়ে।

কূপমণ্ডূক পেটি বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধিত্বটাই তার পেশা, তা জার্মান সমাজতন্ত্র নিজের দিক থেকে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকে।

সেটা ঘোষণা করল যে, জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, খুদে জার্মান কূপমণ্ডূক হল আদর্শ মানুষ। এরা এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানী নীচতার এক-একটা গূঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা সেটার আসল প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এমনকি কমিউনিজমের 'পাশবিক ধ্বংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা এবং সব ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম আর নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণা করতেও সেটার দ্বিধা হল না। আজকের দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, যৎসামান্য কয়েকটিকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলুষিত ক্লান্তিকর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।*

* ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে এর প্রবক্তাদের সমাজতন্ত্র নিয়ে আরও কিছু জল্পনার বাসনা ঘুচিয়ে দেয়। এই ঝোঁকের প্রধান প্রতিভূ এবং ক্লাসিকাল প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্রুন মহাশয়। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

২। রক্ষণশীল, বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতব্রতীরা, মানবতাবাদীরা, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংগঠকেরা, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সদস্যরা, মাদকতা নিবারণের গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভবপর সবরকম খুচরো সংস্কারকরা। এই ধরনের সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ মতধারা হিসেবেও রচিত হয়েছে।

এই ধরনের নিদর্শন হিসেবে আমরা প্রুধোঁ-র 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর উল্লেখ করতে পারি।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম আর বিপদ। তারা সমাজের বিদ্যমান অবস্থাটা চায়, কিন্তু সেটার বৈপ্লবিক এবং ধ্বংসকর উপাদানসমূহ বাদ দিয়ে। তারা চায় প্রলেতারিয়েত ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী। যে দুনিয়ায় বুর্জোয়ারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রীতিকর ধারণাটাকে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র ন্যূনাধিক পূর্ণাঙ্গ নানাবিধ মতধারা হিসেবে দাঁড় করায়। এরূপ মতধারা কাজে পরিণত ক'রে প্রলেতারিয়েত সোজা সামাজিক নব জেরুজালেমে চলে যাক, এই দাবি করে এরা আসলে এটাই চায় যে, প্রলেতারিয়েত বিদ্যমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া সম্বন্ধে সমস্ত বিদ্বেষভাব বর্জন করুক।

এই 'সমাজতন্ত্রের' আর একটা অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক কিন্তু কম সুসংবদ্ধ রূপ আছে। তাতে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এই বলে যে, কোন নিছক রাজনীতিক সংস্কারে নয়, জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থার, আর্থনীতিক সম্পর্কের পরিবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। জীবনযাত্রার বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের 'সমাজতন্ত্র' কোনক্রমেই বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া সম্ভব; সেটা বোঝে বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে শুধু প্রশাসনিক সংস্কার,

অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পঁুজি আর শ্রমের মধ্যে সম্পর্কটাকে কোন দিক থেকেই আঘাত করে না, শুধু বড়জোর বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় এবং সেটাকে সরল করে তোলে।

বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্রের' উপযুক্ত অভিব্যক্তি হয় শুধু তখন, যখন সেটা হয়ে ওঠে বাক্যালঙ্কার মাত্র।

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যে। সংরক্ষণ শুল্ক: শ্রমিক শ্রেণীরই উপকারের জন্যে। কারাগারের সংস্কার: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যে। বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্রের' এই হল শেষ কথা এবং গুরুত্ব দিয়ে বলা একমাত্র কথা।

সংক্ষেপে সেটা এই: বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যেই বুর্জোয়া।

৩। সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম

প্রতিটি বড় বড় আধুনিক বিপ্লবে যে সাহিত্য সবসময়ে প্রলেতারিয়েতের দাবিকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাবেফ এবং অন্যান্যের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করছি না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যখন উচ্ছেদ হচ্ছিল তখনকার সার্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাক্ষাৎ প্রচেষ্টাগুলি অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন পর্যন্ত অপরিণত ছিল, তার মুক্তির অনুকূল আর্থনীতিক অবস্থাও তখন ছিল না, তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাকি, কেবল আসন্ন বুর্জোয়া যুগেই তা গড়ে-ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতারিয়েতের এই প্রথম অভিযানসমূহের সঙ্গী ছিল যে বৈপ্লবিক সাহিত্য সেটার একটা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র থাকা ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন, অতি স্থূল ধরনের সামাজিক সমতা।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট তন্ত্র বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন, ইত্যাদির তন্ত্র, তা পয়দা হল প্রলেতারিয়েত

এবং বুর্জোয়াদের সংগ্রামের উপরে বর্ণিত গোড়ার দিকের অপরিণত যুগে (প্রথম অধ্যায় 'বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়ানরা' দ্রষ্টব্য)।

এইসব তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যমান রূপের সমাজে লক্ষ্য করেন শ্রেণীবিরোধ এবং ধ্বংসকর উপাদানগুলির ক্রিয়াটাও। কিন্তু প্রলেতারিয়েত তখনও তার শৈশবে; দেখে তাদের মনে হল সে শ্রেণীর নিজস্ব ঐতিহাসিক উদ্যম এবং কোন স্বতন্ত্র রাজনীতিক আন্দোলন নেই।

যেহেতু শ্রেণীবিরোধ বাড়ে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সমান তালে, তাই সেদিনের আর্থনীতিক অবস্থা, তাঁরা যেমনটা দেখেন তাতে সেটা তখনও তাঁদের সামনে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বৈষয়িক পরিবেশ তুলে ধরে নি। সুতরাং তাঁরা খুঁজতে লাগলেন সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো নতুন সমাজবিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়মাবলি।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে, মুক্তির ইতিহাসক্রমে সৃষ্ট পরিবেশের বদলে কল্পিত পরিবেশ, প্রলেতারিয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী-সংগঠনের বদলে এই উদ্ভাবকদের নিজেদের বানানো এক সমাজ-সংগঠন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচারে এবং বাস্তব রূপায়ণে পর্যবসিত হল।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময়ে সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। তাঁদের কাছে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বই ছিল কেবল সর্বাধিক নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে।

শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিপার্শ্বের দরুন এই ধরনের সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন তাঁরা সকল শ্রেণীবিরোধের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমনকি সবচেয়ে সুবিধাভোগীরও অবস্থার উন্নতি করতে। সেইজন্যে শ্রেণীনির্বিশেষে সাধারণত গোটা সমাজের কাছে আবেদন জানান, এমনকি তুলনায় শাসক শ্রেণীর কাছেই আবেদন-নিবেদন জানান ছিল এঁদের বেশি পছন্দ। কেননা এঁদের তন্ত্রটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে, এইটেই সমাজের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবস্থার জন্যে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা?

সেইজন্যে সকল রাজনীতিক, বিশেষত সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে এঁরা বর্জন করলেন; এঁদের অভিলাষ হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের

উদ্দেশ্যসাধন, চেষ্টা হল দৃষ্টান্তের জোরে, এবং যার ভাগ্যে ব্যর্থতাই অনিবার্য এমন ছোটখাট পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সামাজিক গসপেলের পথ কাটতে।

ভবিষ্যৎ সমাজের এ ধরনের উদ্ভট ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত অতি অপরিণত অবস্থার মধ্যে ছিল, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল উদ্ভট; সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায়।

কিন্তু এইসব সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট লেখার মধ্যে একটা সমালোচনামূলক দিকও আছে। বিদ্যমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকে তাতে আক্রমণ করা হল। তাই শ্রমিক শ্রেণীর জ্ঞানলাভের পক্ষে অতি অমূল্য অনেক তথ্যে তা পরিপূর্ণ। শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রভেদ, পরিবার প্রথা, ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্যে শিল্প পরিচালনা এবং মজুরি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, সামাজিক সুষমতা ঘোষণা, রাষ্ট্রের কাজকে কেবল উৎপাদনের তদারকে পর্যবসিত করা, ইত্যাদি যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব এইসব লেখার মধ্যে আছে সেগুলি সবই কেবল শ্রেণীবিরোধের অন্তর্ধানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যে-বিরোধ সেদিন সবেমাত্র মাথা তুলছিল, আর এইসব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল শুধু আদি অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট রূপে। প্রস্তাবগুলির প্রকৃতি তাই নিতান্তই ইউটোপীয়।

সমালোচনী-ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের যা তাৎপর্য সেটার একটা বিপরীতমুখী সম্বন্ধ আছে ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে। আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রাম যতই বিকশিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে থাকে, সেই পরিমাণে এই উদ্ভট সংগ্রাম-পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য এবং সমস্ত তাত্ত্বিক যুক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যই এই সমস্ত তন্ত্রের প্রবর্তকেরা অনেক দিক দিয়ে বিপ্লবী হলেও তাঁদের শিষ্যরা প্রতিক্ষেত্রে নিছক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই তাদের অবিচল চেষ্টা যাতে শ্রেণী-সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যাতে শ্রেণীবিরোধ আপসে মিটে যায়। তারা এখনও তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক

রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে; বিচ্ছিন্ন 'ফালেনস্টেরি' প্রতিষ্ঠা, 'হোম কলোনি' স্থাপন, 'ছোট ইকেরিয়া'* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে — নব জেরুজালেমের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে — আর এইসব আকাশকুসুম বাস্তব করার জন্যে আবেদন জানাতে বাধ্য হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সহানুভূতি আর টাকার থলির কাছে। আগে যে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীদের বর্ণনা করা হয়েছে তাদের স্তরে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায়, তফাৎ শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পাণ্ডিত্যে, এবং তাদের সমাজবিদ্যার অলৌকিক মাহাত্ম্যে অন্ধ আর সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রাজনীতিক কর্ম-প্রচেষ্টায় এরা তাই তীব্র বিরোধিতা করে: এদের মতে সে কর্ম-প্রচেষ্টা কেবল নব গস্‌পেলে অন্ধ অবিশ্বাসের ফল।

ইংলন্ডে ওয়েনপন্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুরিয়েভক্তরা যথাক্রমে চার্টিস্ট এবং Réformiste-দের (সংস্কারবাদীদের) বিরোধী (৬২)।

৪

বিভিন্ন প্রতিপক্ষ পার্টি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের অবস্থান

শ্রমিক শ্রেণীর যেসব পার্টি এখন বিদ্যমান, যেমন ইংলন্ডে চার্টিস্টরা এবং আমেরিকায় ভূমিসংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

---

* 'ফালেনস্টেরি' (phalanstère) হল শার্ল ফুরিয়ের পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উপনিবেশ; কাবে তাঁর ইউটোপিয়া এবং পরে আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে ইকেরিয়া নাম দেন। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

ওয়েন তাঁর আদর্শ কমিউনিস্ট সম্প্রদায়গুলিকে 'হোম কলোনি' বলতেন; ফুরিয়ের পরিকল্পিত সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম ছিল 'ফালেনস্টেরি'। যে ইউটোপীয় কল্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান কাবে বর্ণনা করেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইকেরিয়া'। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

শ্রমিক শ্রেণীর আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে, উপস্থিত স্বার্থ হাসিল করার জন্যে কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, সেটার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাটদের* সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু 'মহান বিপ্লব' থেকে যেসব বুলি আর বিভ্রান্তি চলে আসছে সেগুলো সম্বন্ধে সমালোচনার অধিকারটুকু বজায় রেখে।

সুইজারল্যান্ডে কমিউনিস্টরা সমর্থন করে র‍্যাডিকালদের, কিন্তু এ সত্য ভোলে না যে, এই দলটি পরস্পরবিরোধী উপাদানে গঠিত, এদের খানিকটা ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী, আর খানিকটা হল র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া।

পোল্যান্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যেটা জাতীয় মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ভূমিবিষয়ক বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, যে-দলটি ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ অভ্যুত্থান জাগিয়ে তুলেছিল (৬৪)।

জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখনই বৈপ্লবিক অভিযান করে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত-জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তখন কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে।

কিন্তু বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর-বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট উপলব্ধি শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না; সেটা এইজন্যে যাতে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যেসব সামাজিক আর রাজনীতিক অবস্থা চালু করতে বাধ্য সেগুলোকে জার্মান শ্রমিকেরা সোজাসুজি বুর্জোয়াদের

---

* এই পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতেন পার্লামেন্টে লেদ্রু-রলাঁ, সাহিত্য ক্ষেত্রে লুই ব্লাঁ, দৈনিক সংবাদপত্র জগতে 'Réforme' (৬৩)। সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাসি নামের উদ্ভাবকদের কাছে নামটির অর্থ ছিল গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক দলের একাংশ, যাতে সমাজতন্ত্রের কমবেশি রং লেগেছিল। [১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

এই সময়ে ফ্রান্সে যে পার্টি নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাটিক বলত, সেটার প্রতিনিধি রাজনীতিক জীবনে ছিলেন লেদ্রু-রলাঁ, আর সাহিত্য জগতে লুই ব্লাঁ; সুতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দুস্তর পার্থক্য। [১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; সেটা এইজন্যেই যাতে জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পরে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে, তার কারণ সেদেশে বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন, যে-বিপ্লব ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে ঘটবে সেটা অবধারিত, আর সে-বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত থাকবে সতর শতকের ইংলন্ড এবং আঠার শতকের ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনায় ঢের বেশি পরিণত অবস্থায়, আর সেটা এই কারণে যে, জার্মানির বুর্জোয়ারা বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী সংঘটিত প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকামাত্র।

সংক্ষেপে, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বৈপ্লবিক আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সমস্ত আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসেবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, মালিকানার বিকাশের মাত্রা তখন যা-ই থাক না কেন।

শেষ কথা, সকল দেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে সম্মিলন আর বোঝাপড়ার জন্যে তারা সর্বত্র কাজ করে।

নিজেদের মতামত আর লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক পরিবেশের বলপূর্বক উচ্ছেদ দিয়ে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়ানদের হারাবার কিছুই নেই। তাদের জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মেহনতী জনগণ এক হও!

১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত জার্মান ভাষায়

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে প্রকাশিত

কার্ল মার্কস

বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রতিবিপ্লব

দ্বিতীয় প্রবন্ধ (৬৫)

কলোন, ১১ ডিসেম্বর

মহাপ্লাবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ মার্চের মহাপ্লাবন (৬৬) প্রশমিত হবার পর ভূপৃষ্ঠের বার্লিন ভাগে কোন দৈত্য, কোন বৈপ্লবিক অতিকায় জীব পড়ে রইল না, পড়ে রইল শুধু পুরন ধরনের জীবেরা, বামনাকার বুর্জোয়ারা — 'মিলিত প্রাদেশিক সভা'র (৬৭) (United Landtag) উদারপন্থীরা, সচেতন প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। যেসব প্রদেশে বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বাপেক্ষা পরিণত, সেই **রাইনপ্রদেশ** আর **সাইলেশিয়া-ই** নতুন মন্ত্রিসভাগুলির প্রধান অংশটা সরবরাহ করে। তাদের পিছু পিছু আসে রাইন অঞ্চলের আইনবিদদের গোটা একটি দল। যে পরিমাণে সামন্তপ্রভুরা বুর্জোয়াদের পিছনের দিকে হঠিয়ে দিতে থাকে, সেই পরিমাণেই রাইনপ্রদেশ এবং সাইলেশিয়া খাস প্রুশীয় প্রদেশগুলির জন্যে মন্ত্রিসভায় স্থান ছেড়ে দেয়। কেবল এলবারফেল্ডের একজন টোরিই (৬৮) এখনও পর্যন্ত রাইনপ্রদেশের সঙ্গে ব্র্যান্ডেনবুর্গ মন্ত্রিসভার সংযোগ রেখেছে। **হান্‌জেমান** এবং **ফন্ ডের হেইট**! প্রুশীয় বুর্জোয়াদের কাছে ১৮৪৮-এর মার্চ এবং ডিসেম্বরের মধ্যে সমগ্র পার্থক্যের দ্যোতক এই দুটি নাম!

প্রুশীয় বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল কিন্তু **বিপ্লবের** মাধ্যমে, **ক্রাউনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ দর কষাকষির** যে পথ তারা চেয়েছিল সে পথে নয়। নিজেদের স্বার্থ নয়, তাদের **জনগণের স্বার্থ** রক্ষা করার কথা ক্রাউনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ **নিজেদেরই** বিরুদ্ধে, কারণ বুর্জোয়াদের পথ তৈরি করে দিয়েছিল একটি **গণ-আন্দোলন**। ক্রাউন অবশ্য এদের চোখে ছিল ঈশ্বরের কৃপায় একখানি যবনিকামাত্র যার অন্তরালে এদের নিজস্ব ঐহিক

স্বার্থ ঢাকা রাখার কথা। **এদের** নিজেদের স্বার্থের এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনীতিক রূপগুলির অলঙ্ঘনীয়তাকে সংবিধানের ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়: **ক্রাউনের অলঙ্ঘনীয়তা**। জার্মান বুর্জোয়াদের, বিশেষত প্রুশীয় বুর্জোয়াদের **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের** প্রতি এত সোল্লাস আসক্তি এইজন্যেই। তাই প্রুশীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তুলে দেবার জন্যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব এবং তার জার্মান প্রতিধ্বনিগুলোকে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা স্বাগত করলেও সেই বিপ্লব তাদের সমস্ত হিসাব ভণ্ডুল করে দেয়, কারণ তাদের শাসনকে এমন সব শর্তের দ্বারা তা কণ্টকিত করল যা তারা পূরণ করতে ছিল অনিচ্ছুক এবং অক্ষম।

বুর্জোয়ারা একটি হাতও তোলে নি। তারা জনগণকে তাদের হয়ে লড়াইটা চালাতে দিয়েছিল। কাজেকাজেই, তাদের হাতে যে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে এল তা কোন সেনাপতি কর্তৃক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে অর্জন করা শাসনক্ষমতা নয়; এটা হল বিজয়ী জনগণের নিজেদের স্বার্থরক্ষার একটা জন-নিরাপত্তা কমিটির হাতে ন্যস্ত শাসনক্ষমতা।

কাম্পহাউজেন তবু এই পরিস্থিতির জন্যে পরম অস্বস্তিবোধ করতেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত দুর্বলতার মূলে ছিল এই অস্বস্তিবোধ এবং যেখান থেকে এর উদ্ভব সেই পরিস্থিতি। তাঁর সরকারের সর্বাধিক নির্লজ্জ কাজগুলি যেন একটু লজ্জায় আরক্ত। আর নগ্ন **নির্লজ্জতা** এবং **ধৃষ্টতা** হল **হানজেমানের** বৈশিষ্ট্য। এই দুই চিত্রকরের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই রক্তিম আভাটুকু।

ইংরেজদের ১৬৪৮-এর বিপ্লব অথবা **ফরাসীদের** ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সঙ্গে **প্রুশীয় মার্চ বিপ্লবকে** কিছুতেই গুলিয়ে ফেলা চলে না।

১৬৪৮-এ বুর্জোয়ারা আধুনিক অভিজাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ত-অভিজাতদের বিরুদ্ধে এবং সরকারী-স্বীকৃত চার্চের বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এ বুর্জোয়ারা জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে এবং সরকারী-স্বীকৃত চার্চের বিরুদ্ধে।

১৭৮৯-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল (অন্তত ইউরোপে) একমাত্র ১৬৪৮-এর বিপ্লব, আর ১৬৪৮-এর বিপ্লবের প্রতিরূপ ছিল শুধু স্পেনের

বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীদের অভ্যুত্থান (৬৯)। শুধু সময়ের হিসাবেই নয়, বিষয়বস্তুতেও উভয় বিপ্লবই তাদের প্রতিরূপ থেকে ছিল শতবর্ষ এগিয়ে।

দুটি বিপ্লবেই বুর্জোয়ারা **সত্যই** ছিল আন্দোলনের আগুয়ান শ্রেণী। **প্রলেতারিয়েত** এবং **বার্গারদের যে অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না,** তাদের হয় তখন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের স্বার্থ থেকে পৃথক কোন স্বার্থ ছিল না, আর না হয় তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে তারা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশ হয়ে গড়ে ওঠে নি। সুতরাং যেখানে তারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, যেমন ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে, সেখানেও তারা বুর্জোয়াদের **ধরনে** না হলেও বুর্জোয়াদের স্বার্থ সাধনের জন্যেই লড়াই করেছিল। **সমগ্র ফরাসী সন্ত্রাসনীতিটা বুর্জোয়াদের শত্রুদের** সঙ্গে — স্বৈরতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, এবং কূপমন্ডূকতার সঙ্গে ফয়সালা করার **প্লিবিয়ান পদ্ধতি,** আর কিছু নয়।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব **ইংরেজদের** এবং **ফরাসীদের** বিপ্লব নয়। এই দুটি হল **ইউরোপীয়** ছকে বিপ্লব। **পুরন রাষ্ট্রব্যবস্থার** বিরুদ্ধে সমাজের কোন **নির্দিষ্ট** শ্রেণীর জয় নয় — এই বিপ্লব-দুটি হল **নতুন ইউরোপীয় সমাজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঘোষণা**। এই বিপ্লব-দুটিতে বুর্জোয়ারা বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু তখন **বুর্জোয়াদের বিজয়** ছিল একটি **নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়,** সামন্ত মালিকানার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মালিকানার বিজয়; প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে জাতিসত্তার, গিল্ড-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার, **সম্পত্তিতে** জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে সম্পত্তি-বিভাগের, মালিকের উপর জমির আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমির মালিকের, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের, পারিবারিক উপাধির বিরুদ্ধে পরিবারের, বীরোচিত আলস্যের বিরুদ্ধে শ্রমশীলতার, এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে আধুনিক নাগরিক আইনের বিজয়। ১৬৪৮-এর বিপ্লব ছিল ষোল শতাব্দীর বিরুদ্ধে সতর শতাব্দীর বিজয়, আর ১৭৮৯-এর বিপ্লব ছিল সতর শতাব্দীর বিরুদ্ধে আঠার শতাব্দীর বিজয়। এই বিপ্লব পৃথিবীর যে-অঞ্চলে ঘটেছিল সেই ইংলন্ড আর ফ্রান্সের প্রয়োজন প্রকাশ করার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছিল সেদিনের দুনিয়ার প্রয়োজনকে।

প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লবের মধ্যে এই ধরনের কিছুই ছিল না।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং মানসক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **বিলোপ সাধন করেছিল।** প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব হল মানসক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং বাস্তবক্ষেত্রে বুর্জোয়া শাসনের **প্রতিষ্ঠার** জন্যে। **ইউরোপীয় বিপ্লব** হওয়া দূরে থাকুক, এটা ছিল শুধু একটি পশ্চাৎপদ দেশে ইউরোপীয় বিপ্লবের ব্যাহত-বিকাশের পরিণাম ফল মাত্র। নিজ যুগকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে এটা হেঁচড়ে চলেছিল যুগের অর্ধশতকের বেশি পিছনে। গোড়া থেকেই এটা ছিল **গৌণ**; কিন্তু একথা সুবিদিত যে, মুখ্য রোগের চেয়ে গৌণ রোগগুলি নিরাময় করা বেশি কঠিন এবং সেই সঙ্গে সেগুলো দেহের ক্ষয় ঘটায় মুখ্য রোগের চেয়ে বেশি পরিমাণে। প্রশ্নটা এখানে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার নয়, এটা হল প্যারিসে যা লোপ পেয়েছিল বার্লিনে সেই সমাজের পুনর্জন্মের প্রশ্ন। প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব এমনকি **জাতীয়, জার্মানও** নয়; শুরু থেকেই এটা ছিল **প্রুশীয়-প্রাদেশিক।** ভিয়েনা, কাসেল, মিউনিক এবং অপরাপর নানা ধরনের প্রাদেশিক অভ্যুত্থান এটার পাশাপাশি চলেছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এটার নেতৃত্বের।

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর মধ্যে ছিল উচ্চতম সৃষ্টির অপার গর্ববোধ; একটি কালাসংগতি হওয়াই ছিল ১৮৪৮ সালের বার্লিনের উচ্চাশা। তার আলো ছিল সেইসব তারার আলোর মতো, যেগুলির আলো পৃথিবীবাসী আমাদের কাছে পৌঁছয় কেবল বিকীরণকারী জ্যোতিষ্কের বিলুপ্তির শত-সহস্র বর্ষ পরে। প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লব যেমন সমস্ত ব্যাপারেই ক্ষুদ্র তেমনি এই ব্যাপরেও ছিল ইউরোপের কাছে ঠিক এই ধরনের একটা খুদে তারা। এর আলো হল এমন একটি সমাজের মৃতদেহের আলো যা দীর্ঘকাল আগে পচে গলে গেছে।

এত এলোমেলো অবস্থা, ভীরুতা এবং ধীরগতির মধ্য দিয়ে জার্মান বুর্জোয়ারা বিকাশ লাভ করেছিল যে, যখন এরা একটা মহা বিপদ হিসেবে সম্মুখীন হল সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের, তখনই দেখা গেল একটা মহা বিপদ হিসেবে এদেরই সম্মুখীন হচ্ছে প্রলেতারিয়েত এবং বার্গারদের সেইসব অংশ যেগুলির স্বার্থ আর ভাব-ধারণা প্রলেতারিয়েতের কাছাকাছি। এরা

দেখল, শত্রুব্যূহ হিসেবে সজ্জিত রয়েছে **পশ্চাদভাগে** একটি শ্রেণী শুধু নয়, **সম্মুখভাগে** সমগ্র ইউরোপ। ১৭৮৯-এর ফরাসী বুর্জোয়াদের মতো পুরন সমাজের প্রতিনিধি রাজতন্ত্র এবং অভিজাতবর্গের বিপরীতে গোটা আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার শ্রেণী প্রুশীয় বুর্জোয়ারা নয়। এরা একটা **সামাজিক সম্প্রদায়** (social estate) গোছের একটা স্তরে নেমে গিয়েছিল, যারা সমানই স্পষ্টভাবে ক্রাউনের এবং জনসাধারণেরও বিরোধী, উভয় পক্ষেরই বিরোধিতা করতে আগ্রহশীল, অথচ পৃথক পৃথক করে ধরলে প্রত্যেকটি বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধেই অব্যবস্থিতচিত্ত, কারণ সর্বদাই এরা উভয়কে দেখতে হয় সম্মুখে, না হয় পশ্চাতে; একেবারে প্রথম থেকেই এরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুরন সমাজের মুকুটধারী প্রতিনিধির সঙ্গে আপস করতে উদ্‌গ্রীব, কারণ এরা নিজেরাই হল পুরন সমাজের অংশ; পুরন সমাজের বিরুদ্ধে একটা নতুন সমাজের নয়, এরা হল জরাগ্রস্ত সমাজের মধ্যেই পুনর্নবীভূত স্বার্থের প্রতিনিধি; বিপ্লবের কর্ণধার হিসেবে এরা দন্ডায়মান, সেটা জনগণ এদের পিছনে সমবেত হয়েছিল বলে নয় — খোঁচা দিয়ে জনগণ এদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বলে; এরা আগুয়ান ছিল একটা নতুন সমাজ-যুগের উদ্যোগের প্রতিনিধি রূপে নয়, পুরন সামাজিক যুগের বদ্ধমূল বিদ্বেষেরই প্রতিনিধি রূপে; এরা হল পুরন রাষ্ট্রের একটি স্তর যা নিজে থেকে উত্থিত হয় নি, একটা ভূকম্পনের ফলে নতুন রাষ্ট্রের উপরিভাগে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; এরা নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের প্রতি আস্থাহীন; ঊর্ধ্বতনদের প্রতি অসন্তুষ্ট, অধস্তনদের সম্মুখে কম্পমান, উভয় পক্ষের প্রতিই স্বার্থপর এবং স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন, রক্ষণশীলদের কাছে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের কাছে রক্ষণশীল, নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, আদর্শের বদলে বাগাড়ম্বরপ্রিয়, বিশ্ব-ঝঞ্ঝায় আতঙ্কিত অথচ বিশ্ব-ঝঞ্ঝাকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর; কোন ব্যাপারেই উদ্যোগ নেই এবং প্রতি ব্যাপারেই কুম্ভীলক, মৌলিকতার অভাবে মামুলি, আবার মামুলিপনার ক্ষেত্রে মৌলিক; নিজেদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দরকষাকষিতে মত্ত, উদ্যোগহীন, নিজেদের উপর আস্থাহীন, জনগণের উপর আস্থাহীন এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকাহীন; একটি বলিষ্ঠ জাতির প্রথম যৌবনের প্রেরণাকে স্বীয় স্থবির স্বার্থে চালিত এবং বিচ্যুত করার অবধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত এক জঘন্য বৃদ্ধ —

চক্ষুহীন, কর্ণহীন, দন্তহীন, **সর্বইন্দ্রিয়হীন** — এমনই ছিল **প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী,** যারা মার্চ বিপ্লবের পরে প্রুশীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার পদে পড়ে গেল।

১৮৪৮-এর ১১ ডিসেম্বর মার্কসের লেখা

১৮৪৮-এর ১৫ ডিসেম্বর 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার ১৬৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের মূলপাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

পত্রাবলী

প্যারিসে প. ভ. আন্নেন্‌কভ সমীপে মার্কস

ব্রাসেল্‌স্‌, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৪৬

প্রিয় শ্রীযুক্ত আন্নেন্‌কভ,

মাত্র গত সপ্তাহে আমার পুস্তকবিক্রেতা 'দারিদ্র্যের দর্শন' নামক প্রুধোঁর বইখানি আমায় পাঠিয়েছেন, নচেৎ আপনার ১ নভেম্বর তারিখের পত্রের উত্তর আপনি বহুপূর্বেই পেতেন। যাতে সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে আমার অভিমত জানাতে পারি তজ্জন্য দু-দিনে বইখানি শেষ করেছি। খুব তাড়াতাড়ি পড়ায় বিশদ আলোচনা করতে পারব না, বইখানি পড়ে সাধারণভাবে আমার যা মনে হল, শুধু সেইটুকুই আপনাকে জানাতে পারি। যদি চান তাহলে দ্বিতীয় পত্রে বিশদ আলোচনা করা যায়।

আমি খোলাখুলিই আপনার কাছে স্বীকার করছি, বইখানি আমার কাছে মোটের উপর খারাপ লেগেছে, খুবই খারাপ লেগেছে। এই গড়নহীন এবং হামবড়া পুস্তকখানিতে 'জার্মান দর্শনের ছাপ' নিয়ে শ্রী প্রুধোঁ যে জাঁক করেছেন, তাতে তো আপনি নিজেই আপনার চিঠিতে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আপনি ভেবেছেন আর্থনীতিক বিচার দার্শনিক বিষে দুষ্ট হয় নি। আর্থনীতিক বিচারের ভুলভ্রান্তির জন্যে শ্রী প্রুধোঁর দর্শনকে আমিও মোটেই দায়ী করছি না। একটা আজগুবি দর্শন হাতে আছে বলেই শ্রী প্রুধোঁ অর্থশাস্ত্রের একটা ভ্রান্ত সমালোচনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন তা নয়, তিনি আমাদের এক আজগুবি দার্শনিক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন, কারণ শ্রী প্রুধোঁ বর্তমান কালের সামাজিক পরিস্থিতিকে সেটার শৃঙ্খলাবদ্ধতার মাঝে (engrènement) বুঝতে পারেন নি; কথাটি তিনি অন্য অনেক কিছুর মতোই ফুরিয়ের কাছ থেকে ধার করেছেন।

শ্রী প্রুধোঁ ঈশ্বরের কথা বলেছেন কেন, বিশ্বজনীন বোধির কথা বলেছেন কেন, কেন তিনি বলেছেন সর্বমানবের নৈর্ব্যক্তিক বোধির কথা, যা চির-অভ্রান্ত

এবং সর্বযুগে নিজের উপযুক্ত প্রতিপন্ন হয়েছে, যার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারলেই সত্য হস্তগত হয়? নিজেকে একজন দুঃসাহসী চিন্তাবীর বলে জাহির করার জন্যে কেনই বা তিনি ক্ষীণ হেগেলপন্থার শরণ নিয়েছেন?

এ ধাঁধার চাবিকাঠি তিনি নিজেই দিয়েছেন। শ্রী প্রুধোঁর চোখে ইতিহাস হল একসারি সামাজিক বিকাশ; ইতিহাসে প্রগতি রূপায়িত হতে তিনি দেখেছেন; শেষে তিনি দেখতে পেয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে মানুষ জানত না তারা কী করছে এবং নিজেদের গতি সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল, অর্থাৎ তাদের সামাজিক বিকাশকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ থেকে বিশিষ্ট, আলাদা এবং স্বাধীন। তিনি এই তথ্যগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তাই স্বয়ংপ্রকটমান বিশ্বজনীন বোধি সংক্রান্ত প্রকল্পটি তাঁর কাছে খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। অতীন্দ্রিয় হেতু, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বুলি উদ্ভাবন করার চেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ যখন স্বীকার করেন যে, মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের কিছুই তিনি বোঝেন না — বিশ্বজনীন বোধি, ঈশ্বর, ইত্যাদি গালভরা কথা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তাঁর এই স্বীকৃতি প্রকাশ পায় — তখন কি তিনি পরোক্ষে এবং নিশ্চিতভাবে এই কথাই স্বীকার করেন না যে, **আর্থনীতিক বিকাশ** বুঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই?

সমাজের রূপ যাই হোক না কেন, সমাজ কী? মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। খুশিমতো অমুক কিংবা তমুক রূপের সমাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা কি মানুষের আছে? কোনমতেই না। মানুষের উৎপাদন-দক্ষতা বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে এসে যাবে সংসর্গ (commerce) আর পরিভোগের একটি বিশেষ রূপ। উৎপাদন, সংসর্গ এবং পরিভোগের বিকাশের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের কথা ধরলে এসে যাবে তদনুযায়ী সামাজিক গঠন, তদনুযায়ী পারিবারিক, বর্গীয় বা শ্রেণী সংগঠন, এককথায় তদনুযায়ী একটি নাগরিক সমাজ। একটি বিশেষ নাগরিক সমাজ ধরে নিলেই এসে যাবে একটি বিশেষ রাজনীতিক পরিবেশ, যা নাগরিক সমাজের যথাবৎ অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যাপারটা শ্রী প্রুধোঁ কখনও বুঝবেন না, কারণ তাঁর ধারণা রাষ্ট্র থেকে নাগরিক সমাজের কাছে, অর্থাৎ

সারসংক্ষেপ সমাজ থেকে যথাবৎ সমাজটার কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি মস্ত একটা কিছু করছেন।

বলা বাহুল্য, মানুষের সমগ্র ইতিহাসের যা ভিত্তি সেই **নিজেদের উৎপাদন-শক্তিসমূহ** তারা ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারে না, কারণ উৎপাদন-শক্তি মাত্রই অর্জিত শক্তি, পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের ফল। অতএব উৎপাদন-শক্তিসমূহ হল মানুষের ব্যবহারিক কর্মশক্তির ফল; কিন্তু এই কর্মশক্তি নিজেই নির্দিষ্ট-রূপায়িত থাকে লোকে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত সেটা দিয়ে, ইতোমধ্যে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহ দিয়ে, তাদের আগেই বিদ্যমান সমাজ-রূপ দিয়ে, যেটাকে তারা সৃষ্টি করে না, যেটা পূর্ববর্তী পুরুষের উৎপাদিত ফল। প্রত্যেকটি পরবর্তী পুরুষ পূর্ববর্তী পুরুষের অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অধিকারী হয় এবং তাদের জন্যে সেগুলি নতুন উৎপাদনের কাঁচামালের কাজ করে, এই সহজ ব্যাপারটার জন্যে মানবেতিহাসে একটি সুসংগতির সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে মানবজাতির এক ইতিহাস, আর মানুষের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং কাজেই মানুষের সামাজিক সম্পর্কতন্ত্র আরও উন্নত হয়ে উঠেছে বলে এই ইতিহাস আরও বেশি করে মানবজাতির ইতিহাস। কাজেকাজেই আসে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত: মানুষের সামাজিক ইতিহাস কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের ইতিহাস ছাড়া কিছুই নয়, সে সম্পর্কে তারা সচেতন থাক বা না থাক। তাদের বৈষয়িক সম্পর্কগুলিই তাদের সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি। এই বৈষয়িক সম্পর্কগুলি হল তাদের বৈষয়িক এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ বাস্তবে রূপায়ণের প্রয়োজনীয় আধার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রী প্রুধোঁ ভাব এবং জিনিসের তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। মানুষ যা অর্জন করে তা কখনও হাতছাড়া করে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা কখনও সেই সমাজ-রূপটি পরিহার করে না যাতে তারা কোন কোন উৎপাদন-শক্তি অর্জন করেছে। বরং উল্টো, লব্ধ ফল থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে হয় এবং সভ্যতার ফলগুলি যাতে হারাতে না হয় সেজন্যে, যখন তাদের সংসর্গের প্রণালী আর অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না, তখন থেকেই তারা তাদের সমস্ত চিরাচরিত সমাজরূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এখানে আমি 'commerce' শব্দটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করছি,

জার্মান ভাষায় 'Verkehr' শব্দটিকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি। যেমন, বিশেষ অধিকার, গিল্ড আর কর্পোরেশন প্রথা এবং মধ্যযুগীয় নিয়ামন বিধিব্যবস্থা, একমাত্র এইসব সামাজিক সম্পর্কই অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অনুযায়ী ছিল, আর অনুযায়ী ছিল সেই সামাজিক অবস্থার যা ইতোপূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং যা থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হয়েছিল। কর্পোরেশন এবং নিয়ামনের বিধিবিধানের আশ্রয়ে পুঁজি জমে ওঠে, সামুদ্রিক বাণিজ্য বিকাশলাভ করে, উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু এর ফল থেকে মানুষ বঞ্চিত হত, যদি যে সমাজ-রূপের আশ্রয়ে এইসব ফল পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল সেগুলিকে তারা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। তার থেকে দুবার বজ্রপাত হয় -- ১৬৪০ সালের এবং ১৬৮৮ সালের বিপ্লব। সমস্ত পুরন আর্থনীতিক ধরন, সেগুলোর অনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক, পুরন নাগরিক সমাজের যথাবৎ অভিব্যক্তিস্বরূপ রাজনীতিক পরিবেশ ইংলন্ডে ধ্বংস হয়ে গেল। এইভাবে, যেসব আর্থনীতিক ধরনে মানুষ উৎপাদন, পরিভোগ এবং বিনিময় করে সেগুলি **অস্থায়ী এবং ইতিহাসক্রমিক**। নতুন উৎপাদন-দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তিত করে, আর উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করে সমস্ত আর্থনীতিক সম্পর্ককেই, সেগুলি ছিল কেবল এই বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতিরই পক্ষে অপরিহার্য সম্পর্ক।

এই কথাটিই শ্রী প্রুধোঁ বুঝতে পারেন নি, দেখাতে তো পারেনই নি। ইতিহাসের প্রকৃত গতি বুঝতে অক্ষম শ্রী প্রুধোঁ এক আজগুবি ছায়াবাজি সৃষ্টি করেছেন, যেটাকে দ্বন্দ্বমূলক বলে তিনি প্রগল্‌ভ আখ্যা দিতে চেয়েছেন। তিনি সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেন নি, কারণ তাঁর ইতিহাস চলেছে স্থানকালের বহু ঊর্ধ্বে, কল্পনার কুয়াশা-রাজ্যে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে পুরন হেগেলীয় মন্ড, এতো ঐহিক ইতিহাস অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে পবিত্র ইতিহাস — ভাবসমূহের ইতিহাস। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ হচ্ছে হাতিয়ার মাত্র, যেটাকে ভাব অথবা শাশ্বত বোধি ব্যবহার করে আত্মপ্রকাশের জন্যে। শ্রী প্রুধোঁ যে **বিবর্তনগুলির** কথা বলছেন সেগুলি যেন পরম ভাবসত্তার অতীন্দ্রিয় গর্ভেই

নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই রহস্যাচ্ছন্ন ভাষার আবরণ খসিয়ে ফেললে দেখতে পাবেন শ্রী প্রুধোঁ আপনার সম্মুখে এমন একটি শৃঙ্খলা উপস্থিত করছেন যেখানে আর্থনীতিক বর্গগুলি তাঁর নিজের মাথার মধ্যেই বিন্যস্ত হয়ে যায়। এটা যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল মনের শৃঙ্খলা, তা আপনার কাছে প্রমাণ করা আমার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

শ্রী প্রুধোঁ তাঁর বই শুরু করেছেন **মূল্য সম্পর্কে** তত্ত্বালোচনা দিয়ে। এটি তাঁর প্রিয় বিষয়। আজ আমি এই তত্ত্বালোচনা পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছি না।

শাশ্বত বোধির আর্থনীতিক বিবর্তনমালার সূচনা হয়েছে **শ্রমবিভাগ** দিয়ে। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগটি একেবারেই সহজ-সরল ব্যাপার। কিন্তু জাতিভেদ ব্যবস্থাও কি একটি বিশেষ শ্রমবিভাগ ছিল না? কর্পোরেশন ব্যবস্থাও কি ছিল না আরেকটি শ্রমবিভাগ? আর ইংলন্ডে ম্যানুফ্যাকচার ব্যবস্থার আমলের যে শ্রমবিভাগ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শেষ হয় সেটাও কি বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পের শ্রমবিভাগ থেকে একেবারে পৃথক নয়?

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ সত্য থেকে এতটা তফাতে রয়েছেন যে, মামুলী অর্থনীতিবিদেরাও যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাকেও তিনি উপেক্ষা করে চলেন। যখন তিনি শ্রমবিভাগের কথা বলেন, তখন তিনি **বিশ্ব-বাজারের** কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন না। বেশ। তাহলে, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে যখন কোন উপনিবেশ ছিল না, যখনও অবধি ইউরোপের কাছে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না এবং তার কাছে পূর্ব এশিয়ার অস্তিত্ব ছিল কনস্টান্‌টিনোপ্‌ল্‌-রূপে মাধ্যমের মারফত, তখনকার দিনের শ্রমবিভাগ কি মূলগতভাবে পৃথক ছিল না সপ্তদশ শতকের শ্রমবিভাগ থেকে, যখন উপনিবেশ বেশ ভালভাবেই স্থাপিত হয়ে গিয়েছে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জাতিগুলির সমগ্র অভ্যন্তরীণ সংগঠন, জাতিগুলির সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি একটা নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু? এবং শ্রমবিভাগের পরিবর্তন হলে এগুলির কি পরিবর্তন হবে না?

শ্রমবিভাগের সমস্যাটিকে শ্রী প্রুধোঁ এত কম বুঝেছেন যে, শহর

আর গ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি, যে বিচ্ছেদ দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মানিতে ঘটেছিল নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এইভাবে, এর উদ্ভব বা বিকাশ কিছুই শ্রী প্রুধোঁ জানেন না বলে তাঁর কাছে এই বিচ্ছেদ একটা শাশ্বত নিয়ম। বইয়ের আগাগোড়া তিনি এমনভাবে লিখেছেন যেন একটি বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতির এই সৃষ্টিটি অনন্তকাল টিকে থাকবে। শ্রমবিভাগ সম্পর্কে শ্রী প্রুধোঁ যা-কিছু বলেছেন তা তাঁর আগে অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ হাজারো ব্যক্তি যা বলেছেন তারই সারাংশ মাত্র এবং সেটা আবার অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় বিবর্তন হল **যন্ত্র**। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ রহস্যময়। প্রত্যেক রকমের শ্রমবিভাগের ছিল তার বিশিষ্ট উৎপাদনের সাধিত্র। যেমন, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লোকে সবকিছুই হাতে তৈরি করত না। তাদের সাধিত্র ছিল এবং তাঁত, জাহাজ, লেভার (levers) প্রভৃতির মতো অত্যন্ত জটিল সাধিত্র ছিল।

তাই, সাধারণভাবে শ্রমবিভাগ থেকে যন্ত্রপাতি এসেছে একথা বলার চেয়ে আজগুবি আর কিছু হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে আরও বলে রাখি, যন্ত্রপাতির ইতিহাসক্রমিক উদ্ভব শ্রী প্রুধোঁ যৎসামান্যই বুঝেছেন, যন্ত্রপাতির বিকাশটাকে তিনি আরও কম বুঝেছেন। বলা চলে, ১৮২৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব সংকটের পর্ব পর্যন্ত পরিভোগের চাহিদা সাধারণভাবে উৎপাদনের চেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়েছিল, আর যন্ত্রপাতির বিকাশটা ছিল বাজারের প্রয়োজনের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল। ১৮২৫ সাল থেকে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ হল স্রেফ মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে লড়াইয়ের ফল। তবে একথা শুধু ইংলন্ডের বেলাতেই প্রযোজ্য। ইউরোপীয় জাতিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, নিজেদের দেশীয় বাজারগুলি এবং বিশ্ব-বাজার উভয়ত ইংরেজদের প্রতিযোগিতার তাড়নায় তারা যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বশেষে, উত্তর আমেরিকায় যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়েছিল অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, আর মজুরের অভাব, উভয় কারণে, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা এবং তার শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে বৈষম্যের কারণে। এইসব

তথ্য থেকে বুঝতে পারেন, শ্রী প্রুধোঁ যখন যন্ত্রপাতির বিপরীত হিসেবে তৃতীয় বিবর্তন রূপে প্রতিযোগিতার জুজু সৃষ্টি করেন, তখন কী বিজ্ঞতারই না তিনি পরিচয় দেন!

সর্বশেষে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, **যন্ত্রপাতিকে** শ্রমবিভাগ, প্রতিযোগিতা, ক্রেডিট, প্রভৃতির পাশাপাশি একটি আর্থনীতিক বর্গ করে তোলা একেবারেই আজগুবি ব্যাপার।

যন্ত্রপাতি যদি আর্থনীতিক বর্গ হয় তবে হালটানা বলদও তাই। বর্তমান কালে যন্ত্রপাতির **প্রয়োগ** আমাদের বর্তমান আর্থনীতিক ব্যবস্থার অন্যতম সম্পর্কপাত, কিন্তু যে-পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয় সেটা খাস যন্ত্রপাতি থেকে একেবারেই পৃথক। মানুষকে জখম করার জন্যেই ব্যবহৃত হোক, কিংবা মানুষের ক্ষত সারাবার জন্যেই ব্যবহৃত হোক, বারুদ বারুদই থাকে।

শ্রী প্রুধোঁ যখন প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, কর বা পুলিস, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, ক্রেডিট এবং মালিকানাকে নিজের মাথার মধ্যে ঠিক এই পরম্পরাতেই সৃষ্টি হতে দেন তখন কেরামতিতে তিনি নিজেকেই ছাড়িয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগেই ইংলন্ডে প্রায় সমস্ত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছিল। পাবলিক ক্রেডিট ছিল কেবল করবৃদ্ধির এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতালাভ থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর একটা নতুন উপায়।

সর্বশেষে, শ্রী প্রুধোঁর শৃঙ্খলার শেষ বর্গ (category) হচ্ছে **মালিকানা**। বাস্তব দুনিয়ায় কিন্তু শ্রমবিভাগ এবং শ্রী প্রুধোঁর অন্যান্য সমস্ত বর্গই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, যেগুলি সামগ্রিকভাবে আজ **মালিকানা** নামে পরিচিত। এই সম্পর্কগুলির বাইরে বুর্জোয়া মালিকানা একটা আধিবিদ্যক অথবা আইনী ভেলকি ছাড়া কিছুই নয়। ভিন্ন যুগের মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক সম্পর্কতন্ত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে। মালিকানাকে স্বাধীন সম্পর্ক-রূপে দেখাতে গিয়ে শ্রী প্রুধোঁ শুধু যে একটা পদ্ধতিগত ভুল করেছেন তা নয়, তিনি স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, **বুর্জোয়া** উৎপাদনের সমস্ত রূপকে একত্রে বিধৃত করে রাখে যে বন্ধন সেটাকে তিনি ধরতে পারেন নি, আর কোন বিশেষ যুগের উৎপাদনের ধরনগুলির

ইতিহাসক্রমিক এবং **অস্থায়ী** প্রকৃতিও তিনি বুঝতে পারেন নি। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ ইতিহাসক্রমিক উৎপাদ বলে মনে করেন না, তিনি সেগুলির উদ্ভব আর বিকাশ কোনটাই বোঝেন না, তাই সেগুলি সম্পর্কে তিনি শুধু অন্ধ গোঁড়ামিদুষ্ট সমালোচনাই করতে পারেন।

সেইজন্যেই শ্রী প্রুধোঁ বিকাশধারার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **অলীকতার** আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি ভাবেন শ্রমবিভাগ, ক্রেডিট, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি সবকিছুই উদ্ভাবিত হয়েছিল তাঁর বদ্ধ ধারণা, সমতার ধারণার খিদমত করার জন্যে। অপূর্ব অতি-সরল তাঁর ব্যাখ্যা। সমতার স্বার্থেই এইসব জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গেল সমতার বিরুদ্ধে। এই হল তাঁর সমগ্র যুক্তি। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি একটা ভিত্তিহীন অনুমান করলেন এবং পরে প্রকৃত ঘটনাবলি যখন প্রতিপদে তাঁর এই অলীকতাকে খন্ডন করে তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন দ্বন্দ্ব-অসংগতি রয়েছে। সে বিরোধ যে শুধুই তাঁর বদ্ধ ধারণা আর বাস্তব গতির মধ্যে, সে কথা তিনি চেপে গিয়েছেন।

অতএব, প্রধানত ইতিহাসের জ্ঞানের অভাবের জন্যেই শ্রী প্রুধোঁ দেখতে পান নি যে, মানুষের উৎপাদন-দক্ষতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তারা জীবনধারণ করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে তাদের কতকগুলি সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, আর উৎপাদন-দক্ষতার পরিবর্তন আর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই সম্পর্কগুলির প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, **অর্থনীতিক বর্গগুলি** হল এইসব বাস্তব সম্পর্কের **বিমূর্ত প্রকাশ** মাত্র, আর এইসব সম্পর্ক বর্তমান থাকার অবস্থাতেই সেগুলি যথার্থ। তাই, যাঁরা এইসব আর্থনীতিক বর্গকে ঐতিহাসিক নিয়ম নয়, চিরন্তন বলে ধরে নেন সেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভুলই তিনি করে বসেছেন, ঐতিহাসিক নিয়মগুলি কেবল একটি বিশেষ ইতিহাসক্রমিক বিকাশের ক্ষেত্রে, উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরের ক্ষেত্রেই নিয়ম। অতএব অর্থশাস্ত্রীয় বর্গগুলিকে প্রকৃত, অস্থায়ী, ইতিহাসক্রমিক সামাজিক সম্পর্কসমূহের বিমূর্ত প্রকাশ বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে শ্রী প্রুধোঁ তাঁর রহস্যবাদী উল্টা-দৃষ্টির বলে প্রকৃত সম্পর্কগুলির মধ্যে এই বিমূর্তনগুলিরই রূপায়ণ দেখেছেন। এই বিমূর্তনগুলিও আবার জগতের আদিকাল হতে পিতা ঈশ্বরের বুকের মধ্যে সূত্রাকারে সুপ্ত ছিল।

এখানে কিন্তু বেচারা শ্রী প্রুধোঁ এক গুরুতর চিন্তা-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। যদি এই সমস্ত আর্থনীতিক বর্গই ঈশ্বরের বক্ষোকন্দর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, এগুলিই যদি মানুষের প্রচ্ছন্ন এবং শাশ্বত জীবন হয়, তবে প্রথমত, কেমন করে বিকাশ বলে জিনিসটি সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত, কেমন করেই বা শ্রী প্রুধোঁকে রক্ষণশীল না বলে পারা যায়? এই সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলির ব্যাখ্যা তিনি করেছেন একটা পুরো বিরোধতন্ত্রের সাহায্যে।

এই বিরোধতন্ত্রটাকে ভালভাবে দেখাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

একচেটিয়া ভাল জিনিস, কারণ এটি একটি আর্থনীতিক বর্গ, অতএব ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত। প্রতিযোগিতা ভাল জিনিস, কারণ এটাও একটি আর্থনীতিক বর্গ। কিন্তু, যা ভাল নয় তা হচ্ছে একচেটিয়ার বাস্তবতাটা এবং প্রতিযোগিতার বাস্তবতাটা। যা আরও খারাপ তা হচ্ছে এই যে, প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়া পরস্পরকে গ্রাস করে। কী করা যাবে? যেহেতু ঈশ্বরের এই দুটি শাশ্বত ভাব পরস্পরের বিরুদ্ধ, তাই শ্রী প্রুধোঁর কাছে এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের বুকের মধ্যে এ দুয়ের সংশ্লেষণও আছে, তাতে একচেটিয়ার কুফল প্রতিযোগিতার দ্বারা আর প্রতিযোগিতার কুফল একচেটিয়ার দ্বারা অপসৃত হয়ে সমতা রক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ভাবের সংগ্রামের ফলে সে-দুটোর কেবল ভাল দিকটাই আত্মপ্রকাশ করবে। এই গোপন ভাবটি ঈশ্বর থেকে নিষ্কাশন করে এনে প্রয়োগ করলেই সবকিছুই পরম কল্যাণকর হয়ে উঠবে; মানুষের নৈর্ব্যক্তিক বোধির অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়ে আছে যে সমন্বয়ী সূত্র সেটা উদ্‌ঘাটিত হবে। এই উদ্‌ঘাটক রূপে এগিয়ে আসতে শ্রী প্রুধোঁ এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বর্তমান কালের আর্থনীতিক জীবনে দেখবেন প্রতিযোগিতা আর একচেটিয়াই শুধু নয়, দেখবেন দুইয়ের সংশ্লেষণও, এবং সেটা সূত্র নয়, একটা গতি। একচেটিয়া পয়দা করে প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা পয়দা করে একচেটিয়া। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যা মনে করেন সেভাবে এই সমীকরণ বর্তমান পরিস্থিতির অসুবিধা দূর করা দূরে থাকুক, আরও কঠিন এবং তালগোল পাকান পরিস্থিতিই সৃষ্টি করে। অতএব, বর্তমান কালের আর্থনীতিক

সম্পর্কসমূহ যে-ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে যদি পালটে দেওয়া হয়, যদি বর্তমান উৎপাদন-**পদ্ধতিকে** ধ্বংস করা হয়, তাহলে ধ্বংস হবে প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া এবং দুইয়ের পারস্পরিক বিরোধিতাই শুধু নয়, আরও ধ্বংস হবে দুইয়ের ঐক্য, দুইয়ের সংশ্লেষণ, প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়ার মধ্যে যা সত্যকার ভারসাম্য সেই গতি।

এবার আমি আপনাকে শ্রী প্রুধোঁর দ্বান্দ্বিকতার একটি দৃষ্টান্ত দেব।

স্বাধীনতা আর দাসত্ব নিয়ে একটি বিরোধ। স্বাধীনতার ভাল আর মন্দ দিকগুলি সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই, দাসত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়েও সেটার খারাপ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধু এর ভাল দিকটাই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা এখানে পরোক্ষ দাসত্ব নিয়ে, প্রলেতারিয়েতের দাসত্ব নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি প্রত্যক্ষ দাসত্ব নিয়ে, আলোচনা করছি সুরিনামে, ব্রেজিলে, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিতে কৃষ্ণজাতিগুলির দাসত্ব নিয়ে।

যন্ত্রপাতি, ক্রেডিট, ইত্যাদির মতোই প্রত্যক্ষ দাসত্বও আমাদের বর্তমান শিল্পব্যবস্থার একটি খুঁটি। দাসত্ব ছাড়া তুলো অসম্ভব এবং তুলো ছাড়া বর্তমান শিল্প অসম্ভব। দাসত্ব উপনিবেশগুলিকে মূল্যবান করেছে, উপনিবেশগুলি বিশ্ববাণিজ্য সৃষ্টি করেছে, আবার বিশ্ববাণিজ্য হল বৃহদায়তন শিল্পের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। নিগ্রোদের নিয়ে দাস ব্যবসায় শুরু হবার আগে উপনিবেশগুলি পুরন দুনিয়াকে জাতদ্রব্য যোগাত খুব অল্প কয়েকটা মাত্র, পৃথিবীতে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। অতএব, দাসত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক বর্গ। দাসত্ব ব্যতীত সবচেয়ে উন্নয়নশীল দেশ উত্তর আমেরিকা একটি গোষ্ঠীপতিশাসিত দেশে পরিণত হত। জাতিসমূহের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দিলেই দেখা দেবে শুধু নৈরাজ্য, আর বাণিজ্য এবং আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ অবক্ষয়। কিন্তু দাসত্ব বিলুপ্ত হতে দেওয়ার অর্থ জাতিসমূহের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দেওয়া। সেইজন্যেই, আর্থনীতিক বর্গ বলেই দুনিয়ার আদি থেকেই প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দাসত্ব দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক জাতিগুলি শুধু কীভাবে নিজেদের দেশে দেশে দাসত্ব ঢেকে রাখতে হয় সেইটে শিখেছে, আর নতুন দুনিয়ায় সেটা রপ্তানি করেছে খোলাখুলি। দাসত্ব

সম্পর্কে এইসব কথার পর আমাদের গুণধর শ্রী প্রুধোঁ আর কীভাবে এগোবেন? তিনি স্বাধীনতা আর দাসত্বের মধ্যে একটা সংশ্লেষণের সন্ধান করবেন, সন্ধান করবেন স্বাধীনতা আর দাসত্বের মধ্যে একটা সুবর্ণ মধ্যপন্থা অথবা ভারসাম্য।

শ্রী প্রুধোঁ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষই কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্র, রেশম, প্রভৃতি তৈরি করে, এবং এইটুকু বুঝতে পারাও তাঁর পক্ষে মহাকৃতি বই কি! কিন্তু যা তিনি বুঝতে পারেন নি তা হচ্ছে এই যে, এইসব মানুষ তাদের সাধ্য অনুসারে পয়দা করে সেইসব **সামাজিক সম্পর্কও** যে-অবস্থায় তারা কাপড় আর ক্ষৌম বস্ত্র তৈরি করে। এর চেয়ে আরও কম যেটা তিনি বুঝেছেন তা হচ্ছে এই যে, যেসব মানুষ নিজেদের বৈষয়িক উৎপাদনশীলতা অনুসারে নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে, তারা আরও পয়দা করে বিভিন্ন **ভাব, বর্গ,** অর্থাৎ এই সামাজিক সম্পর্কগুলিরই বিমূর্ত, ভাবগত অভিব্যক্তি। কাজেই, বিভিন্ন বর্গ সেগুলির দ্বারা প্রকাশিত সম্পর্কগুলির চেয়ে বেশি শাশ্বত নয়। এগুলি ইতিহাসক্রমিক এবং অস্থায়ী সৃষ্টি। কিন্তু শ্রী প্রুধোঁর বিবেচনা বিপরীত: বিমূর্তন, বর্গ — এগুলি আদ্য হেতু। তাঁর মতে, মানুষেরা নয়, এগুলিই ইতিহাস সৃষ্টি করে। **বিমূর্তন, তদবস্থ বর্গ,** অর্থাৎ মানুষ এবং তাদের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরা বর্গ নিশ্চয়ই অমর, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল; তা হচ্ছে বিশুদ্ধ বোধির একটামাত্র রূপ; কথাটা দাঁড়ায় এই যে, বিমূর্তনটা বিমূর্তন হিসেবে বিমূর্ত। চমৎকার **জ্ঞাতজ্ঞাপন!**

এইভাবে, শ্রী প্রুধোঁর কাছে বর্গ হিসেবে বিবেচিত আর্থনীতিক সম্পর্কগুলি শাশ্বত সূত্র, যেগুলোর উদ্ভবও নেই, অগ্রগতিও নেই।

ব্যাপারটা অন্যভাবে বলা যাক: শ্রী প্রুধোঁ সরাসরি বলছেন না যে, তাঁর কাছে **বুর্জোয়া জীবন একটি শাশ্বত সত্য;** সে কথা তিনি বলছেন পরোক্ষে, যখন তিনি বর্গগুলিকে দেবত্ব দান করছেন, যেগুলি হচ্ছে চিন্তা-রূপে অভিব্যক্ত বুর্জোয়া সম্পর্ক। বুর্জোয়া সমাজের উৎপন্নগুলি তাঁর মনের কাছে বর্গ-রূপে, চিন্তা-রূপে প্রতিভাত হওয়া মাত্র সেগুলিকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত স্বকীয় জীবনসম্পন্ন চিরন্তন সত্তা বলে ধরে নিয়েছেন। কাজেই বুর্জোয়া দিগন্তের ঊর্ধ্বে তিনি ওঠেন নি। বুর্জোয়া ভাবগুলি নিয়েই

যেহেতু তাঁর কারবার, সেগুলোর শাশ্বত সত্যই তিনি ধরে নিয়েছেন, তাই সেগুলোর একটা সংশ্লেষণ, একটা ভারসাম্যের সন্ধান তিনি করেছেন; তিনি কিন্তু বুঝতে পারেন নি যে, বর্তমানে যেভাবে সেগুলো ভারসাম্যে পৌঁছয় সেটাই একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি।

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ভালমানুষ বুর্জোয়া যা করেন, শ্রী প্রুধোঁও তাই করেছেন। তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, নীতিগতভাবে অর্থাৎ বিমূর্ত ভাব হিসেবে বিবেচনা করলে প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া, ইত্যাদি হচ্ছে জীবনের একমাত্র ভিত্তি, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইসব ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় আরও অনেক কিছুই বাকি থাকে। এঁরা সকলেই প্রতিযোগিতা চান সেটার মারাত্মক ফলটা বাদ দিয়ে। তাঁরা সকলেই চান অসম্ভবকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিগুলি বাদ দিয়ে সেই বুর্জোয়া জীবনযাত্রার পরিবেশ। তাঁদের কেউই বোঝেন না যে, উৎপাদনের বুর্জোয়া ধরনটা ইতিহাসক্রমিক এবং অস্থায়ী, ঠিক যেমন ছিল সামন্ততান্ত্রিক ধরনটা। তাঁদের এই ভুলের কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন বুর্জোয়া মানুষই সমস্ত সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি; এমন কোন সমাজব্যবস্থা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না যেখানে মানুষ আর বুর্জোয়া নয়।

কাজেকাজেই শ্রী প্রুধোঁ অনিবার্যভাবেই **অন্ধ মতবাগীশ।** যে ঐতিহাসিক গতি বর্তমান দুনিয়াকে একেবারে উল্টে দিচ্ছে, সেটা তাঁর কাছে দুটি বুর্জোয়া ভাবের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য, সংশ্লেষণ আবিষ্কারের সমস্যায় পর্যবসিত হয়। তাই, এই চতুর ব্যক্তিটি সূক্ষ্ম প্যাঁচে ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটি, অর্থাৎ দুইটি বিচ্ছিন্ন ভাবের একত্ব আবিষ্কার করে ফেলেন; সে ভাব-দুটি যে বিচ্ছিন্ন তার একমাত্র কারণ শ্রী প্রুধোঁ এদের ব্যবহারিক জীবন থেকে, বর্তমান কালের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন; বর্তমান কালের এ উৎপাদন হচ্ছে সেইসব বাস্তবতারই সমাহার, যার অভিব্যক্তি হচ্ছে ঐ দুটি ভাব। মানুষের ইতোমধ্যে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সেগুলির সঙ্গে আর যা খাপ খায় না সেই সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ থেকে উদ্ভূত বিরাট ঐতিহাসিক গতির স্থলে; প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব ভীষণ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে সেগুলির স্থলে; জনগণের যেসব ব্যবহারিক এবং প্রচণ্ড কার্যকরণ দিয়েই

শুধু এইসব সংঘাতের মীমাংসা হতে পারে তার স্থলে — এই বিশাল, সুদীর্ঘ এবং জটিল গতির স্থলে শ্রী প্রুধোঁ হাজির করেন তাঁর নিজের মস্তিষ্কের খামখেয়ালী গতি। তাহলে, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই, অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটা মেরে দিতে পারেন, তাঁরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সাধারণ মানুষের কাজ শুধু তাঁদের ধ্যানসত্যকে প্রয়োগ করা।

এখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন শ্রী প্রুধোঁ সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনের ঘোষিত শত্রু। তাঁর বিচারে বর্তমান সমস্যাবলির সমাধান হবে জনসাধারণের কার্যকরণের ফলে নয়, হবে তাঁর মাথার দ্বান্দ্বিক আবর্তনের সাহায্যে। যেহেতু তাঁর বিবেচনায় বর্গগুলিই চালিকা-শক্তি, তাই বর্গগুলিকে পরিবর্তন করার জন্যে বাস্তব জীবন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। বর্গগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে, তার পরিণতি হবে বিদ্যমান সমাজের পরিবর্তন।

দ্বন্দ্ব-অসংগতিগুলিকে মেলাবার কামনা রয়েছে বলে শ্রী প্রুধোঁ এই মর্মে প্রশ্নটাও তোলেন নি যে, এইসব দ্বন্দ্ব-অসংগতির একেবারে ভিত্তিটাকেই উচ্ছেদ করা আবশ্যক কিনা। যিনি রাজা, প্রতিনিধি পরিষদ আর অভিজাতদের পরিষদকে সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, শাশ্বত বর্গ হিসেবে বজায় রাখতে চান, তিনি একেবারে ঠিক সেই রাজনীতিক মতবাগীশেরই মতো। তিনি শুধু এমন একটি নতুন সূত্র বার করার চেষ্টা করছেন যার দ্বারা এই শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, যে-ভারসাম্য হল ঠিক যথার্থ গতিটাই, যাতে এক শক্তি কখনও অন্য শক্তির বিজেতা, কখনও বা তার দাস। এইভাবে, অষ্টাদশ শতকে মাঝারি মাথাওয়ালা কিছু লোক এমন একটি নির্ভুল সূত্র আবিষ্কারে ব্যাপৃত ছিল, যেটার সাহায্যে সামাজিক বর্গগুলি, অভিজাত শ্রেণী, রাজা, পার্লামেন্ট, ইত্যাদির মধ্যে ভারসাম্য ঘটবে, আর হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেল, প্রকৃতপক্ষে কোন রাজা, পার্লামেন্ট বা অভিজাত সম্প্রদায় আর নেই। এই বিরোধের প্রকৃত ভারসাম্য ছিল সেই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের উচ্ছেদে, যে-সম্পর্কগুলিই হয়ে ছিল এই সামন্ততান্ত্রিক জীবগুলির এবং তাদের বিরোধের ভিত্তি।

শাশ্বত ভাবগুলিকে, বিশুদ্ধ বোধির বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ একদিকে ফেলেছেন, অন্যদিকে ফেলেছেন মানুষকে আর তাদের ব্যবহারিক জীবনকে,

যা তাঁর মতে এই বর্গগুলিরই প্রয়োগ, সেইজন্যে গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় জীবন আর ভাবের মধ্যে, আত্মা আর দেহের মধ্যে একটা **দ্বৈতভাব**, যা বহুরূপে প্রকাশ পায়। এখন বুঝতে পারছেন, যে-বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ দেবতার স্তরে তুলে দেন, সেগুলির ঐহলৌকিক উদ্ভব আর ঐহলৌকিক ইতিহাস বুঝতে শ্রী প্রুধোঁর অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় এই বিরোধটা।

আমার পত্র ইতোমধ্যে এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে, শ্রী প্রুধোঁ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে আজগুবি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার আর অবকাশ নেই। আপাতত আপনি আমার এই কথাটা মেনে নেবেন যে, সমাজের বর্তমান অবস্থাটাকে যিনি বুঝতে পারেন নি, তিনি সেই সমাজের উচ্ছেদের আন্দোলনকে এবং সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিকে আরও কম বুঝবেন বলেই মনে করা যেতে পারে।

যে **একটিমাত্র বিষয়ে** আমি শ্রী প্রুধোঁর সঙ্গে একমত তা হচ্ছে ভাবাবেগাপ্লুত সমাজতান্ত্রিক দিবাস্বপ্নের প্রতি তাঁর বিরক্তি। ইতোমধ্যে, শ্রী প্রুধোঁর আগেই, আমি এই ভাবালুতাগ্রস্ত, ইউটোপীয়, ভেড়ামার্কা সমাজতন্ত্রকে বিদ্রূপ করে বহু শত্রুতা জুটিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতা, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ ফুরিয়েরের ক্ষেত্রে আমাদের গুণধর প্রুধোঁর আত্মম্ভরি মামুলিয়ানার চেয়ে অনেক বেশি গভীর, সেটার বিরুদ্ধে নিজের পেটি-বুর্জোয়া ভাবালুতাকে উপস্থাপিত করে শ্রী প্রুধোঁ কি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন না? শ্রী প্রুধোঁর পেটি-বুর্জোয়া ভাবালুতা বলতে এখানে আমি পরিবার, দাম্পত্যপ্রেম এবং অন্যান্য সব মামুলী ব্যাপার নিয়ে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের কথাই বলছি। নিজের যুক্তিসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে, এইসব জিনিস নিয়ে কথা বলতে নিজের ডাহা অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিজেই এতই সম্যক সচেতন বলেই তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, উদাত্ত ক্রোধে ফেটে পড়েন, চীৎকার করেন, মুখ দিয়ে গেঁজলা তোলেন, শাপশাপান্ত করেন, গালি দেন, ধিক্কার হানেন, বুক চাপড়ান এবং ঈশ্বর আর মানুষের কাছে বড়াই করেন সমাজতান্ত্রিক কলঙ্কের দাগ তাঁর গায়ে লাগে নি! সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতাকে অথবা সমাজতান্ত্রিক ভাবালুতা বলতে তিনি যা বোঝেন সেটাকে

তিনি গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনা করেন নি। তিনি সাধু মোহান্তের মতো, পোপের মতো হতভাগ্য পাপীদের সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করে দেন এবং পেটি বুর্জোয়াদের গুণগান করেন, গার্হস্থ্যজীবনের শোচনীয় পিতৃতান্ত্রিক আর প্রণয়শীল মোহের গুণগান করেন। কিন্তু এটা আকস্মিক নয়। শ্রী প্রুধোঁ হচ্ছেন আপাদমস্তক পেটি বুর্জোয়াদের দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ। উন্নত সমাজে **পেটি বুর্জোয়ারা** তাদের অবস্থানের কারণেই অনিবার্যভাবে একদিকে সমাজতন্ত্রী, অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়ার মহিমায় তাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং জনসাধারণের দুর্গতির প্রতি তাদের সহানুভূতিও থাকে। তারা হচ্ছে একাধারে বুর্জোয়া এবং জনসাধারণের লোক। অন্তরে-অন্তরে তারা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে, তারা নিরপেক্ষ এবং সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে, যে ভারসাম্যটা সুবর্ণ মধ্যপন্থা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে তাদের ধারণা। এই ধরনের পেটি বুর্জোয়া **দ্বন্দ্ব-অসংগতির** মাহাত্ম্যকীর্তন করে, কারণ দ্বন্দ্ব-অসংগতিই তার অস্তিত্বের ভিত্তি। নিজে সে সক্রিয় সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছাড়া কিছুই নয়। কার্যক্ষেত্রে সে যা সেটাকে তার সমর্থন করা চাই তত্ত্ব দিয়ে, আর ফরাসী পেটি বুর্জোয়ার বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকার হবার যোগ্যতা শ্রী প্রুধোঁর আছে — একটা সত্যিকারের যোগ্যতা, কারণ পেটি বুর্জোয়ারা হবে সমস্ত আসন্ন সমাজবিপ্লবের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত আমার বইখানি (৭০) যদি এই পত্রের সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু বইখানা ছাপানো আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি; জার্মান দার্শনিকদের এবং সমাজতন্ত্রীদের যে-সমালোচনার* কথা ব্রাসেল্সে আপনাকে বলেছিলাম তাও ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। জার্মানিতে এই ধরনের বই ছাপাতে গেলে যে কীরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। বাধা আসে একদিকে পুলিসের নিকট থেকে, অন্যদিকে প্রকাশকদের নিকট থেকে, যারা নিজেরাই হচ্ছে সেইসব ধারারই স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি যে-ধারাগুলিকে আমি আক্রমণ করছি। আর আমাদের নিজেদের পার্টির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তা যে শুধু দরিদ্র

* মার্কস এবং এঙ্গেলস: 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

তাই নয়, অধিকন্তু জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির একটা বড় অংশ আমার উপর ক্রুদ্ধ এই কারণে যে, আমি তাদের ইউটোপিয়া এবং ভাবোচ্ছ্বাসগুলির বিরোধিতা করেছি...

'চিঠিপত্রে ম. ম. স্টাসিউলেভিচ এবং তাঁর সমসাময়িকেরা' বইয়ের ৩য় খণ্ডে (সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ১৯১২) প্রথম প্রকাশিত হয় মূল ফরাসী ভাষায়

এই বই অনুসারে মুদ্রিত

ফরাসী থেকে ইংরেজী তরজমার ভাষান্তর

টীকা

(১) **'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ'** রচনাটি ক. মার্কস লেখেন ব্রাসেল্সে ১৮৪৫ সালের বসন্তে। এই সময়ের মধ্যেই তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বের বিকাশ সাধন মোটের উপর শেষ করেন এবং মানবসমাজটাকে উপলব্ধি করার জন্যে বস্তুবাদ সম্প্রসারিত করেন। এঙ্গেলসের বক্তব্য অনুসারে এটি হল 'নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল'।

'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' রচনায় কার্ল মার্কস ফয়েরবাখ এবং তাঁর সমস্ত পূর্বসূরীর বস্তুবাদের মূল ত্রুটি উন্মোচন করেন, সেই ত্রুটি হল সেটার নিষ্ক্রিয়-অনুধ্যানশীল দৃষ্টিপাত, মানুষের বৈপ্লবিক, 'ব্যবহারিক-পরীক্ষামূলক' কার্যকলাপের গুরুত্ব বুঝতে অপারকতা। জগৎ সংবেদ এবং জগৎটাকে নতুন করে গড়ায় বৈপ্লবিক চালিতকর্মের চূড়ান্ত ভূমিকার উপর মার্কস জোর দেন।

'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' রয়েছে মার্কসের ১৮৪৪ — ১৮৪৭ সালের 'মন্তব্য-পুস্তক'-এ এবং শিরোনাম হল 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে'। ১৮৮৮ সালে 'থিসিসসমূহ' প্রকাশ করার সময়ে এঙ্গেলস এগুলিতে কিছু কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তন করেন, যাতে এই দলিলটিকে পাঠকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত বোধগম্য করা যায় (মার্কস এটিকে ছাপা মনস্থ করেন নি)। বর্তমান সংস্করণে 'থিসিসসমূহ' দেওয়া হয়েছে এঙ্গেলসের দেওয়া আকারে, তাতে মার্কসের পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে কিছু কিছু বাঁকা ছাঁদের অক্ষর এবং উদ্ধার-চিহ্ন যোগ করা হয়েছে, যা ১৮৮৮ সালের সংস্করণে নেই। 'ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ' নামটি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট। পৃঃ ৯

(২) **'জার্মান ভাবাদর্শ। ফয়েরবাখ, ব. বাউয়ের এবং স্টির্নারের বর্ণিত সর্বসাম্প্রতিক জার্মান দর্শন এবং বিভিন্ন পয়গম্বরের বর্ণিত জার্মান সমাজতন্ত্রের সমালোচনা'** রচনাটি ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলস লেখেন যুক্তভাবে ব্রাসেল্সে ১৮৪৫—১৮৪৬ সালে। 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনায় মার্কস এবং এঙ্গেলস সেই প্রথম

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী ধারণা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

'জার্মান ভাবাদর্শ'-র পান্ডুলিপিটি দুই খণ্ডে রচিত, এর প্রথম খণ্ড হল হেগেলোত্তর দর্শনের পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রকৃত সমাজতন্ত্রের' সমালোচনা।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে 'জার্মান ভাবাদর্শ'-র গঠনমূলক প্রধান মর্মবস্তু। সেজন্যে এটা পুরো রচনাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং এটার নিজস্ব তাৎপর্য আছে।

প্রথম অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি হল মাজাঘষা-না-করা পাণ্ডুলিপির তিনটি অংশ এবং অধ্যায়ের প্রথম দিকের দুটি পরিষ্কারভাবে লেখা লিপি নিয়ে। তদনুসারে অধ্যায়টি চার ভাগে বিভক্ত।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হল পরিষ্কার লিপির দ্বিতীয় আকার, তাতে প্রথম আকার থেকে যোগ করা হয়েছে সেই জিনিসগুলি যা দ্বিতীয় আকারে বাদ পড়েছে। দ্বিতীয় ভাগে হাজির করা হয়েছে পুরো অধ্যায়ের আদি মর্মবস্তু। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ হল স্টির্নারের সম্পর্কিত অধ্যায় থেকে (প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়) নেওয়া তত্ত্বগত প্রসঙ্গান্তর। এই বইখানায় মালমশলা সাজান হয়েছে ১৯৬৬ সালে মস্কোয় রুশ ভাষায় প্রকাশিত ক. মার্কস এবং ফ. এঙ্গেলসের 'ফয়েরবাখ। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিযোগ' ('জার্মান ভাবাদর্শ'-র প্রথম অধ্যায়ের নতুন প্রকাশনা) পুস্তিকা অনুসারে।

সমস্ত সম্পাদকীয় শিরোনাম আর প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় সন্নিবেশ এবং পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার সংখ্যাও দেওয়া হয়েছে গুরু বন্ধনীতে। মার্কস এবং এঙ্গেলসের পরিষ্কার দ্বিতীয় লিপির মূল পাতাগুলির নম্বর [১ বিভাগ], ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিষ্কার প্রথম লিপিতে লেখকরা পৃষ্ঠার নম্বর দেন নি, সেগুলি এখানে [১ পৃঃ] ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। পাণ্ডুলিপির খসড়া হিসেবে লেখা তিনটে অংশের পৃষ্ঠাগুলিতে মার্কস নম্বর দিয়ে গেছেন, সেগুলি এখানে শুধু [১] ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা সূচিত। পৃঃ ১৩

(৩) এখানে ড. ফ. স্ট্রাউসের 'যীশুর জীবন' শীর্ষক প্রধান রচনাটির কথা বলা হচ্ছে (D. F. Strauß, 'Das Leben Jesu'. Bd. 1-2, Tübingen, 1835-1836)। ধর্মের দার্শনিক সমালোচনা এবং হেগেলীয় সম্প্রদায়টি ভেঙে সাবেকী হেগেলপন্থী আর নবীন হেগেলপন্থী এই দুই ধারায় বিভক্ত হবার সূত্রপাত করে এই রচনাটি। পৃঃ ১৩

(৪) এখানে অষ্টাদশ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩

(৫) **দিয়াদোচি** — ম্যাসিডোনিয়ার আলেক্‌জান্ডরের সেনাপতিরা। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতা লাভের জন্যে তারা নিজেদের মধ্যে হিংস্র লড়াই চালায়। এই সংগ্রামের মধ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শুরু) আলেক্‌জান্ডরের সাম্রাজ্য — সামরিক-প্রশাসনিক দিক থেকে অস্থিত পরিমেল — কয়েকটা পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। পৃঃ ১৩

(৬) **'জগৎবিদারক চিন্তন'** — ১৮৪৫ সালে 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকায় চতুর্থ খণ্ডে, পৃঃ ৩২৭ প্রকাশিত একটি বেনামী প্রবন্ধের উক্তি।

'Wigand's Vierteljahrsschrift' ('ভিগান্ডের ত্রৈমাসিক পত্রিকা') হল নবীন হেগেলপন্থীদের দার্শনিক পত্রিকা; ১৮৪৪—১৮৪৫ সালে লাইপজিগে ভিগান্ড কর্তৃক প্রকাশিত। ব. বাউয়ের, ম. স্টির্নারের, ল. ফয়েরবাখ এবং অন্যান্যরা এই পত্রিকায় লিখতেন। পৃঃ ১৭

(৭) 'জার্মান ভাবাদর্শ'-তে 'Verkehr' শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক পৃথক ব্যক্তি আর সামাজিক বর্গ এবং গোটা গোটা দেশের বৈষয়িক আর মানসিক সংসর্গ এর মধ্যে পড়ে। মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, বৈষয়িক সংসর্গ এবং সর্বোপরি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপিত মানুষে-মানুষে সংসর্গ অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংসর্গের ভিত্তি। 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনায় ব্যবহৃত 'Verkehrsform', 'Verkehrsweise', 'Verkehrsverhältnisse', 'Produktions-und Verkehrsverhältnisse' ('সংসর্গের রূপ', 'সংসর্গের প্রণালী', 'সংসর্গের সম্পর্ক বা পরিবেশ', 'উৎপাদন এবং সংসর্গের সম্পর্ক') এই কথাগুলিকে মর্কস এবং এঙ্গেলস ব্যবহার করেছেন উৎপাদন-সম্পর্ক সংক্রান্ত ধারণাটি প্রকাশ করার জন্যে, এটা তখন তাঁদের মনে দানা বেঁধে উঠছিল। পৃঃ ২০

(৮) 'Stamm' এই পরিভাষাটিকে 'জার্মান ভাবাদর্শ'-এ 'গোষ্ঠী' বলে তরজমা করা হয়েছে, এটা ১৯ শতকের পঞ্চম দশকের ইতিহাসবিজ্ঞানের রচনাগুলিতে বর্তমানের চেয়ে অনেক মস্ত ভূমিকায় থেকেছে। এটা দিয়ে বোঝানো হত একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত লোক-সম্প্রদায়কে; 'গণ' (Gens) এবং 'গোষ্ঠী' (Stamm) অর্থ এটার মধ্যে পড়ে। এই ধারণাগুলির সংজ্ঞার্থ সর্বপ্রথমে করেন লুইস হেনরি মর্গান তাঁর প্রধান রচনা 'আদিম সমাজ'-এ (১৮৭৭)। এই বিশিষ্ট মার্কিন নৃকুলবিদ্যাবিদ ও ইতিহাসকার এই প্রথম আদিম কমিউন-ব্যবস্থার কোষকেন্দ্র হিসেবে 'গণ'-এর তাৎপর্যটাকে প্রদর্শন করেন এবং এইভাবে সমগ্র আদিম সমাজের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেন। মর্গানের আবিষ্কারগুলি থেকে এঙ্গেলস বিভিন্ন সাধারণ সিদ্ধান্ত স্থির করেন এবং 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা

ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' (১৮৮৪) রচনায় 'গণ' ও 'গোষ্ঠী' সংক্রান্ত ধারণা সর্বাত্মক বিশ্লেষণ করেন। পৃঃ ২১

(৯) রোমক জন-ট্রিবিউন লিসিনাস এবং সেকস্টিয়াসের ভূমি-আইন খৃঃ পূঃ ৩৬৭ সালে গৃহীত হয় প্যাট্রিশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্লিবিয়ানদের সংগ্রামের ফলে। এই আইন অনুসারে রোমক নাগরিকদের সাধারণের ভূমি থেকে (ager publicus) ৫০০ ইউগেরের (প্রায় ১২৫ হেক্টর) বেশি জমি দখল করতে পারত না। পৃঃ ২২

(১০) ১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে ৮৬-১৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ব. বাউয়েরের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৩০

(১১) দ্রঃ হেগেল, **'ইতিহাসের দর্শন'**। মুখবন্ধ, বিশ্ব ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি। পৃঃ ৩৩

(১২) এখানে **'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য'** (১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০) প্রবন্ধে ব. বাউয়েরের একটা উক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৪

(১৩) 'Deutch-Französische Jahrbücher' ('জার্মান-ফরাসী বর্ষপঞ্জি') পত্রিকা প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে জার্মান ভাষায়, ক. মার্কস এবং আ. রুগে সম্পাদনা করতেন। এর শুধু প্রথম, ডবল সংখ্যাটিই প্রকাশিত হয় (১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে)। এতে ছিল ক. মার্কসের দুটি প্রবন্ধ — 'ইহুদি সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে' এবং 'হেগেলীয় দর্শনের পর্যালোচনা সম্পর্কে। মুখবন্ধ' এবং ফ. এঙ্গেলসের দুটি প্রবন্ধ — 'অর্থশাস্ত্রের পর্যালোচনার রূপরেখা' এবং 'ইংলন্ডের অবস্থা। টমাস কার্লাইলের "অতীত ও বর্তমান"', লন্ডন, ১৮৪৩। বস্তুবাদ ও কমিউনিজমে মার্কস এবং এঙ্গেলসের চূড়ান্ত উত্তরণ সূচিত হয় এইসব রচনায়। এই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার প্রধান কারণ হল মার্কস এবং বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল রুগে'র মধ্যে মূলগত মতবিরোধ। পৃঃ ৪০

(১৪) সমস্ত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কেবল যুগপৎই প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হতে পারে, অতএব একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব, এই সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে, ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের অসম অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে পেঁাছন: একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের বিজয় প্রথমে কয়েকটি, এমনকি একটিমাত্র দেশেও সম্ভব এবং সব দেশে অথবা বেশির ভাগ দেশে বিপ্লবের যুগপৎ বিজয় অসম্ভব। এই থিসিস প্রথম তুলে ধরা হয় ভ. ই. লেনিনের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি' প্রবন্ধে (১৯১৫)। পৃঃ ৪৪

(১৫) **মহাদেশীয় ব্যবস্থা** বা মহাদেশীয় অবরোধ — ১৮০৬ সালে প্রথম নেপোলিয়ন গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য করার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় মূলভূমির দেশগুলির প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এটা বাতিল হয়ে যায়। পৃঃ ৪৬

(১৬) **'মার্সেলেজ', 'কার্মেনিওল'**, 'Ça ira' (সা ইরা) — ১৮ শতকের শেষের দিকে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ের বৈপ্লবিক গান। শেষ গানটির ধুয়া হল: 'Ah! ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne!' ('এটাই চলবে। অভিজাতদের টাঙাও ল্যাম্পপোস্টে!')। পৃঃ ৪৯

(১৭) ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি' (M. Stirner. 'Der Einzige und sein Eigenthum'. Leipzig, 1845) থেকে এই উক্তিগুলি। পৃঃ ৫০

(১৮) ব্রাউয়েরের 'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ থেকে উক্তিটি গৃহীত (১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯)। পৃঃ ৫৪

(১৯) ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি' থেকে গৃহীত উক্তি। পৃঃ ৫৪

(২০) 'Hallische Jahrbücher' এবং 'Deutsche Jahrbücher' — নবীন হেগেলপন্থীদের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার সংক্ষেপিত নাম। লাইপজিগ থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের আকারে প্রকাশিত হত ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪১ সালের জুন পর্যন্ত 'Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst' ('জার্মান বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত গল্-এর বর্ষপঞ্জি') নামে এবং ১৮৪১ সালের জুলাই থেকে ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত 'Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst' ('বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত জার্মান বর্ষপঞ্জি') নামে। ১৮৪৩ সালের জানুয়ারিতে সরকার পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করে দেয়। পৃঃ ৫৪

(২১) B. Bauer. 'Geschichte der Politik, Cultur und Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts.' Bd. 1-2, Charlottenburg, 1843–1845 (ব. বাউয়ের,

'অষ্টাদশ শতকের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানালোক বিতরণের ইতিহাস', ১-২ খণ্ড, শার্লোটেনবার্গ, ১৮৪৩—১৮৪৫)। পৃঃ ৫৫

(২২) **রাইন-গীত** — এটাকে জাতীয়তাবাদীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। জার্মান পেটি-বুর্জোয়া কবি ন. বেকেরের 'জার্মান রাইন' কবিতা; কবিতাটি রচিত হয় ১৮৪০ সালে; পরবর্তী বছরগুলিতে বিভিন্ন সুরকার গানটিতে সুর দেন। পৃঃ ৫৫

(২৩) ১৮৪৫ সালের 'Wigand's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩-২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ল. ফয়েরবাখের ' "অদ্বিতীয় এবং তাঁর সম্পত্তি" প্রসঙ্গে "খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম" সম্পর্কে' প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। প্রবন্ধটি শেষ হয় এইভাবে: 'কাজেই, ব্যক্তি হিসেবে ফয়েরবাখকে বস্তুবাদী, ভাববাদী কিংবা দার্শনিক কোনটাই বলা যায় না। তাহলে তিনি কী? তিনি বচনে যা, চিন্তনে তাইই, মরদেহে, বোধশক্তিতে যা, মনেও তাই — তিনি **মানুষ; যেহেতু** ফয়েরবাখ মানুষের সত্তাকে সঞ্চারিত করেন কেবল তার সম্প্রদায়ের মাঝে — তিনি সামাজিক মানুষ, **কমিউনিস্ট**। পৃঃ ৫৬

(২৪) L. Feuerbach. 'Grundsätze der Philosophie der Zukunft', Zürich und Winterthur, 1843, S. 47 (ল. ফয়েরবাখ, 'ভবিষ্যতের দর্শনের মূল উপাদানসমূহ', জুরিখ এবং ভিন্টেরথুর, ১৮৪৩, পৃঃ ৪৭)।

সম্ভবত 'জার্মান ভাবাদর্শ' রচনার প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের জন্যে লেখা 'ফয়েরবাখ' শীর্ষক মন্তব্যলিপিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের বইখানা থেকে নিম্নলিখিত অংশটা উদ্ধৃত করে তার উপর মন্তব্য করেন:

'যেটাকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন একটা সাধারণ ধারণা নয় অস্তিত্ব। বিদ্যমান সবকিছুর সঙ্গে মিলে অস্তিত্ব... অস্তিত্ব হল সত্তার অবস্থান। **আমার সত্তাই আমার অস্তিত্ব।** মাছ রয়েছে জলে, কিন্তু এই অস্তিত্ব থেকে মাছের সত্তাকে আলাদা করা যায় না। এমনকি ভাষাও অস্তিত্ব আর সত্তাকে অভিন্নরূপে ধরে। শুধু মানুষের জীবনেই অস্তিত্ব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন — **কিন্তু কেবল ব্যতিক্রমী, অনুপযোগী ক্ষেত্রে;** এমনটা ঘটে যাতে কোন লোক যেখানে বিদ্যমান, তার সত্তা সেখানে নয়, কিন্তু এই অবস্থারই দরুন তার দেহ বাস্তবিকই যেখানে সেখানে যথার্থই থাকে না তার অন্তরাত্মা। শুধু যেখানে তোমার অন্তর, **সেখানেই তুমি।** কিন্তু সবকিছু — **অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ছাড়া** — যেখানে আছে সেখানে থেকেই খুশি এবং নিজেরা যা তাই হয়েই খুশি' (পৃঃ ৪৭)।

'বিদ্যমান পরিস্থিতির সংস্কার স্তুতিই বটে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলি এবং কয়েকটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছেড়ে দিলে, তুমি সাত বছর বয়সে কোন কয়লাখনির

দারেয়ান হলে এবং দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা অন্ধকারে একা থেকে খুশি, আর যেহেতু এটা তোমার অস্তিত্ব, তাই এটা তোমার সত্তাও বটে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে যে সুতো জোড়ে তার বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। শ্রমের কোন একটা শাখার অধীন হওয়াতেই তোমার "সত্তা"।' পৃঃ ৫৬

(২৫) 'জার্মান ভাবাদর্শ'-র প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের কথা এখানে বলেছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। ফয়েরবাখ সম্পর্কে এই অংশটি গোড়ায় তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর তার ঠিক পরেই ছিল মার্কস এবং এঙ্গেলস যেটার কথা বলেছেন সেই বয়ানটা। তৃতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত অংশে মার্কস এবং এঙ্গেলস উদ্ধৃতি দেন হেগেলের 'ইতিহাসের দর্শন' ও অন্যান্য রচনা থেকে। পৃঃ ৬২

(২৬) **শস্য-আইনবিরোধী লীগ** — ইংরেজ শিল্প-বুর্জোয়াদের একটা সংগঠন; ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-মালিক কবডেন এবং ব্রাইট এটার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সীমাবদ্ধ কিংবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন ইংলন্ডে চালু হয়েছিল বড় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে 'লীগ' শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন রদের চেষ্টা করে, যাতে শ্রমিকদের মজুরি কমানো যায় এবং ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক অবস্থান দুর্বল করা যায়। এই সংগ্রামের ফলে ১৮৪৬ সালে আইনটা রদের বিল গৃহীত হয় এবং তাতে ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে শিল্প-বুর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়। পৃঃ ৬৫

(২৭) **'পরিমেল'** ('Verein') — স্টির্নারের বক্তব্য অনুসারে এটা ছিল আত্মবাদীদের স্বেচ্ছা-সম্মিলনী। পৃঃ ৬৭

(২৮) J. Aikin. 'A Description of the Country from thirty to forty Miles round Manchester'. London, 1795 (জ. আইকিন, 'ম্যাঞ্চেস্টারের চারপাশে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল গ্রামাঞ্চলের বর্ণনা,' লন্ডন, ১৭৯৫)। পৃঃ ৭৫

(২৯) ই. পিন্টোর 'Traité de la Circulation et du Crédit', Amsterdam, 1771 ('মুদ্রা প্রচলন এবং ক্রেডিট সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ', আমস্টার্ডাম, ১৭৭১) বই থেকে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে 'Lettre sur la Jalousie du Commerce' ('বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে পত্র'), ২৩৪ এবং ২৮৩ পৃষ্ঠা। পৃঃ ৭৬

(৩০) A. Smith. 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth

of Nations'. London, 1776 (আ. স্মিথ, 'জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান', লন্ডন, ১৭৭৬)। পৃঃ ৭৬

(৩১) ১৭৬২ সালে আমস্টার্ডামে প্রকাশিত জ. জ. রুসো'র 'Du Contract social; ou, Principes du droit politique' ('পারস্পরিক সামাজিক চুক্তি বা রাজনীতিক নিয়মের মূল উপাদানসমূহ') গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৭

(৩২) ১৮৪৫ সালের 'Wigands's Vierteljahrsschrift' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় ম. স্টির্নারের 'স্টির্নারের সমালোচকগণ' প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর অভিমতের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৮৯

(৩৩) নর্মানরা ইংলন্ড জয় করে ১০৬৬ সালে; নেপল্স — ১১৩০ সালে। পৃঃ ৮৯

(৩৪) **বাইজ্যান্টাইন** — পূর্ব রোম সাম্রাজ্য; ৩৯৫ সালে দাস-মালিকানার রোম সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া রাষ্ট্র; এটার কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল্; পরে এই রাষ্ট্রের নাম হয় বাইজ্যান্টাইন; ১৪৫৩ সালের তুর্কী বিজয় পর্যন্ত এই রাষ্ট্র টিকে ছিল। পৃঃ ৯২

(৩৫) ইতালির আমাল্‌ফি শহর ১০-১১ শতকে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই শহরের সামুদ্রিক আইন (Tabula Amalphitana) সারা ইতালিতে বলবৎ এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পৃঃ ১০১

(৩৬) **'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ'** রচনাটি হল কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচির খসড়া, প্যারিসে 'লীগের' আঞ্চলিক কমিটির নির্দেশে এঙ্গেলসের লেখা। ১৮৪৭ সালের ২৩-২৪ নভেম্বর মার্কসের কাছে চিঠিতে এঙ্গেলস প্রশ্নোত্তরের আকার ছেড়ে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রূপে কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (২৯ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর) মার্কস এবং এঙ্গেলসের অভিমতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেওয়া হয় এবং লীগের কর্মসূচি 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' লেখার ভার দেওয়া হয় তাঁদের উপর। 'ইশতেহার' লেখার সময়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় 'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' রচনায় তুলে ধরা কথাগুলি ব্যবহার করেন।

'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' রচনায় এঙ্গেলস প্রলেতারীয় পার্টির কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগত এবং কর্মকৌশলগত নীতি তাত্ত্বিকভাবে প্রতিপন্ন করেন, এবং বিজয়ী প্রলেতারিয়েত যেগুলির সাহায্যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে সেইসব ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। পৃঃ ১০৬

(৩৭) পাণ্ডুলিপিতে ২২ এবং ২৩ নং প্রশ্নের উত্তরের বদলে 'রয়েছে' কথাটি লেখা আছে। বোধ হয়, এর মানে হল কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচির কোন একটি প্রাথমিক খসড়ায় যেমনটি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে তেমনিই রয়েছে উত্তরটা, ঐ খসড়া আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। পৃঃ ১২৪

(৩৮) **চার্টিস্টরা** — ১৯ শতকের চতুর্থ দশক থেকে ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদের রাজনীতিক আন্দোলনে অংশগ্রাহীরা। কঠিন আর্থনীতিক অবস্থা এবং রাজনীতিক অধিকারহীনতার ফলেই এই আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'গণ-চার্টার' কার্যে পরিণত করার জন্যে সংগ্রাম। 'চার্টার'-এ ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং কয়েকটা শর্তের দাবি, যা শ্রমিকদের জন্যে ঐ অধিকার সুনিশ্চিত করবে। লেনিন বলেছেন, চার্টিজম হল 'প্রথম ব্যাপক, সত্যিকার সর্বজনীন, বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় আন্দোলন যার ছিল রাজনীতিক আকার'। পৃঃ ১২৬

(৩৯) **'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'** — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল, যাতে তুলে ধরা হয়েছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের মহৎ শিক্ষার বুনিয়াদী মূল উপাদানসমূহের সুসম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যান। 'এই রচনাটিতে মহাপ্রতিভাসম্ভূত স্বচ্ছতা আর উজ্জ্বলতা দিয়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এক নতুন বিশ্ববীক্ষা, সঙ্গতিপূর্ণ বস্তুবাদ, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রও যেটার অন্তর্ভুক্ত; বিকাশ সম্পর্কে সবচেয়ে সর্বাত্মক এবং গভীর শিক্ষা হিসেবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব; শ্রেণী-সংগ্রাম এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকা সংক্রান্ত তত্ত্ব' (ভ. ই. লেনিন)।

পুঁজিতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রলেতারিয়েতকে সজ্জিত করে এবং বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের কাজ এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'।

কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচি হিসেবে মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা এই 'ইশতেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। বর্তমান সংস্করণটিতে মূল রচনাটির ছাড়াও সমস্ত সংস্করণের মুখবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, শুধু ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত ইংরেজী সংস্করণের মুখবন্ধটি ছাড়া, কারণ এটির সারমর্ম রয়েছে অন্যান্য মুখবন্ধগুলিতে, এবং বিশেষ করে ১৮৯০ সালে প্রকাশিত জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে। পৃঃ ১২৮

(৪০) **কমিউনিস্ট লীগ** — মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, যা বিদ্যমান ছিল ১৮৪৭—১৮৫২ সালে। ফ. এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস সম্পর্কে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২৮

(৪১) এখানে ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১২৮

(৪২) 'The Red Republican' ('লাল প্রজাতন্ত্রী') — চার্টিস্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৫০ সালের জুন থেকে নভেম্বর অবধি লন্ডনে এটা প্রকাশ করেছিলেন জ. হার্নি। ১৮৫০ সালের নভেম্বরে এটার ২১-২৪ সংখ্যায় সংক্ষেপিত আকারে 'ইশতেহার' প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২৮

(৪৩) **জুন অভ্যুত্থান'** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান। অতি নিষ্ঠুরভাবে এটাকে দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ইতিহাসে প্রথম মহা গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ১২৮

(৪৪) 'Le Socialiste' ('সমাজতন্ত্রী') — ১৮৭১ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৩ সালের মে পর্যন্ত নিউ-ইয়র্কে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ছিল 'আন্তর্জাতিক'-এর উত্তর-আমেরিকান ফেডারেশনের ফরাসী শাখার একটি মুখপত্র। হেগ কংগ্রেসের পরে পত্রিকাটি 'আন্তর্জাতিক'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর ফরাসী অনুবাদ 'Le Socialiste' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের জানুয়ারি-মার্চে। পৃঃ ১২৮

(৪৫) এখানে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণের কথা বলা হচ্ছে। বাকুনিনের অনূদিত এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় জেনেভায় ১৮৬৯ সালে। অনুবাদের সময়ে বাকুনিন কয়েক জায়গায় 'ইশতেহার'-কে বিকৃত করেন। প্রথম সংস্করণের ত্রুটি প্লেখানভের অনূদিত ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রকাশিত সংস্করণে দূর করা হয়। প্লেখানভের অনুবাদ রাশিয়ায় 'ইশতেহার'-এর ব্যাপক প্রচারের সূচনা ঘটায়। পৃঃ ১২৮

(৪৬) **১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউন** — ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত বিদ্যমান শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক সরকার। ব্যাপক অর্থে, প্যারিস কমিউন নামে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চের প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং তার পরবর্তী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কালও বলে। প্যারিস কমিউনের ইতিহাস এবং তার মর্মের বিশদ ব্যাখ্যান পাওয়া যায় মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনায়। পৃঃ ১২৯

(৪৭) এখানে মুক্ত রুশ ছাপাখানার কথা বলা হচ্ছে। আ. ই. গের্ৎসেন এবং ন. প. ওগারিয়োভের প্রকাশিত 'কলোকোল' (ঘণ্টা) নামক বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পত্রিকাটি এখানে ছাপা হত। গের্ৎসেনের প্রতিষ্ঠিত এই ছাপাখানা ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ছিল

লন্ডনে, তারপর স্থানান্তরিত হয় জেনেভায়। এই ছাপাখানায়ই ১৮৬৯ সালে 'ইশতেহার'-এর প্রথম রুশ সংস্করণ ছাপান হয়। ৪৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৩০

(৪৮) ১৮৮১ সালের ১ মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' (জনগণের সংকল্প)-পন্থীদের হাতে নিহত হবার পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তৃতীয় আলেক্সান্দর যখন 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া'-র গুপ্ত নির্বাহী কমিটির সম্ভাব্য নতুন নতুন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভয়ে গাৎচিনায় লুকিয়েছিলেন, সেই সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মার্কস এবং এঙ্গেলস এখানে বলেছেন। পৃঃ ১৩১

(৪৯) **কলোন কমিউনিস্ট মামলা** (১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর-১২ নভেম্বর) — কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া সরকারের সাজান মামলা। জাল দলিল এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সাত জনকে ৩ থেকে ৬ বছর কেল্লাবন্দী রাখার দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রুশীয় পুলিসী রাষ্ট্রের জঘন্য প্ররোচনাটাকে খুলে ধরেন মার্কস এবং এঙ্গেলস (এঙ্গেলসের 'কলোনে সাম্প্রতিক মামলা' প্রবন্ধ এবং মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলার রহস্যোদ্‌ঘাটন' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৩৩

(৫০) ১৯ শতকের পঞ্চম দশক থেকে শুরু করে বহু রচনায় মার্কস এবং এঙ্গেলস এই তাত্ত্বিক উপস্থাপনাটিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন; এখানে যেমনটা সূত্রবদ্ধ সেই আকারে এটা রয়েছে আন্তর্জাতিক মেহনতী জন সমিতির নিয়মাবলিতে।

পৃঃ ১৩৫

(৫১) উক্ত ভূমিকাটি এঙ্গেলস লেখেন ১৮৯০ সালের ১ মে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্যারিস কংগ্রেসের (১৮৮৯ সালের জুলাই) সিদ্ধান্ত অনুসারে যেদিন ইউরোপ আর আমেরিকার কতকগুলি দেশে আট ঘণ্টার কর্মদিন এবং কংগ্রেসের বিবৃত অন্যান্য দাবিতে গণ-মিছিল, ধর্মঘট এবং সভা-সমাবেশ করা হয়। এই সময় থেকে ১ মে দিনটিকে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংহতির সংগ্রামী প্রদর্শন দিবস হিসেবে সমস্ত দেশের শ্রমিকেরা প্রতি বছর উদ্‌যাপন করে। পৃঃ ১৩৫

(৫২) **কংগ্রেসী পোল্যান্ড** — পোল্যান্ডের যে অংশটাকে ১৮১৪—১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পোল্যান্ড রাজ্য নামে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। পৃঃ ১৩৬

(৫৩) জার-স্বৈরতন্ত্রের পীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১৮৬৩—১৮৬৪ সালের পোলীয় জাতীয়-মুক্তি অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে এখানে। 'লাল' ক্ষুদ্র অভিজাত পার্টির

অযৌক্তিকতার দরুন বৈপ্লবিক উদ্যোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, ফলে অভ্যুত্থানের পরিচালনা চলে যায় ভূস্বামী-অভিজাত এবং বড়ো বুর্জোয়াদের হাতে. তারা জার সরকারের সঙ্গে লাভজনক রফার চেষ্টা চালায়। ১৮৬৪ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ জারের সৈন্যবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে অভ্যুত্থান দমন করে। পৃঃ ১৪২

(৫৪) এই টীকাটি এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এর ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণেও ব্যবহার করেন, তাতে শুধু শেষ বাক্যটি বাদ দেন। পৃঃ ১৩৭

(৫৫) **ধর্মযুদ্ধ** — মুসলমান শাসনের হাত থেকে জেরুজালেম এবং অন্যান্য 'পুণ্যক্ষেত্রে' খ্রীষ্টীয় পূতবস্তুগুলি মুক্ত করার নামে ধর্মীয় পতাকাতলে ১১-১৩ শতকে বড় বড় পশ্চিম-ইউরোপীয় সামন্ত, নাইট, ইতালীয় বাণিজ্যিক শহরগুলির পূর্ব দিকে সামরিক-ঔপনিবেশিক আন্দোলন। ধর্মযুদ্ধের আদর্শবিদ এবং প্রোৎসাহদাতা ছিল ক্যাথলিক চার্চ আর বিশ্বপ্রভুত্বকামী পোপতন্ত্র এবং প্রধান সামরিক শক্তি ছিল নাইটহুড। সামন্তদের নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে ব্যগ্র কৃষকরাও এই অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করে। যেসব দেশের উপর দিয়ে ধর্মযোদ্ধারা যায় সেখানকার মুসলমান এবং খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর লুণ্ঠন এবং অত্যাচার চালানো হয়। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, টিউনিসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিই শুধু নয়, খ্রীষ্টীয় বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যও ছিল এই ধর্মযোদ্ধাদের আগ্রাসী বাসনার লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এই ধর্মযোদ্ধাদের বিজয় পাকাপোক্ত না থাকায় তাদের অধিকৃত এলাকাগুলি শিগগিরই মুসলমানদের হাতে ফিরে যায়। পৃঃ ১৪৬

(৫৬) পরবর্তী রচনাগুলিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস 'শ্রমের মূল্য' আর 'শ্রমের দাম' কথাগুলির বদলে মার্কসের চালু করা আরও সঠিক পরিভাষা 'শ্রমশক্তির মূল্য' এবং 'শ্রমশক্তির দাম' ব্যবহার করেছেন (এই প্রসঙ্গে মার্কসের 'মজুরি-শ্রম এবং পুঁজি' রচনায় এঙ্গেলসের লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৫০

(৫৭) এখানে নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্যে আন্দোলন সম্পর্কে বলা হচ্ছে। জনসাধারণের চাপে এই আইন কমন্স্ সভায় পাস হয় ১৮৩১ সালে এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ড সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এই সংস্কারটাকে তাক করা হয়েছিল ভূমি-সম্পত্তির মালিক এবং ফিনান্স অভিজাতদের রাজনীতিক একচেটে শাসনের বিরুদ্ধে এবং এটি শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে প্রবেশের পথ খুলে দেয়। এই সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের প্রধান শক্তি প্রলেতারিয়েত এবং পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রতারিত হয় এবং নির্বাচনী অধিকার লাভ করে না। পৃঃ ১৬৮

(৫৮) **১৬৬০—১৬৮৯ সালের রেস্টোরেশন** — ইংলন্ডে ১৭ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের পরে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্ব-কাল।

১৮১৪—১৮৩০ সালের রেস্টোরেশন — ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের পুনর্বার শাসনের কাল। বুরবোঁদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র অভিজাত এবং যাজকতন্ত্রের স্বার্থ দেখত। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে এই শাসনের উচ্ছেদ ঘটে। পৃঃ ১৬৮

(৫৯) **লেজিটিমিস্টরা** — ১৮৩০ সালে উৎখাত 'বৈধ' ('legitimate') বুরবোঁ বংশের অনুগামীরা। এই বংশ বড় বড় ভূমি-সম্পত্তি মালিক অভিজাতদের স্বার্থ দেখত। ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করা রাজত্বকারী অর্লিয়েন্স বংশের (১৮৩০—১৮৪৮) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ সোশ্যাল বাগাড়ম্বরের শরণ নিয়ে বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে শ্রমজীবীদের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করত। পৃঃ ১৬৯

(৬০) **'নবীন ইংলন্ড'** — টোরি পার্টির ইংরেজ রাজনীতিক এবং সাহিত্যিকদের একটি গ্রুপ; ১৯ শতকের পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে গঠিত হয়। বুর্জোয়াদের বেড়ে-চলা আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক পরাক্রমের বিরুদ্ধে ভূস্বামী অভিজাতদের অসন্তোষ প্রকাশ করে 'নবীন ইংলন্ড' বাগাড়ম্বরের ছল দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে নিজেদের প্রভাবাধীন করা এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রামে এই শ্রেণীকে হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা করত। পৃঃ ১৬৯

(৬১) **জাঙ্কার** — সংকীর্ণ অর্থে পূর্ব প্রাশিয়ার ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী; ব্যাপক অর্থে — জার্মান ভূস্বামীদের শ্রেণী। পৃঃ ১৬৯

(৬২) ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত 'La Réforme' ('সংস্কার') পত্রিকার পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী অনুগামীদের কথা। তারা প্রজাতন্ত্র স্থাপন এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পৃঃ ১৭৯

(৬৩) 'La Réforme' পত্রিকার কথা ৬২ নং টীকায় দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮০

(৬৪) ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তির জন্যে পোল্যান্ডের সমগ্র অঞ্চলে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলে। এই অভ্যুত্থানের প্রেরণাদাতা ছিলেন পোলীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা (দেম্বোভ্স্কি এবং অন্যান্যরা)। কিন্তু পোলীয় অভিজাত বর্গের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অভ্যুত্থানের নেতারা প্রুশীয়

পুলিসের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে সার্ব অভ্যুত্থান ঘটে না, শুধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ হয়। ১৮১৫ সাল থেকে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া আর প্রাশিয়ার সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণে ছিল ক্রাকোভ, শুধু সেখানে বিদ্রোহীরা ২২ ফেব্রুয়ারি জয়লাভে এবং জাতীয় সরকার গঠনে সমর্থ হয়; সামন্ত মনিবদের বাধ্যতামূলক খাটুনির প্রথা বাতিল ক'রে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল এই সরকার। ১৮৪৬ সালের মার্চের গোড়ার দিকে ক্রাকোভের অভ্যুত্থান দমন করা হয়। ১৮৪৬ সালের নভেম্বরে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে, তাতে ক্রাকোভ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃঃ ১৮০

(৬৫) এই প্রবন্ধটি ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরে লেখা মার্কসের 'বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লব' রচনার অংশ। এই রচনাটিতে মার্কস প্রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের বিজয়ের কারণগুলিকে ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেন এবং জার্মানির মার্চ বিপ্লবের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেন। পৃঃ ১৮২

(৬৬) এখানে জার্মানির ১৮৪৮ সালের মার্চ বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৮২

(৬৭) প্রাশিয়ার সমস্ত প্রাদেশিক সভার প্রতিনিধিদের সাম্প্রদায়িক সংস্থার কথা বলা হচ্ছে এখানে। বর্তমান ক্ষেত্রে মার্কস দ্বিতীয় 'মিলিত প্রাদেশিক সভা'র কথা বলছেন, এটি আহূত হয় ১৮৪৮ সালের ২ এপ্রিল কাম্পহাউজেনের মন্ত্রণালয়ে। তা প্রাশিয়ার জাতীয় সভা নির্বাচনের আইন চালু করে এবং ঋণ মঞ্জুর করে, যা সরকারকে দিতে ১৮৪৭ সালের 'মিলিত প্রাদেশিক সভা' অস্বীকার করেছিল। এর পর ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিলে সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। পৃঃ ১৮২

(৬৮) **টোরি** — ইংলন্ডে ১৮ শতকের শেষে উদ্ভূত একটি রাজনীতিক পার্টি। এই পার্টি ভূস্বামী অভিজাত এবং উচ্চ যাজক সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রকাশ করত, সামন্ততান্ত্রিক অতীতের ঐতিহ্য রক্ষা করত এবং উদারপন্থী আর প্রগতিশীল দাবিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাত। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে টোরি পার্টির ভিত্তিতে কনসার্ভেটিভ পার্টি গঠিত হয়। পৃঃ ১৮২

(৬৯) তখনকার স্পেন সাম্রাজ্যের অধীন নেদারল্যান্ডসের (এখনকার বেলজিয়াম আর হল্যান্ড) ১৫৬৬-১৬০৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা এখানে বলা হচ্ছে; এই বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং জনসাধারণের সংগ্রাম এবং স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের সংযুক্তি ঘটে। ১৬০৯ সালে কতকগুলি পরাজয়ের পর স্পেন বুর্জোয়া হল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৬ শতকের নেদারল্যান্ডসের বুর্জোয়া বিপ্লব ইউরোপে বুর্জোয়া

বিপ্লবগুলির বিজয়লাভের যুগের সূচনা করে। এখনকার বেলজিয়ামের রাজ্যক্ষেত্র স্পেনের দখলে ছিল ১৭১৪ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১৮৪

(৭০) এখানে মার্কসের পরিকল্পিত 'রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা' রচনাটির কথা বলা হচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত তিনি লিখে যেতে পারেন নি। পৃঃ ২০২

নামের সূচি

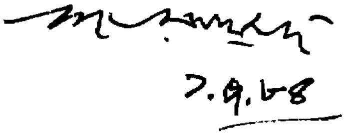
ম

র

ল

শ

দুনিয়ার মজদুর এক হও!



কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

২

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো · ১৯৭৯

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том II

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}801}{014(01)\text{-}79}$ 738-79 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি (১)

১৮৯১ সালের সংস্করণের জন্য ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা

এই রচনাটি ১৮৪৯ সালের ৪ এপ্রিল থেকে 'Neue Rheinische Zeitung' (২) পত্রিকাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্রাসেলসের 'জার্মান শ্রমিক সমিতি'তে (৩) ১৮৪৭ সালে **মার্কস** যে সব বক্তৃতা দেন তার ভিত্তিতে এটা লেখা। রচনাটি যতটা ছেপে বেরয় তা অসমাপ্ত; ২৬৯ সংখ্যার শেষে 'ক্রমশ'টা 'অসম্পূর্ণই থেকে যায়, কারণ ঠিক সেই সময়ে ঘটনার পর ঘটনা এসে ভিড় করে: রুশদের হাঙ্গেরি আক্রমণ (৪), ড্রেসডেন, ইজেরলোহন, এলবারফেল্ড, পেলাটিনেট ও বাডেনের অভ্যুত্থান (৫), যার ফলে পত্রিকাটিই বন্ধ করে দেওয়া হয় (১৮৪৯ সালের ১৯ মে)। পরবর্তী অংশের পাণ্ডুলিপি মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি।

স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি'র কয়েকটা সংস্করণ বার হয়েছে — হটিঙ্গেন-জুরিখের 'সুইশ সমবায় প্রেস'-এর ১৮৮৪ সালের সংস্করণটিই এর শেষ সংস্করণ। এ পর্যন্ত সব সংস্করণেই মূল পাঠ অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রচার-পুস্তিকা হিসেবে বর্তমান নতুন সংস্করণটি প্রচার করা দরকার অন্তত দশ হাজার কপিতে। কাজেই, এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় না হয়ে পারে নি বর্তমান অবস্থায় মূল পাঠকেই অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করা মার্কস স্বয়ং মঞ্জুর করতেন কিনা।

পঞ্চম দশকে মার্কস তাঁর অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা সম্পূর্ণ করেন নি। ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকেই তা সম্ভব হয়। ফলে তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' ('A Contribution to the Critique of Political Economy')

(১৮৫৯) প্রথম সংস্করণ বার হবার আগেকার লেখার সঙ্গে ১৮৫৯ সালের পরেকার লেখার কোনো কোনো বিষয়ে পার্থক্য আছে। আগের লেখায় এমন সমস্ত বাক্য ও বাক্যাংশ আছে যাকে পরবর্তী লেখার দিক থেকে বেখাপ্পা, এমন কি ভুল বলে মনে হয়। পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাধারণ সংস্করণে গ্রন্থকারের মানসিক বিকাশের একটা পর্যায় হিসেবে তাঁর পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গিরও যে একটা স্থান আছে, এবং পূর্ববর্তী রচনার অপরিবর্তিত প্রকাশে গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গের যে অবিসংবাদী অধিকার আছে, তা স্বতঃসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে তার একটিও শব্দ পরিবর্তনের কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না।

কিন্তু নতুন সংস্করণটির উদ্দেশ্য যেখানে কার্যক্ষেত্রে কেবল শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার তখন অন্য কথা। এক্ষেত্রে মার্কস নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ১৮৪৯ সালে লেখা পুরনো রচনার সামঞ্জস্য সাধন করে নিতেন। সমস্ত মূল বিষয়ে এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য **এই সংস্করণে** যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু অদলবদল ও সংযোজন করে আমি ঠিক মার্কস যা করতেন তাই করেছি বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই পাঠকদের পূর্ব থেকেই জানিয়ে রাখি: ১৮৪৯ সালে মার্কস যে পুস্তিকা লেখেন এটি তা নয়, ১৮৯১ সালে তিনি এটি লিখলে যা দাঁড়াত প্রায় তাই। তাছাড়া, মূল রচনা এত বেশি কপিতে ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভবিষ্যতে মার্কসের একখানা সম্পূর্ণ রচনাবলিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় এর পুনর্মুদ্রণ যতদিন না করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত এটা যথেষ্ট।

আমার অদলবদল সবই একটি বিষয় নিয়ে। মূল লেখা অনুসারে শ্রমিক মজুরির বদলে পুঁজিপতির কাছে তার **শ্রম** বিক্রয় করে, বর্তমান পুস্তক অনুসারে সে বিক্রয় করে তার **শ্রমশক্তি**। এই পরিবর্তনের জন্য আমি একটি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। কৈফিয়ত দিতে হবে শ্রমিকদের কাছে যাতে তারা বোঝে যে এটা একটা কথার মারপ্যাঁচ নয়, সমগ্র অর্থশাস্ত্রেরই একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কৈফিয়ত দিতে হবে বুর্জোয়াদের কাছে যাতে তারা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারে, অশিক্ষিত শ্রমিকেরা আমাদের 'শিক্ষিত লোকদের' তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ; সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ শ্রমিকদের কাছে বোধগম্য করে তোলা যায় অথচ এদের কাছে সারা জীবনেও এ জটিল প্রশ্নের সমাধান হয় না।

শিল্প জগতের রেওয়াজ থেকে চিরায়ত অর্থশাস্ত্র (৬) কারখানা-মালিকের এই চালু ধারণাটি গ্রহণ করে যে, সে তার শ্রমিকদের শ্রম কেনে ও তার দাম দেয়। ব্যবসায়গত প্রয়োজন, হিসাব রাখা ও দাম ধরার দিক থেকে কারখানা-মালিকের কাছে এই ধারণা উপযোগীই ছিল। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নির্বিচারে স্থানান্তরিত হয়ে এই ধারণা সেখানে সত্যসত্যই বিস্ময়কর ভুল ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

অর্থশাস্ত্র এই ঘটনাটি দেখে যে, সবরকম পণ্যেরই দাম — তার মধ্যে যে পণ্যটিকে তারা বলে 'শ্রম' তার দামও — অবিরাম বদলায়; দাম ওঠা-নামা করে অতি বিচিত্র সব অবস্থার ফলে, যার সঙ্গে সে পণ্যের উৎপাদনের কোনো সম্বন্ধই নেই, ফলে মনে হয় যেন দাম সাধারণত নির্ধারিত হয় নিতান্ত আপতিক ঘটনাবশেই। তাই যখন অর্থশাস্ত্র (৭) বিজ্ঞানরূপে দেখা দিল তখন তার অন্যতম প্রথম কর্তব্য হল, যে আপতিকতা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার পিছনে লুকিয়ে আছে যে-নিয়ম, যে-নিয়ম প্রকৃতপক্ষে নিজেই সেই আপতিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই নিয়মটিকেই আবিষ্কার করা। কখনো উপরের দিকে, কখনো নীচের দিকে অবিরামভাবে ওঠা-নামা করা বা দোদুলামান পণ্য দামের মধ্যে এমন একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে বার করতে চায় অর্থশাস্ত্র যাকে ঘিরে দামের এই ওঠা-নামা ও দোল খাওয়া, অর্থাৎ পণ্যের দাম থেকে সে খুঁজতে শুরু করল তার দাম নিয়ামক বিধিস্বরূপ পণ্যের মূল্যকে, যে মূল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে দামের সর্বপ্রকার ওঠা-নামা ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দামেরই যা কারণ।

চিরায়ত অর্থশাস্ত্র তখন দেখতে পেল যে পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয় পণ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক যেটুকু শ্রম পণ্যের মধ্যে নিহিত আছে তা দিয়ে। এই ব্যাখ্যাতেই অর্থশাস্ত্র নিজেকে সন্তুষ্ট রাখে। আমরাও সাময়িকভাবে এখানে থামতে পারি। পাঠকগণ যাতে ভুল না বোঝেন তার জন্য শুধু তাঁদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই ব্যাখ্যা এখন একেবারে অচল। মার্কস সর্বপ্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রমের মূল্য-সঞ্চারী গুণটির অনুসন্ধান করেন। তা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, কোনো একটা পণ্যের উৎপাদনে আপাতভাবে এমন কি বাস্তবপক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই সকল অবস্থায় পণ্যে এমন পরিমাণ মূল্য যোগ করে না যেটা বিনিযুক্ত শ্রমের পরিমাণের সমান। কাজেই

আজকে যদি রিকার্ডোর মতো অর্থতাত্ত্বিকদের সঙ্গে আমরাও সহজ করে বলি, কোনো পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনে আবশ্যক শ্রম দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহলেও সবসময় কিন্তু তাকে মার্কসের ব্যতিরেকী শর্তগুলিও আমরা ধরে নিই। এখানে এই যথেষ্ট। মার্কসের 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে', ১৮৫৯, ও 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে বাকিটা পাওয়া যাবে।

কিন্তু 'শ্রম'রূপে পণ্যের বেলায় শ্রমের মাপকাঠিতে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থতাত্ত্বিকরা একের পর এক স্ববিরোধের মধ্যে পড়তে থাকেন। 'শ্রমের' মূল্য কি করে নিরূপিত হবে? তার মধ্যে নিহিত আবশ্যক শ্রম দিয়ে। কিন্তু একজন শ্রমিকের এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, কিংবা এক বছরের শ্রমের মধ্যে কতটা শ্রম নিহিত থাকে? এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, কিংবা এক বছরের শ্রম। শ্রমই যদি সকল মূল্যের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরা 'শ্রমের মূল্য' ব্যক্ত করতে পারি কেবল শ্রম দিয়েই। কিন্তু একঘণ্টা শ্রমের মূল্য একঘণ্টা শ্রমের সমান, শুধু এইটুকু জানলে একঘণ্টা শ্রমের মূল্য সম্পর্কে কিছুই জানা হয় না। এতে আমরা লক্ষ্যের দিকে একচুলও এগোতে পারি না, বৃত্তাকারে ঘুরতেই থাকি।

কাজেই, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র অন্য পথে চেষ্টা করে। তাতে বলা হয়, পণ্যের মূল্য তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। তাহলে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্থতাত্ত্বিকদের খানিকটা যুক্তির গোঁজামিল দিতে হয়। শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় না খতিয়ে দুর্ভাগ্যবশত তা স্থির করা যায় না তাঁরা **শ্রমিকের** উৎপাদন-ব্যয়ের খোঁজ করতে যান। সেটা স্থির করা সম্ভব। কাল ও অবস্থাভেদে তা বদলায়, কিন্তু সমাজের নির্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, উৎপাদনের নির্দিষ্ট শাখায় তাও সুনির্দিষ্ট, অন্তত তার তারতম্য অতি স্বল্পই। বর্তমানে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অধীনে, এতে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জীবনধারণের উপকরণ অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের জন্য মজুরির বিনিময়ে কাজ করেই শুধু জনগণের এক বিরাট ও ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে। এই উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয় হল তার জীবনধারণের উপকরণের পরিমাণ-অথবা মুদ্রাতে ব্যক্ত তার দাম, গড় হিসাবে যা তাদের কর্মক্ষম করতে ও কর্মক্ষম রাখতে পারে, এবং তার বার্ধক্য, পীড়া বা মৃত্যুজনিত

অনুপস্থিতিতে নতুন শ্রমিককে তার স্থলাভিষিক্ত করে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বংশ রাখে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বৃদ্ধি করে। ধরা যাক, শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের মুদ্রাগত দাম পড়ে রোজ তিন মার্ক।

কাজেই আমাদের শ্রমিকটি নিয়োগকর্তা পুঁজিপতির কাছ থেকে রোজ তিন মার্ক করে মজুরি পায়। তার জন্য পুঁজিপতি তাকে খাটায় ধরুন রোজ বারো ঘণ্টা করে। তার মোটামুটি হিসাবটা এই রকম:

ধরা যাক, আমাদের শ্রমিকটি একজন মিস্ত্রি, মেশিনের একটা অংশ তাকে তৈরি করতে হয়। একদিনে সে সেটা শেষ করতে পারে। কাঁচামালের — প্রয়োজনীয় আকৃতিতে আধা-তৈরী লোহা ও পেতলের দাম পড়ে কুড়ি মার্ক। স্টিম ইঞ্জিনের জন্য কয়লা খরচ, স্টিম ইঞ্জিন ও লেদ মেশিন ও অন্যান্য যে সব হাতিয়ারপত্র শ্রমিকটি ব্যবহার করে তার ক্ষয়ক্ষতির দরুন শ্রমিকটির বাবদে একদিনের খরচ এক মার্ক। একদিনের মজুরি আমরা ধরে নিয়েছি তিন মার্ক। সুতরাং মেশিনের অংশটি তৈরি করতে সবশুদ্ধ খরচ দাঁড়াচ্ছে চব্বিশ মার্ক। অথচ পুঁজিপতিটি হিসাব করে দেখে যে, তার খদ্দেরের কাছ থেকে গড়পড়তায় সে পাবে সাতাশ মার্ক, অর্থাৎ সে যা খরচ করে তার থেকে তিন মার্ক বেশি।

পুঁজিপতির পকেটস্থ এই তিন মার্ক আসে কোত্থেকে? চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের মতে গড়পড়তায় পণ্য তার সমমূল্যে বিক্রয় হয়, অর্থাৎ বিক্রয় হয় যে পরিমাণ আবশ্যক শ্রম তার মধ্যে নিহিত আছে তার সমান দামে। আমাদের মেশিনের অংশটির গড়পড়তা দাম সাতাশ মার্ক তাহলে তার মূল্যেরই সমান, অর্থাৎ তার মধ্যে নিহিত শ্রমের সমান। কিন্তু এই সাতাশ মার্কের মধ্যে একুশ মার্কের মতন মূল্য মিস্ত্রি কাজ শুরু করার পূর্বে থেকেই বর্তমান ছিল। কাঁচামালে নিহিত ছিল কুড়ি মার্ক, আর এক মার্ক খরচ পড়ল কাজের সময় যে কয়লা খরচ হল তার জন্য, অথবা কার্যকালে যে সব যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ব্যবহার করা হল এবং ব্যবহারের ফলে যার কার্যক্ষমতা ঐ অনুপাতে হ্রাস পেল। বাকি থাকে ছয় মার্ক; কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অর্থতাত্ত্বিকদেরই মতে এই ছয় মার্ক আসতে পারে কেবল কাঁচামালে শ্রমিকটি যে শ্রম যোগ করেছে তা থেকে। তার বারো ঘণ্টার শ্রমে এইভাবে তৈরী হয়েছে ছয় মার্ক সমান এক নতুন

মূল্যে। কাজেই, তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্যে ছয় মার্কের সমান হওয়ার কথা। তার ফলে শেষ পর্যন্ত 'শ্রমের মূল্য' কি, তা আবিষ্কার করা সম্ভব।

আমাদের মিস্ত্রি চেঁচিয়ে উঠবে: 'থামুন মশাই, ছয় মার্ক? আমি যে মাত্র তিন মার্ক পেয়েছি! আমার মালিক তো পবিত্র সবকিছুর দিব্যি করে বলে, আমার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য মাত্র তিন মার্ক। ছয় মার্ক দাবি করলে মালিক আমাকে হেসে উড়িয়ে দেয়। হিসাবটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তো!'

শ্রমের মূল্য নিয়ে আগে আমরা একটি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছিলাম, এখন তো আবার একটা সমাধানের অতীত স্ববিরোধের মধ্যেই জড়িয়ে পড়ছি। শ্রমের মূল্য বের করতে গিয়ে যেটা পেলাম সেটা অনেক বেশি। শ্রমিকের পক্ষে বারো ঘণ্টার শ্রমের মূল্য তিন মার্ক, পুঁজিপতির পক্ষে তা ছয় মার্ক — এর থেকে মজুরি হিসেবে সে শ্রমিককে দেয় তিন মার্ক, বাকি তিন মার্ক পকেটস্থ করে নিজের জন্য। তাই দাঁড়াচ্ছে শ্রমের একটি নয়, দুটি মূল্য, তদুপরি মূল্য-দুটি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের!

যেই আমরা মুদ্রায় ব্যক্ত মূল্যগুলোকে শ্রম-সময়ে পরিণত করতে যাই, অমনি স্ববিরোধটা আরো বিদঘুটে হয়ে ওঠে। বারো ঘণ্টা শ্রমে ছয় মার্কের এক নতুন মূল্য তৈরী হয়েছে। কাজেই, ছয় ঘণ্টায় তিন মার্ক — বারো ঘণ্টা শ্রমের জন্য শ্রমিক যা পেয়ে থাকে। বারো ঘণ্টার শ্রমের সমতুল মূল্য হিসেবে শ্রমিক পাচ্ছে ছয় ঘণ্টা শ্রমের ফল। কাজেই, হয় শ্রমের দুরকম মূল্য আছে, যার মধ্যে একটি অপরটির আকারের দ্বিগুণ, অন্যথায় বারো আর ছয় সমান! উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা হয়ে ওঠে নিতান্তই অর্থহীন প্রলাপ।

শ্রম কেনা-বেচা ও শ্রম-মূল্যের কথা ধরে থাকলে যত টানাহেঁচড়াই করি না কেন এই স্ববিরোধের হাত থেকে নিস্তার নেই। অর্থতাত্ত্বিকদের বেলায়ও তা ঘটেছিল। প্রধানত এই স্ববিরোধের সমাধান না করতে পারার জন্যই চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সর্বশেষ ধারক রিকার্ডোপন্থীদের ভরাডুবি হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র কানাগলির মধ্যে আটকা পড়ল। এই কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ যিনি বার করেন তিনি হচ্ছেন কার্ল মার্কস।

অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে 'শ্রমের' উৎপাদন-ব্যয় বলে গণ্য করে এসেছেন সেটা শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় নয়, জীবন্ত শ্রমিকটিরই উৎপাদন-ব্যয়। আর এই শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে যা বেচে তা তার শ্রম নয়। মার্কস বলেন: 'শ্রমিকের শ্রম প্রকৃতপক্ষে যখনই শুরু হচ্ছে তখন থেকেই সে শ্রম আর তার হাতে থাকছে না। কাজেই, তা আর সে বেচতে পারে না।'* বড় জোর সে তার **ভাবী কালের** শ্রম বেচতে পারে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের কাজ করে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নিতে পারে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে শ্রম (যেটা আগে সম্পাদন করতে হবে) বেচে না; শুধু সে নির্দিষ্ট অর্থের বদলে তার শ্রমশক্তিটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (দিন-মজুরির বেলায়) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য (ফুরন কাজের বেলায়) পুঁজিপতির হেফাজতে ছেড়ে দেয়: সে তার **শ্রমশক্তিটাকে** ভাড়া খাটায় বা বিক্রয় করে। কিন্তু এই শ্রমশক্তি তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা থেকে অচ্ছেদ্য, কাজেই শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় যা, শ্রমিকটির উৎপাদন-ব্যয়ও তাই। অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় বলেন তা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের এবং সেই সঙ্গে তার শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়। এইভাবে আমরা শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় থেকে শ্রমশক্তির **মূল্যে** ফিরে যেতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমশক্তি উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি। শ্রমশক্তি কেনা-বেচা বিষয়ক ভাগটিতে মার্কস তাই করেছেন (পুঁজি', ১ খণ্ড, ৪ অধ্যায়, ৩ ভাগ)।

পুঁজিপতির নিকট শ্রমিকের শ্রমশক্তি বেচে দেবার পর, অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুক্তিবদ্ধ মজুরির বদলে — সেটা দিন-মজুরিই হোক আর ফুরন কাজের মজুরিই হোক — পুঁজিপতির হেফাজতে শ্রমশক্তি তুলে দেবার পর কি হয়? পুঁজিপতি শ্রমিককে তার কর্মশালায় বা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস — কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্য (কয়লা, রঙ প্রভৃতি), হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি মজুত থাকে। শ্রমিক এখানে খাটতে শুরু করে। তার দিন-মজুরি হয়ত পূর্বোক্তমতো তিন মার্ক। এই তিন মার্ক সে দিন-মজুরি হিসেবেই রোজগার করুক আর ফুরন হিসেবেই

* কার্ল মার্কস, 'পুঁজি', ১ খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

রোজগার করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। আগের মতোই ফের ধরে নেওয়া যাক, বারো ঘণ্টার শ্রমে শ্রমিক ব্যবহৃত কাঁচামালের সঙ্গে ছয় মার্কের একটা নতুন মূল্য যুক্ত করে। তৈরী দ্রব্যটি বেচে পুঁজিপতি এই নতুন মূল্য আদায় করে নেয়। এ থেকে সে শ্রমিককে তার তিন মার্ক দেয়। বাকি তিন মার্ক সে তার নিজের জন্য রেখে দেয়। তাই, যদি শ্রমিক বারো ঘণ্টার ছয় মার্কের মতো একটা নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, তাহলে ছয় ঘণ্টায় সে তিন মার্কের একটা মূল্য সৃষ্টি করে। কাজেই, ছয় ঘণ্টা কাজ করার পরেই সে পুঁজিপতিকে মজুরিতে নিহিত তিন মার্কের তুল্যমূল্য শোধ করে দেয়। ছয় ঘণ্টা শ্রমের পর উভয়েরই শোধবোধ, কেউ কারো কানাকড়িও ধারে না।

পুঁজিপতি এবার চেঁচিয়ে উঠবে, বলবে: 'থামুন, গোটা দিনের জন্য, বারো ঘণ্টার জন্য শ্রমিককে আমি ভাড়া নিয়েছি। ছয় ঘণ্টা তো মাত্র আধা দিন। কাজেই, বাকি ছয় ঘণ্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ করে যেতে হবে — তখনই কেবল আমাদের শোধবোধ!' বস্তুত, শ্রমিক 'স্বেচ্ছাকৃত' চুক্তি পালনে বাধ্য। তদনুযায়ী যার দাম ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান তেমন একটা শ্রমফলের বদলে সে বারো ঘণ্টা কাজ করার কথা দিয়েছে।

ফুরন কাজের মজুরির বেলাতেও ঠিক তাই। ধরুন, আমাদের শ্রমিক বারো ঘণ্টায় কোনো পণ্যের বারোটি একক তৈরী করে। কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদে পণ্যের প্রত্যেকটিতে দুই মার্ক করে খরচ পড়ে, আর প্রত্যেকটি বেচা হয় আড়াই মার্কে। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি পূর্বের ধারণানুযায়ী প্রত্যেক এককের জন্য পঁচিশ ফেনিগ মজুরকে দেবে; তাতে বারোটা এককের জন্য মেলে তিন মার্ক। এ রোজগার করতে শ্রমিকের বারো ঘণ্টা সময় দরকার হয়। পুঁজিপতি ত্রিশ মার্ক পায় বারোটা এককের জন্য; কাঁচামাল ও ক্ষয়ক্ষতির দরুন চব্বিশ মার্ক বাদ দিলে থাকে ছয় মার্ক। তার মধ্যে সে শ্রমিককে দেয় তিন মার্ক আর নিজের পকেটে ফেলে তিন মার্ক। এও ঠিক আগেরই মতো। এখানেও শ্রমিক তার নিজের জন্য, অর্থাৎ মজুরি শোধের জন্য ছয় ঘণ্টা কাজ করে (বারো ঘণ্টার প্রতি ঘণ্টায় আধ-ঘণ্টা করে) আর পুঁজিপতির জন্য সে কাজ করে ছয় ঘণ্টা।

'শ্রম'-মূল্য থেকে শুরু করায় সেরা সেরা অর্থতাত্ত্বিকেরা যে মুশকিলে পড়েছিলেন, তা অবিলম্বেই অদৃশ্য হয় যদি তার বদলে শুরু করি **'শ্রমশক্তির'**

মনুল্য থেকে। বর্তমানের পঁনুজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি একটি পণ্য, ঠিক অন্য যেকোন পণ্যেরই মতো, তাসত্ত্বেও এটা একটা বিশিষ্ট রকমের পণ্য। যেমন বলা যায়, এর একটা বিশেষ গনুণ এই যে, এ একটা মনুল্য-সঞ্চারী শক্তি, এ হল মনুল্যের একটি উৎস এবং বস্তুত যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হলে স্বীয় মনুল্যের চেয়েও বেশি মনুল্য উৎপাদনের উৎস। উৎপাদনের বর্তমান অবস্থায় মানুষের শ্রমশক্তি দৈনিক তার স্বীয় মনুল্য বা স্বীয় উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশি মনুল্য উৎপাদন করে শনুধনু তাই নয়; প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেকটি নতুন টেকনিকাল উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে তার দৈনিক উৎপন্ন দ্রব্যের এই উদ্বৃত্তটাও বেড়েই চলে; কাজেই, শ্রম-দিবসের যে অংশটুকুতে শ্রমিক দিনের মজনুরি শোধ দেবার জন্য মনুল্য উৎপন্ন করে তার পরিমাণ কমতে থাকে; সনুতরাং অপরদিকে শ্রম-দিবসের যে সময়টুকুতে **বিনা পয়সায়** মালিককে তার শ্রম **উপহার দিতে** হয় তার পরিমাণ বেড়ে চলে।

আর আমাদের বর্তমান গোটা সমাজটার অর্থনৈতিক কাঠামো হল এই: একা শ্রমিক শ্রেণীই কেবল সকল মনুল্য উৎপন্ন করে। কারণ, মনুল্য হল শ্রমেরই নামান্তর মাত্র, যা দিয়ে আমাদের বর্তমান পঁনুজিবাদী সমাজে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যে কী পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম নিহিত আছে তা বোঝানো হয়। শ্রমিকের উৎপন্ন এই সব মনুল্যের মালিক কিন্তু শ্রমিকেরা নয়। কাঁচামাল, মেশিন, হাতিয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের অধিকারীরাই এর মালিক, এ সবের সাহায্যে এই মালিকেরা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমশক্তি কিনে নিতে পারে। কাজেই, শ্রমিক শ্রেণী তার উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্যের মধ্যে মাত্র একটি অংশই ফেরত পায়। আর একটু আগেই দেখেছি, অপর যে অংশটি পঁনুজিপতি শ্রেণী নিজের জন্য রেখে দেয় এবং বড়ো জোর ভূস্বামী শ্রেণীকে একটা ভাগ দেয়, তা প্রতিটি নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে, আর যে অংশটি শ্রমিক শ্রেণীর ভাগে পড়ে (মাথাপিছনু হিসাবে) তা বাড়লেও খনুবই মন্দগতিতে নগণ্যভাবেই বাড়ে, হয়ত-বা বাড়েই না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেও যেতে পারে।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান গতিতে পাল্লা দিয়ে ছোটা এই সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, দিনের পর দিন অশ্রনুতপনুর্ব মাত্রায় বর্ধমান মানব-শ্রমের উৎপাদনশীলতা শেষ পর্যন্ত এমন একটা সংঘাতের সনৃষ্টি করে যাতে বর্তমান

পংজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংস অনিবার্য। একদিকে অপরিমিত ধন ও উৎপন্নের প্রাচুর্য ঘটে, ক্রেতারা যা সামাল দিতে পারে না; অপরদিকে সমাজের অধিকাংশই প্রলেতারীয় হয়ে পড়ে, পরিণত হয় মজুরি-খাটা শ্রমিকে, এবং ঠিক এই কারণেই তাদের পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের এই প্রাচুর্য ভোগ সম্ভব হয় না। সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে — অত্যধিক ধনীদের একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী ও সম্পত্তিবিহীন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের এক বিরাট শ্রেণী। ফলে নিজেরই প্রাচুর্যের ভারে সমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসে, অথচ সেই সমাজেরই বেশির ভাগ লোক চরম অভাবের তাড়না থেকে সামান্যই রক্ষা পায়, অথবা মোটেই রক্ষা পায় না। সমাজের এই অবস্থা উত্তরোত্তর আরো উদ্ভট, আরো অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। একে দূর **করতেই হবে**, একে দূর করা **সম্ভব**। এমন একটি নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করা যেতে পারে যেখানে আজকালকার শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না, যেখানে সম্ভবত কিছুটা অভাব-অনটন সইতে হলেও যার অন্তত নৈতিক মূল্য বিপুল, এমন একটা সংক্ষিপ্ত উৎক্রমণমূলক পর্বের পরে সমাজের সকল সদস্যের যে বিপুল উৎপাদন-শক্তি এখনই বর্তমান তার পরিকল্পিত প্রয়োগ ও প্রসার মারফত এবং সকলের জন্য শ্রমবাধ্যতা চালু করে জীবনধারণের, জীবন উপভোগের, সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও ব্যবহারের সমস্ত উপায়-উপকরণ ক্রমবর্ধমান পরিপূর্ণভাবে সর্বজনের লভ্য হবে। শ্রমিক শ্রেণী যে এই নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য ক্রমেই বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছে, মহাসাগরের উভয় তীরে সেটাকে প্রদর্শন করবে আগামীকাল ১ মে এবং রবিবার ৩ মে (৮)।

লণ্ডন, ৩০ এপ্রিল, ১৮৯১

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'Vorwärts' পত্রিকার ১৮৯১ সালের ১৩ মে তারিখের ১০৯ নং সংখ্যার ক্রোড়পত্র হিসেবে এবং ক. মার্কসের 'Lohnarbeit und Kapital' (বার্লিন, ১৮৯১) পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়

মূল জার্মান পাঠ অনুসারে ছাপা হল

মজুরি-শ্রম ও পুঁজি

যে **অর্থনৈতিক সম্পর্ক** হল এ যুগের শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বৈষয়িক বনিয়াদ, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করি নি বলে নানা দিক থেকে আমাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে যখন এ ধরনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষরূপে সামনে এসে হাজির হয়েছে, শুধু তখনই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেটা ইচ্ছাপূর্বকই।

তখন সর্বাগ্রে প্রশ্ন ছিল চলতি ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামটা অনুসরণ করা, আর যেসব ঐতিহাসিক মালমশলা হাতে আছে বা যা নিত্যই নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে তা দিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যে, ফেব্রুয়ারি ও মার্চে শ্রমিক শ্রেণীর যে অধীনতা ঘটায় সেটার সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত হয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা — ফ্রান্সের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এবং সমগ্র ইউরোপীয় ভূখন্ড জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায়; ফ্রান্সে 'সৎ প্রজাতন্ত্রের' বিজয় হল সেই সঙ্গে সঙ্গে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ডাকে যেসব জাতি বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম ক'রে সাড়া দেয় তাদের পতন; পরিশেষে বিপ্লবী শ্রমিকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ সাবেকী দুনো দাসত্বে, অর্থাৎ **ইঙ্গ-রুশ** দাসত্বে আবার পতিত হয়। প্যারিসের জুন সংগ্রাম, ভিয়েনার পতন, বার্লিনে ১৮৪৮ সালে নভেম্বরের বিয়োগাত্মক প্রহসন, পোল্যান্ড ইতালি হাঙ্গেরির মরীয়া প্রচেষ্টা, বুভুক্ষার চাপে আয়র্ল্যান্ডকে বশীভূত করা — এই সব প্রধান ঘটনাতেই ইউরোপে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রামের বিশেষক ও এগুলির সাহায্যেই আমরা প্রমাণ করেছিলাম, যে কোনো বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থান, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে তার লক্ষ্য যত দূরেই মনে হোক না কেন, তা ব্যর্থ হবেই যতক্ষণ না বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী জয়ী হচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব একটা **বিশ্বযুদ্ধে** পরস্পর তরোয়াল না হাঁকাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সকল রকমের সামাজিক সংস্কার ইউটোপিয়াই থেকে যাবে। আমাদের বর্ণনায়, এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও ইতিহাসের মহামঞ্চে **বেলজিয়ম** এবং **সুইজারল্যান্ড** ছিল বিয়োগাত্মক প্রহসনের এক মামুলী ছবির মতো, যা প্রায় ব্যঙ্গচিত্রের শামিল: এর একটা হল বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, অন্যটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র, উভয় রাষ্ট্রেরই ধারণা যেন তারা যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম তেমনি ইউরোপীয় বিপ্লব থেকে মুক্ত।

১৮৪৮ সালে শ্রেণী-সংগ্রাম যে সুবিপুল রাজনৈতিক আকার ধারণ করে তা পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন সময় এসেছে যে-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শ্রেণী-প্রভুত্ব এবং শ্রমিকদের দাসত্বের প্রতিষ্ঠা সেই সম্পর্কটি নিয়েই আরো খুঁটিয়ে আলোচনা করা।

তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করে আমরা উপস্থাপন করব: (১) **পুঁজির সঙ্গে মজুরি-শ্রমের** সম্পর্ক, শ্রমিকদের গোলামি, পুঁজিপতির প্রভুত্ব; (২) **বর্তমান ব্যবস্থায় মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির ও তথাকথিত কৃষক সামাজিক বর্গের অবশ্যম্ভাবী পতন**; (৩) **ইউরোপের নানা** জাতির **বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর** জগৎ-জোড়া বাজারে স্বৈরাচারী প্রভু **ইংলন্ডের বাণিজ্যিক প্রভুত্ব ও শোষণ।**

আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সহজ ও সাধারণবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করব। অর্থশাস্ত্রের অতি প্রাথমিক সব ধারণাও পাঠকের আছে বলে ধরে নেব না। শ্রমিকেরা আমাদের কথা বুঝুক, এই আমাদের ইচ্ছা। তাছাড়া, জার্মানির সর্বত্র বর্তমান ব্যবস্থার সাধারণো প্রচলিত সমর্থনকারী থেকে শুরু করে **সমাজতান্ত্রিক অসম্ভব-সম্ভবকারী** এবং **অখ্যাতনামা যেসব রাজনৈতিক প্রতিভাধরের** সংখ্যা খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানির কর্ণধারদের চেয়েও বেশি তাদের সকলের মধ্যেই অতি সরল অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও একান্ত অজ্ঞতা ও ভাব-বিভ্রান্তি বর্তমান।

তাহলে প্রথম প্রশ্নটি এখন তোলা যাক:

মজুরি কি?
কিভাবে তা নিরূপিত হয়?

শ্রমিকদের যদি প্রশ্ন করা হয়: 'আপনাদের মজুরি কত?' তাহলে কেউ উত্তর দেয়: 'দিনে এক মার্ক করে আমার মালিক আমায় দেয়'; কেউ বলে: 'আমি পাই দুই মার্ক', ইত্যাদি। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক নিজ নিজ মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য — যেমন, এক গজ কাপড় বোনা বা বইয়ের এক ফর্মা কম্পোজ করার জন্য — ভিন্ন ভিন্ন মজুরির উল্লেখ করে। নানা রকম কথা বললেও এক বিষয়ে সবাই একমত: একটা নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের জন্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমফলের জন্য পুঁজিপতি যে অর্থ দেয় তাই মজুরি।

কাজেই, মনে হয়, পুঁজিপতি যেন টাকা দিয়ে শ্রমিকের শ্রম **ক্রয় করে,** টাকার বদলে মজুরেরা তার কাছে **বিক্রয় করে শ্রম**। কিন্তু এ হচ্ছে শুধু বাইরে থেকে দেখা। আসলে তারা পুঁজিপতির কাছে টাকার বদলে যা বিক্রয় করে সেটা তাদের **শ্রমশক্তি**। একদিন, একসপ্তাহ বা একমাস ইত্যাদির জন্য পুঁজিপতি তাদের এই শ্রমশক্তিটা কিনে নেয়। কেনার পর সে এ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ সময়টার জন্য শ্রমিকদের খাটিয়ে। যে পরিমাণ টাকা দিয়ে, ধরুন, দুই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাদের শ্রমশক্তি কিনল, তা দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি বা নির্দিষ্ট পরিমাণের অন্য যে কোনো পণ্যও কিনতে পারত। যে দুই মার্ক দিয়ে সে দু-পাউন্ড চিনি কেনে, সে টাকাটা হল এই দু-পাউন্ড চিনির **দাম**। যে দুই মার্ক দিয়ে সে বারো ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য শ্রমশক্তি কিনেছে, তা হচ্ছে বারো ঘণ্টার শ্রমের দাম। কাজেই, শ্রমশক্তি হুবহু চিনির মতোই একটা পণ্য। প্রথমটির মাপ ঘড়িতে, দ্বিতীয়টির মাপ দাঁড়িপাল্লায়।

শ্রমিকেরা তাদের পণ্য শ্রমশক্তিকে বিনিময় করে পুঁজিপতির পণ্যের জন্য, টাকার জন্য, এবং এই বিনিময় হয় একটা নির্দিষ্ট হারে। এত ঘণ্টা শ্রমশক্তি ব্যবহার করার দরুন এই পরিমাণ অর্থ। বারো ঘণ্টা তাঁত চালাবার জন্য দুই মার্ক। কিন্তু এই দুই মার্ক দিয়ে অন্য যে-যে পণ্য কেনা যায়, এই দুই মার্ক কি সে-সব পণ্যের তুল্য নয়? অতএব বাস্তবিকপক্ষে, শ্রমিক তার

পণ্য শ্রমশক্তি বিনিময় করেছে অন্যান্য সকল রকমের পণ্যের সঙ্গে এবং একটা নির্দিষ্ট হারে। তার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে দুই মার্ক দিয়ে পুঁজিপতি তাকে আসলে নির্দিষ্ট পরিমাণের মাংস, কাপড়, জ্বালানী কাঠ, আলো ইত্যাদি দিয়েছে। সুতরাং শ্রমশক্তি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যে হারে বিনিময় করা হয় সেই হার বা শ্রমশক্তির বিনিময়-মূল্য ব্যক্ত হচ্ছে এই **দুই মার্কে**। কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্যকে **টাকার** হিসেবে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই পণ্যের **দাম**। শ্রমশক্তির দাম, সাধারণত যাকে বলা হয় **শ্রমের দাম**, তার একটা বিশেষ নামই হচ্ছে **মজুরি**, মানুষের রক্তমাংস ছাড়া এই অদ্ভুত পণ্যটির আর কোনো আশ্রয় নেই।

যেকোন শ্রমিকের কথা ধরা যাক; ধরুন একজন তাঁতী। পুঁজিপতি তাকে তাঁত ও সুতো যোগায়। তাঁতী কাজে লাগে, সুতো কাপড়ে রূপান্তরিত হয়। পুঁজিপতি এই কাপড় নিয়ে, ধরুন, কুড়ি মার্কে বিক্রয় করে। তাঁতীর মজুরিটা কি এই কাপড়ের, এই কুড়ি মার্কের বা তার শ্রমফলের একটা **অংশ**? কোনোমতেই নয়। কাপড় বেচার অনেক আগে, সম্ভবত বোনা শেষ হবার অনেক আগেই তাঁতী তার মজুরি পেয়ে গেছে। কাজেই, কাপড় বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে পুঁজিপতি তার মজুরি দেয় না, বরং ইতোপূর্বে তার হাতে যে অর্থ ছিল তা থেকেই দেয়। মালিকের যোগানো তাঁত আর সুতো যেমন তাঁতীর উৎপন্ন দ্রব্য নয়, ঠিক তেমনি, তাঁতী তার নিজস্ব পণ্য, অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে পণ্য পেল, তাও তার উৎপন্ন দ্রব্য নয়। এও সম্ভব, মালিক তার কাপড়ের কোনো ক্রেতাই পেল না। হতে পারে, যা মজুরি দেওয়া হয়েছে, কাপড় বিক্রয় করে সেটুকুও উঠল না। আবার এও সম্ভব, তাঁতীর মজুরির তুলনায় বেশ লাভেই সে তা বিক্রয় করল। তাঁতীর সঙ্গে এসবের কোনো সংস্রব নেই। পুঁজিপতি যেমন তার মজুত ধনের, তার পুঁজির একাংশ দিয়ে কাঁচামাল — সুতো এবং শ্রমের হাতিয়ার — তাঁতটি কেনে, তেমনি তার ধনের আর এক অংশ দিয়ে তাঁতীর শ্রমশক্তি ক্রয় করে। এই সব জিনিস — কাপড়ের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি সমেত এই সব জিনিস কেনা-কাটার পরে পুঁজিপতি শুধু **নিজস্ব কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার** দিয়েই উৎপাদন করে। কেননা, আমাদের তাঁতীটিও

এখন ঐ শ্রমের হাতিয়ারেরই মধ্যে পড়ে, উৎপন্ন দ্রব্যে বা তার দামে যেমন তাঁতের কোনো বখরা নেই, তেমনি তাঁতীরও নেই।

কাজেই, মজুরিটা শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।

সুতরাং শ্রমশক্তি একটি পণ্য বিশেষ, এর মালিক শ্রমিক পুঁজির কাছে তা বিক্রয় করে। কেন বিক্রয় করে? বেঁচে থাকার জন্য।

কিন্তু শ্রমশক্তির, শ্রমের ব্যবহার হল শ্রমিকের নিজস্ব জৈবিক ক্রিয়া, তার স্বীয় জীবনের অভিব্যক্তি। আর **জীবনধারণের** প্রয়োজনীয় **উপকরণাদি** পাবার জন্য সে তার এই **জৈবিক ক্রিয়া** অন্যের নিকট বিক্রয় করে। কাজেই, জৈবিক ক্রিয়াটা তার কাছে বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। বেঁচে থাকার জন্য সে কাজ করে। শ্রমটাকে শ্রমিক নিজের জীবনের অঙ্গ বলেও গণ্য করে না; সেটা বরং তার জীবনের বলিদান। সেটা অন্যের কাছে হস্তান্তরিত একটি পণ্য। এই কারণে আবার তার কর্মের ফলটা তার কর্মের লক্ষ্য নয়। যে রেশমী কাপড় সে বোনে, খনি থেকে যে সোনা সে তুলে আনে, যে প্রাসাদ সে বানায়, এ সব সে তার নিজের জন্য উৎপাদন করে না। নিজের জন্য সে যা উৎপন্ন করে সেটা হল **মজুরি**, আর রেশমী কাপড়, সোনা, প্রাসাদ — সবকিছু তার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণের জীবনধারণের উপকরণে, হয়তো-বা তুলোর জামা, তামার কিছু মুদ্রা আর ভূগর্ভ কুঠরিতে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। শ্রমিক যে এই বারো ঘণ্টা কাল ধরে বোনে, সুতো কাটে, তুরপুন চালায়, কোঁদে, ইঁট গাঁথে, কোদাল চালায়, পাথর ভাঙ্গে বোঝা বয়, আরো কত কি করে — সেই বারো ঘণ্টা কালের বুনন, সুতো-কাটা, ফোঁড়া, কোঁদা, ইঁট গাঁথা, কোদাল চালানো, পাথর ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজকে কি শ্রমিকেরা জীবনের অভিব্যক্তি বা জীবন বলে গণ্য করে? উল্টো, এ কাজ থামার পরেই তাদের জীবনের শুরু: খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায়। অন্যদিকে, তাদের কাছে এই বারো ঘণ্টার শ্রমের কোন অর্থ নেই বুনন, সুতো-কাটা, কুঁদন ইত্যাদি হিসেবে, অর্থটা **উপার্জন** হিসেবে, যা দিয়ে সে খাবারের টেবিলে, তাড়িখানায়, বিছানায় পোঁছবে।

গ্রুটিপোকা যদি গ্রুটি বুনত কেবল শুঁয়াপোকা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য তবে সেই হত একটি পুরো মজুরি-খাটা শ্রমিক। শ্রমশক্তি বরাবর **পণ্য** ছিল না। শ্রম বরাবর মজুরি-শ্রম, অর্থাৎ **স্বাধীন শ্রম** ছিল না। ঠিক বলদ যেমন তার কর্মশক্তি কৃষকের কাছে বেচে না, দাসমালিকের কাছে **দাস**ও তেমনি নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করত না। শ্রমশক্তি সমেত দাস তার মনিবের কাছে সারা জীবনের মতো বিক্রীত হত। সে ছিল পণ্য, এক মনিব থেকে অন্য মনিবে তার হস্তান্তর চলত। **সে নিজেই** একটা পণ্য, কিন্তু শ্রমশক্তিটা **তার নি**জের পণ্য নয়। **ভূমিদাস** শুধু তার আংশিক শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। জমির মালিকের কাছ থেকে সে নিজে কোনো মজুরি পায় না; বরং জমির মালিকই তার কাছ থেকে একটা কর পায়।

ভূমিদাস হচ্ছে ভূমির সম্পত্তি, ভূস্বামীর হাতে সে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য তুলে দেয়। অপরদিকে, **স্বাধীন শ্রমিক** নিজেকে বিকিয়ে দেয় এবং বাস্তবিকপক্ষে বিকিয়ে দেয় নিজেকে খন্ড খন্ড করে। যে সর্বোচ্চ ডাক হাঁকে তার কাছে, কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার ও জীবনধারণের উপকরণের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক দিনের পর দিন তার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময় নিলামে বিক্রয় করে থাকে। এই শ্রমিক কোনো প্রভুর সম্পত্তি নয়, কোনো জমির সম্পত্তি নয়, কিন্তু তার দৈনিক জীবনের এই আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময়ের মালিক হল ক্রেতা। যে পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক নিজেকে খাটায়, খুশিমতো তাকে সে ছেড়ে যেতে পারে; পুঁজিপতিও প্রয়োজন বোধ করলে কোনো মুনাফা বা আশানুরূপ মুনাফা আর তার কাছে না পেলে তাকে বরখাস্ত করে। কিন্তু শ্রমশক্তি বিক্রয়ই শ্রমিকের জীবিকার একমাত্র উৎস — তাই তাকে বেঁচে থাকতে হলে **সমগ্র ক্রেতা শ্রেণীকে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীকে** সে ছেড়ে যেতে পারে না। বিশেষ কোনো পুঁজিপতির সম্পত্তি না হলেও সে **সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর** সম্পত্তি বটে; তার কাজ একজন মালিক পাওয়া, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই একজন ক্রেতা বেছে নেওয়া।

পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক আরো সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করার আগে মজুরি নির্ধারণের বেলায় অতি সাধারণ যে সব সম্পর্ক বিবেচনা করা দরকার, আমরা সংক্ষেপে তার আলোচনা করব।

আমরা দেখেছি, **মজ্বরি** একটা বিশেষ পণ্যের, অর্থাৎ শ্রমশক্তির **দাম**। কাজেই, অন্যান্য পণ্যের দাম যে নিয়মে নির্ধারিত হয় মজ্বরিও নির্বপিত হয় সে নিয়মেই।

সব্তরাং প্রশ্ন ওঠে: **পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় কিভাবে?**

কি দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়?

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, চাহিদার সঙ্গে যোগানের, প্রয়োজনের সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে। যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় তা **ত্রিবিধ**।

একই পণ্য বেচে বিভিন্ন বিক্রেতা। তাদের মালের উৎকর্ষ একই হলে যে সবচেয়ে সস্তা দামে বিক্রয় করে সে নিশ্চয়ই অন্যদের বাজার থেকে হটিয়ে দেবে এবং সবচেয়ে বেশি বেচতে পারবে। কাজেই, বিক্রয়ের জন্য, বাজারের জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা বিক্রয় করা, যতদ্বর সম্ভব বেশি বিক্রয় করা, সম্ভব হলে অন্য বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে বিক্রয় করা। কাজেই, একজন বেচে অপরের চেয়ে সস্তা দামে। সব্তরাং **বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** দেখা দেয়, তার ফলে তাদের আনা **পণ্যের** দাম **পড়ে যায়**।

ক্রেতাদের মধ্যেও আবার **প্রতিযোগিতা** আছে, তার ফলে বিক্রেয় পণ্যের দাম **চড়ে যায়**।

পরিশেষে, **প্রতিযোগিতা** চলে **ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে;** ক্রেতা চায় যতদ্বর সম্ভব সস্তা দামে ক্রয় করতে, বিক্রেতা চায় যতদ্বর সম্ভব চড়া দামে বিক্রয় করতে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ভর করে প্রতিযোগিতার উপরোক্ত দ্বই পক্ষের সম্পর্কের উপর, অর্থাৎ ক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, নাকি বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশি, তার উপর। দ্বই বাহিনীকে পরস্পর লড়াইয়ে নামায় শিল্প, এই দ্বই বাহিনীর প্রত্যেকটির ভিতর আবার নিজেদের মধ্যে, নিজ সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্যব্দ্ধ চলে। যে বাহিনীর সেনাদের মধ্যে অন্তর্যব্দ্ধ কম, বিপক্ষ দলের উপর তাদেরই জয় হয়।

ধরা যাক, বাজারে আছে ১০০ গাঁট তুলো, অথচ ক্রেতা আছে ১,০০০ গাঁটের জন্য। কাজেই, এক্ষেত্রে যোগানের চেয়ে চাহিদা দশ গুণ বেশি। ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেবে, তাদের প্রত্যেকেই চাইবে একশ গাঁটের অন্তত এক গাঁট, সম্ভব হলে সব গাঁটই নিজে নিতে। দৃষ্টান্তটি মোটেই খামখেয়ালীভাবে ধরে নেওয়া নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখেছি তুলো-ফসল অজন্মার কালে জনকয়েক পুঁজিপতি জোট বেঁধে শতেক গাঁট নয়, দুনিয়ার তামাম তুলো কেনার চেষ্টা করে। কাজেই, উল্লিখিত ক্ষেত্রে, একজন ক্রেতা চাইবে অন্যের চেয়ে গাঁট পিছু বেশি দাম দিয়ে অন্য ক্রেতাদের বাজার থেকে হটাতে। তুলো-বিক্রেতারা দেখে যে শত্রুবাহিনীর সেনাদলের মধ্যে তুমুল মারামারি কাটাকাটি চলেছে, তাদের মোট একশো গাঁট তুলোই যে বিক্রয় হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তুলোর দাম বাড়িয়ে দেবার জন্য যখন তাদের বিপক্ষদলের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে, সে মুহূর্তে যাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধিয়ে তুলোর দাম না কমিয়ে দেয় তার জন্য খুবই সতর্ক থাকবে তারা। ফলে, বিক্রেতাবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ সন্ধি হয়ে যায়। **একজোট** হয়ে তারা ক্রেতাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়, দার্শনিকের মতো হাত গুটিয়ে থাকে। অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ও উৎসুক ক্রেতার প্রস্তাবিত দামেরও একটা সুনির্দিষ্ট সীমা থাকে, তা না হলে বিক্রেতাদের দাবি চড়ানোর মাত্রারও সীমা-পরিসীমা থাকত না।

কাজেই, যদি কোনো পণ্যের যোগান তার চাহিদার চেয়ে কম হয়, তাহলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে খুব সামান্যই, এমন কি একেবারেই থাকে না। যে অনুপাতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমতে থাকে সে অনুপাতে ক্রেতাদর মধ্যে আবার তা বাড়তে থাকে। ফল দাঁড়ায়, পণ্যের দাম কম বেশি অনেকটা বেড়ে যায়।

সবাই জানে, এর বিপরীত ঘটনা এবং বিপরীত ফলাফলটা ঘটে আরো হামেশা: চাহিদার চেয়ে যোগান অনেক বেশি হয়ে পড়ে, বিক্রেতাদের মধ্যে মরীয়া প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, ক্রেতার অভাব ঘটে, মাল বিকোয় অসম্ভব সস্তায়।

কিন্তু দামের উঠতি ও পড়তি কি বোঝায়? চড়া দাম, কমতি দাম

মানেই বা কি? অণুবীক্ষণযন্ত্রযোগে দেখলে ধূলিকণাটিকে উঁচু বলে মনে হবে, আর পর্বতের সঙ্গে তুলনায় মিনার নিচু। দাম যদি চাহিদা আর যোগানের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, তাহলে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কটা নির্ধারিত হয় কিসে?

প্রথম যে বুর্জোয়াটির সঙ্গে দেখা হয়, চলুন তার কাছেই যাই। মুহূর্তেকও সে ভাববে না; নামতা দিয়ে সে আর-এক আলেকজন্ডরের মতো এই আধিবিদ্যক গ্রন্থিটিকে (৯) ছিন্ন করে দেবে। সে আমাদের বলবে, আমি যে পণ্য বিক্রয় করি তার উৎপাদন-ব্যয় যদি ১০০ মার্ক হয়, এবং ধরুন, বছরখানেকের মধ্যেই অবিশ্যি আমি যদি এইসব পণ্য বিক্রয় করে পাই ১১০ মার্ক, তাহলে সেটা হবে একটা ঠিক-ঠিক, সাধু, ন্যায্য মুনাফা। আর যদি তার বদলে পাই ১২০ মার্ক কি ১৩০ মার্ক, তাহলে সেটা চড়া মুনাফা; আর যদি ২০০ মার্কই পাই, তাহলে সেটা হবে অসাধারণ, বিরাট ধরনের মুনাফা। তাহলে বুর্জোয়াটির কাছে মুনাফার **মাপকাঠিটা** কি? তা হচ্ছে তার পণ্যের **উৎপাদন-ব্যয়**। তার এই পণ্যের বিনিময়ে যদি সে নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় কম, তাহলে তার ক্ষতি। তার পণ্যের বিনিময়ে সে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় বেশি, তাহলে তার মুনাফা। তার পণ্যের বিনিময়-মূল্যটা শূন্যমানের, অর্থাৎ **উৎপাদন-ব্যয়ের** কত ডিগ্রি উপরে বা নিচে তাই দেখে সে মুনাফার উঠতি বা পড়তি হিসাব করে।

তাহলে আমরা দেখলাম, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক দামের উঠতি পড়তি ঘটায় — দাম কখনো হয় চড়া, কখনো কমতি। অপ্রচুর যোগান অথবা চাহিদার অপরিমিত বৃদ্ধির দরুন যদি একটি পণ্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো পণ্যের দাম সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। তার কারণ পণ্যের দাম মুদ্রার হিসেবে সেই অনুপাতটাই শুধু ব্যক্ত করে যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্য তার বিনিময়ে দেওয়া হয়। ধরুন, এক গজ রেশমী কাপড়ের দাম যদি পাঁচ মার্ক থেকে ছয় মার্কে ওঠে, তাহলে রেশমী কাপড়ের তুলনায় রুপোর দাম পড়ে গেছে। একই ভাবে, যে সব পণ্যের দাম আগের মতো স্থির আছে, রেশমী কাপড়ের তুলনায় সে-সব পণ্যের দামও সমানভাবে পড়ে যায়। একই পরিমাণ রেশমী

কাপড়ের বিনিময়ে এখন অধিকতর পরিমাণে এইসব পণ্য দিতে হবে। বিশেষ কোনো পণ্যের দাম বাড়লে কি দাঁড়ায়? শিল্পের এই উন্নতিশীল শাখায় বিপুল পুঁজি ঢালা হবে এবং যে পর্যন্ত না এই শিল্পের মুনাফা চলতি মুনাফার সমান হয়ে আসে অথবা বরং, যে পর্যন্ত না এই শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অত্যুৎপাদনের দরুন উৎপাদন-ব্যয়ের নিচে নেমে যায় সে পর্যন্ত এই অনুকূল শিল্পটিতে পুঁজির আগম চলতেই থাকবে।

উল্টোদিকে, কোন পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের নিচে পড়ে গেলে এই পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে পুঁজি সরিয়ে নেওয়া হবে। শিল্পের যে-সব শাখা অপ্রচলিত হওয়ার দরুন উঠে যেতে বাধ্য তেমন ক্ষেত্র ছাড়া চাহিদার অনুরূপ না হওয়া পর্যন্ত এবং সেই হেতু তার দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে না ওঠা পর্যন্ত, বা বলা ভালো, যোগান চাহিদার চেয়ে কমে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দাম পুনরায় উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে না ওঠা পর্যন্ত, ঐ পণ্যের উৎপাদন বা যোগান ক্রমাগত পুঁজি ভেগে যাবার জন্য পড়ে চযতে থাকবে, **কারণ কোনো পণ্যের চলতি দাম সবসময়ে সেটার উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে বা নিচে থাকে।**

শিল্পের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজি ক্রমাগত যাতায়াত করে তা দেখা গেল। চড়া দাম অতিমাত্রায় পুঁজি টেনে আনে, কমতি দাম তেমনি অতিমাত্রায় পুঁজি সরিয়ে দেয়।

অন্যদিক দিয়েও দেখানো যায় কি করে শুধু যোগানই নয়, চাহিদাও উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু তাতে আমাদের বক্তব্য বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়।

এই মাত্র আমরা দেখলাম যে, যোগান ও চাহিদার ওঠা-নামা পণ্যের দামকে ক্রমাগত উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। **একথা ঠিক যে, কোনো পণ্যের প্রকৃত দাম সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে বা নিচে থাকবে; কিন্তু ওঠা-নামায় পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যায়।** কাজেই, নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে শিল্পের জোয়ার-ভাঁটা একসঙ্গে ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে, উৎপাদন-ব্যয় অনুযায়ী এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময় চলছে। কাজেই, পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে এই দাম-নির্ধারণ অর্থতত্ত্ববিদদের অর্থে দেখলে

চলবে না। অর্থতত্ত্ববিদরা বলেন, পণ্যের **গড়পড়তা দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান**; এবং তাঁদের মতে এটা হল একটা **নিয়ম।** যে বিশৃঙ্খল গতিবিধির মধ্যে পড়তি দিয়ে উঠতি এবং উঠতি দিয়ে পড়তির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় সেটাকে তাঁরা আপতিক ব্যাপার বলে গণ্য করেন। সমান যুক্তিতেই দামের এই ওঠা-নামাটাকেই নিয়ম এবং উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নিরূপণটাই বরং আকস্মিক বলে গণ্য হতে পারে, কোনো কোনো অর্থতত্ত্ববিদ তা সত্যিই করেছেন। আরো গভীরভাবে দেখতে গেলে কিন্তু একমাত্র এই যে ওঠা-নামাটা সঙ্গে নিয়ে আসে অত্যন্ত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, ভূমিকম্পের মতো বুর্জোয়া সমাজকে ভিতসুদ্ধ কাঁপিয়ে তোলে, আসলে একমাত্র এই ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারিত করে দামকে। এই বিশৃঙ্খলার সামগ্রিক গতিটাই হচ্ছে সেটার শৃঙ্খলা। শিল্পের এই অরাজকতার মধ্যে, চক্রাকার এই আবর্তনের মধ্যে প্রতিযোগিতা যেন একদিকের আতিশয্যের ক্ষতিপূরণ করে আর একদিকের আতিশয্য দিয়ে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, পণ্যের দাম এমনভাবে উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়, যাতে করে যখন দাম উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে বেশি হচ্ছে এমন একটা পর্বের অভাবপূরণ হয় আরেকটা পর্বে যখন দাম উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম, এবং অনুরূপভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে কম দামের পর্বের অভাবপূরণ করে বেশি দামের পর্ব। বিশেষ এক-একটা শিল্পজাত দ্রব্যকে আলাদা আলাদা ভাবে নিলে অবশ্য এটা খাটে না, খাটে শিল্পের সমগ্র শাখাটি সম্পর্কে। সুতরাং বিশেষ কোনো শিল্পপতির ক্ষেত্রেও এটা খাটে না, শুধু খাটে সমগ্র শিল্পপতি শ্রেণীটির ক্ষেত্রে।

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নির্ণয়, আর পণ্যোৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় দিয়ে দাম নির্ণয় — এ দুটো একই কথা। কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে থাকে: (১) কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ এমন সব শিল্পজাত দ্রব্য যেগুলির উৎপাদনে নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রম-দিবস লেগেছে, সুতরাং তা হল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময়; এবং (২) প্রত্যক্ষ শ্রম, যার পরিমাপ হয় সময় দিয়েই।

কিন্তু, যে-সব সাধারণ নিয়ম সাধারণভাবে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, সে-সব নিয়মই অবশ্য **মজুরিকেও, শ্রমের দামকেও** নিয়ন্ত্রণ করে।

যোগান ও চাহিদার সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমশক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি ও শ্রমশক্তির বিক্রেতা শ্রমিক, উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার গতি অনুযায়ী মজুরি বাড়ে বা কমে। পণ্যের দামের ওঠা-নামা অনুযায়ী সাধারণভাবে মজুরি বাড়ে কমে। **এই ওঠা-নামার সীমার অভ্যন্তরে কিন্তু শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে — শ্রমশক্তির রূপে পণ্যের উৎপাদনে আবশ্যক শ্রম-সময় দিয়ে।**

তাহলে শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়টা কি?

শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে খরচ পড়ে তাই হল শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয়।

তাই বিশেষ কোনো কাজের শিক্ষানবিসিতে সময় যত অল্প লাগবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয়ও তত কম পড়বে, তার শ্রমের দাম, তার মজুরিও তত কম হবে। শিল্পের যে-সব শাখায় শিক্ষানবিসির জন্য সময় বিশেষ প্রয়োজন হয় না, যেখানে শ্রমিকের শুধু দৈহিক সত্তাটাই যথেষ্ট, সে-সব শ্রমিকের উৎপাদন-ব্যয় হল প্রায় তাকে বাঁচিয়ে ও শ্রমক্ষম রাখার উপযোগী পণ্যগুলি মাত্র। কাজেই, **এই শ্রমিকের শ্রমের দাম তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম দিয়ে** নির্ধারিত।

আরো একটা কথা কিন্তু এখানে আসে যাতে মনোযোগ না দেওয়া চলবে না। কারখানা-মালিক তার উৎপাদন-ব্যয় এবং সেই অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হিসাব করার সময় শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি হিসাব ধরে নেয়। ধরুন, একটা যন্ত্রের দাম ১,০০০ মার্ক, আর দশ বছরের মধ্যে তা ক্ষয় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে পণ্যের দামের মধ্যে বছরে আরো ১০০ মার্ক ধরে নেবে, যাতে সে দশ বছর বাদে জীর্ণ মেশিনের বদলে একটা নতুন মেশিন কিনতে পারবে। ঠিক এইভাবেই সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করার সময় তার সঙ্গে ধরতে হবে বংশবৃদ্ধির খরচ, যাতে করে শ্রমিকের জাত বেড়ে চলে, জীর্ণ শ্রমিকের জায়গায় নতুন শ্রমিক নিতে পারে। এইভাবে, যন্ত্রপাতির অবচয়ের মতো শ্রমিকের অবচয়ও হিসেবে ধরা হয়।

সুতরাং সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হল **শ্রমিকের জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচের সমান।** এই জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচার দাম হল মজুরি। এইভাবে নিরূপিত মজুরিকে **ন্যূনতম মজুরি** বলা হয়। উৎপাদন-

ব্যয় দিয়ে সকল পণ্যের দাম নির্ধারণের মতো ন্যূনতম মজুরিও **ব্যক্তিবিশেষের** বেলায় খাটে না, খাটে **বর্গের** বেলায়। ব্যক্তি-শ্রমিক, লাখ লাখ শ্রমিক নিজেদের জীবনধারণ এবং বংশরক্ষার মতো যথেষ্ট টাকা পায় না; **কিন্তু সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর মজুরি** তাদের ওঠা-নামার পরিধির মধ্যে এই ন্যূনতম মজুরির সমান হয়ে দাঁড়ায়।

যেকোন পণ্যের দামের মতো মজুরিকেও যে-সব অতি সাধারণ নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তা বোঝা গেল, তাই আমরা এখন আরো খুঁটিয়ে আমাদের বিষয়টি আলোচনা করতে পারব।

নতুন কাঁচামাল, নতুন শ্রমের হাতিয়ার, জীবনধারণের বিভিন্ন নতুন উপকরণ উৎপন্ন করার জন্য যত কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং জীবনধারণের যত রকমের উপকরণ নিয়োজিত হয়, তার সমষ্টি হল পুঁজি। পুঁজির এই সব উপাদানই শ্রমের সৃষ্টি, শ্রমোৎপন্ন, **সঞ্চিত শ্রম**। যে সঞ্চিত শ্রম নতুন উৎপাদনের উপায়স্বরূপ তাকে পুঁজি বলে।

এই কথা বলেন অর্থতাত্ত্বিকেরা।

নিগ্রো ক্রীতদাস কাকে বলে? কৃষ্ণাঙ্গ জাতির একজন মানুষ। উভয় ব্যাখ্যাই সমান দরের।

নিগ্রো নিগ্রোই। নির্দিষ্ট এক সম্পর্কপাতেই সে ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায়। সুতো-কাটার যন্ত্র একটা যন্ত্র যা দিয়ে সুতো কাটা হয়। বিশেষ একটা সম্পর্কপাতেই শুধু তা **পুঁজি** হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে আর তখন পুঁজি থাকে না, ঠিক যেমন সোনা নিজে থেকে কোনো **মুদ্রা** নয়, চিনি যেমন চিনির দাম নয়।

উৎপাদনে মানুষের ক্রিয়া শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, পরস্পরের ওপরেও। বিশেষ ধরনে সহযোগিতা ক'রে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া বিনিময় ক'রে তবেই তারা উৎপাদন করে। উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেবল এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকৃতির উপর তাদের ক্রিয়া, উৎপাদন।

উৎপাদকরা যে-সব পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যে-সব অবস্থার মধ্যে তারা পরস্পরের কাজের বিনিময় সাধন করে এবং উৎপাদনের সমগ্র কর্মে অংশগ্রহণ করে সে-সব সামাজিক সম্পর্ক স্বভাবতই উৎপাদনের

উপায়ের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হবে। যুদ্ধের নতুন একটা হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সমগ্র অভ্যন্তরীণ সংগঠনের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। যে-সব সম্পর্কপাতের অভ্যন্তরে ব্যক্তিবিশেষেরা সৈন্যবাহিনী গঠন করে ও সৈন্যবাহিনী হিসেবে কাজ করতে পারে তা পরিবর্তিত হল, বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কেও বদল ঘটল।

এইভাবে, যে-সব সামাজিক **সম্পর্কের** মধ্যে ব্যক্তিবিশেষেরা উৎপাদন করে, **উৎপাদনের বৈষয়িক উপকরণের, উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে সমগ্রভাবে নিলে যা হয় তাকে বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরের সমাজ**, স্বকীয় বিশিষ্ট চরিত্রের একটা সমাজ। **প্রাচীন** সমাজ, **সামন্ততান্ত্রিক** সমাজ, **বুর্জোয়া** সমাজ, এগুলি হল উৎপাদন-সম্পর্কগুলিরই এই ধরনের সমষ্টি, যার প্রত্যেকটিই আবার মানব ইতিহাসের বিকাশ-ধারার এক একটি বিশেষ স্তর।

পুঁজিও একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক। **এ হল বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক**, বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক। জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল, যে-সব নিয়ে পুঁজি গঠিত, সে-সব কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয় নি? এগুলি কি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায়, নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না? ঠিক এই নির্দিষ্ট সামাজিক চরিত্রের জন্যই কি যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য নতুন উৎপাদনের কাজে লাগে তা **পুঁজিতে** পরিণত হচ্ছে না?

পুঁজি শুধু জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার ও কাঁচামাল, শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যই নয়; তা সেই সঙ্গে **বিনিময়-মূল্যও** বটে। যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য পুঁজির অন্তর্ভুক্ত সে-সবই হল **পণ্য**। কাজেই, পুঁজি শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিই নয়, পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি, **সামাজিক পরিমাণসমূহের** (magnitudes) সমষ্টি।

পশমের বদলে তুলো, গমের বদলে চাল, রেলগাড়ির বদলে স্টিমার

ধরলেও পঁব্জি সেই একই থাকে, শব্ধব্ যদি পশম, গম ও রেলগাড়ির ভিতর পর্বে যে পঁব্জি নিহিত ছিল, তার সঙ্গে পঁব্জির অবয়ব — এই তুলো, চাল ও স্টিমারের বিনিময়-মব্ল্যও, দামও এক হয়। পঁব্জির বিন্দব্মাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার অবয়বের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

কিন্তু প্রতিটি পঁব্জি পণ্যের সমষ্টি অর্থাৎ বিনিময়-মব্ল্যের সমষ্টি হলেও পণ্যের প্রতিটি সমষ্টি বা বিনিময়-মব্ল্যের প্রতিটি সমষ্টিই পঁব্জি নয়।

বিনিময়-মব্ল্যের প্রত্যেকটি সমষ্টিই এক একটি বিনিময়-মব্ল্য। প্রত্যেক পৃথক বিনিময়-মব্ল্যও আবার নানা বিনিময়-মব্ল্যের সমষ্টি। যেমন, ১,০০০ মার্ক দামের একখানা বাড়ির বিনিময়-মব্ল্য হল ১,০০০ মার্ক। এক ফেনিগ দামের একখানা কাগজ হচ্ছে একশতাংশ ফেনিগ দামের একশোটি বিনিময়-মব্ল্যের সমষ্টি। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যই হল **পণ্য**। যে নির্দিষ্ট হারে তাদের বিনিময় করা হয় তাই তাদের **বিনিময়-মব্ল্য,** অথবা মব্দ্রারব্পে ব্যক্ত করলে তাই তাদের **দাম**। এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাই হোক তাতে তাদের **পণ্য** ধর্ম বা **বিনিময়-মব্ল্য** রব্প চরিত্র বা নির্দিষ্ট **দাম** থাকার গব্ণ বদলায় না। গাছ সেটা বড়ই হোক আর ছোটই হোক গাছই থেকে যায়। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে এক মন লোহা বা এক ছটাক লোহা যাই বিনিময় করি তাতে কি তার পণ্য চরিত্রে বা বিনিময়-মব্ল্য রব্প চরিত্রে কোনো তারতম্য ঘটে? পরিমাণ অনব্যায়ী পণ্যটির মব্ল্য বাড়ে বা কমে, দাম বেশি বা কম হয়।

তাহলে কি করে পণ্যের সমষ্টি, বিনিময়-মব্ল্যের সমষ্টি পঁব্জি হয়ে দাঁড়ায়?

প্রত্যক্ষ, জীবন্ত শ্রমশক্তির সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে একটা স্বাধীন সামাজিক **শক্তি** হিসেবে, অর্থাৎ **সমাজের একাংশের** শক্তিরব্পে নিজেকে টিকিয়ে রেখে এবং বাড়িয়ে তুলে তা পঁব্জি হয়ে দাঁড়ায়। পঁব্জির অপরিহার্য পর্বশর্ত হিসেবে এমন একটি শ্রেণী থাকা দরকার যাদের শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর কিছব্ই নেই।

প্রত্যক্ষ, জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত, অতীত, মব্র্ত করা শ্রমের প্রভুত্বই সঞ্চিত শ্রমকে পঁব্জিতে পরিণত করে।

নতুন উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে সঞ্চিত শ্রম জীবন্ত শ্রমের সেবা করলে তা পঁব্জি হয় না। পঁব্জি হয় যদি সঞ্চিত শ্রমের বিনিময়-মব্ল্যে সংরক্ষণ

ও সংবর্ধনের উপায় হিসেবে জীবন্ত শ্রম সঞ্চিত শ্রমের কাজে লাগে।

পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটে?

শ্রমিক তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবনধারণের উপকরণ পায়, আর পুঁজিপতি তার দেওয়া জীবনধারণের উপকরণের বিনিময়ে পায় শ্রম, শ্রমিকের উৎপাদনী ক্রিয়া, সৃজন শক্তি, যা দিয়ে শ্রমিক যেটুকু ভোগ করে শুধু তাই সে শোধ দেয় না, **সঞ্চিত শ্রমের যে মূল্য ছিল তা আরো বাড়িয়ে দেয়।** শ্রমিক পুঁজিপতির কাছ থেকে প্রাপ্তিসাধ্য জীবনোপায়ে একাংশ পায়। উপকরণগুলো তার কোন্ কাজে লাগে? প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করার কাজে। জীবনধারণের উপকরণগুলো দিয়ে আমার দেহটাকে যে সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখি সে সময়টা যদি জীবনধারণের নতুন উপকরণ তৈরী না করি, জীবনধারণের উপকরণগুলো ভোগ করার ফলে যে মূল্য লোপ পায় তার বদলে আমার শ্রম দিয়ে যদি নতুন মূল্য তৈরী না করি—তাহলে ভোগ করা মাত্র সে সব জীবনধারণের উপকরণ আমার কাছে একেবারেই ফুরিয়ে যায়। জীবনধারণের প্রাপ্ত উপকরণগুলোর বিনিময়ে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে কিন্তু এই মহৎ করে সঞ্চিত শ্রমের পুনরুৎপাদনশীল শক্তিটুকুকেই সমর্পণ করে দেয়। ফলে নিজের দিক থেকে সে তা হারায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; একজন খামারমালিক তার দিন-শ্রমিককে দৈনিক মজুরি দেয় পাঁচ রৌপ্য গ্রশ। এই পাঁচ রৌপ্য গ্রশের জন্য দিন-শ্রমিক দিনভোর খামারমালিকের মাঠে কাজ করে এবং তাতে করে মালিকের জন্য দশ রৌপ্য গ্রশের আয় নিশ্চিত করে দেয়। দিন-শ্রমিক খামারমালিক যা দিল শুধু সেই মূল্যটুকুই সে ফিরে পেল তাই নয়, তা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কাজেই, দিন-শ্রমিককে দেওয়া পাঁচ রৌপ্য গ্রশ সে খাটিয়েছে, ভোগ করেছে ফলপ্রসূ ও উৎপাদনশীলভাবে। পাঁচ রৌপ্য গ্রশ দিয়ে সে কিনেছে শ্রমিকের সেই পরিমাণ শ্রম ও শক্তি, যা দিয়ে সে দ্বিগুণ মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য ফলিয়েছে, পাঁচ রৌপ্য গ্রশ থেকে তুলেছে দশ। অপরপক্ষে, দিন-শ্রমিক যে উৎপাদন-শক্তির ক্রিয়া খামারমালিককে বিকিয়ে দিয়েছে তার বদলে সে পায় পাঁচ রৌপ্য গ্রশ, যা বিনিময় ক'রে সে কেনে জীবনধারণের উপকরণ এবং কম-বেশি দ্রুত তা ভোগ করে ফেলে। কাজেই, এই পাঁচ রৌপ্যে গ্রশ টাকাটা ব্যবহৃত হচ্ছে দুই ভাবে:

পুঁজির পক্ষে **উৎপাদনশীলভাবে**, কারণ এই টাকাটা যে শ্রমশক্তির* সঙ্গে বিনিময় করা হয়েছে তা দশ রৌপ্য গ্রশ উৎপাদন করেছে, সেটা শ্রমিকের পক্ষে **অনুৎপাদনশীলভাবে**, কারণ যে জীবনধারণের উপকরণের সঙ্গে টাকাটার বিনিময় হয়েছে তা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, খামারমালিকের সঙ্গে ঐ একই বিনিময়ের পুনরাবৃত্তি করেই সে কেবল তার মূল্য পুনরুদ্ধার করতে পারে। **তাই, পুঁজি বললে সেই সঙ্গে মজুরি-শ্রম, এবং মজুরি-শ্রম বললে সেই সঙ্গে পুঁজি ধরে নিতে হয়। একটি হল অপরের অস্তিত্বের হেতুস্বরূপ; উভয়ে উভয়কে সৃষ্টি করে চলেছে।**

সুতাকলের শ্রমিক কি শুধুই সুতীবস্ত্র উৎপন্ন করে? না, সে পুঁজি উৎপন্ন করছে। সে যে মূল্য উৎপাদন করে তা দিয়ে ফের তার শ্রম খাটান যায় এবং তাতে করে নতুন মূল্য তৈরী করা চলে।

শ্রমশক্তির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করে, মজুরি-শ্রমকে উজ্জীবিত করেই শুধু পুঁজি বাড়তে পারে। পুঁজিকে বাড়িয়ে, সেটা যে শক্তির গোলাম সেটাকে শক্তিশালী করেই কেবল মজুরি-খাটা শ্রমিকের শ্রমশক্তি পুঁজির সঙ্গে নিজেকে বিনিময় করতে পারে। **কাজেই, পুঁজির বৃদ্ধি মানেই প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি।**

কাজেই, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের স্বার্থ **এক ও অভিন্ন**, তাই বলে বুর্জোয়ারা ও তাদের অর্থতাত্ত্বিকেরা। তাই বটে! পুঁজি শ্রমিককে না খাটালে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। শ্রমশক্তি শোষণ করতে না পারলে পুঁজিরও ধ্বংস, এবং শোষণ করার জন্য শ্রমশক্তিকে কিনতে হবে তাকে। যত তাড়াতাড়ি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্ত পুঁজি, উৎপাদনশীল পুঁজি বাড়ে, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি শিল্প ফেঁপে ওঠে, যতই বেশি বুর্জোয়াদের ধনাগম হয়, কাজ-কারবার তাদের যত ভাল চলতে থাকে, ততই পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ে, ততই চড়া দামে শ্রমিকেরা নিজেদের বিক্রয় করে।

কাজেই, শ্রমিকের একটা চলনসই অবস্থার জন্য অনিবার্য শর্ত হচ্ছে **উৎপাদনশীল পুঁজির যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি।**

---

* এখানে 'শ্রমশক্তি' শব্দটি এঙ্গেলস যোগ করেন নি, 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসের রচনাতেই তা ছিল। — সম্পাঃ

কিন্তু উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধিটা কি বস্তু? জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত শ্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব বৃদ্ধি। মজুরি-শ্রম যদি অন্যের এরূপ ধন উৎপন্ন করে যেটা তার উপরই প্রভুত্ব করে, যে শক্তি তার বিরুদ্ধ, সেই পুঁজি উৎপন্ন করে — তাহলে এই বিরুদ্ধ শক্তির কাছ থেকে তার কাছে ফিরে আসবে কর্মসংস্থান, অর্থাৎ জীবনধারণের উপকরণ, সেটা এই শর্তে যে, মজুরি-শ্রম নিজেকে নতুনভাবে পুঁজির অংশবিশেষ করে তুলবে, সে নিজে সেই চালকদণ্ডে পরিণত হবে, যাতে পুনরায় বৃদ্ধির ত্বরান্বিত গতিতে চালু হয় পুঁজি।

পুঁজি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন একথা বলার মানে শুধু এই বলা যে, মজুরি-শ্রম আর পুঁজি একই সম্পর্কের দুটো দিক। একটি অপরটিকে উপযোজিত করে, সুদখোর ও অপব্যয়কারী যেমন পরস্পর পরস্পরকে উপযোজিত করে।

মজুরি-খাটা শ্রমিক যতদিন মজুরি-খাটা শ্রমিক থাকে ততদিন তার ভাগ্য নির্ভর করে পুঁজির উপর। এই হল শ্রমিক আর পুঁজিপতির বহুবিঘোষিত স্বার্থসমতা।

পুঁজি বাড়লে মজুরি-শ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে; এককথায় বেশি লোকের উপর পুঁজির প্রভুত্ব প্রসারিত হয়। সবচেয়ে সুবিধাজনক উদাহরণই ধরা যাক: উৎপাদনশীল পুঁজি বাড়লে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায়, ফলে শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরিও চড়ে যায়।

একটা বাড়ি যত ছোট হোক আশেপাশের বাড়িগুলো যতদিন তারই মতো ছোট ততদিন বসবাসের যাবতীয় সামাজিক চাহিদা তাতেই মেটে। কিন্তু সেই ছোট বাড়িটির পাশে যদি একটি প্রাসাদ দেখা দেয়, তাহলে সেই ছোট বাড়িটিকে নগণ্য কুঁড়েঘরই মনে হবে। ক্ষুদ্র বাড়িটি দেখে মনে হবে এর মালিকের কোনো দাবি নেই, থাকলেও তা সামান্য। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িটি যত বড়ই হয়ে উঠুক না কেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিবেশীর প্রাসাদও তার সমান অনুপাতে বা অপেক্ষাকৃত বেশি অনুপাতে বড় হয়, তাহলে ক্ষুদ্রতর বাড়িটির বাসিন্দা ক্রমাগত চারটি দেয়ালের মধ্যে অস্বস্তি, অসন্তুষ্ট ও হীন বোধ করবে।

মজ্বরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ধরে নেয় উৎপাদনশীল প্‌জির একটা দ্রুত বৃদ্ধি। উৎপাদনশীল প্‌জির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত, বিলাসব্যসন, সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক উপভোগও সমান দ্রুতগতিতেই বেড়ে যায়। কাজেই, শ্রমিকের উপভোগ কিছুটা বাড়লেও তার থেকে সামাজিক পরিতৃপ্তি যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা শ্রমিকের কাছে যা দুর্লভ প্‌জিপতিদের সেই বর্ধিত উপভোগের তুলনায় আর সাধারণত গোটা সমাজের বিকাশের তুলনায় পিছিয়েই যায়। সমাজ থেকেই জাগে আমাদের চাহিদা ও উপভোগ; তাই সমাজের মাপকাঠিতেই আমরা সেগুলোর পরিমাপ করি, চরিতার্থতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মাপকাঠিতে নয়। আমাদের চাহিদা ও উপভোগের চরিত্র সামাজিক, তাই সেগুলো আপেক্ষিক।

সাধারণত মজ্বরির বিনিময়ে যে পরিমাণ পণ্যাদি পাওয়া যায় শুধু তা দিয়েই মজ্বরি নির্পিত হয় না। তার মধ্যে নানা রকমের সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

শ্রমশক্তির বিনিময়ে শ্রমিকেরা যা পায় তা হল প্রথমত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ। শুধু কি এই আর্থিক দামেই মজ্বরি নির্ধারিত?

আমেরিকায় আরো সমৃদ্ধ ও সহজক্রিয় খনি আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতকে ইউরোপে সোনা ও রুপোর প্রচলন বেড়ে গেল। তাই অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সোনা ও রুপোর মূল্য তখন পড়ে যায়। শ্রমশক্তির বিনিময়ে শ্রমিকেরা কিন্তু আগেরই মতো একই পরিমাণের রৌপ্য মুদ্রা পেত। তাদের শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই থাকলেও তখন তাদের মজ্বরি গেল পড়ে, কারণ একই পরিমাণের রুপোর বিনিময়ে তারা তখন অন্যান্য পণ্য কম পরিমাণে পেতে থাকল। ষোড়শ শতকে যে সমস্ত অবস্থাধীনে প্‌জি বেড়ে যায় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এটা তার অন্যতম।

আরেকটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। অজন্মার ফলে ১৮৪৭ সালের শীতে শস্য, মাংস, মাখন, পনীর প্রভৃতি একান্ত অপরিহার্য জীবনধারণের উপকরণগুলোর দাম খুব চড়ে যায়। ধরুন, শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তির বিনিময়ে তখন আগের মতো একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছে। কিন্তু তাদের মজ্বরি পড়ে যায় নি কি? নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। সেই একই পরিমাণের অর্থের বিনিময়ে তারা এখন কম পরিমাণের রুটি, মাংস ইত্যাদি পাবে। তাদের মজ্বরিটা পড়ে গেল রুপোর

মূল্য কমে যাওয়ায় নয়, পরন্তু জীবনধারণের উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়ায়।

পরিশেষে ধরা যাক, শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই আছে, অথচ নতুন যন্ত্রাদির ব্যবহার, অনুকূল ঋতু প্রভৃতির ফলে কৃষিজ ও শিল্পজ সমস্ত পণ্যের দাম পড়ে গেছে। সেই একই অর্থে শ্রমিকেরা এখন সব রকমের পণ্যই বেশি পরিমাণে কিনতে পারবে। কাজেই, এক্ষেত্রে তাদের মজুরির আর্থিক মূল্য অদলবদল হয় নি বলেই তাদের মজুরিটা বেড়ে গেল।

তাই শ্রমের আর্থিক দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরি, এবং আসল মজুরি, অর্থাৎ মজুরির বিনিময়ে যে পণ্যসমষ্টি প্রকৃতই পাওয়া যায়, এ দুটি তাহলে এক জিনিস নয়। সুতরাং আমরা যখন মজুরির ওঠা বা নামার কথা তুলি, তখন শ্রমের শুধু আর্থিক দাম, অর্থাৎ আর্থিক মজুরির কথা মনে রাখলেই চলবে না।

কিন্তু আর্থিক মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থের জন্য মজুর পুঁজিপতির কাছে নিজেকে বিক্রয় করে, অথবা আসল মজুরি, অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য এই অর্থ দিয়ে কেনা যায়, মজুরির মধ্যে শুধু এ দুটি সম্পর্কই বর্তমান নয়।

সর্বোপরি, পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেও মজুরি নির্ধারণ করা যায়। এই হিসাবে এ হল তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি।

আসল মজুরি অন্যান্য পণ্যের দামের আপেক্ষিকে শ্রমের দাম ব্যক্ত করে; অপরপক্ষে, আপেক্ষিক মজুরি ব্যক্ত করে উৎপাদিত নতুন মূল্যের যতটা অংশ সঞ্চিত শ্রম বা পুঁজিতে বর্তাল তার আপেক্ষিকে কতটা অংশ পেল প্রত্যক্ষ শ্রম।

আগে ২১ পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি, 'মজুরিটা শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ দিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি।' কিন্তু শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য বেচে যে দাম পুঁজিপতি পায় তা থেকে মজুরির বাবদে যে খরচা হয় তা পুঁজিপতিকে পূরণ করে নিতে হবে; আর এমনভাবে পুরিয়ে নিতে হবে যাতে সাধারণত উৎপাদন-ব্যয়ের উপরেও তার একটা উদ্বৃত্ত থাকে, মুনাফা থাকে। পুঁজিপতির কাছে শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় দাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়: **প্রথমত**, কাঁচামালের বাবদ আগাম দেওয়া

দাম তুলে নেওয়া, তাছাড়া সরবরাহ করা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের অন্যান্য উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা; **দ্বিতীয়ত,** আগাম দেওয়া মজুরি তুলে নেওয়া; **তৃতীয়ত,** যে উদ্বৃত্তটা বাকি থাকে, অর্থাৎ যেটা পুঁজিপতির মুনাফা। প্রথম অংশটায় শুধু **পূর্ব থেকে বর্তমান মূল্য** তুলে নেওয়া হয়, তাই বেশ বোঝা যায়, মজুরি পূরণ করা এবং পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মুনাফা এই দুটোই পুরোপুরি আসে কাঁচামালে সংযুক্ত **শ্রমিকের শ্রমোৎপন্ন নতুন মূল্য** থেকে। **এই অর্থে,** পরস্পর তুলনার জন্য আমরা মজুরি ও মুনাফা উভয়কেই শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্যের বখরা হিসাবে গণ্য করতে পারি।

আসল মজুরি একই থাকলে, এমন কি বেড়ে গেলেও আপেক্ষিক মজুরি পড়ে যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, জীবনধারণের সবগুলো উপকরণের দাম দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে, আর দৈনিক মজুরি কমে গেছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, ধরা যাক, তিন মার্ক থেকে দু-মার্কে। আগে তিন মার্ক দিয়ে শ্রমিক যা পেত এখন এই দু-মার্ক দিয়ে সে তার চেয়ে বেশি পরিমাণের পণ্য পেলেও পুঁজিপতির মুনাফার অনুপাতে তার মজুরি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। পুঁজিপতির (ধরা যাক কারখানা-মালিকের) মুনাফা এক মার্ক বেড়ে গেছে, তার মানে সে শ্রমিককে আগের চেয়ে কম পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি দিচ্ছে, কিন্তু তার বদলে শ্রমিককে উৎপন্ন করতে হচ্ছে আগের চেয়ে অধিক পরিমাণের বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। শ্রমের বখরার তুলনায় পুঁজির বখরা বেড়ে গেছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামাজিক ধনের বণ্টন আরো অসম হয়েছে। একই পুঁজিতে পুঁজিপতি এখন বেশি পরিমাণের শ্রমের উপর প্রভুত্ব করছে। শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, শ্রমিকের সামাজিক অবস্থান অবনত হয়েছে, পুঁজিপতির কাছ থেকে আরো এক ধাপ নিচে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল।

তাহলে মজুরি ও মুনাফার পারস্পরিক সম্পর্কে যে পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা নির্ধারিত হয় কোন্ সাধারণ নিয়ম অনুসারে?

পরস্পরের সঙ্গে মজুরি ও মুনাফার বাস্ত অনুপাতের সম্পর্ক। শ্রমের বখরা দৈনিক মজুরি যে পরিমাণ কমে, পুঁজির বখরা মুনাফা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়; বিপরীত ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম। মজুরি যতটা কমে, মুনাফা ততটা বাড়ে; মজুরি যতটা বাড়ে, মুনাফা ততটা কমে।

সম্ভবত এখানে আপত্তি উঠবে, কোনো নতুন বাজার উন্মুক্ত হওয়া, অথবা পুরাতন বাজারের চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি যে কোনো কারণেই হোক, তার পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে পুঁজিপতি অন্য কোনো পুঁজিপতির সঙ্গে সুবিধাজনক বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে; কাজেই, মজুরি বাড়া-কমা অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিনিময়-মূল্যের বাড়া-কমা ছাড়াই অন্য পুঁজিপতিদের ঘাড় ভেঙে কোনো পুঁজিপতির মুনাফা বাড়তে পারে; অথবা শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতি, প্রাকৃতিক শক্তির একটা নতুন প্রয়োগ ইত্যাদি মারফতও তার মুনাফা বাড়তে পারে।

প্রথমত, স্বীকার করতে হবে যে, বিপরীতভাবে ঘটলেও ফল একই দাঁড়াচ্ছে। এখানে মজুরি কমে যাবার ফলে মুনাফা বেড়ে গেল না বটে, কিন্তু মুনাফা বেড়ে যাবার ফলেই মজুরিটা কমে গেল। অন্য লোকের একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে পুঁজিপতি বেশি পরিমাণের বিনিময়-মূল্য অর্জন করেছে, এবং সেজন্য শ্রমকে বেশি পয়সা দেয় নি, তার অর্থ শ্রম থেকে পুঁজিপতির জন্য যে পরিমাণ নীট মুনাফা উঠল তার অনুপাতে শ্রম কম পয়সা পেল।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, পণ্যের দামে ওঠা-নামা সত্ত্বেও প্রত্যেক পণ্যের গড়পড়তা দাম, যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার বিনিময় হয়, **তার উৎপাদন-ব্যয়** দিয়েই নির্ধারিত হয়। কাজেই, পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার ব্যাপারটাও অপরিহার্য রূপে কাটাকাটি করে সমতা লাভ করে। যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন বা উৎপাদনক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির নতুন নিয়োগের ফলে নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ে একই পরিমাণের শ্রম ও পুঁজি দিয়ে অধিকতর পরিমাণের দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে কোনো ক্রমেই অধিকতর পরিমাণের বিনিময়-মূল্য পাওয়া যায় না। সুতো-কাটা কলের সাহায্যে যদি আমরা সুতো-কল আবিষ্কারের আগের তুলনায় ঘণ্টায় দ্বিগুণ পরিমাণের সুতো কাটতে পারি, ধরা যাক যদি পঞ্চাশ পাউণ্ডের জায়গায় একশ পাউণ্ডের সুতো কাটতে পারি, তাহলেও গড়ে ন্যূনাধিক দীর্ঘ একটা পর্ব ধরলে ঐ পঞ্চাশ পাউণ্ডের বিনিময়ে যে পরিমাণের পণ্য পাওয়া যেত এখন এই একশ পাউণ্ডের বদলে তার চেয়ে বেশি পাব না। তার কারণ, উৎপাদন-ব্যয় ঠিক অর্ধেক কমে গেছে, অথবা একই খরচে এখন আমি দ্বিগুণ জিনিস উৎপন্ন করতে পারি।

শেষ কথা, এক দেশের কিংবা গোটা পৃথিবীজোড়া বাজারে পুঁজিপতি শ্রেণী — বুর্জোয়া শ্রেণী — নিজেদের মধ্যে যে কোনো অনুপাতেই উৎপাদনের নীট মুনাফা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিক না কেন, যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়ে সঞ্চিত শ্রম বর্ধিত হয়েছে তাই হল সর্বদাই এই নীট মুনাফার মোট পরিমাণ। কাজেই, এই মোট পরিমাণটা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, যে অনুপাতে শ্রম পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলে, অর্থাৎ মজুরির তুলনায় মুনাফা যে অনুপাতে বেড়ে চলে।

তাহলে **পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্কের মধ্যে** নিজেদের আলোচনা **সীমাবদ্ধ** রাখলেও আমরা দেখতে পাই, **পুঁজির স্বার্থ ও মজুরি-শ্রমের স্বার্থ পরস্পরের একান্ত বিপরীত**।

পুঁজির দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি আর মুনাফার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি একই কথা। শ্রমের দাম, আপেক্ষিক মজুরি যদি দ্রুতগতিতে কমে যায়, তাহলেই শুধু মুনাফা ঠিক তত দ্রুতগতিতে বাড়তে পারে। আর্থিক মজুরির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের আর্থিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে আসল মজুরি বেড়ে গেলেও কিন্তু যদি তা মুনাফার অনুপাতে না বাড়ে, তাহলে আপেক্ষিক মজুরি এই ক্ষেত্রেও পড়ে যেতে পারে। ধরুন ব্যবসা যখন ভালো চলছে, মজুরি শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়ল, আর অপরপক্ষে মুনাফা বাড়ল শতকরা ত্রিশ ভাগ, সেক্ষেত্রে তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজুরি **বাড়ল না, কমল**।

কাজেই, পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্রমিকের আয় বেড়ে যায় তবু সেই সঙ্গে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। শ্রমের ওপর পুঁজির প্রভুত্ব, পুঁজির ওপর শ্রমের অধীনতাও বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধিতে শ্রমিকের স্বার্থ আছে বলা মানেই এই কথা বলা: শ্রমিক অন্যের ধন যত দ্রুতগতিতে বাড়ায় তত তার ভাগ্যে কৃপাকণার পরিমাণও বাড়ে, কাজ পাবে, শ্রমিক হবার ডাক পড়বে এমন লোকের সংখ্যা তত বেড়ে চলে, পুঁজির উপর নির্ভরশীল গোলামদের সংখ্যাও তত বাড়ানো যায়।

তাহলে আমরা দেখলাম:

শ্রমিক শ্রেণীর **সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা, যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে পুঁজি বৃদ্ধি** শ্রমিকের বৈষয়িক জীবনের যতই উন্নতিসাধন করুক না কেন, তা বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থের বৈরভাব

লোপ করতে পারে না। **মুনাফা ও মজুরি** ঠিক আগের মতোই **পরস্পর ব্যস্ত অনুপাতে** থেকে যায়।

পুঁজি দ্রুতগতিতে বেড়ে চললে মজুরি বাড়তেও পারে, কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফা বাড়ে অতুলনীয় দ্রুততর গতিতে। শ্রমিকের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি হল বটে, কিন্তু তার সামাজিক অবস্থানের বিনিময়ে। পুঁজিপতির সঙ্গে তার যে সামাজিক ব্যবধান সেটার পরিসর আরো বেড়ে গেল।

পরিশেষে:

উৎপাদনশীল পুঁজির যতদূর সম্ভব দ্রুত বৃদ্ধিই মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা, আসলে এই কথা বলা মানে: যত বেশি দ্রুত শ্রমিক শ্রেণী বর্ধিত ও প্রসারিত করবে তার বিরুদ্ধ শক্তিকে, অর্থাৎ যে ধন তার নয়, বরঞ্চ যা তারই উপর প্রভুত্ব করে সেই ধনকে, বুর্জোয়ার ধন বাড়িয়ে তোলার জন্য, পুঁজির ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য নতুন করে শ্রম করবার অনুমতি লাভের অবস্থা ততই অনুকূল হয়ে উঠবে। আর নিজেকে সে সন্তুষ্ট রাখবে সেই সোনার শেকলটি বানিয়ে চলায়, যা দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তাকে পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে যায়।

বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদেরা যা বলেন, **উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি** এবং **মজুরি বৃদ্ধি** সত্যই কি তেমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত? তাঁদের কথা অভ্রান্ত বলে ধরা উচিত নয়। তাঁরা যখন বলেন, পুঁজি যতই মোটা হয় সেটার গোলামরা ততই ভাল দানাপানি পায় — একথাটাও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই আলোকপ্রাপ্ত, খুবই তারা হিসেবী, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের মতো অনুচরদের জাঁকজমকে রাখার কুসংস্কার তাদের নেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের পরিবেশই তাদের হিসেবী করে তোলে।

সুতরাং আরো খুঁটিয়ে আমাদের পরখ করে দেখতে হবে:

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধি কিভাবে মজুরিকে প্রভাবিত করে?

বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদনশীল পুঁজি মোটের ওপর বাড়লে শ্রম-সঞ্চয় হয় **আরো বহুবিধ।** পুঁজির সংখ্যা ও প্রসার বেড়ে যায়। পুঁজির **সংখ্যাগত বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা** বাড়িয়ে দেয়। পুঁজির **বর্ধমান প্রসার শিল্পের সংগ্রামক্ষেত্রে বিপুলতর যুদ্ধ হাতিয়ার সহ অধিকতর শক্তিশালী শ্রমিক-বাহিনী নিয়ে আসার** উপায় যোগায়।

বেশী সস্তা দামে বিক্রয় করেই কেবল একজন পুঁজিপতি অন্য পুঁজিপতি হটিয়ে তার পুঁজি করায়ত্ত করতে পারে। নিজের সর্বনাশ না করে আরো সস্তায় মাল বেচতে হলে তাকে অল্প খরচায় পণ্য উৎপন্ন করতে হবে, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। কিন্তু শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো হয় সর্বাগ্রে **অধিকতর শ্রম-বিভাগ** দিয়ে, **যন্ত্রপাতির** আরো সার্বিক প্রচলন ও অবিরত উন্নতিসাধন দিয়ে। যে শ্রমিক-বাহিনীর মধ্যে শ্রম ভাগ করে দেওয়া হয় তা যত বিশাল হয়, যত বিশালাকারের যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদন-ব্যয় ততই দ্রুত কমে যেতে থাকে, শ্রম ততই বেশি ফলপ্রদ হয়। কাজেই, পুঁজিপতিদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো এবং তাদের সবচেয়ে বেশি মাত্রায় খাটানোর জন্য ব্যাপক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

এখন, যদি কোনো পুঁজিপতি শ্রম-বিভাগ বাড়িয়ে, নতুন নতুন যন্ত্রাদি খাটিয়ে ও যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে, প্রাকৃতিক শক্তির অধিকতর লাভজনক ও ব্যাপকতর প্রয়োগ করে একই পরিমাণের শ্রম বা সঞ্চিত শ্রমের সাহায্যে তার প্রতিযোগীদের চেয়ে বেশি মাত্রায় দ্রব্য বা পণ্য উৎপন্ন করবার উপকরণ পেয়ে যায়, অর্থাৎ ধরা যাক, পুরো একগজ কাপড় বানাতে তার যে শ্রম-সময় লাগে তার প্রতিযোগীরা যদি সে শ্রম-সময়ে বানায় মাত্র আধগজ — তাহলে সেই পুঁজিপতি কি করবে?

আধগজ কাপড় সে পুরনো বাজার-দরেই বেচে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর প্রতিযোগীদের বাজার থেকে তাড়িয়ে তার নিজের বিক্রয়-ক্ষেত্র বাড়ানো যায় না। কিন্তু তার উৎপাদন যে পরিমাণ বেড়েছে, বিক্রয়-ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে সে পরিমাণে। যে-সব শক্তিশালী ও ব্যয়বহুল উৎপাদনের উপকরণ সে সম্ভব করেছে তাতে তার পণ্য সস্তায় বিক্রয় করতে সে সক্ষম হয় বটে, তবে সেই সঙ্গে সে-সবই আবার তাকে আরো **বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে**, তার পণ্যের জন্য **আরো বড়** বাজার জয় করতে **বাধ্য করে**; সেইজন্য আমাদের পুঁজিপতিটি তার আধগজ কাপড় প্রতিযোগীদের চেয়ে সস্তায় বিক্রয় করবে।

প্রতিযোগীদের আধগজ তৈরিতে যে খরচ পড়ে এই পুঁজিপতির একগজে সে খরচ পড়লেও সে কিন্তু তার পুরো একগজ প্রতিযোগীদের আধগজের দামে

বিক্রয় করে না। তাহলে তো আর সে বেশি কিছু মুনাফা পায় না, বিনিময়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয়টাই শুধু ফিরে আসে। তার সম্ভাব্য বৃহত্তর আয়টা আসবে বৃহত্তর পুঁজি খাটানোর দরুন, তার পুঁজিটাকে সে যে অন্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান করে তুলেছে এ কারণে নয়। তাছাড়া, সে যদি তার পণ্যের দাম প্রতিযোগীদের চেয়ে সামান্য শতাংশও কমিয়ে দেয় তাতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। **কম দামে বেচে** সে বাজার থেকে তাদের হটিয়ে দিতে পারবে বা অন্তত তাদের বিক্রয়-ক্ষেত্রের খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নেবে। পরিশেষে একথাও মনে রাখা দরকার যে, পণ্যের চলতি দাম সর্বদাই **উৎপাদন-ব্যয়ের বেশি অথবা কম হয়** এবং তা নির্ভর করে পণ্যটি শিল্পের জন্য অনুকূল অথবা প্রতিকূল কী রকম মরশুমে বিক্রি হচ্ছে। যে পুঁজিপতি নতুন ও আরো বেশি ফলপ্রসূ উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগ করে সে তার আসল উৎপাদন-ব্যয়ের কত ভাগ বেশি দামে বিক্রি করবে সেটা কমে-বাড়ে — সেটা নির্ভর করে একগজ কাপড়ের বাজার-দর তদবধি প্রচলিত উৎপাদন-ব্যয়ের কতটুকু নিচে বা উপরে।

যাই হোক, আমাদের এই পুঁজিপতিটির বিশেষ **সুবিধাটি** বেশি দিনের জন্য নয়: অন্যান্য প্রতিযোগী পুঁজিপতিরাও ঠিক সমপরিমাণে কিংবা বৃহত্তর আকারে সেই একই যন্ত্রপাতি, একই শ্রম-বিভাগ প্রচলন করতে থাকবে এবং এই নতুন পদ্ধতি এত ব্যাপক হবে যে, কাপড়ের দাম তার **পূর্বেকার উৎপাদন-ব্যয়েরই** যে শুধু **নিচে নামবে** তা নয়, **নতুন উৎপাদন-ব্যয়েরও নিচে** নেমে যাবে।

কাজেই, উৎপাদনে নতুন উপকরণ প্রচলনের আগে পুঁজিপতিদের পারস্পরিক অবস্থান যেমন ছিল, পরে আবার সেই একই রকম অবস্থা ফিরে আসে। উৎপাদনের এই সব নতুন উপকরণের সাহায্যে যদি তারা আগেকার দামে দ্বিগুণ পণ্য যোগাতে সমর্থ হয়ে থাকে, তবে **এখন** তারা আগেকার দামের চেয়েও **কমে** সেই দ্বিগুণ পণ্য বেচতে বাধ্য হবে। এই নতুন উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে আবার শুরু হয় সেই পুরাতন খেলা। আবার অধিকতর শ্রম-বিভাগ, আরো বেশি যন্ত্রপাতির প্রচলন, যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগকে বর্ধিত মাত্রায় খাটানো। এই নতুন পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আবার সেই একই পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এইভাবে দেখতে পাই কি করে উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপকরণ অনবরত রূপান্তরিত হয়, আমূল পরিবর্তিত হয়, **কি করে শ্রম-**

বিভাগের ফলে অপরিহার্যরূপে আসে অধিকতর শ্রম-বিভাগ, যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে আসে আরো বেশি যন্ত্র প্রয়োগ, বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে আরো বৃহত্তর আকারের উৎপাদন।

এই নিয়মই বারবার বুর্জোয়া উৎপাদনকে তার পুরনো ধারা থেকে সরিয়ে দেয়, আর পুঁজিকে বাধ্য করে শ্রমের উৎপাদন-শক্তিগুলিকে প্রবলতর করে তুলতে, **যেহেতু এই নিয়ম** উৎপাদন-শক্তিগুলিকে আগে প্রবল করে তুলেছে তাই এই নিয়ম পুঁজিকে কখনও থেমে থাকতে দেয় না, তার কানে কানে অবিরাম ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!'

বিভিন্ন বাণিজ্যিক পর্যায়কালের উত্থান-পতনের মধ্যে যে নিয়ম পণ্যের দামকে অনিবার্যভাবেই তার **উৎপাদন-ব্যয়ের সমতলে নামায়** এ হল সেই নিয়মই।

পুঁজিপতি যতই শক্তিশালী উৎপাদনের উপকরণ প্রচলন করুক না কেন, প্রতিযোগিতা সেই উপকরণকে সর্বজনীন করে তুলবে, এবং সর্বজনীন করে তোলার মুহূর্ত থেকে তার পুঁজির অধিকতর ফলপ্রসূতার পরিণাম দাঁড়ায় মাত্র এই যে, তাকে **একই দামে** আগের তুলনায় দশ গুণ, বিশ গুণ, একশো গুণ পণ্য যোগাতে হবে। কিন্তু যেহেতু বেশি পরিমাণের বিক্রয় দিয়ে পড়ে-যাওয়া বাজার-দর সামলে নেবার জন্যে তার এখন আগের চেয়ে হয়ত হাজার গুণ বেশি বিক্রয় করা চাই; যেহেতু শুধু অধিকতর মুনাফার জন্যই নয়, উৎপাদন-ব্যয় ওঠাবার জন্যও তার পক্ষে তখন বিপুল পরিমাণে পণ্যের বিক্রয় আবশ্যক — আমরা দেখেছি, উৎপাদনের হাতিয়ারটাই উত্তরোত্তর বহু ব্যয়সাধ্য হয়ে ওঠে এবং যেহেতু এই বিপুল পরিমাণের বিক্রয় শুধু তারই নয়, তার প্রতিযোগীদেরও মরণ-বাঁচনের সমস্যা হয়ে ওঠে, সুতরাং **নবাবিষ্কৃত উৎপাদনের উপকরণগুলি যতই ফলপ্রদ হয়** পুরনো সংগ্রাম **হয় ততই প্রচণ্ড। কাজেই, শ্রম-বিভাগ ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ নতুন করে চলতে থাকবে অতুলনীয় বেশি মাত্রায়।**

নিয়োজিত উৎপাদনের উপকরণের যতই শক্তি থাক, এই শক্তির সোনার সফল থেকে প্রতিযোগিতা পুঁজিকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে পণ্যের দামকে উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে ফিরিয়ে এনে; এইভাবে অপেক্ষাকৃত সস্তা উৎপাদন — একই মোট দামে ক্রমাগত বেশি দ্রব্য সরবরাহ — একটা আবশ্যিক

নিয়ম হয়ে ওঠে, সেটা সেই একই পরিমাণে যতখানি উৎপাদন সস্তা করা যায়, অর্থাৎ একই পরিমাণ শ্রমে যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কাজেই, একই শ্রম-সময়ে বেশি পরিমাণের মাল যোগান দিতে বাধা হওয়া ছাড়া, এক কথায় **তার পুঁজির মূল্যবৃদ্ধির শর্ত আরো দুরূহ করা** ছাড়া নিজের এই প্রয়াসে পুঁজিপতি আর বেশি কিছু লাভ করতে পারে না। সুতরাং যখন প্রতিযোগিতা সেটার উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম নিয়ে পুঁজিপতিকে অবিরত তাড়া করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে তার তৈরি অস্ত্র সবই তার নিজের উপর আঘাত হানে, তখন অবিরাম পুরনোর জায়গায় নতুন শ্রম-বিভাগ ও নতুন যন্ত্রপাতি — যার দাম বেশি বটে কিন্তু তার সাহায্যে সস্তায় উৎপাদন করা যায় — প্রবর্তন করে পুঁজিপতি অবিরাম প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, এই নতুন প্রতিযোগিতার ফলে যন্ত্রপাতি ও শ্রম-বিভাগ অচল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে না।

সারা দুনিয়ার বাজারে এই যে একটা অধীর যুগপৎ আলোড়ন চলছে তার একটা চিত্র যদি এখন মনের মধ্যে এঁকে নিই, তাহলে বেশ বোঝা যাবে কি করে পুঁজির বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পুঞ্জীভবনের পরিণাম হয় শ্রমের অবিরাম বিভাগ, এবং আগে থেকেই ও ক্রমবর্ধমান বিপুলাকারে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ও পুরনো যন্ত্রের উন্নয়ন।

উৎপাদনশীল পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে অচ্ছেদ্য এই অবস্থাগুলি তাহলে কিভাবে মজুরি-নির্ণয় প্রভাবিত করে?

শ্রম-বিভাগ যতই বেড়ে চলে ততই একজন শ্রমিক পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করতে পারে; কাজেই, শ্রমিকদের মধ্যে পাঁচ, দশ, কুড়ি গুণ প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। শ্রমিক অন্যদের চেয়ে নিজেকে সস্তায় বিক্রয় করেই শুধু প্রতিযোগিতা চালায় না, প্রতিযোগিতা করে **একা** পাঁচ, দশ, কুড়ি জনের কাজ করেও; পুঁজি যে **শ্রম-বিভাগের** প্রবর্তন করে এবং অবিরাম তাকে বাড়িয়ে যায় তার ফলে শ্রমিকেরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়।

তাছাড়া, **শ্রম-বিভাগ** যে মাত্রায় বেড়ে যায়, শ্রমটা সেই মাত্রায় **সহজসাধ্য হয়ে ওঠে**। শ্রমিকের বিশেষ নৈপুণ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে একটা সহজ ও একঘেয়ে উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তার আর বেশি কিছু

শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা আর দক্ষতা খাটাতে হয় না। তার শ্রম হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা শ্রম যা সবাই করতে পারে। ফলে প্রতিযোগীরা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাছাড়া, আপনাদের তো মনে আছে, যে কাজ যত সহজ, যত অল্পায়াসে শেখা যায়, তা আয়ত্ত করবার উৎপাদন-ব্যয় যত কম, ততই কমে যায় মজুরি। কারণ, অন্যান্য পণ্যের দামের মতো মজুরিও উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই নিরূপিত হয়।

কাজেই, শ্রম যতই অপ্রীতিকর ও ন্যক্কারজনক হয়ে ওঠে, ততই প্রতিযোগিতা বাড়ে, মজুরি কমে যায়। কাজ বেশি ক'রে — তা অধিক সময় কাজ করেই হোক বা এক ঘণ্টায় বেশি পরিমাণ জিনিস উৎপন্ন করেই হোক — শ্রমিক তার মজুরির মোট পরিমাণটি বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অভাবের তাড়নায় শ্রম-বিভাগের কুফল সে এইভাবে আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে, **সে যত বেশি খাটে, ততই কম মজুরি পায়**; তার সহজ কারণ এই যে, শ্রমিক যত বেশি কাজ করে তত বেশি পরিমাণেই সে সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা বাড়ায়, ফলে সকলকেই সে তার প্রতিযোগী করে তোলে, তারাও তারই মতো সমান প্রতিকূল শর্তে নিজেদের বিকিয়ে দেয়; তাই শেষ পর্যন্ত সে **নিজেরই সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর একজন হিসেবে তার নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা চালায়।**

অনেক বিপুল আকারে সেই একই ফল হয় **যন্ত্রপাতি** থেকে, কারণ যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে দক্ষের জায়গায় অদক্ষ শ্রমিক, পুরুষের বদলে নারী নেওয়া হয়, বয়স্কদের স্থান শিশু দিয়ে পূরণ করা হয়। যন্ত্রপাতি প্রথম চালু হলে সেই একই ফল হয়, তাতে হাতের কাজের শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হয়, এবং অধিকতর বিকশিত, উন্নত এবং উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি চালু হলে কারখানা থেকে শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলে দলে বরখাস্ত হয়। উপরে আমরা পুঁজিপতিদের পরস্পরের মধ্যে শিল্প-যুদ্ধের একটা মোটামুটি চিত্র দিয়েছি; **এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রমিক-বাহিনীকে সংগ্রহ না করে বরখাস্ত করলেই বরং যুদ্ধ জয় হয় বেশি। শিল্পের সেনাদের কে কত বেশি সংখ্যক বরখাস্ত করতে পারে এই নিয়ে সেনাপতিরা অর্থাৎ পুঁজিপতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে।**

অর্থতত্ত্ববিদরা বলে থাকেন বটে, যন্ত্রপাতির প্রচলনে যে-সব শ্রমিক নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তারা শিল্পের **নতুন** শাখায় কাজ পায়।

যে-সব শ্রমিক বরখাস্ত হয় ঠিক তারাই শ্রমের নতুন শাখায় কাজ পাবে একথা তাঁরা সরাসরি বলতে সাহস করেন না। এ মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা বড়ই সোচ্চার। আসলে তাঁরা এটুকু মাত্র বলতে চান যে, **শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য অঙ্গ-অংশ,** দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিল্পের যে-সব শাখা উঠে গেল তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর যে তরুণ পুরুষদের একাংশ, তাদের জন্য নতুন কাজ মিলবে। নাস্তিমান শ্রমিকদের পক্ষে তা একটা মস্ত সান্ত্বনা বই কি। টাটকা শোষণযোগ্য রক্ত-মাংসের অভাব পুঁজিপতি মহোদয়গণের হবে না, নিজেদের মৃতকে মৃত সমাধিস্থ হতেই তারা দেবে। ধরতে গেলে এ স্তোকবাক্য পুঁজিপতিরা খোঁজে নিজেদের জন্য, শ্রমিকদের জন্য নয়। যন্ত্রপাতির প্রচলনের দরুন মজুরি-খাটা শ্রমিকদের গোটা শ্রেণীটাই যদি উচ্ছেদ হয়ে যায় তবে যে পুঁজির পক্ষে সেটা সাংঘাতিক কথা, মজুরি-শ্রম ছাড়া পুঁজি যে আর পুঁজিই থাকে না!

যা হোক, ধরা যাক, যন্ত্রপাতি সরাসরি যাদের কর্মচ্যুত করে তারা, এবং এই সব কাজের জন্য যে তরুণ পুরুষদের একাংশ উৎসুক হয়ে ছিল তারা, সকলেই **নতুন কাজ পেল।** কেউ কি বিশ্বাস করবে, যে কাজ গেছে তাতে যত বেশি মজুরি মিলত এ কাজেও সে রকম মজুরি দেওয়া হবে? **সেটা অর্থশাস্ত্রের সমস্ত নিয়মের বিরোধী।** আমরা দেখেছি, কিভাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্প সর্বদাই জটিল ও উঁচু ধরনের কাজের বদলে সরল ও নিম্ন ধরনের কাজ চালু করে।

শিল্পের এক শাখা থেকে যন্ত্রপাতির দরুন কর্মচ্যুত একরাশ শ্রমিক তাহলে কি করে অন্য শাখায় আশ্রয় পায়, যদি সে কাজ **আরো নিচু, আরো কম মজুরির** না হয়?

যন্ত্রপাতি উৎপাদনে যে-সব শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় তাদের এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, শিল্পে মেশিনের চাহিদা ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়া মাত্র যন্ত্রপাতির সংখ্যা অপরিহার্যভাবে বেড়েই চলবে, সুতরাং যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেড়ে যাবে, সেই হেতু বাড়বে যন্ত্রপাতির উৎপাদনে শ্রমিক নিয়োগ; তাছাড়া, শিল্পের এই শাখায় নিযুক্ত শ্রমিকরা সুনিপুণ, এমন কি শিক্ষিত।

আগে বরং এই উক্তিতে অর্ধেকটা সত্য ছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালের পর

থেকে কথাটিতে সত্যের লেশও আর নেই, কারণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শাখাতে হুবহু সুতো কারখানার মতোই ক্রমাগত বহুকর্মক্ষম যন্ত্রাদি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মেশিন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরা অতি জটিল মেশিনের তুলনায় কেবল অতি সরল একটা মেশিনের ভূমিকাই পালন করতে পারে।

কিন্তু মেশিন প্রবর্তনের দরুন যে লোকটি বরখাস্ত হয়, তার বদলে হয়ত কারখানা **তিনটি** শিশু ও **একজন** নারী নিযুক্ত করে! এই তিনজন শিশু ও একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মজুরিই কি যথেষ্ট নয়? বংশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনকল্পে ন্যূনতম মজুরিটাই কি যথেষ্ট নয়? তাহলে বুর্জোয়াদের এই প্রিয় বুলিটি কি প্রমাণ করল? শুধু এই প্রমাণ করল যে, **একটি** শ্রমিক পরিবারের জীবিকা সংস্থানের জন্য এখন চারগুণ শ্রমিককে জীবনপাত করতে হচ্ছে।

সংক্ষেপে দাঁড়ায়: **উৎপাদনশীল পুঁজি যতই বেড়ে যায়, শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলনেরও ততই প্রসার ঘটে। আবার, শ্রম-বিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলন যতই বেড়ে চলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে, মজুরিও ততই কমে যায়।**

তাছাড়া, **সমাজের উচ্চতর স্তর** থেকেও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; ক্ষুদে শিল্পপতি এবং ক্ষুদে লভ্যাংশজীবীরাও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চাওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। এইভাবে কর্মপ্রার্থীদের বাড়ানো হাতের অরণ্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়, আর হাতগুলি কিন্তু হতে থাকে আরও কৃশ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদে শিল্পপতি যে টিকতে পারে না তা স্বতঃস্পষ্ট কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় উৎপাদন করা, অর্থাৎ বড় শিল্পপতি হওয়া, ক্ষুদে নয়।

পুঁজির আয়তন ও সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ে, পুঁজি যত বাড়ে, পুঁজির সুদ সেই পরিমাণে কমে যায়; কাজেই, ক্ষুদে লভ্যাংশজীবী আর তার সুদের উপর নির্ভর করতে পারে না, শিল্পের মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে হয়, ফলে ক্ষুদে শিল্পপতিদের সংখ্যা বাড়ায় এবং তাতে করে বাড়ায় প্রলেতারিয়েতভুক্ত হবার প্রার্থীদের সংখ্যা। এই সমস্ত কথা আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই।

পরিশেষে, উপরে বর্ণিত গতিবিধির চাপে পঁুজিপতিরা যেহেতু বাধ্য হয় পূর্ব থেকে বিদ্যমান বৃহদাকার উৎপাদনের উপকরণগুলিকে ক্রমবর্ধনশীল মাত্রায় নিয়োগ করতে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রেডিটের সমস্ত উৎসকে সক্রিয় করে তুলতে — তাই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় শিল্পজগতের ভূমিকম্প, যখন বাণিজ্য জগৎ তার কতকাংশ ধন ও উৎপন্ন দ্রব্য, এমন কি কিছুটা উৎপাদন-শক্তি পর্যন্ত পাতালপুরীর দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করেই কেবল নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় — এক কথায় **সংকট** বৃদ্ধি পায়। ঘন ঘন সেগুলো দেখা দেয় এবং ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে, অন্য কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত এই কারণে যে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণে ও সেই হেতু প্রসারিত বাজারের চাহিদা যত বাড়ে বিশ্ব-বাজার ততই সঙ্কুচিত হতে থাকে, শোষণযোগ্য নতুন বাজারের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসে, কারণ আগের প্রতিটি সংকটেই বিশ্ব বাণিজ্যের দখলে এসেছে নতুন নতুন অথবা তখনো পর্যন্ত যথাসাধ্য শোষণ না করা বাজার। কিন্তু পঁুজি শুধু শ্রমের ঘাড় ভেঙে বাঁচে না। অভিজাত বর্বর দাসমালিকের মতো সে কবরে ঢোকার সময় নিজের দাসদের শবগুলোকে, সংকটে ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুরো অষ্টোত্তরশত বলি সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে। তাই দেখা যাচ্ছে: **পঁুজি দ্রুত বেড়ে চললে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় আরো অতুলনীয় দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ পঁুজি যত দ্রুত বেড়ে যায় শ্রমিক শ্রেণীর উপার্জনের উৎস, জীবনধারণের উপকরণও তত বেশি কমে যেতে থাকে; তবু মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা হল পঁুজির দ্রুত বৃদ্ধি।**

১৮৪৭ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে
কার্ল মার্কসের বক্তৃতাবলির ভিত্তিতে তাঁর লেখা

পুস্তিকাখানার মূল জার্মান
পাঠ অনুসারে ছাপা হল

'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার ১৮৪৯
সালের এপ্রিল মাসের ৫-৮ ও ১১ তারিখের
২৬৪-২৬৭ ও ২৬৯ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

এঙ্গেলসের সম্পাদনায় এবং তাঁর ভূমিকা
সম্বলিত হয়ে ১৮৯১ সালে বার্লিনে স্বতন্ত্র
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি (১০)

লীগের (১১) প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি

ভ্রাতৃগণ! ১৮৪৮-৪৯-এর বৈপ্লবিক বৎসর দুটিতে লীগ দুভাবে তার সার্থকতা সপ্রমাণ করেছে: প্রথমত, লীগের সভ্যরা সতেজে সর্বত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সংবাদপত্রে, ব্যারিকেডে ও সমরাঙ্গনে — সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবী একমাত্র যে শ্রেণী, সেই প্রলেতারিয়েতের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করেছেন। লীগের আরো সার্থকতা প্রমাণিত হল এইজন্য যে, আন্দোলন সম্পর্কে লীগের যে ধারণা কংগ্রেসসমূহের ও ১৮৪৭ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারগুলিতে এবং 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে'ও বিঘোষিত হয়েছে তা-ই একমাত্র সঠিক ধারণা বলে দেখা গেল; এই সব দলিলে অভিব্যক্ত প্রত্যাশাগুলি পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে উঠল, আজকের দিনের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা ইতিপূর্বে লীগ কর্তৃক শুধু গোপনেই প্রচার করা হত তা এখন সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং প্রকাশ্যভাবে হাটে-বাজারেও প্রচারিত। সেই সঙ্গে আবার লীগের পূর্বতন দৃঢ় সংগঠন বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছে। যে-সব সভ্য বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, গুপ্ত সমিতির দিন চলে গেছে এবং শুধু প্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপই এখন যথেষ্ট। পৃথক পৃথক চক্র এবং সম্প্রদায় কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শিথিল ও ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে দিয়েছে। ফলে, পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি গণতান্ত্রিক পার্টি যখন জার্মানিতে নিজেকে আরো সংগঠিত করে তুলেছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হারিয়ে বসেছে তার একমাত্র দৃঢ় পদাবস্থানটি,

খুব বেশি হলে পৃথক পৃথক অঞ্চলে আঞ্চলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত থেকেছে মাত্র, এবং এইভাবে সাধারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণত পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন এবং নেতৃত্বাধীন। এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে, শ্রমিকদের স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে এবং সেই কারণে ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের শীতকালেই ইয়োজেফ মল্‌কে দূতরূপে জার্মানিতে পাঠানো হয় লীগের পুনর্গঠনের জন্য। মল্-এর দৌত্যে অবশ্য কোনো স্থায়ী ফল হয় নি, অংশত তার কারণ জার্মান শ্রমিকেরা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি, এবং অংশত, বিগত মে মাসের অভ্যুত্থানের ফলে কাজ ব্যাহত হয়। মল্ নিজেই অস্ত্রধারণ করে বাডেন-পেলাট্‌নেট সেনাদলে যোগ দেন এবং মুর্গ্-এর সংঘর্ষে ১৯ জুলাই* প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুতে লীগ তার প্রাচীনতম, সর্বাধিক সক্রিয়, সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য কর্মীদের একজনকে হারাল, হারাল এমন কর্মীকে যিনি সকল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে সক্রিয় ছিলেন এবং এর আগেও নির্দিষ্ট কার্যভার নিয়ে পরপর কয়েকটি দৌত্য বিপুল সাফল্যের সহিত পালন করেছিলেন। ১৮৪৯ সালের জুলাই-এ জার্মানি এবং ফ্রান্সে বৈপ্লবিক পার্টিগুলির পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সকল সদস্যই আবার একত্র হন লন্ডনে এবং নতুন বৈপ্লবিক শক্তি দিয়ে তাঁদের সংখ্যা পূরণ করে নতুন উদ্যমে লীগের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হন।

পুনর্গঠনের কাজ শুধু কোনো দূত (emissary) দ্বারাই চালিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাই মনে করে যে, যখন একটি নতুন বিপ্লব আসন্ন, যখন সেই কারণেই শ্রমিকদের পার্টিকে সর্বাধিক সংগঠিতভাবে, সর্বাধিক ঐকমত্য নিয়ে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তাকে আবার ১৮৪৮ সালের মতো বুর্জোয়াদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে এবং তার লেজুড়ে পরিণত হতে না হয় — ঠিক এই মুহূর্তেই প্রতিনিধির রওনা হওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

* ১৮৮৫ সালের সংস্করণে ভুল তারিখ দেওয়া হয়; এটি হবে ২৯ জুন। — সম্পাঃ

ভ্রাতৃগণ! পূর্বে, ১৮৪৮ সালেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম যে, জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা শীঘ্রই ক্ষমতা হাতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই নতুন অর্জিত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আপনারা দেখেছেন একথা কত সত্য হয়েছে। বস্তুত ১৮৪৮ সালের মার্চ আন্দোলনের ঠিক পরেই বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সংগ্রাম-সাথী শ্রমিকদের পূর্বতন নির্যাতিত অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার জন্য। যদিও মার্চে যে সামন্ততান্ত্রিক তরফকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল সেটার সঙ্গেই আবার মিলিত না হয়ে, এমন কি শেষ পর্যন্ত সেই সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রী তরফেরই হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ না করে বুর্জোয়ারা এ কাজ করতে পারে নি, তবু তারা নিজেদের জন্য এমন বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যার ফলে, শেষ পর্যন্ত, সরকারের আর্থিক দায়গ্রস্ত অবস্থার জন্য তাদের হাতেই ক্ষমতা এসে পড়বে, তাদের সকল স্বার্থই সংরক্ষিত হবে, যদি এখন ইতিমধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন একটা তথাকথিত শান্তিপূর্ণ বিকাশের রূপ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শাসনকে নিরাপদ করার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা নিজেদের ঘৃণিত করে তোলার দরকারও বুর্জোয়াদের হবে না, কারণ সে ধরনের বলপ্রয়োগ-ব্যবস্থা সবই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবিপ্লব আগেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য ঘটনাবলির বিকাশ ঠিক এই শান্তিপূর্ণ পথ ধরে চলবে না। বরং, সে বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে যে বিপ্লব তা প্রত্যাসন্ন, তা সে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কোনো স্বাধীন অভ্যুত্থানের দ্বারাই উদ্দীপিত হোক বা বৈপ্লবিক ব্যাবিলনের (১২) বিরুদ্ধে পবিত্র মিতালীর (১৩) আক্রমণের মধ্যে দিয়েই আসুক।

এবং এই ভূমিকা, জনগণের বিরুদ্ধে অতি বিশ্বাসঘাতকতার এই যে ভূমিকা জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেছিল ১৮৪৮ সালে, আসন্ন বিপ্লবে তাই গ্রহণ করবে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা; ১৮৪৮ সালের পূর্বে উদারপন্থী বুর্জোয়ারা যে স্থান অধিকার করেছিল, বিরোধীদের মধ্যে সেই একই স্থান আজ অধিকার করে আছে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা। এই তরফ, এই গণতান্ত্রিক তরফ পূর্বতন উদারপন্থীদের তুলনায় শ্রমিকদের কাছে অনেক বেশী বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপাদান:

১। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সর্বাধিক অগ্রসর অংশ, যারা অবিলম্বে সামন্ততন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্য অনুসরণ করে। এই অংশটির প্রতিনিধিত্ব করছে এককালের বার্লিনের আপোসকারীরা, কর-প্রতিরোধকারীরা (tax resisters)।

২। গণতন্ত্রী নিয়মতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা; এদের পূর্বতন আন্দোলনে প্রধান লক্ষ্য ছিল অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক ফেডারেল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, যা লাভের জন্য চেষ্টা হয়েছিল এদের প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বামপন্থীদের দ্বারা, পরে স্টুটগার্ট পার্লামেন্টের মধ্যে, আর রাইখ সংবিধানের (১৪) জন্য অভিযানে এদের নিজেদের দ্বারাই।

৩। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এদের আদর্শ সুইজারল্যান্ডের ধরনের একটি জার্মান ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র; তারা এখন নিজেদের লাল ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বলে আখ্যা দেয়, কেননা তারা ছোট পুঁজির উপর থেকে বৃহৎ পুঁজির এবং ছোট বুর্জোয়াদের উপর থেকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের চাপের বিলোপ সাধনের সাধু ইচ্ছা পোষণ করে। এই উপদলের প্রতিনিধিরাই ছিল গণতান্ত্রিক কংগ্রেস এবং কমিটিসমূহের সভারা, গণতান্ত্রিক সমিতিগুলির নেতারা এবং গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকেরা।

এখন নিজেদের পরাজয়ের পরে এই সব অংশই নিজেদের প্রজাতন্ত্রী বা লাল নামে অভিহিত করছে, ঠিক যেমন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা এখন নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে। ভুর্টেমবের্গ, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে এরা এখনো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিজেদের লক্ষ্য অনুসরণ করার সুবিধা পাচ্ছে সেখানে এরা এই সুযোগে এদের পুরানো বুলি বজায় রাখছে ও তারা যে কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নি একথা কাজে প্রমাণ করছে। উপরন্তু এ কথাও পরিষ্কার যে, তাদের পরিবর্তিত নাম শ্রমিকদের প্রতি তাদের মনোভাবের তিলমাত্র অদলবদল সূচিত করে না, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়ারা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে এরা এখন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং প্রলেতারিয়েতের সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছে।

জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক তরফ খুবই শক্তিশালী। এই তরফের মধ্যে শুধু যে শহরগুলির বুর্জোয়া অধিবাসীদের অধিকাংশ, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষুদে মানুষেরা এবং গিল্ড-কর্তারাই রয়েছে তা নয়; এদের

সমর্থকদের মধ্যে কৃষকদেরও এবং যে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত আজো শহরের স্বাধীন প্রলেতারিয়েতের সমর্থন পায় নি তাদেরও এরা গণনা করে থাকে।

পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক শ্রমিক তরফের সম্পর্ক হল এই: যে অংশটাকে এ তরফ উচ্ছেদ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েই এটা অভিযান করে, যে সব কাজের দ্বারা এরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের অবস্থান সংহত করার চেষ্টা করে, এই তরফ বিরোধিতা করে এদের সেই সব কাজের।

বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের স্বার্থে সমগ্র সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করার বাসনা দূরের কথা, গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সামাজিক পরিস্থিতিতে সেইটুকু পরিবর্তনের জন্যই সচেষ্ট যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থাটাই তাদের পক্ষে যথাসম্ভব সহনীয় ও আরামপ্রদ হতে পারে। তাই তারা সর্বোপরি দাবি করে আমলাতন্ত্র ছাঁটাই করে এবং বৃহৎ ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের উপর প্রধান প্রধান করগুলির ভার চাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন। এ ছাড়াও তারা দাবি করে সরকারী ঋণদান-সংস্থার মাধ্যমে এবং সুদখোরির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দ্বারা স্বল্প পুঁজির উপর বৃহৎ পুঁজির চাপের বিলোপ; এর ফলে পুঁজিপতিদের পরিবর্তে স্বয়ং রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে নিজেদের এবং কৃষকদের জন্য দাদন পাওয়া সম্ভব হবে; তারা সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ বিলুপ্তি মারফত গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া সম্পত্তি-সম্পর্কের প্রবর্তনও দাবি করে থাকে। এগুলি সম্পাদনের জন্য যেখানে তাদের নিজেদের এবং তাদের মিত্র কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো তাদের প্রয়োজন — তা সে নিয়মতান্ত্রিক হোক বা প্রজাতান্ত্রিক হোক; এমন একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় কাঠামোও তাদের দরকার যাতে বারোয়ারি সম্পত্তিগুলির উপর এবং আমলারা এখন যে সব কর্ম সম্পাদনের অধিকারী সেগুলির একাংশের উপর তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাদের মতে অংশত উত্তরাধিকারের স্বত্বকে খর্ব করে এবং অংশত যতগুলি সম্ভব কাজকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে পুঁজির আধিপত্য এবং দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিহত করতে হবে। আর শ্রমিকদের ব্যাপারে, তারা যে পূর্বের মতোই মজুরি-খাটা শ্রমিক থাকবে, সর্বোপরি এ বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জন্য কেবল চায় বেশি মজুরি ও আরো নিরাপদ জীবন; অংশত রাষ্ট্রের অধীনে কর্মসংস্থান দিয়ে, অংশত দাতব্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অর্জন করার আশা পোষণ করে তারা। সংক্ষেপে, এরা কমবেশী গোপন ভিক্ষা দিয়ে শ্রমিকদের বশীভূত করার এবং সাময়িকভাবে তাদের অবস্থা সহনীয় করে তুলে তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে ভেঙে দেবার আশা করে। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত এই দাবিগুলি সব কয়টি অংশ একই সময়ে উত্থাপন করে না, এদের খুব অল্পসংখ্যক সদস্যই এই দাবিগুলিকে সমগ্রভাবে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বলে মনে করে। এদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ বা অংশগুলি যতই এগিয়ে যাবে, ততই তারা এই দাবিগুলির বেশীর ভাগটা নিজস্ব দাবিরূপে গ্রহণ করতে থাকবে; এবং যে অল্পসংখ্যক লোক উল্লিখিত দাবিগুলিকে নিজেদের কর্মসূচী বলেই মনে করে তাদের হয়তো বিশ্বাস যে, বিপ্লবের কাছে সর্বাধিক যা প্রত্যাশা করা চলে তার সব কিছুই এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের তরফের কাছে এই সব দাবি কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। যেখানে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ও সেই সঙ্গে বড় জোর উপরোক্ত দাবিগুলিকে হাসিল করা, সেখানে আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য হল বিপ্লবকে স্থায়ী করে তোলা, — যতদিন না সমস্ত কমবেশী অস্তিমান শ্রেণীগুলি তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সঙ্ঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারিয়ানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে, আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন-শক্তিসমূহ প্রলেতারিয়ানদের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত মালিকানার অদলবদল নয় — ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপই, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয় — শ্রেণীসমূহেরই বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতিসাধন নয় — নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের পরবর্তী ক্রমবিকাশের মধ্যে জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে কিছু কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, এদের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর, বিশেষ করে লীগের মনোভাব কী হবে:

১। বর্তমান যে অবস্থায় পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও নিপীড়িত হচ্ছে সেই অবস্থা চলতে থাকার সময়;

২। পরবর্তী যে বৈপ্লবিক সংগ্রামে তারা প্রধান হয়ে উঠবে সেই সময়;

৩। সে সংগ্রামের পর উচ্ছেদ-করা শ্রেণীগুলির উপর এবং প্রলেতারিয়েতের উপর এদের প্রাধান্যের সময়ে।

১। বর্তমানে, যখন গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা সর্বত্র নিপীড়িত, তখন তারা সাধারণভাবে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যের এবং আপোসের কথা প্রচার করে, তারা প্রলেতারিয়েতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং যাতে গণতান্ত্রিক পার্টির ভিতরকার সব রকমের মতের স্থান হতে পারে এমন একটি বৃহৎ প্রতিপক্ষ পার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, অর্থাৎ, শ্রমিকদের তারা এমন একটি পার্টি সংগঠনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করে যেখানে সাধারণ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক বুলির প্রাধান্য আর তার আড়ালে লুকানো থাকে তাদের বিশেষ স্বার্থসমূহ, যেখানে পরম আদরের শান্তির খাতিরে প্রলেতারিয়েতের বিশেষ দাবিগুলি হাজির না করাই ভালো। এই ধরনের মিলন কেবল তাদেরই কাছে সুবিধাজনক, আর প্রলেতারিয়েতের কাছে পুরোপুরিই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে প্রলেতারিয়েত তার সমস্ত স্বাধীন ও কষ্টার্জিত অবস্থান হারাবে এবং পুনরায় সরকারী বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির লেজুড়ে পরিণত হবার পর্যায়ে নেমে যাবে। অতএব, এ মিলনকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। সমস্বরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের স্তবগানের জন্য আনত হবার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীকে, এবং সর্বোপরি লীগকে সরকারী গণতন্ত্রীদের পাশাপাশি শ্রমিক পার্টির একটি স্বতন্ত্র, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন গড়ার জন্য অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হবে; তাদের প্রতিটি শাখাকে শ্রমিক সমিতিসমূহের কেন্দ্রস্থল এবং কোষকেন্দ্রে পরিণত করতে হবে, যেখানে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হবে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে স্বাধীনভাবে। সমান শক্তি ও সমান অধিকার নিয়ে প্রলেতারিয়ানরা যেখানে তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবে এমন মৈত্রী গড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যে কতদূরে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তা দেখা যাবে ব্রেস্‌লাউ-এর গণতন্ত্রীদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের মুখপত্র 'Neue Oder-Zeitung' পত্রিকায় (১৫) স্বাধীনভাবে

সংগঠিত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে সক্রোধে, এদের তারা বলে সমাজতন্ত্রী। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সম্মিলনী প্রয়োজন হয় না। তেমন কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যখনই প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করতে হয় তখনই দুই তরফের স্বার্থ সেই সময়টুকুর জন্য মিলে যায়। অল্পকালের এই সম্পর্ক অতীতের মতনই ভবিষ্যতেও আপনা থেকে গড়ে উঠবে। পূর্বতন সকল সংগ্রামের মতো আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেও প্রধানত শ্রমিকদেরই যে সাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের দ্বারা বিজয় অর্জন করতে হবে — একথা স্বয়ংসিদ্ধ। অতীতের মতো এই সংগ্রামেও পেটি বুর্জোয়া জনসমষ্টি যতদিন সম্ভব দ্বিধাগ্রস্ত, অস্থিরমতি ও নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং তারপর লড়াই নিষ্পত্তি হওয়ামাত্রই অর্জিত জয়কে আত্মসাৎ করবে, আর শান্তিরক্ষার জন্য ও কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করবে শ্রমিকদের, তথাকথিত আধিক্য নিবারণের ব্যবস্থা করবে এবং অর্জিত জয়ের ফল লাভ করার ব্যাপারে প্রলেতারিয়েতের পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এ কাজ থেকে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নিরস্ত করা শ্রমিকদের সাধ্যায়ত্ত নয়, কিন্তু সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে প্রাধান্যলাভ এদের পক্ষে কঠিন করে তোলা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের শাসনের মধ্যে তার প্রারম্ভ থেকেই যাতে পতনের বীজ নিহিত থাকে ও পরে প্রলেতারিয়েতের শাসন মারফত তাদের বহিষ্কারের পথ যাতে প্রভূত পরিমাণে সুগম হয়ে পড়ে এমন শর্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শ্রমিক শ্রেণীর আয়ত্তের মধ্যে। সর্বোপরি, সংঘর্ষের সময় এবং সংগ্রামের অব্যবহিত পরে, আদৌ যতটা সম্ভব, ঝড় শান্ত করার বুর্জোয়া প্রচেষ্টাকে শ্রমিকদের প্রতিহত করতে হবে এবং গণতন্ত্রীদের বাধ্য করতে হবে বর্তমান সন্ত্রাসবাদী বচনগুলিকে কার্যকর করে তুলতে। শ্রমিক শ্রেণীর কাজকর্ম এমন লক্ষ্য অনুসারে চালাতে হবে, যাতে বিজয়লাভের অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক উত্তেজনা পুনরায় অবদমিত না হয়ে পড়ে। উল্টে, যথাসম্ভব দীর্ঘকাল এ উত্তেজনা উজ্জীবিত রাখতে হবে। তথাকথিত বাড়াবাড়ির ঘৃণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা শুধু জঘন্য স্মৃতিবিজড়িত সরকারী ভবনগুলির উপর জনগণের প্রতিহিংসার এই সব ঘটনার বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, সেগুলিকে শুধু সহ্য করা নয়, সেগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও হাতে তুলে নিতে হবে। সংগ্রামের সময়ে এবং সংগ্রামের পরেও প্রতিটি সুযোগে

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দাবির পাশাপাশি তুলে ধরতে হবে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিগুলিকে। গণতন্ত্রী বুর্জোয়ারা শাসন হাতে নেওয়া শুরু করামাত্র বিভিন্ন নিশ্চয়তা দাবি করতে হবে শ্রমিকদের জন্য। দরকার হলে বলপ্রয়োগেই এই সব নিশ্চয়তা আদায় করতে হবে এবং সাধারণভাবে দেখতে হবে যাতে নতুন শাসকরা সম্ভাব্য সকল সুবিধা এবং প্রতিশ্রুতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, এই হচ্ছে তাদের বেকায়দায় ফেলার সবচেয়ে নিশ্চিত পথ। প্রতিটি জয়যুক্ত রাস্তার লড়াইয়ের পর যে বিজয়োন্মাদনা দেখা দেয় এবং নতুন ব্যবস্থার প্রতি যে উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাকে সর্বপ্রকারে যতদূর সম্ভব সংযত রাখতে হবে পরিস্থিতির শান্ত ও নিরাসক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং নতুন সরকারের প্রতি প্রকাশ্য অবিশ্বাস দেখিয়ে। নবগঠিত সরকারী শাসনসংস্থাগুলির পাশাপাশি যুগপৎ তাদের নিজস্ব বৈপ্লবিক শ্রমিক শাসনসংস্থাসমূহ গঠন করতে হবে — হয় পৌর কমিটি ও পৌর পরিষদের আকারে, না হয় শ্রমিক ক্লাব বা শ্রমিক কমিটির আকারে, যাতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনসংস্থাগুলি অবিলম্বেই শুধু শ্রমিকদের সমর্থন হারায় তা নয়, শুরু থেকেই যেন তারা দেখে যে, সমগ্র শ্রমিক জনগণ কর্তৃক সমর্থিত এক কর্তৃপক্ষ তাদের উপর তত্ত্বাবধান চালাচ্ছে ও তাদের বিপন্ন করছে। এক কথায়, বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্তটি থেকে বিজিত প্রতিক্রিয়াশীলতার তরফের বিরুদ্ধে আর নয়, শ্রমিক শ্রেণীর পূর্বতন সহযোগীদের বিরুদ্ধে, যে পার্টিটি সাধারণ জয়লাভের ফল একাই আত্মসাৎ করতে চায় তার বিরুদ্ধেই অবিশ্বাস চালিত করা প্রয়োজন।

২। কিন্তু বিজয়লাভের প্রথম মুহূর্ত থেকে শ্রমিকদের প্রতি এই যে তরফটির বিশ্বাসঘাতকতা শুরু হবে, সতেজে ও ত্রাস জাগানোর মতো করে তার বিরোধিতা করতে হলে শ্রমিকদের সশস্ত্র এবং সংগঠিত হতে হবে। রাইফেল, বন্দুক, কামান এবং গোলাবারুদ দিয়ে সমগ্র প্রলেতারিয়েতকে অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ করতে হবে অবিলম্বে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত পুরনো নাগরিক রক্ষিদলের পুনরুজ্জীবন প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই শ্রমিকদের নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রলেতারীয় রক্ষিদলরূপে সংগঠিত হবার চেষ্টা করতে হবে, তাতে অধিনায়কদের তারা নিজেরা নির্বাচিত করবে, তাদের নিজেদের

পছন্দমতোই এর সেনাপতিমণ্ডলী গঠিত হবে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে নয়, শ্রমিকদেরই সৃষ্ট বৈপ্লবিক সমাজ পরিষদগুলির অধীনে তারা থাকবে। রাষ্ট্রের ব্যয়ে যেখানে শ্রমিকেরা নিযুক্ত, সেখানে শ্রমিকদের দেখতে হবে যাতে তারা সশস্ত্র ও সংগঠিত হয় নিজেদের বাছাই করা অধিনায়কদের পরিচালনাধীন স্বতন্ত্র বাহিনীতে অথবা প্রলেতারিয়ান রক্ষিদলের অংশরূপে। কোনো অছিলা-অজুহাতেই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করা চলবে না এবং নিরস্ত্রীকরণের যে কোনো প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে হবে — প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে। শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস করা, অবিলম্বে শ্রমিকদের স্বাধীন ও সশস্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করা, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের অপরিহার্য ক্ষণস্থায়ী শাসনের উপর যতদূর সম্ভব কঠোর ও বিপন্নকারী শর্ত আরোপ করা — এই প্রধান কয়েকটি কথা আসন্ন অভ্যুত্থানের সময় এবং তার পরে প্রলেতারিয়েত তথা লীগকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। নতুন শাসনসংস্থাগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা কিছুটা সংহত করামাত্র সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম। সে অবস্থায় সতেজে গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সমর্থ হতে হলে ক্লাবসমূহে শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত এবং কেন্দ্রীভূত হওয়াই সর্বোপরি প্রয়োজন। বর্তমান শাসনসংস্থাগুলি উচ্ছেদ হবার পর, যথা সম্ভবসত্বর কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মানিতে চলে যাবে, অবিলম্বে কংগ্রেস আহ্বান করবে এবং এই কংগ্রেসে পেশ করবে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের অধীনে শ্রমিকদের ক্লাবগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি। শ্রমিকদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির অন্যতম হবে শ্রমিকদের ক্লাবগুলির মধ্যে কমপক্ষে প্রদেশগত সংযোগের দ্রুত সংগঠন; বর্তমান শাসনসংস্থাসমূহের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরিণতি হবে একটি জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন। এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতকে দেখতে হবে:

(এক) — স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্তাদের কোনো অছিলায়, অথবা তাদের কোনো কূটকৌশলে শ্রমিকদের কোনো অংশকেই যেন নির্বাচন থেকে বাদ না দেওয়া হয়।

(দুই) — সর্বত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রী নির্বাচনপ্রার্থীর পাশাপাশি যেন শ্রমিকদের নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করানো হয়; যেন এই সব প্রার্থী যথাসম্ভব লীগেরই সভ্য হয়; এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের নির্বাচনকর্মে যেন সহায়তা করা হয়। এমন কি যেখানে নির্বাচিত হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনাই নেই সেখানেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য, নিজেদের শক্তির পরিমাপ করার জন্য, এবং জনসাধারণের কাছে নিজেদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্টির বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য শ্রমিকদের নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করাতে হবে। এ কাজের ফলে গণতান্ত্রিক দলে বিভেদ আসবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের জয়লাভের সুযোগ হবে — গণতন্ত্রীদের এই ধরনের বুলির দ্বারা শ্রমিকরা যেন এ বিষয়ে কিছুতেই নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে না দেয়। এ সব বুলির আখেরী উদ্দেশ্য হল প্রলেতারিয়েতকে প্রতারিত করা। প্রতিনিধি পরিষদে সামান্য কয়জন প্রতিক্রিয়াশীলের উপস্থিতির ফলে যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব তার চেয়ে এই ধরনের স্বাধীন কাজের ভিতর শ্রমিক পার্টির যে অগ্রগতি ঘটতে বাধ্য তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র যদি দৃঢ়চিত্তে ও সন্ত্রাস চালিয়ে এগিয়ে আসে, তবে নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব পূর্বাহ্নেই বিনষ্ট হবে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা সর্বপ্রথম যে বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে তা হল সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের মতোই পেটি বুর্জোয়ারা সামন্তপ্রভুদের জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবে মুক্ত সম্পত্তি হিসেবে, অর্থাৎ, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের জিইয়ে রেখে তারা একটা পেটি-বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইবে, যাদের চলতে হবে ঋণ ও দারিদ্র্যের সেই চক্রে, যার মধ্য দিয়ে ফরাসী কৃষক আজও চলছে।

গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীকে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করতে হবে। তাদের দাবি তুলতে হবে যে, বাজেয়াপ্ত সামন্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে থাকুক, এই সম্পত্তি পরিণত করা হোক শ্রমিকদের উপনিবেশে, বৃহদায়তন কৃষির সকল সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে দিয়ে এখানে কৃষিকর্ম চলুক; এরই ভিতর

দিয়ে টলায়মান বুর্জোয়া মালিকানা সম্পর্কের মাঝে সাধারণের মালিকানার নীতি অবিলম্বে একটা দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যাবে। গণতন্ত্রীরা যেমন কৃষকদের সঙ্গে জোট বাঁধে, শ্রমিকদেরও তেমনি মিলতে হবে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে (১৬)। উপরন্তু, গণতন্ত্রীরা সরাসরি একটি ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জন্য চেষ্টা করবে, আর যদি বা তারা একটি একক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র এড়াতে না পারে তাহলে তারা অন্ততপক্ষে কমিউনিটিসমূহ* ও প্রদেশগুলির জন্য যতটা সম্ভব বেশি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাতন্ত্র্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে পঙ্গু করে রাখতে চেষ্টা করবে। এই পরিকল্পনার বিপক্ষে শ্রমিকদের একটি একক, অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্যই শুধু নয়, সে প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের হাতে সমস্ত ক্ষমতা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্যও লড়াই করা দরকার। কমিউনিটিগুলির জন্য স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বুলিতে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। জার্মানির মতো একটি দেশে, যেখানে এখনও বিদ্যমান মধ্যযুগের অনেক অবশিষ্টাংশকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে, যেখানে এখনও এত বেশি স্থানীয় ও প্রাদেশিক গোঁড়ামি বিচূর্ণ করতে হবে, সেখানে যে-বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা একমাত্র কেন্দ্র থেকেই পূর্ণোদ্যমে চালানো সম্ভব, তার পথে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি নগর ও প্রতিটি প্রদেশকে কোনো অবস্থাতেই নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া চলে না। বর্তমান অবস্থাটা ফের মাথা চাড়া দেবে, একই অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক প্রদেশে পৃথকভাবে লড়তে হবে জার্মানদের, এ সহ্য করা চলে না। সম্প্রদায়গত মালিকানা অর্থাৎ মালিকানার যে রূপটা আজো আধুনিক ব্যক্তিগত মালিকানার পিছনে পড়ে আছে এবং যা তৎপ্রসূত ধনী ও গরিব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কলহসহ সর্বত্রই অনিবার্যরূপে ঐ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হচ্ছে, এবং যে সম্প্রদায়গত দেওয়ানি আইন শ্রমিকদের ঠকায় ও রাষ্ট্রীয় নাগরিক আইনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত, সেগুলোকে একটা

---

* কমিউনিটি (Community) – শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রাম্য-সমাজ উভয়ই জড়িয়ে এখানে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

তথাকথিত মুক্ত সম্প্রদায়গত সংবিধান দিয়ে চিরস্থায়ী করা হবে — এটা তো বরদাস্ত করা চলে না একেবারেই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সের মতো আজকের জার্মানিতেও প্রকৃত বৈপ্লবিক পার্টির কাজ হল কঠোরতম কেন্দ্রীকরণের প্রবর্তন।*

গণতন্ত্রীরা কিভাবে আগামী আন্দোলনের সময় ক্ষমতা হাতে পাবে এবং কিভাবে তারা অল্পবিস্তর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে বাধ্য হবে — তা দেখা গেল। প্রশ্ন উঠবে যে, এর উত্তরে শ্রমিকদের কোন্ কোন্ ব্যবস্থা প্রস্তাব করা উচিত। অবশ্য, আন্দোলনের প্রারম্ভে শ্রমিকেরা কোন বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে না। কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব:

---

* আজ অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অনুচ্ছেদটির মূলে ছিল একটা ভুল সমীক্ষা। বোনাপার্টপন্থী ও উদারনীতিক ইতিহাস-মিথ্যাকারকদের দৌলতে সেই সময় অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হত যে, ফ্রান্সের কেন্দ্রীকৃত শাসনযন্ত্র মহান বিপ্লব কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ করে রাজতান্ত্রিক ও ফেডারেলপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করার জন্য অপরিহার্য ও মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কনভেন্শন (১৭) কর্তৃক কার্যকর করা হয়েছিল এই যন্ত্র। এখন কিন্তু একথা সুবিদিত যে, আঠারোই ব্রুমেয়ার (১৮) পর্যন্ত সমগ্র ফরাসী বিপ্লব জুড়ে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও কমিউনের শাসনসংস্থা গঠিত হত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সব সংস্থা কাজ করত। আমেরিকার অনুরূপ এই প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে বিপ্লবের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার, এতটা শক্তিশালী যে আঠারোই ব্রুমেয়ার কুদেতার (coup d'état) পরই নেপোলিয়ন অতি দ্রুত এর পরিবর্তে প্রবর্তন করলেন প্রিফেক্টদের দিয়ে শাসন পরিচালনার বন্দোবস্ত। সেই ব্যবস্থা এখনও বর্তমান, আর সেইজন্যই প্রথম থেকে এটা ছিল বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীলতার হাতিয়ার। কিন্তু স্থানীয় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যতটুকু পরিমাণে রাজনৈতিক, জাতীয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধধর্মী, ঠিক ততটুকু পরিমাণেই তা সেই সংকীর্ণমনা ক্যান্টনগত বা কমিউনগত আত্মপরতার সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত — যা সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এত ঘৃণা মনে হয়, আর দাক্ষিণ জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রীরা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যাকে সারা জার্মানির চলতি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। [১৮৮৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১। চলতি সমাজব্যবস্থার যত বেশি সম্ভব নানা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে, তার নিয়মিত ধারাকে ব্যাহত করতে, নিজেদের বেকায়দায় ফেলতে, এবং উৎপাদন-শক্তি, যানবাহন, কল-কারখানা এবং রেলপথগুলি যত বেশি সম্ভব রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীভূত করতে গণতন্ত্রীদের বাধ্য করা;

২। গণতন্ত্রীরা কোনো অবস্থাতে বৈপ্লবিক পথে চলবে না, চলবে নিতান্ত সংস্কারবাদী পদ্ধতিতেই, তাই তাদের প্রস্তাবগুলিকে চরম পথে ঠেলে দিতে হবে ও সেগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রত্যক্ষ আঘাতে পরিণত করতে হবে শ্রমিকদের; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেটি বুর্জোয়ারা যদি রেলপথ আর কল-কারখানা কিনে নেবার প্রস্তাব করে তাহলে শ্রমিকদের দাবি করা উচিত যে, রেলপথ এবং কল-কারখানা প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পত্তি বলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিনা ক্ষতিপূরণে সরাসরি বাজেয়াপ্ত করে নিতে হবে। গণতন্ত্রীরা আনুপাতিক করধার্যের প্রস্তাব করলে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রবর্তন; যদি গণতন্ত্রীরা নিজেরাই অল্পস্বল্প ক্রমবর্ধিত করধার্যের প্রস্তাব আনে, তাহলে শ্রমিকদের এমন উঁচু হারে বেড়ে চলা করধার্যের জিদ ধরতে হবে যাতে বৃহৎ পুঁজির সর্বনাশ ঘটে; যদি গণতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের ঋণ নিয়ন্ত্রণের দাবি তোলে তবে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা (state bankruptcy) ঘোষণার জন্য। এইভাবে শ্রমিকদের দাবি সর্বত্র নির্ধারিত হবে গণতন্ত্রীরা কতটা ছাড়বে ও কী ব্যবস্থা আনবে সেই অনুসারে।

জার্মান শ্রমিকেরা যদি একটা দীর্ঘ বৈপ্লবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণত না গিয়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থসমূহ অর্জন করতে না পারে, তবে তারা এবার অন্তত এইটুকু সুনিশ্চিত বলে জানবে যে, আসন্ন বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্কটি ফ্রান্সে তাদেরই স্ব-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ জয়লাভের সঙ্গে মিলে যাবে এবং তার দ্বারা ত্বরান্বিত হবে বিপুল পরিমাণে।

কিন্তু, নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ যে কী সে বিষয়ে নিজেদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলে, স্বাধীন পার্টি হিসেবে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেদের স্থান গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের কপটবুলিতে মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হয়ে প্রলেতারীয় পার্টির স্বাধীন সংগঠনের কাজ থেকে বিরত না হয়ে তাদের নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য নিজেদেরই যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।

তাদের রণধ্বনি তুলতে হবে: নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব (The Revolution in Permanence)।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫০

১৮৫০ সালে লিফ্‌লেট আকারে বিলি করা হয়

মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলা সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন' ('Revelations about the Cologne Communst Trial'), (জুরিখ, ১৮৮৫) গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত

বইখানার মূল জার্মান পাঠ অনুসারে ছাপা হল

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ (১৯)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা (২০)

এখানে পুনঃপ্রকাশিত এই রচনাটি মার্কসের সমসাময়িক ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষকে তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে, নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এ এই তত্ত্ব সমগ্র আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে মোটের উপর রূপরেখাকারে প্রযুক্ত হয়েছিল; 'Neue Rheinische Zeitung'-এ (২১) মার্কস ও আমার প্রবন্ধগুলিতে সে তত্ত্ব দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণে অনবরত ব্যবহৃত হত। অপরদিকে এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল, কয়েক বছর ধরে গোটা ইউরোপের পক্ষে যেমন সংকটসংকুল তেমনই বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক যে বিকাশ ঘটেছিল তার গতিপথের অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ খুলে দেখানো, অর্থাৎ লেখকের ধারণা অনুসারে, রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে তারই পরিণাম বলে উদ্‌ঘাটিত করা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা হল অর্থনৈতিক হেতু।

ঘটনা ও ঘটনামালাকে সমসাময়িক ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক কারণের হদিশ পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না। আজও, সংশ্লিষ্ট বিশেষ পত্রিকাগুলিতে যখন মূল্যবান মালমশলার যোগান এত বিপুল তখনও, এমন কি ইংলন্ডে বসেও, দুনিয়ার বাজারে শিল্প ও বাণিজ্যের গতিবিধি এবং উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটছে তার দৈনন্দিন হিসাব এমনভাবে রাখা অসম্ভব যাতে ঐসব বিচিত্র, জটিল ও নিত্য পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি থেকে — এদের মধ্যে আবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি তারা সাধারণত বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় থাকে, তার পরই হঠাৎ প্রচন্ড তেজে উপরিতলে আত্মপ্রকাশ করে — যে কোন মুহূর্তে

সাধারণ সিদ্ধান্ত টানা চলে। বিশেষ কোন এক পর্বের আর্থিক ইতিহাসের পরিচ্ছন্ন পর্যালোচনা কখনোও ঘটনাপ্রবাহের সমসাময়িক কালে সম্ভব নয়, সম্ভব একমাত্র পরবর্তীকালেই, মালমশলার যোগাড় ও বাছাই হয়ে যাবার পর। পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, আর সর্বদাই তা পিছিয়ে থাকে। এ জন্য সাম্প্রতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রয়োজন হয় সব থেকে নির্ধারক এই উপাদানটিকে স্থির বলে ধরা; আলোচ্য পর্বের সূচনায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাকে গোটা পর্ব জুড়েই নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা; অথবা পরিস্থিতিটার ভিতরে শুধু সেই সব পরিবর্তনকেই হিসাবের মধ্যে গণ্য করা, যেগুলি উদ্ভূত হয়েছে একান্তই সুপরিস্ফুট ঘটনাবলি থেকেই, এবং তাই যেগুলি নিজেরাও সমানই সুপরিস্ফুট। সুতরাং বস্তুবাদী পদ্ধতিকে এক্ষেত্রে প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকতে হয় অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত বর্তমানের সামাজিক শ্রেণীগুলি ও তাদের অংশগুলির মধ্যেকার স্বার্থসংঘাতে রাজনৈতিক সংঘাতগুলির হেতু সন্ধান করাতে এবং এই কথাটাই প্রমাণ করতে যে, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পার্টিগুলি হল ঐ সব শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশগুলিরই কমবেশী যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিফলন।

বিচার্য প্রক্রিয়াগুলির সকলের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার সমকালীন পরিবর্তনগুলির এই অনিবার্য অবহেলা যে ভুলত্রুটির উৎস হতে বাধ্য একথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার সকল অবস্থাতেই অনিবার্যভাবে রয়েছে ভুলের উৎস — যদিও তার জন্য কেউই তো সাম্প্রতিক ইতিহাস রচনা থেকে নিবৃত্ত হন না।

মার্কস যখন এই লেখায় হাত দেন তখন উল্লিখিত ত্রুটির উৎসটি ছিল আরোই বেশি অপরিহার্য। ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লবের যুগে যে সব অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছিল তার অনুসরণ, এমন কি তা নজরে রাখাও ঐ সময়ে একেবারেই অসম্ভব ছিল। লণ্ডনে নির্বাসনের গোড়ার কয়েক মাসে, ১৮৪৯—১৮৫০ সালের শরৎ ও শীতকালেও অবস্থা একইরকম ছিল। আর ঠিক ঐ সময়েই মার্কস এই লেখা শুরু করেন। অথচ এমন সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বেকার ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিপ্লবের পরবর্তীকালে সে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস উভয়

ক্ষেত্রেই নিখুঁত জ্ঞানের দরুন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল ঘটনাবলির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করে এমনভাবে তাদের এক চিত্র উপস্থিত করা যার জুড়ি এর পরে আর মেলে নি, এবং মার্কস নিজেই পরবর্তীকালে যে দুইদফা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে যা চমৎকার কৃতিত্বে উত্তীর্ণ হয়।

প্রথম পরীক্ষার উদ্ভব হয়েছিল এই ঘটনা থেকে যে, ১৮৫০ সালের বসন্তকালের পর মার্কস অর্থতত্ত্বচর্চার আবার একবার ফুরসত পেলেন, আর প্রথমেই শুরু করলেন গত দশ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে। এর ফলে অসম্পূর্ণ মালমশলা থেকে **আধা আনুমানিক** পন্থায় তদবধি যা তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, নিছক তথ্য থেকেই তা তাঁর কাছে এবার পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল — অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের বিশ্ববাণিজ্য সংকটই হল ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবের সত্যকার জন্মদাত্রী, আর ১৮৪৮ সালের মাঝামাঝি থেকে যে শিল্পসমৃদ্ধি ক্রমশ ফিরে আসছিল এবং যার পূর্ণপরিণতি ঘটেছিল ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ সালে, তাই ছিল পুনর্বলীয়ান ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার পুনরুজ্জীবনী শক্তি। এইটেই হল নির্ধারক ব্যাপার। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে* ('Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue', হামবুর্গ, ১৮৫০-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল) তখনও পর্যন্ত অতি শীঘ্রই বৈপ্লবিক শক্তির নতুন এক জোয়ারের প্রত্যাশা থাকলেও ১৮৫০ সালের শরৎকালে প্রকাশিত শেষ সংখ্যারূপী (মে থেকে অক্টোবর) যুগ্ম সংখ্যাটিতে মার্কস ও আমি যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা লিখি তা চিরতরে সেই বিভ্রমের অবসান ঘটায়: 'নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নতুন কোনও সংকটের পেছু পেছু। তবে সেই সংকটের মতনই বিপ্লবও সমান সুনিশ্চিত।'** একমাত্র এই মূলগত পরিবর্তনটুকুই করতে হয়েছিল। গোড়ার প্রবন্ধগুলিতে ঘটনা প্রবাহের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, অথবা সেখানে যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে পরিবর্তন করার মতো কিছুই ছিল না, তার প্রমাণ উল্লিখিত পর্যালোচনায় ১৮৫০-এর ১০

* এই খণ্ডের ৯০-১৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

মার্চ থেকে শরৎকাল পর্যন্ত বিবরণীর পূর্বানুবৃত্তি। এজন্যই আমি হালের এই নবসংস্করণে এই পূর্বানুবৃত্তিকে চতুর্থ প্রবন্ধ হিসাবে স্থান দিলাম।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আরও কঠোর। ১৮৫১ সালে ২ ডিসেম্বর তারিখে লুই বোনাপার্টের কুদেতার ঠিক পরেই মার্কস ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুদিনের মতন বৈপ্লবিক পর্বের অবসানসূচক এই ঘটনাটি পর্যন্ত সময়টুকু নিয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাস আবার নতুন করে লেখেন ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', তৃতীয় সংস্করণ, হামবুর্গ, মাইসনার, ১৮৮৫)। এই পুস্তিকাতে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত পর্বটি আরও সংক্ষেপে হলেও ফের আলোচিত হয়। বৎসরাধিক পরে যে চূড়ান্ত ঘটনা ঘটেছিল তারই আলোকে রচিত এই দ্বিতীয় উপস্থাপনের সঙ্গে আমাদেরটির তুলনা করুন — দেখা যাবে লেখককে খুব সামান্যই পরিবর্তন করতে হয়েছে।

এছাড়াও আমাদের রচনাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কারণে যে, এইটিতেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় সেই সূত্রটি, জগতের সকল দেশের শ্রমিক পার্টি একমত হয়ে যার মারফত তাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের দাবিটা সংক্ষেপে সংহত করেছে: উৎপাদনের উপকরণগুলির উপরে সমাজের দখল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'প্রাথমিক যে আনাড়ী সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক দাবিগুলি' বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে সেই 'কাজের অধিকার' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 'কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে আছে পুঁজির উপরে আয়ত্তি; পুঁজির উপরে আয়ত্তির পিছনে আছে **উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে** সেগুলিকে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেইহেতু মজুরি-শ্রম ও পুঁজি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও অবসান।'* অতএব এইখানেই সর্বপ্রথম এই একটি উপস্থাপনা রচিত হল যেটা অনুসারে আধুনিক শ্রমিক-সমাজতন্ত্র হল একদিকে সামন্ত, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, প্রভৃতি সমাজতন্ত্রের নানাবিধ রকমফের থেকে, এবং অপরদিকে ইউটোপীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক-কমিউনিজমের তালগোল পাকান সামগ্রীসমূহের যৌথ সম্ভোগ উভয়ের থেকে সমানেই পরিস্ফুটভাবে স্বতন্ত্র। পরে মার্কস যখন সূত্রটিকে প্রসারিত করে বিনিময়ের উপকরণগুলির

* এই খণ্ডের ১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

উপরেও দখল এর অন্তর্ভুক্ত করলেন, তখন সেই সম্প্রসারণে মূল সূত্রের একটি অনুসিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ পেল — 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর পরে এমনিতেই যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। ইংলন্ডে জনকয়েক পন্ডিতমূর্খ সম্প্রতি যোগ করেছেন, 'বণ্টনের উপকরণগুলি'ও সমাজের হাতে তুলে দিতে হবে। উৎপাদন ও বিনিময়ের উপকরণগুলি থেকে স্বতন্ত্র এই বণ্টনের অর্থনৈতিক উপকরণগুলি যে কী তা এই ভদ্রলোকদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যদি না বণ্টনের **রাজনৈতিক** উপকরণের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যেমন কর অথবা জাক্‌সেন্‌ভালদ (২২) ও অন্যান্য দান সমেত দুঃস্থদের জন্য খয়রাতি। কিন্তু প্রথমত এগুলি তো ইতিমধ্যে এখনই গোটা সমাজের, হয় রাষ্ট্রের নয়ত-বা সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত বণ্টনের উপকরণ, আর দ্বিতীয়ত, ঠিক এগুলিরই অবসান আমরা চাই।

* * *

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সকলকার যা কিছু ধারণা তা ছিল পূর্বতন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন। আসলে ফ্রান্সই ১৭৮৯ থেকে গোটা ইউরোপীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল; সেখান থেকেই এখন আর একবার ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ বৈপ্লবিক রূপান্তরের সঙ্কেতধ্বনি। কাজেই, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে যে 'সামাজিক' বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ঘোষিত হয় তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত আমাদের ধারণা যে ১৭৮৯ ও ১৮৩০ সালের প্রতিরূপগুলির স্মৃতির দ্বারা তীব্রভাবেই রঞ্জিত হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। তাছাড়া, প্যারিস অভ্যুত্থানের প্রতিধ্বনি যখন শোনা গেল ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের বিজয়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানে; একেবারে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ইউরোপ যখন ডুবে গেল আন্দোলনের জোয়ারে; তারপর জুন মাসে যখন প্যারিসে সংঘটিত হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে ক্ষমতাদখলের জন্য প্রথম বড় লড়াই; সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা যখন আপন শ্রেণীর জয়লাভের ফলেই এত নাড়া খেল যে তারা আবার সদ্য-উৎখাত রাজতান্ত্রিক-

সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কোলেই ফিরে গেল, তখন এ বিষয়ে তদানীন্তন পরিস্থিতিতে আমাদের আর কোন সংশয়ই থাকা সম্ভব ছিল না যে, নির্ধারক মহাসংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, সে সংগ্রাম চালাতে হবে একটা অখন্ড, সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল বৈপ্লবিক পর্ব জুড়ে, কিন্তু যার একমাত্র পরিণতি ঘটবে প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিজয়ে।

১৮৪৯ সালের পরাজয়গুলোর পর আমরা মোটেই in partibus (২৩) অস্থায়ী হবু সরকারগুলির চারিদিকে সমবেত খেলো গণতন্ত্রের বিভ্রান্তিতে অংশ নিই নি। খেলো সেই গণতন্ত্রের ভরসা ছিল 'স্বৈরপ্রভুদের' উপরে 'জনসাধারণের' দ্রুত ও শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত জয়লাভ হবে; আমরা তাকিয়েছিলাম 'স্বৈরপ্রভুদের' অপসারণের পর এই 'জনসাধারণের' মধ্যেই প্রচ্ছন্ন পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দিকে। খেলো গণতন্ত্র যেকোন দিন আর এক দফা অভ্যুত্থানের প্রত্যাশায় রইল; আমরা ১৮৫০ সালের শরৎকালেই ঘোষণা করেছিলাম যে, বৈপ্লবিক পর্বের অন্তত **প্রথম** অধ্যায় শেষ হয়ে গেল এবং নতুন এক দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের আবির্ভাবের আগে আর কিছুর আশা নেই। এর জন্য বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে আমাদের একঘরে করেছিল ঠিক সেই সব লোকরাই যারা পরে প্রায় সকলেই বিসমার্কের সঙ্গে বনিবনাও করে নেয় — অবশ্য সে ঝামেলা পোয়ানোটা বিসমার্ক যতটুকু দরকার বোধ করেছিলেন ততটুকু।

ইতিহাস কিন্তু আমাদের ধারণাও ভুল প্রতিপন্ন করেছে, উদ্ঘাটিত করেছে আমাদের সেই সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটা বিভ্রম। ইতিহাস তার থেকেও বেশি কিছু করেছে: আমরা তখন যে ভ্রান্ত মত পোষণ করতাম শুধু তাকেই সেটা খণ্ডন করে নি, প্রলেতারিয়েতকে যে অবস্থায় সংগ্রাম চালাতে হবে ইতিহাস তারও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ১৮৪৮ সালের সংগ্রাম পদ্ধতিটা আজ সবদিক থেকেই অচল, আর এটা হল এমন এক ব্যাপার যার দিকে বর্তমান মুহূর্তে আরও ঘনিষ্ঠ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আজ পর্যন্ত সব বিপ্লবের ফলেই একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর শাসনকে হটিয়ে তার জায়গা জুড়েছে অন্য এক শ্রেণীর শাসন; কিন্তু শাসিত জনসাধারণের তুলনায় সকল শাসক শ্রেণী এযাবৎ হয়ে এসেছে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু

অংশমাত্র। এইভাবেই একটা সংখ্যালঘু শাসক গোষ্ঠী পর্যুদস্ত হয়েছে, আর তার জায়গায় আর একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব করায়ত্ত করেছে ও নিজ স্বার্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঢেলে সাজিয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই শেষোক্তরা ছিল এমন সংখ্যালঘু অংশ যারা অর্থনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারে শাসনভার গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত ও আহূত হয়েছে। আর ঠিক এই কারণে, একমাত্র এই কারণেই শাসিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয় এদের উপকারার্থে বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল, নয়ত-বা এ বিপ্লব মেনে নিয়েছিল শান্তভাবে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রের বাস্তব অন্তঃসারটিকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে এই সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ রূপ হল এই যে, এগুলি সংখ্যালঘুদের বিপ্লব। এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেক্ষেত্রে যোগ দিয়েছে সেখানেও তারা জেনেশুনেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যোগ দিয়েছে শুধু সংখ্যালঘুদের স্বার্থের জন্য; কিন্তু তারই জন্য, অথবা এমন কি নিতান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিষ্ক্রিয় নির্বিরোধী মনোভাবের জন্যও বোধ হয়েছে ঐ সংখ্যালঘু অংশ বুঝি-বা সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি।

সাধারণত, গোড়ার দিকের বড়রকম জয়লাভের পর বিজয়ী সংখ্যালঘুর অংশ ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক অংশ যা পাওয়া গেল তাতেই তুষ্ট থেকেছে, অন্যেরা চেয়েছে আরও এগোতে, আর এমন সব নতুন দাবি তুলেছে যা অন্তত আংশিকভাবে বিপুল জনসাধারণের সত্যকার অথবা আপাতস্বার্থের অনুকূল। পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে এইসব অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল দাবি আসলে জোর করে কাজে পরিণত হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তা ক্ষণকালের জন্য; অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী তরফ ফের প্রাধান্য লাভ করে, আর যেটুকু তখন পাওয়া গিয়েছিল তা আবার পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে হারাতে হয়। পরাস্তরা তখন হৈচৈ করেছে বিশ্বাসঘাতকতার রব তুলে অথবা তাদের হারের জন্য দায়ী করেছে আপতিকতাকে। আসলে কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার যা ঘটল তা অনেকটা এইরকম: প্রথম জয়ের ফলে অর্জিত লাভ আরো র‍্যাডিক্যাল তরফের দ্বিতীয় জয়ের দ্বারাই সুদৃঢ় হয়; এ কাজ এবং সেই সঙ্গে সে মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেটা সম্পন্ন হবার পর র‍্যাডিক্যালপন্থীরা ও তাদের কীর্তিকলাপ রঙ্গমঞ্চ থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

সপ্তদশ শতকের মহান ব্রিটিশ বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান

যুগের সকল বিপ্লবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেছে — সেগুলিকে মনে হয়েছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামমাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য মনে হয়েছিল, আরও বেশি প্রযোজ্য এই কারণে যে, কোন্ পথে সে মুক্তির সন্ধান করতে হবে ঠিক সে সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা ১৮৪৮ সালে খুব কম লোকেরই ছিল। এমন কি প্যারিসে পর্যন্ত, প্রলেতারিয়ান সাধারণ নিজেরাও জয়লাভের পর কোন্ পথ ধরতে হবে সে সম্পর্কে তখনো ছিল পুরোপুরি অন্ধকারে। অথচ আন্দোলন চলেছে সাহজিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও অদম্য। এই কি ঠিক সেই পরিস্থিতি নয় যখন সফল হওয়ার কথা এমন একটা বিপ্লবের, যার নেতৃত্ব সংখ্যালঘুদেরই হাতে সত্য, কিন্তু এবার তা ঘটছে আর সংখ্যালঘুর স্বার্থে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠেরই প্রকৃত স্বার্থে? অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমস্ত বৈপ্লবিক পর্বেই যদি ঠেলে এগিয়ে-আসা সংখ্যালঘুদের পক্ষে শুধু আপাতমধুর ভুয়া বাক্যজাল বিস্তার করেই বিপুল জনসাধারণকে পক্ষে টানা অত সহজ হয়ে থাকে, তবে যে সব ভাবনা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে যথার্থ প্রতিফলন, যে সব চাহিদা তারা তখনও বুঝতে শেখে নি অথচ ভাসাভাসাভাবে অনুভব করেছে তারই যা স্পষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য অভিব্যক্তি, তাই দিয়ে সে জনসাধারণ কেন কম প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখাবে? একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, মোহভঙ্গ ঘটা ও নৈরাশ্যসঞ্চার হওয়ামাত্র জনসাধারণের ঐ বৈপ্লবিক মেজাজ প্রায় সব সময়েই, সাধারণত খুবই দ্রুত অবসাদে এমন কি বিরাগ-বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুয়া বাক্যজালের প্রশ্ন ছিল না, বরঞ্চ ছিল বিপুল সংখ্যাধিক্যেরই একান্ত স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন — যে স্বার্থবোধ অবশ্য সে সময়ে তখনকার বিপুল সংখ্যাধিক্যের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয় নি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বার্থ বাস্তব রূপায়ণের ভিতর দিয়ে, প্রত্যয়জনক স্পষ্টতার জোরেই তাদের কাছে যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল। আর যখন, মার্কস ১৮৫০ সালের বসন্তকালে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে যা দেখান, ১৮৪৮-এর সামাজিক বিপ্লব থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের

বিকাশ প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করল বড় বুর্জোয়াদের হাতেই, তাও আবার যাদের টান ছিল রাজতন্ত্রের দিকে তাদেরই হাতে, এবং অপরদিকে সেই সমাজের অন্য সব শ্রেণীকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া উভয়কেই সমবেত করল

প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে, যার ফলে সম্মিলিত জয়লাভের সময়ে ও তারপরে তারা নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রলেতারিয়েতকেই দাঁড়াতে হয় নির্ধারক কারিকা হিসেবে — তখন সংখ্যালঘুর বিপ্লবকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপ্লবে রূপান্তরিত করার প্রতিটি সম্ভাবনাই কি উপস্থিত ছিল না?

আমাদের, ও যাঁরা আমাদের মতন করে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের সকলকে ইতিহাস ভুল প্রতিপন্ন করেছে। সেটা এই কথাই পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, সে সময়ে ইউরোপীয় মূলভূমির অর্থনৈতিক বিকাশের অবস্থা বহুলাংশেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন লোপ করার উপযোগী হয়ে ওঠে নি; ইতিহাস এ কথাটি প্রমাণ করল সেই অর্থনৈতিক বিপ্লব দিয়ে যা ১৮৪৮ থেকে সমগ্র ইউরোপীয় মূলভূমিকে আঁকড়ে ধরেছে, যার ফলে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও সম্প্রতি রাশিয়াতেও বৃহৎ শিল্প সত্যই শিকড় গেড়ে বসেছে এবং জার্মানি নিশ্চিতভাবে পরিণত হয়েছে একটা প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রধান দেশে। এ সবকিছু ঘটল পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তিতেই, সুতরাং ১৮৪৮ সালে তার প্রসারলাভের তখনও বিপুল সম্ভাবনা বাকি ছিল। কিন্তু ঠিক এই শিল্প-বিপ্লবটাই সর্বত্র আবার শ্রেণী-সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে তুলেছে; ম্যানুফ্যাকচারের যুগ থেকে ও পূর্বে ইউরোপে এমন কি গিল্‌ড্‌-হস্তশিল্পের সময় থেকে যে কতকগুলি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চলে আসছিল তাকে অপসারিত করেছে; খাঁটি বুর্জোয়া ও খাঁটি বৃহদায়তন-শিল্প প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করেছে, আর তাদের টেনে এনেছে সমাজবিকাশের অগ্রভূমিতে। তাছাড়া এর ফলে এই দুই বিরাট শ্রেণীর মধ্যকার সংগ্রামটা, যার অস্তিত্ব ইংলন্ড বাদ দিলে ১৮৪৮ সালে শুধু প্যারিসে আর বড়জোর গুটিকয়েক বড় বড় শিল্পকেন্দ্রেই আবদ্ধ ছিল, তা আজ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে ও এমন তীব্রতা লাভ করেছে যা ১৮৪৮ সালে ছিল কল্পনাতীত। তখন ছিল আপন আপন সর্বরোগহর দাওয়াই সমেত নানা সম্প্রদায়ের বহুতর ঝাপসা সুসমাচার; আর আজ রয়েছে **একটিমাত্র** সাধারণ স্বীকৃত স্ফটিকস্বচ্ছ মার্কসের তত্ত্ব, সংগ্রামের চরম লক্ষ্য যার মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তখন ছিল অঞ্চল ও জাতি অনুসারে খণ্ডিত ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসাধারণ, একমাত্র সাধারণ দুঃখভোগের অনুভূতির দ্বারাই সংযুক্ত, অপরিণত, এবং উল্লাস থেকে হতাশার স্রোতে ইতস্তত অসহায়ভাবে

নিক্ষিপ্ত; আর আজ রয়েছে সমাজতন্ত্রীদের একক মহান আন্তর্জাতিক বাহিনী, অপ্রতিরোধ্য তার গতি, প্রতিদিনই বাড়ছে তার সংখ্যা, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অন্তর্দৃষ্টি ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা। প্রলেতারিয়েতের এই প্রবল বাহিনীও যদি এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছে না থাকে, একটি প্রচন্ড আঘাতে জয়লাভ দূরে থাকুক, যদি তাকে কঠিন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে ধীরে ধীরে এক এক কদম করেই অগ্রসর হতে হয়, তবে তা থেকে চূড়ান্তভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ১৮৪৮ সালে নিতান্ত এক তড়িৎ অভিযানে সমাজের রূপান্তর ঘটানো কতটা অসম্ভব ছিল।

দুই রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি রাজতান্ত্রিক দলে বিভক্ত বুর্জোয়া (২৪), সে বুর্জোয়ার আবার চরম কাম্য হল তার আর্থিক লেনদেনের উপযোগী শান্তি ও নিরাপত্তা, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক প্রলেতারিয়েত, পরাজিত ঠিকই, কিন্তু তবু সর্বদাই ভয়াবহ, সে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে ক্রমশই দানা বাঁধছে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকেরা — হিংস্র অভ্যুত্থানের একটানা আশঙ্কা, যদিও তা থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনাও নেই — এই ছিল তখনকার অবস্থা; তৃতীয় এক জনের, মেকিগণতন্ত্রী দাবিদার লুই বোনাপার্টের কুদেতার জন্যই যেন বিশেষভাবে এর সৃষ্টি। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর সৈন্যদলের সহায়তায় তিনি এই উত্তেজিত অবস্থার নিরসন ঘটালেন আর ইউরোপে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তাকে নতুন যুদ্ধবিগ্রহের একটা যুগ (২৫) আশীর্বাদ হিসেবে প্রদানের জন্য। নিচের থেকে বিপ্লবের যুগ তখনকার মতো শেষ হল; শুরু হল উপর থেকে বিপ্লবের যুগ।

তখনকার প্রলেতারিয়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কত অপরিপক্ক ছিল তারই এক নতুন প্রমাণ হাজির করল ১৮৫১ সালে সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তন। অথচ এরই ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবার কথা যাতে তারা পরিপক্ক হয়ে উঠতে বাধ্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন তেজী ভাবটির পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করল; সেনাবাহিনীকে ব্যাপৃত রাখা এবং বৈপ্লবিক ধারাটাকে ঘুরিয়ে বহির্মুখী করার তাগিদে পয়দা হল যুদ্ধগুলো, যার ভিতর দিয়ে 'জাতি সংক্রান্ত নীতি' (২৬) প্রতিষ্ঠার অজুহাতে বোনাপার্ট ফ্রান্সের জন্য রাজ্যগ্রাস করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। তাঁর অনুকারী

বিসমার্ক প্রাশিয়ার জন্য চালালেন সেই একই নীতি; ১৮৬৬ সালে তিনি করলেন তাঁর কুদেতা, উপর থেকে তাঁর বিপ্লব — সেটা জার্মান কনফেডারেশন (২৭) ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যতটা, প্রাশিয়ার Konfliktskammer-এর* বিরুদ্ধে তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু দুইজন বোনাপার্টের পক্ষে ইউরোপ ছিল খুবই সংকীর্ণ, আর এমনই ইতিহাসের পরিহাস যে, বিসমার্কই বোনাপার্টকে গদীছাড়া করলেন ও প্রাশিয়াধিপতি ভিলহেল্ম শুধু ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্যেরই (২৮) নয়, ভিত্তি স্থাপন করলেন ফরাসী প্রজাতন্ত্রেরও। অবশ্য সাধারণ ফলাফল দাঁড়াল এই যে, ইউরোপে পোল্যান্ড বাদে বৃহৎ জাতিগুলির স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ ঐক্য বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সত্য বটে এটা ঘটল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যেই, তবু তা সত্ত্বেও এতটা পরিসর জুড়ে যাতে এর পর শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের পথে জাতিগত জটিলতা আর গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে রইল না। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সমাধিখনকেরা হয়ে দাঁড়াল এই বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রেরই কর্মনির্বাহক। আর তাদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে বিভীষিকার মতো আবির্ভূত হল ১৮৪৮ সালের উত্তরাধিকারী, **আন্তর্জাতিকের** রূপ নিয়ে প্রলেতারিয়েত বাহিনী।

১৮৭০—১৮৭১ সালের যুদ্ধের পর বোনাপার্ট অন্তর্ধান করলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে এবং বিসমার্কের ব্রত পূর্ণ হল, যার ফলে তিনি তখন মামুলি **জাঙ্কারের** ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করতে পারলেন। অবশ্য এই পর্বের ছেদ টানল প্যারিস কমিউন। তিয়ের কর্তৃক গোপনে প্যারিস জাতীয় রক্ষিদলের (২৯) কামান চুরির চেষ্টার ফলে একটা সার্থক অভ্যুত্থান ঘটল। আর একবার দেখা গেল যে, প্যারিসে তখন প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ছাড়া আর কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। জয়লাভের পর ক্ষমতা একেবারে আপনা থেকেই ও সম্পূর্ণ অবিসংবাদীভাবেই গিয়ে পড়ল শ্রমিক শ্রেণীর মুঠোয়। এ কথাও আর একবার প্রমাণ হল যে, তখনো, আমাদের রচনায় উল্লিখিত সময়ের বিশ বছর পরেও শ্রমিক শ্রেণীর শাসন কত অসম্ভব ছিল। একদিকে ফ্রান্স প্যারিসকে পথে বসাল: মাকমাহনের বুলেট যখন প্যারিসে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল তখন দেশ

---

* Konfliktskammer, অর্থাৎ তখনকার প্রাশিয়ার সরকারবিরোধী আইন পরিষদ। — সম্পাঃ

রইল শুধু তাকিয়ে। অন্যদিকে ব্লাঙ্কিপন্থী (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ও প্রুধোঁপন্থীদের (সংখ্যালঘু) (৩০) মধ্যে বিভক্ত কমিউন এদের মধ্যকার নিষ্ফল বিতণ্ডায় ক্ষয়ে যেতে থাকল; দুপক্ষের কেউই জানত না কী করা প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে যে বিজয় পাওয়া গিয়েছিল অতি সহজেই, ১৮৪৮ সালের চকিত আক্রমণের মতোই তা অসার্থক হয়ে রইল।

মনে হয়েছিল সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের বুঝি-বা প্যারিস কমিউনের সঙ্গেই চিরসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত — কমিউন ও ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ থেকেই শুরু হল তার সব থেকে জোরালো পুনরুজ্জীবন। এর পর থেকে শুধু লক্ষ লক্ষের হিসাবেই গণনীয় এমন সব সৈনাবাহিনীতে অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি, এবং এতদিন যা স্বপ্নাতীত মনে হত এমন সব শক্তিধর আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা ও বিস্ফোরক পদার্থের প্রবর্তন সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সে বিপ্লব অশ্রুতপূর্ব নির্মমতা ও একেবারে অনিশ্চিত ফলাফলের বিশ্বযুদ্ধ বাদে অন্য যেকোন যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলে একদিকে বোনাপার্টীয় যুদ্ধ পর্বের আকস্মিক অবসান ঘটাল আর শান্তিপূর্ণ শিল্পবিকাশ সুনিশ্চিত করল। অপর পক্ষে সে বিপ্লব গুণোত্তর প্রগতিতে সেনাবিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার ফলে অত্যধিক মাত্রায় কর বাড়িয়ে তুলল, আর তাতে করে জনসাধারণের ভিতরকার দরিদ্রতর শ্রেণীদের ঠেলে দিল সমাজতন্ত্রের কোলে। অস্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উন্মত্ত প্রতিযোগিতার আশু কারণ অ্যালসেস-লরেন গ্রাসের ঘটনা ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়াদের উগ্রজাতিবাদে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিল; দুই দেশের শ্রমিকদের পক্ষে সেই ঘটনাই হল নতুন এক ঐক্যবন্ধন। আর প্যারিস কমিউনের বার্ষিকী পরিণত হল সমগ্র প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাধারণ উৎসব দিবসে।

মার্কস যা আগেই বলেছিলেন, ১৮৭০—১৮৭১ সালের যুদ্ধ ও কমিউনের পরাভব ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ভারকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে স্থানান্তরিত করে। স্বভাবতই ১৮৭১ সালে যে গ্রাসের রক্তক্ষয়ের চোট সামলাতে ফ্রান্সের বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। অন্যদিকে জার্মানিতে, যেখানে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রার (৩১) আশীর্বাদে একেবারেই কৃত্রিম অনুকূল পরিবেশে সযত্নে লালিত শিল্পগুলি ক্রমশই

দ্রুতহারে বেড়ে ওঠে, সেখানে আরও দ্রুত ও স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির। ১৮৬৬ সালে প্রবর্তিত সর্বজনীন ভোটাধিকার জার্মান শ্রমিকেরা বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করার ফলে পার্টির আশ্চর্য প্রসার অবিসংবাদী পরিসংখ্যান মারফত সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে: ১৮৭১—১,০২,০০০; ১৮৭৪—৩,৫২,০০০; ১৮৭৭—৪,৯৩,০০০ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ভোট। তারপর উচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের (৩২) রূপে এল এই অগ্রগতির স্বীকৃতি। সাময়িকভাবে পার্টি ভেঙেচুরে গেল, ১৮৮১ সালে ভোটসংখ্যা নেমে এল ৩,১২,০০০-এ। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থা কাটানো গেল, আর তারপর জরুরী আইনের (Exceptional Law) চাপ সত্ত্বেও, বিনা সংবাদপত্রে, বিনা বৈধ সংগঠনে এবং ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত হওয়ার অধিকার ছাড়াই শুরু হল প্রকৃত দ্রুত প্রসার: ১৮৮৪—৫,৫০,০০০; ১৮৮৭—৭,৬৩,০০০; ১৮৯০—১৪,২৭,০০০ ভোট। এর ফলে রাষ্ট্রের হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন লুপ্ত হল; সমাজতন্ত্রীদের ভোট উঠল ১৭, ৮৭,০০০-এ, মোট যত ভোট পড়ল তার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। সরকার ও শাসক শ্রেণীর সব কারসাজি ফুরিয়ে গেল ব্যর্থতায়, নিরুদ্দেশে, অসাফল্যে। তাদের নির্বীর্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ রাতের পাহারাওলা থেকে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব কর্তৃপক্ষই মেনে নিতে বাধ্য হয় — তাও আবার ঘৃণিত শ্রমিকদের কাছ থেকেই — সে প্রমাণ গোণা হতে লাগল নিযুতের ঘরে। রাষ্ট্র পৌঁছল তার দৌড়ের শেষ সীমায় — শ্রমিকরা তার কেবল শুরুতে।

উপরন্তু, সব থেকে শক্তিশালী, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও দ্রুততম হারে বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবে শুধু বিদ্যমান থেকেই জার্মান শ্রমিকেরা তাদের আদর্শের জন্য যে কাজ সম্পন্ন করেছিল, সেই প্রথম কাজটি বাদেও তারা আর একটি মস্ত কাজ করল। সর্বজনীন ভোটাধিকার কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়ে তারা তাদের সব দেশের কমরেডদের নতুন ও সব থেকে তীক্ষ্ণ একটি হাতিয়ার যোগাল।

বহুদিন থেকেই ফ্রান্সে সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু তার বদনাম রটেছিল বোনাপার্টীয় সরকারের হাতে অপব্যবহারের দরুন। কমিউনের পর সেটাকে ব্যবহার করার মতন কোন শ্রমিক পার্টিও ছিল না। প্রজাতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্পেনেও এই ভোটাধিকার ছিল, কিন্তু স্পেনে সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচন বর্জনই হয়েছিল বরাবরের রেওয়াজ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীদের অভিজ্ঞতাও কোন শ্রমিক পার্টির পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক হয় নি। লাটিন দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিকেরা ভোটাধিকারকে একটি ফাঁদ, সরকারী কারসাজির একটা হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। জার্মানিতে ব্যাপার দাঁড়াল অন্যরকম। সর্বজনীন ভোটাধিকার, গণতন্ত্র অর্জনকে ইতিপূর্বেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের সব থেকে গোড়াকার ও গুরুতর একটা কাজ বলে ঘোষণা করেছিল, আর সেই কথাই আবার তুলে ধরেন লাসাল। বিসমার্ক জনসাধারণকে তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করার একমাত্র পন্থা হিসেবে যখন ঐ সর্বজনীন ভোটাধিকার (৩৩) চালু করতে বাধ্য হলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শ্রমিকরা গুরুত্ব সহকারে তাকে গ্রহণ করে ও আগস্ত বেবেলকে পাঠায় প্রথম সংবিধান পরিষদ রাইখস্টাগে। আর সেদিন থেকেই তারা এমনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে যার ফলে তাদের লাভ হয়েছে হাজার গুণ এবং সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সামনে তা আদর্শের কাজ করেছে। ফরাসী মার্কসবাদী কর্মসূচীর ভাষায় ভোটাধিকার transformé, de moyen de duperie qu'il a été jusqu'ici, en instrument d'émancipation — আগে যা ছিল সেই প্রতারণার যন্ত্র থেকে তারা রূপান্তরিত করেছে মুক্তির হাতিয়ারে (৩৪)। প্রত্যেক তিনবছর অন্তর আমাদের সংখ্যা গণনার সুযোগদান; নিয়মিতভাবে প্রকাশিত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে আমাদের ভোট বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শ্রমিকদের জয়লাভের নিশ্চয়তা ও বিরোধী পক্ষের দুশ্চিন্তা সমমাত্রায় বাড়িয়ে তোলা, আর সেজন্যই আমাদের প্রচারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ানো; আমাদের নিজেদের ও সমস্ত বিরুদ্ধ পার্টির শক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন ও তার মারফত যেমন অসময়োচিত ভীরুতা তেমনই অসময়োচিত দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার উপযোগী আমাদের কার্যকলাপের মাত্রা নির্ণয়ের এক অদ্বিতীয় মাপকাঠি যোগানো — এছাড়া আর কোন সুবিধা যদি নাও দিয়ে থাকে সর্বজনীন ভোটাধিকার, এই যদি আমাদের কাছে সেটার একমাত্র সুবিধা হত, তবু সেটা হত যথেষ্টর চেয়েও বেশি। কিন্তু তার কীর্তি এর চেয়ে অনেক বেশি।

যেখানে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত আমাদের থেকে দূরে সরে আছে, সেখানে নির্বাচনী প্রচারের মারফত তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের, এবং আমাদের আক্রমণের মুখে অন্য সব পার্টিকে সমগ্র জনসাধারণের দরবারে নিজেদের মতামত ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা-সমর্থন করতে বাধ্য করার এক অদ্বিতীয় হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এই ভোটাধিকার। আর তা ছাড়াও সে ভোটাধিকার রাইখস্টাগে আমাদের প্রতিনিধিদের এমন একটি মঞ্চ জুটিয়ে দিয়েছে যেখান থেকে তারা পরিষদের ভিতরে বিরোধীদের সঙ্গে ও বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে কথা চালাতে পারে, তাতে থাকে সংবাদপত্র বা সভাসমিতির চেয়ে একেবারে ভিন্ন রকমের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন সরকার ও বুর্জোয়াদের আর কোন্ কাজে লাগতে পারল যখন অবিরাম তাতে ভাঙন ধরাল নির্বাচনী প্রচার ও রাইখস্টাগে সমাজতান্ত্রিক বক্তৃতা?

সর্বজনীন ভোটাধিকারের এই সার্থক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল, আর সে পদ্ধতি দ্রুত আরও বিকাশলাভ করল। যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে বুর্জোয়া শাসন সংগঠিত রয়েছে, দেখা গেল সেগুলিই শ্রমিক শ্রেণীকে আরও অনেক সুযোগ এনে দেয় খাস সেই প্রতিষ্ঠানগুলিরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার। শ্রমিকেরা রাষ্ট্রের এক একটা মিলিত সভা, মিউনিসিপাল কাউন্সিল ও পেশাগত আদালতের (trades courts) নির্বাচনে যোগ দিল; যে সব পদ অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সংখ্যক প্রলেতারিয়েতের কোন হাত ছিল তার প্রত্যেকটিতেই তারা বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। আর তাই অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে, বুর্জোয়ারা ও সরকার অনেক বেশি ভয় পেতে শুরু করল শ্রমিকদলের বেআইনী কাজের চেয়ে আইনানুগ কার্যকলাপকে, বিদ্রোহের থেকে নির্বাচনের ফলাফলকে।

কারণ এক্ষেত্রেও সংগ্রামের পরিবেশের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। সাবেকী কেতার বিদ্রোহ, ব্যারিকেড তুলে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, ১৮৪৮ পর্যন্ত সর্বত্রই যাতে ফয়সালা হয়েছে, তা এখন অকেজো হয়ে পড়ল বহুলাংশেই।

এ ব্যাপারে আমাদের ভুল ধারণা প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত: রাস্তার লড়াইয়ে সামরিক বাহিনীর উপরে সশস্ত্র বিদ্রোহের সত্যকার জয়লাভ, দুই

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেমনটি ঘটে থাকে তেমন ধরনের জয়লাভ হল বিরলতম ব্যতিক্রম। আর বিদ্রোহীরাও এর উপরে ভরসা রাখত ঠিক তেমনি বিরল ক্ষেত্রে। তাদের কাছে এটি ছিল শুধু নৈতিক শক্তির কাছে সৈন্যদের নতিস্বীকার করানোর প্রশ্ন, দুটি যুধ্যমান দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যকার সংগ্রামে যে শক্তির প্রভাব একেবারেই পড়ে না অথবা সামান্যই পড়ে। এ ব্যাপারে তারা সফল হলে সৈন্যদল আর হুকুমে সাড়া দেয় না, অথবা সেনানায়কদের মাথা ঠিক থাকে না এবং বিদ্রোহ হয় জয়যুক্ত। তারা এতে সফল না হলে সামরিক বাহিনী সংখ্যায় কম থাকলেও তখন অস্ত্রসজ্জা ও শিক্ষা, একক নেতৃত্ব, সামরিক শক্তির পরিকল্পিত প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলাই প্রাধান্য লাভ করে। প্রকৃত রণকৌশলগত তৎপরতার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ বড়জোর যা করতে পারে তা হল একটি ব্যারিকেড ঠিকমত বানানো ও তাকে রক্ষা করা। পারস্পরিক সহায়তা, মজুত শক্তির বিন্যাস ও প্রয়োগ, সংক্ষেপে আলাদা আলাদা বাহিনীগুলির যুগপৎ ও সুসমন্বিত কার্যকলাপ — একটা গোটা বড় শহর দূরে থাক, শহরের অঞ্চলবিশেষকে রক্ষা করার পক্ষেও যা অপরিহার্য — তা খুব স্বল্পমাত্রাতেই সম্ভব হয়, অধিকাংশ সময়ে একেবারেই হয় না। নির্ধারক ক্ষেত্রটিতে সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করার কথাটা তো এখানে আদৌ ওঠে না। সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধটাই এ সংগ্রামের প্রধান ধরন; শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই আক্রমণ, এখানে-ওখানে সাময়িক হানা বা পাশ থেকে হামলার রূপ নেয়; সাধারণত কিন্তু আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয় পিছু-হটা সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত অবস্থানগুলি দখলে রাখার মধ্যেই। এর উপরে, সৈন্যবাহিনীরই হাতে থাকে কামান ও সুসজ্জিত শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়রের ইউনিট — যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম যা প্রায় কখনোই বিদ্রোহীদের ভাগ্যে মোটেই জোটে না। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, সব থেকে নির্ভীকভাবে যে সব ব্যারিকেড লড়াই চালিত হয়েছে — প্যারিসে ১৮৪৮ সালে জুন মাসে, ভিয়েনায় ১৮৪৮-এর অক্টোবরে, ড্রেসডেন-এ ১৮৪৯ সালের মে মাসে — সেখানেও, যখনই আক্রমণরত সৈন্যের নেতারা রাজনৈতিক বিচারের তোয়াক্কা না রেখে নিছক সামরিক দৃষ্টি নিয়েই কাজ চালিয়েছে, আর তাদের সৈন্যরা বিশ্বস্ত থেকেছে, তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ হয়েছে পরাভূত।

১৮৪৮ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যে বহু সাফল্য অর্জন করে তার পিছনে

বহুবিধ কারণ ছিল। স্পেনের অধিকাংশ রাস্তার লড়াইয়ের মতো ১৮৩০ সালের জুলাই ও ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্যারিসে একটা জাতীয় রক্ষিদল এসে দাঁড়িয়েছিল বিদ্রোহী ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে। সেই রক্ষিদল হয় সরাসরি বিদ্রোহের পক্ষ সমর্থন করে, নয়ত-বা তাদের নিমরাজী দোমনা মনোভাবের দ্বারা সৈন্যবাহিনীকেও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে, আর তার উপরে আবার অস্ত্র যোগায় বিদ্রোহীদেরই। যেখানে এই জাতীয় রক্ষিদল গোড়া থেকেই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যেমন ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসে, সেখানে বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হয়। ১৮৪৮ সালে বার্লিনে জনসাধারণ জয়যুক্ত হয়েছিল, তার আংশিক কারণ হল [মার্চ মাসের] ১৯ তারিখ রাতে ও সকালে যথেষ্ট পরিমাণে নতুন সংগ্রামী শক্তির যোগদান, অংশত সৈন্যবাহিনীর অবসন্নতা ও তাদের মধ্যে খাদ্য পরিবেশনের বেবন্দোবস্ত, এবং সর্বশেষে অংশত যে বৈকল্য সৈন্যদলের নেতৃত্বকে গ্রাস করছিল তারই দরুন। কিন্তু সব কটি ক্ষেত্রেই সংগ্রামে জয়লাভ ঘটেছিল, কারণ সৈন্যবাহিনী তাদের নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেয় নি, কারণ নেতৃস্থানীয় অফিসাররা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে বসে, অথবা তাদের কাজের স্বাধীনতা ছিল না।

রাস্তার লড়াইয়ের স্বর্ণযুগেও তাই ব্যারিকেড থেকে বাস্তবের চেয়ে নৈতিক ফলাফলই দেখা গিয়েছিল বেশি। এটা ছিল সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা বিচলিত করারই হাতিয়ার। সেই ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত যদি তা টিকে থাকতে পারত তাহলে জয়লাভ ঘটত, নইলে পরাজয়। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রাস্তার লড়াইয়ের সাফল্যবিচারে এই মূলকথাটি মনে রাখতেই হবে।*

একেবারে ১৮৪৯ সালেই এ সম্ভাবনা ছিল বেশ ক্ষীণই। সর্বত্রই বুর্জোয়ারা সরকারের সঙ্গে আপন ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করেছিল, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আগুয়ান সৈন্যবাহিনীকে অভিনন্দন ও ভোজ দিয়েছিল 'সংস্কৃতি ও সম্পত্তি'র প্রতিনিধিরা। ব্যারিকেডের মোহ কেটে গেল; তার পিছনে সৈন্যরা আর 'জনসাধারণকে' নয়, দেখছিল বিদ্রোহীদের, প্ররোচকদের, লুঠেরাদের, উচ্চনীচ-সমস্থানীদের, সমাজের আবর্জনাদেরই। কালক্রমে

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে এই বাক্য বাদ ছিল। — সম্পাঃ

অফিসাররাও পোক্ত হয়ে উঠেছিল রাস্তার লড়াইয়ের কায়দায়: তখন আর তারা হঠাৎ-তোলা প্রতিরোধব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আড়াল না নিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হত না, এগিয়ে যেত বরঞ্চ বাগান, চত্বর ও বাড়ির মধ্য দিয়ে ঘোরা পথে। আর সামান্য দক্ষতায় এই কায়দা দশের মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই এখন সার্থক হতে থাকে।

কিন্তু তারপর থেকে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আর তার সবগুলিই আবার সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে। বড় শহরগুলি যেমন যথেষ্ট ফেঁপে উঠেছে, তেমনই সৈন্যদল বৃদ্ধি পেয়েছে আরও অনেক বেশি। ১৮৪৮ থেকে প্যারিস ও বার্লিনের লোকসংখ্যা চারগুণের থেকে কমই বেড়েছে, কিন্তু তাদের গ্যারিসন বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। রেলপথের কল্যাণে এই সেনাদলকে আবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানো যায়, আর আটচল্লিশ ঘণ্টায় তো তাকে পরিণত করা যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীতে। সংখ্যার দিক থেকে বিপুলমাত্রায় স্ফীত এই সৈন্যদলের অস্ত্রসজ্জা হয়ে উঠেছে অতুলনীয় রকমের কার্যকর। ১৮৪৮ সালে ছিল মসৃণ নলের মাজ্‌ল-লোডিং পার্কাশ্‌ন বন্দুক, আর আজ এসেছে ছোট ক্যালিবারের ব্রিচ্‌-লোডিং ম্যাগাজিন রাইফেল, এটার গুলি পোঁছয় প্রথমটির চেয়ে চারগুণ দূরে, লক্ষ্য দশগুণ বেশি নির্ভুল ও ছোঁড়া যায় দশগুণ দ্রুতহারে। সেদিন ছিল কামানের অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর রাউন্ড শট আর গ্রেপ-শট (grape-shot); আর আজ হয়েছে সংঘাতে বিদীর্ণ হয় এমন গোলা, সব থেকে মজবুত ব্যারিকেডকেও ধ্বংস করার পক্ষে যার একটিমাত্রই যথেষ্ট। তখন অগ্নিনিরোধক প্রাচীর ভেঙে এগোবার জন্য ছিল স্যাপারের গাঁইতি; আর আজ সেখানে আছে ডিনামাইটের কার্তুজ।

অপরদিকে বিদ্রোহীদের তরফের হাল সব রকমেই আগের চেয়ে খারাপ দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণের সব স্তরেরই সহানুভূতি থাকবে এমন বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আজ খুবই কম; শ্রেণী-সংগ্রামে সব ক'টি মধ্যবর্তী স্তর সম্ভবত কখনও এত একান্তভাবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে দানা বাঁধবে না, যাতে তার তুলনায় বুর্জোয়াদের চারিদিকে সমবেত প্রতিক্রিয়াশীলের তরফ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। 'জনসাধারণ' সেইজন্য সর্বদাই বিভক্ত হয়ে যাবে, তাই ১৮৪৮ সালে খুবই শক্তিশালী যে হাতলটা

অসামান্য ফলপ্রসূ হয়েছিল আজ তা নেই। সামরিকভাবে পোক্ত সৈনিক বেশী সংখ্যায় যদি-বা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যায়, তাহলে আবার তাদের অস্ত্র যোগানোও সেই অনুপাতে কঠিন হয়ে উঠবে। বন্দুকের দোকানের শিকারোপযোগী বা শখের বন্দুকগুলোকে পুলিসের হুকুমে আগে থাকতেই টিপকলের কিয়দংশ সরিয়ে রেখে যদি অকেজো করা নাও হয়, তবু সেগুলি নিকট পাল্লার লড়াইয়েও কোনক্রমেই সৈন্যদের ম্যাগাজিন রাইফেলের সমকক্ষ নয়। ১৮৪৮ পর্যন্ত বারুদ ও সীসা দিয়ে প্রয়োজনীয় গোলাগুলি নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল; আজ কিন্তু প্রতি ধাঁচের বন্দুকের জন্য আছে আলাদা ঢংয়ের কার্তুজের ব্যবস্থা, আর সেগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে মিল হল শুধু একটি জায়গাতেই, অর্থাৎ সব ক'টিই হল বৃহৎ শিল্পজাত জটিল সামগ্রী, যাদের হঠাৎ বসে (ex tempore) তৈরী করা অসম্ভব — ফলে উপযোগী গোলাগুলি না পাওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ বন্দুকই অকেজো। আর সর্বশেষে, ১৮৪৮ থেকে বড় বড় শহরগুলির সদ্য গড়ে তোলা পাড়াগুলিতে লম্বা, সোজা ও চওড়া সড়ক ফাঁদা হয়েছে, যেন নতুন ধাঁচের কামান ও রাইফেল চালানের পুরোদস্তুর সুবিধার জন্যই। নেহাত উন্মাদ না হলে কোন বিপ্লবীই নিশ্চয় নিজ থেকে বার্লিনের উত্তর বা পূর্বের নয়া শ্রমিক মহল্লাগুলিকে ব্যারিকেডের লড়াইয়ের জন্য বেছে নেবে না।

এর মানে কি এই যে, রাস্তার লড়াইয়ের আর কোন ভূমিকা ভবিষ্যতে থাকবে না? নিশ্চয়ই তা নয়। এর অর্থ শুধু এই যে, ১৮৪৮ থেকে অবস্থাটা বেসামরিক লড়িয়েদের পক্ষে ঢের বেশি প্রতিকূল ও মিলিটারির পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অসুবিধাজনক অবস্থা অন্যান্য উপায়ে পরিপূরণ করতে পারলেই শুধু ভবিষ্যতে রাস্তার লড়াই জয়যুক্ত হবে। সুতরাং বিরাট কোন বিপ্লবে পরবর্তী পর্যায়ের তুলনায় সূচনার দিকে এটা খুব কমই ঘটবে, আর সে লড়াইও চালাতে হবে অনেক বেশি শক্তির সাহায্যে। অবশ্য সমগ্র মহান ফরাসী বিপ্লবে বা প্যারিসে ১৮৭০ সালে ৪ সেপ্টেম্বর ও ৩১ অক্টোবর তারিখের (৩৫) মতন তারা হয়ত নিষ্ক্রিয় ব্যারিকেড কৌশলের চেয়ে সরাসরি আক্রমণটা বেশি পছন্দ করতেই পারে।*

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে এই অনুচ্ছেদটা বাদ ছিল। — সম্পাঃ

পাঠক কি এখন ধরতে পারছেন কেন কর্তৃপক্ষ আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেখানে ঠেলে দিতে চায় যেখানে গুলি চলেছে ও তলোয়ার ঘোরেছে? যেখানে আগে থেকেই পরাজয় অবধারিত বলে আমরা জানি সেই রাস্তার লড়াইয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে পড়ছি না বলে কেন তারা আমাদের কাপুরুষতার অপবাদ রটায়? আমরা যাতে একবারটি কামানের খোরাকের ভূমিকা গ্রহণ করি তার জন্য উৎসাহভরে কেন তারা অত পীড়াপীড়ি করে?

সেই ভদ্রলোকরা খামাকাই, বেমালুম খামাকাই মিনতি করছেন, দ্বন্দ্বাহ্বান জানাচ্ছেন, একেবারেই খামাকা। আমরা অত নির্বোধ নই। আগামী যুদ্ধে তাদের শত্রুপক্ষের কাছেও তাহলে এ দাবি তারা জানাতে পারে যে, শত্রুকে ফ্রিৎস* বুড়োর মতো লাইনে লাইনে সেনাবাহিনী সাজানোর নক্সা অনুসারে অথবা ভাগ্রাম ও ওয়াটার্লুর (৩৬) মতন গোটাগুটি এক একটা ডিভিশন সারি বেঁধে লড়াই চালাতে হবে — আর তাও আবার গাদা-বন্দুক হাতে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি অবস্থান্তর ঘটে থাকে, তবে শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপারেও তা কম সত্য নয়। চকিত আক্রমণের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন যেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে শামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে কিসের জন্য তারা সংগ্রাম চলছে, কিসের জন্য তারা রক্তপাত করছে ও জীবন উৎসর্গ করছে।** গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যাতে যথাকর্তব্য বুঝতে পারে তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করা দরকার, আর ঠিক সেই কাজই আমরা এখন চালাচ্ছি, এতটা সার্থকভাবেই চালাচ্ছি যে তার ফলে শত্রুপক্ষ হতাশ হয়ে উঠছে।

পুরানো রণকৌশল যে পাল্টাতেই হবে — একথা লাটিন দেশগুলিতেও

---

* প্রাশিয়ার রাজা, দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ। — সম্পাঃ

** 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'কিসের জন্য তারা সংগ্রামে চলছে, কিসের জন্য তারা রক্তপাত করছে ও জীবন উৎসর্গ করছে', এই কথার বদলে ছাপানো হয়: 'কিসের জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয়'। — সম্পাঃ

ক্রমশই উপলব্ধি করা হচ্ছে। সর্বত্রই ভোটাধিকারের সুযোগ গ্রহণের, আমাদের কাছে উন্মুক্ত সব ক'টি পদ দখলের জার্মান দৃষ্টান্তটি অনুসৃত হয়েছে; সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনার ব্যাপারটাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে।* ফ্রান্স, যেখানে এক-শ' বছরেরও বেশিকাল ধরে বিপ্লবের পর বিপ্লবের ফলে জমিন নড়বড়ে হয়েছে, যেখানে এমন কোন তরফ নেই যেটা চক্রান্ত ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য সমস্ত রকম বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের অংশীদার হয় নি; ফ্রান্স, যেখানে এ সবের ফলে সরকার মোটেই সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয় ও সাধারণভাবে জার্মানির তুলনায় যেখানে অবস্থা অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল — এমন কি সেই ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রীরা উত্তরোত্তর এ কথা উপলব্ধি করছে যে, যতদিন পর্যন্ত না তারা আগে জনসাধারণের বিপুল অংশকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে টানতে পারছে ততদিন তাদের পক্ষে স্থায়ী জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। ধীরেসুস্থে প্রচারকার্য ও সংসদীয় কার্যকলাপ সেখানেও পার্টির আশু কাজ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সাফল্যের অভাব ঘটে নি। শুধু যে বহুসংখ্যক পৌর পরিষদেই জয়লাভ করা গেছে তাই নয়, ব্যবস্থা পরিষদগুলিতে (Chambers) পঞ্চাশ জন সমাজতন্ত্রী আসন লাভ করেছে, আর ইতিমধ্যেই তারা পতন ঘটিয়েছে প্রজাতন্ত্রের তিন-তিনটি মন্ত্রিসভা ও একজন রাষ্ট্রপতির। বেলজিয়মে শ্রমিকেরা গত বছর জোর করে ভোটাধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে এবং নির্বাচনকেন্দ্রগুলির এক-চতুর্থাংশে তারা জয়লাভ করেছে। সুইজারল্যান্ডে, ইতালিতে, ডেনমার্কে, এমন কি বুলগেরিয়ায় ও রুমানিয়াতেও সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে সমাজতন্ত্রীরা। অস্ট্রিয়াতে সব পার্টিই স্বীকার করে যে, রাইখস্রাটে (Reichsrat) আমাদের প্রবেশ আর ঠেকানো যাবে না। তাতে প্রবেশ যে আমরা করব এটা সুনিশ্চিত, যা নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে সেই প্রশ্নটি হল শুধু — কোন্ দরজা দিয়ে? রাশিয়াতে পর্যন্ত, তরুণ নিকোলাস যে জাতীয় পরিষদকে রুখবার বৃথা চেষ্টা করছেন সেই বিখ্যাত জেম্স্কি সবর-এর (Zemsky Sobor) অধিবেশন যখন হবে তখন সেখানেও

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ চালনার ব্যাপারটাকে দূর করে দেওয়া হয়েছে', এই শব্দগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

যে আমাদের প্রতিনিধিরা থাকবে, এ ভরসা আমরা নিঃসন্দেহে করতে পারি।

অবশ্য এর ফলে আমাদের বিদেশী কমরেডরা মোটেই তাঁদের বিপ্লবের অধিকারটা ছেড়ে দিচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের অধিকারই হল একমাত্র প্রকৃত 'ঐতিহাসিক অধিকার', যে একটিমাত্র অধিকারের উপরেই বিনা ব্যতিক্রমে সব ক'টি আধুনিক রাষ্ট্র খাড়া হয়ে রয়েছে — এমন কি মেক্‌লেনবুর্গ পর্যন্ত, যেখানকার অভিজাত বিপ্লব ১৭৫৫ সালে সমাপ্ত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের যে গৌরবোজ্জ্বল সনদ আজও কার্যকর সেই 'পুরুষানুক্রমিক বন্দোবস্ত' (Erbvergleich) দিয়ে (৩৭)। সাধারণ চেতনায় বিপ্লবের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি এতই তর্কাতীত যে, জেনারেল ফন বগুস্লাভস্কি তাঁর কাইজারের জন্য যে কুদেতার অধিকার দাবি করেন সেটাও এই জনপ্রিয় অধিকার থেকেই উদ্ভূত।

তবু অন্য দেশে যাই হোক না কেন, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটা বিশিষ্ট অবস্থান আছে ও সেইসঙ্গে অন্তত আশু ভবিষ্যতে সেটার একটা বিশেষ কাজও রয়েছে। যে বিশ লক্ষ ভোটদাতাকে পার্টি ভোটবাক্সের কাছে আনে, আর তার সঙ্গে ভোটদাতা নয় এমন যেসব তরুণ-তরুণীরা তাদের পিছনে দাঁড়ায় — এরাই হল সব থেকে সংখ্যাবহু, সব চাইতে সংহত জনসমষ্টি, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়ান বাহিনীর চূড়ান্ত 'সংঘাতশক্তি' (shock force)। মোট যত ভোট পড়ে তার এক-চতুর্থাংশের বেশি ইতোমধ্যে যোগাচ্ছে এই জনসমষ্টি, আর রাইখস্টাগের উপনির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রের মিলিত সভা নির্বাচন, পৌর পরিষদ ও পেশাগত আদালত নির্বাচনগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ জনসমষ্টি ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এর ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, অবিরল, দুর্নিবার ও সেইসঙ্গে তেমনি প্রশান্ত ভাবে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত সরকারী হস্তক্ষেপ শক্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি আজই আমরা সাড়ে-বাইশ লক্ষ ভোটদাতার ভরসা করতে পারি। এইভাবে যদি চলে তবে এই শতকের শেষাশেষি আমরা সমাজের মধ্যস্তরের অধিকাংশকেই, পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদের আমাদের পক্ষে টেনে আনব এবং দেশের এমন নির্ধারক শক্তি হয়ে দাঁড়াব যার সামনে অন্য সব শক্তিকেই, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, নতিস্বীকার করতে হবে। এই ক্রমবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আপনা তাগিদেই চলতি সরকারী

ব্যবস্থার আয়ত্তাতীত হয়ে পড়ছে, দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশক্তিকে আগ্‌বাড়া সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরঞ্চ চূড়ান্ত দিনটা পর্যন্ত তাকে অক্ষুণ্ন রাখা* — এই হল আমাদের প্রধান কাজ। জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির অবিচল অগ্রগতি সাময়িকভাবে রোধ করার, এমন কি কিছুকালের মতন সেটাকে পিছে হঠিয়ে দেবার উপায় আছে একটিমাত্র — সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ, ১৮৭১ সালের প্যারিসের মতন রক্তপাত। শেষ পর্যন্ত তাও কাটিয়ে ওঠা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পার্টিকে গুলি চালিয়ে নিঃশেষ করা ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ম্যাগাজিন রাইফেলের পক্ষেও সাধ্যাতীত। তবে তাতে স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে, হয়ত সংকট-মুহূর্তে সংঘাতশক্তির হদিশ মিলবে না, চূড়ান্ত সংগ্রাম** পিছিয়ে যাবে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বলিদান হবে অধিকতর।

বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাসে সবকিছুরই ওলটপালট হয়ে যায়। 'বিপ্লবপন্থী' ও 'উচ্ছেদকারী' আমরা বেআইনী কর্মপদ্ধতি ও উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ছি বৈধ পন্থায়। যারা নিজেদের শৃঙ্খলার পার্টি বলে অভিহিত করে তারা মারা পড়ছে স্বরচিত বৈধ পরিবেশেই। অদিলোঁ বারো-র সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারা নৈরাশ্যে চেঁচাচ্ছে: la légalité nous tue— বৈধতাই আমাদের মরণ; অথচ সেই বৈধতার আমলেই আমাদের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠছে, কপোল রঙিন হচ্ছে, দেখাচ্ছে যেন আমরা অনন্তজীবনের অধিকারী। আর **আমরা** যদি ওদের খুশি করার জন্য রাস্তার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার মতন পাগলামি না করি, তবে শেষ পর্যন্ত ওদের পক্ষে এই মারাত্মক বৈধতাটাকে নিজের থেকেই ভেঙে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

ইতিমধ্যে ওরা উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নয়া কানুন বানাচ্ছে। আবার ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছুই। আজকের দিনের এই উৎকট উচ্ছেদ-

---

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশক্তিকে আগ্‌বাড়া সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরঞ্চ চূড়ান্ত দিনটা পর্যন্ত তাকে অক্ষুণ্ন রাখা' শব্দগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

** 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে 'সংকট-মুহূর্তে সংঘাতশক্তির হদিশ মিলবে না' শব্দগুলি বাদ ছিল, এবং 'চূড়ান্ত সংগ্রাম'-এর বদলে ছাপানো হয়: 'সিদ্ধান্ত'। — সম্পাঃ

বিরোধীরা, এরা নিজেরাই কি গতদিনের উচ্ছেদকারী নয়? ১৮৬৬ সালের গৃহযুদ্ধ বুঝি **আমরাই** বাধিয়েছিলাম? **আমরাই** কি হ্যানোভারের রাজা, হেসের ইলেক্টর ও নাসাউ-এর ডিউককে তাঁদের বংশগত বিধিসম্মত রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দখল করেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ সব রাজ্যকে? ঈশ্বরের কৃপায় যারা জার্মান কনফেডারেশন ও তিন-তিনটি রাজমুকুটের উচ্ছেদ ঘটাল তারাই কিনা আজ নালিশ জানাচ্ছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে (৩৮)! Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?* উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিসমার্কভক্তদের তর্জন করতে দেবে কে?

তবু, ওরা উচ্ছেদবিরোধী বিল্‌ই পাস করুক, আরও জঘন্য করে তুলুক সে কানুনকে, সমস্ত ফৌজদারী আইনগুলোকে না হয় রবারে পরিণত করুক, তবু এত করেও আপন অক্ষমতার নতুন প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই ওদের কপালে জুটবে না। যদি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে ওরা মোক্ষম ঘা দিতে চায়, তবে এ ছাড়াও ওদের একেবারে অন্য ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের উচ্ছেদ অভিযান ঠিক এই মুহূর্তে আইন মেনে চলেই বেশ ভালো আছে, এ উচ্ছেদের ওরা সামাল দিতে পারে শুধু শৃঙ্খলা পার্টিদের তরফ থেকে উচ্ছেদ চালিয়েই, আইন না ভেঙে সে উচ্ছেদ অবশ্য সম্ভব না। প্রাশিয়ার আমলাতন্ত্রী হের রেস্‌লার ও প্রাশিয়ার জেনারেল হের ফন বগুস্লাভস্কিই ওদের নিশানা দিচ্ছেন একটিমাত্র সম্ভাব্য পথের যেটার মারফত এখনও নাগাল পাওয়া যায় শ্রমিকদের, যারা সোজাসুজি অস্বীকার করছে রাস্তার লড়াইয়ে প্রলুব্ধ হতে। সংবিধানভঙ্গ, একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, regis voluntas suprema lex!** সুতরাং মহাশয়গণ, সাহসে ভর করুন; আধখেঁচড়া ব্যবস্থায় এখানে কুলবে না; এখানে একেবারে ষোল-কলা করতে হবে!

কিন্তু এও ভুলবেন না যে, সব ছোট রাষ্ট্র ও সাধারণভাবে সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই জার্মান সাম্রাজ্যও **চুক্তির ফল**, প্রথমত রাজাদের পরস্পরের

---

* 'গ্রাকাস-রা রাজদ্রোহ সম্পর্কে নালিশ জানাবে — এ কার সহ্য হবে?' জুভেনাল, ব্যঙ্গরচনা, ২। — সম্পাঃ

** রাজাভিলাষই চূড়ান্ত আইন! — সম্পাঃ

ভিতরে চুক্তি ও দ্বিতীয়ত জনসাধারণের সঙ্গে রাজাদের চুক্তি। এক পক্ষ যদি চুক্তি ভাঙে তবে গোটা চুক্তিই খতম হয়ে যায়; অন্য পক্ষেরও তখন আর বাধ্যবাধকতা থাকে না — ১৮৬৬ সালে অমন চমৎকারভাবে তা আমাদের দেখিয়েছিলেন বিসমার্ক। সুতরাং আপনারা যদি রাইখ-এর সংবিধান ভাঙেন তবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পথও খোলা, সেটাও যা খুশি করতে পারবে আপনাদের সম্পর্কে। অবশ্য সেটা তখন কী করবে, নিশ্চয় আজই তা ফস করে বলে ফেলবে না।*

আজ প্রায় ঠিক-ঠিক ষোল শতাব্দী হতে চলল, রোমক সাম্রাজ্যেও এক বিপজ্জনক উচ্ছেদপন্থী তরফ এইরকম তৎপর হয়ে উঠেছিল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমস্ত বনিয়াদকেই তা নড়বড়ে করে দিয়েছিল; সম্রাটের ইচ্ছাই যে চূড়ান্ত আইন এ কথা সেটা সোজাসুজি অস্বীকার করে; সেটার পিতৃভূমি ছিল না, সেটা ছিল আন্তর্জাতিক; গল্‌ থেকে এশিয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশে, এবং সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও প্রসার লাভ করে এই তরফটি। বহুকাল ধরে সংগোপনে প্রচ্ছন্নভাবে সেটা রাজদ্রোহকর কার্যকলাপ চালায়; অবশেষ বেশ কিছুদিন ধরে খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করার মতন শক্তিও সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করল। এই যে উচ্ছেদপন্থী তরফটি খ্রিষ্টিয়ান নামে পরিচিত ছিল, সেটার জোরাল প্রতিনিধিত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীর ভিতরেও — গোটা এক-একটা বাহিনীই ছিল খ্রিষ্টিয়ান। পৌত্তলিকতাবাদী সরকারী যাজকতন্ত্রের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য যখন তাদের বলিদান অনুষ্ঠানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সেই নাশকতাকারী সৈন্যরা প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শিরস্ত্রাণে বিশেষ এক প্রতীক চিহ্ন ক্রুশ ধারণ করার স্পর্ধা দেখায়। এমন কি তাদের সেনানায়কদের অভ্যস্ত পল্টনী জবরদস্তিও নিষ্ফল হয়। সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে বিধিবদ্ধতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার হানি চলতে থাকবে, এ তিনি আর নীরব দর্শকের মতন দেখে যেতে পারলেন না। সময় থাকতেই তিনি প্রবল হস্তক্ষেপ

* 'Die Neue Zeit' পত্রিকা এবং 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম' ১৮৯৫ সালের পৃথক সংস্করণে '১৮৬৬ সালের অমন' থেকে অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত কথাগুলি বাদ ছিল। — সম্পাঃ

করলেন। তিনি চালু করলেন এক সমাজতন্ত্রীবিরোধী — মাপ করবেন আমি বলতে চেয়েছিলাম খ্রিষ্টিয়ানবিরোধী — কানুন। উচ্ছেদপন্থীদের বৈঠক নিষিদ্ধ হল; তাদের সভাকক্ষ হল বন্ধ অথবা এমন কি চূর্ণবিচূর্ণ; সাক্সনিতে লাল রুমালের মতো বেআইনী হয়ে গেল ক্রুশ প্রভৃতি খ্রিষ্টিয়ান প্রতীকচিহ্ন। সরকারী পদ গ্রহণের পক্ষে খ্রিষ্টিয়ানরা অযোগ্য ঘোষিত হল, এমন কি সৈন্যদলে নিচু অফিসার (corporals) পর্যন্ত তাদের হতে দেওয়া হল না। হের ফন ক্যেলারের উচ্ছেদবিরোধী বিলে (৩৯) 'ব্যক্তির মর্যাদা' বিষয়ে সুশিক্ষিত যে ধরনের বিচারকদের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়েছে, ঐ সময়ে তেমন বিচারক না থাকতে খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষে আদালতে বিচার প্রার্থনা সরাসরি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এমন জরুরী আইনও কিন্তু নিষ্ফল হয়। খ্রিষ্টিয়ানেরা ঘৃণাভরে দেওয়াল থেকে তার ঘোষণা ছিঁড়ে ফেলে দেয়, এমন কি তারা নাকি নাইকোমিডিয়ায় সম্রাটের পরোয়া না করেই তাঁর প্রাসাদটি পুড়িয়ে ফেলেছিল, যেখানে সেই সময়ে সম্রাট ছিলেন। সম্রাট তখন আমাদের অব্দের ৩০৩ সালে খ্রিষ্টিয়ানদের উপর প্রবল নির্যাতন চালিয়ে এর প্রতিশোধ নিলেন। এ ধরনের ঘটনার সেই শেষ। আর এটা এতই ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, সতেরো বছর পরে গোটা সৈন্যবাহিনীর বিপুল অধিকাংশই হয়ে দাঁড়াল খ্রিষ্টিয়ান, আর গোটা রোমক সাম্রাজ্যের পরবর্তী স্বৈরশাসক কনস্টানটাইন — যাজকেরা যাঁকে মহান নাম দেন — তিনি খ্রিষ্টধর্মকেই ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে।

লণ্ডন, ৬ মার্চ, ১৮৯৫

ফ. এঙ্গেলস

'Die Neue Zeit',
Bd. 2, Nos. 27 and
28, 1894-95 এবং
বইয়ে: ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম,
১৮৪৮ থেকে ১৮৫০',
বার্লিন, ১৮৯৫ সালে
সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত

মূল জার্মান পাঠ
অনুসারে ছাপা হল

ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম

১৮৪৮ থেকে ১৮৫০

কয়েকটিমাত্র অধ্যায় বাদে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত বিপ্লবের ইতিহাসের প্রতিটি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশের শিরোনামা হচ্ছে **বিপ্লবের পরাজয়!**

এইসব পরাজয়ে যেটার পতন হল তা কিন্তু বিপ্লব নয়। পতন হয়েছিল বিপ্লবপূর্ব চিরাচরিত লেজুড়গুলির, যেগুলোর উদ্ভব সেই সামাজিক সম্পর্কাদি থেকে যা তখনও পর্যন্ত তীব্র শ্রেণীসংঘাতের পর্যায়ে পৌঁছয় নি — ব্যক্তি, বিভ্রম, প্রত্যয়, পরিকল্পনা, যে সবের হাত থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বৈপ্লবিক তরফ মুক্ত ছিল না, যার থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব ছিল **ফেব্রুয়ারির বিজয়ের** ফলে নয়, একমাত্র উপর্যুপরি কয়েকটি **পরাজয়ের** মারফতই।

এককথায় বিপ্লবের অগ্রগতি হল, বিপ্লব এগিয়ে গেল সেটার আশু বিয়োগাত্মক প্রহসনের কীর্তি দিয়ে নয়, বরঞ্চ শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির ফলে, এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব ঘটিয়ে, একমাত্র যার সঙ্গে সংগ্রাম করেই উচ্ছেদপন্থী তরফ পরিপক্ক হয়ে প্রকৃত বৈপ্লবিক তরফে পরিণত হল।

এটা প্রমাণ করাই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির কাজ।

১

১৮৪৮-এর জনুনের পরাজয়

জনুলাই বিপ্লবের (৪০) পর উদারপন্থী ব্যাঙ্কার লাফিৎ যখন তাঁর সঙ্গী ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্সকে (৪১) বিজয়োল্লাসে নিয়ে গিয়েছিলেন টাউন হল্-এ* তখন তাঁর মনুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথাগনুলি: **'এখন থেকে শনুরনু হবে ব্যাঙ্কারদের রাজত্ব।'** লাফিৎ বিপ্লবের গনুপ্ত রহস্যটাই উদ্ঘাটিত করে দেন।

লনুই ফিলিপের আমলে ফরাসী বনুর্জোয়ারা শাসন চালায় নি, চালিয়েছিল তাদের **একটি শাখা** — ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজারের সম্রাট, রেলপথের রাঘববোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জড়িত ভূস্বামীদের একটি অংশ — অর্থাৎ তথাকথিত **ফিনান্স অভিজাতবর্গ**। এরাই সিংহাসন দখল করেছিল, প্রতিনিধি-পরিষদে এরাই আইন নির্দেশ করে দিত, আর মন্ত্রিসভার দপ্তর থেকে তামাক অফিসের চাকুরিটা পর্যন্ত লাভজনক সরকারী পদের ভাগবাঁটোয়ারাও করত এরাই।

খাঁটি **শিল্প বনুর্জোয়ারা** সরকারীভাবে বিরোধী পক্ষেরই অঙ্গ হয়ে রইল, অর্থাৎ প্রতিনিধি-পরিষদে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল শনুধনু সংখ্যালঘনু দল হিসেবেই। ফিনান্স অভিজাতবর্গের স্বেচ্ছাচার একদিকে যতই নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে, এবং অন্যদিকে রক্তগঙ্গায় নিমজ্জিত ১৮৩২, ১৮৩৪ ও ১৮৩৯ সালের (৪২) বিদ্রোহগনুলির পরে এরা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নিজস্ব আধিপত্য

* টাউন হল্, Hôtel de Ville অস্থায়ী সরকারের পীঠ। — সম্পাঃ

যতই সুপ্রতিষ্ঠিত বলে কল্পনা করতে থাকে, ততই এদের সরকার-বিরোধিতা আরও জোরালোভাবে পরিস্ফুট হতে লাগল। রুয়েঁ-র কারখানা-মালিক এবং সংবিধান-সভা (Constituent Assembly) ও জাতীয় বিধান-সভা (Legislative National Assembly) উভয়তঃই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে উদগ্র বাহন **গ্রাঁদাঁ** ছিলেন প্রতিনিধি-পরিষদে (Chamber of Deputies) গিজোর সব থেকে প্রচন্ড বিরোধী। পরবর্তীকালে ফরাসী প্রতিবিপ্লবের গিজো হিসেবে খ্যাতিলাভের ব্যর্থ প্রয়াসের জন্য সুপরিচিত **লেওঁ ফশে** লুই ফিলিপের অন্তিমপর্বে শিল্পের তরফ থেকে ফাটকাবাজি ও তার অনুগামী সরকারের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালান। বোর্দো শহর ও ফ্রান্সের সমস্ত মদ্যোৎপাদকদের তরফে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান **বাস্তিয়া।**

সব স্তরের **পেটি বুর্জোয়া** আর **কৃষকেরাও** অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থেকে গেল। সর্বশেষে, বিধিসম্মত বিরোধী পক্ষে, অথবা pays légal'দের* একেবারে বাইরে থাকল উপরোক্ত শ্রেণীগুলির **মতাদর্শগত** প্রতিনিধি ও মুখপাত্ররা, তাদের পন্ডিত, আইনবিশারদ, চিকিৎসক প্রভৃতি, এককথায় তাদের তথাকথিত **গুণী ব্যক্তিরা।**

জুলাই রাজতন্ত্র (৪৩) সেটার আর্থিক অনটনের দরুন প্রথম থেকেই বড় বুর্জোয়াদের উপরে নির্ভরশীল ছিল, আর বড় বুর্জোয়া-মুখাপেক্ষিতাই হল তার ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনটনের অফুরন্ত উৎস। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে জাতীয় উৎপাদন স্বার্থের অনুবর্তী করে তোলা বাজেটের সমতারক্ষা ছাড়া, রাষ্ট্রের ব্যয় ও তার আয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই সমতারক্ষা কী করে সম্ভব হবে রাষ্ট্রের খরচ সীমাবদ্ধ না করে, অর্থাৎ যে সব স্বার্থ ছিল শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে খুঁটির মতন তাদের এখতিয়ারে হাত না দিয়ে, এবং কর-ব্যবস্থার পুনর্বণ্টন না করে, অর্থাৎ করের বোঝার একটা বড়ো অংশ বড় বুর্জোয়াদেরই কাঁধে না চাপিয়ে?

অপরপক্ষে, বুর্জোয়াদের যে অংশটি পরিষদ দুটি মারফত শাসন চালাত ও আইন প্রণয়ন করত সেটার **প্রত্যক্ষ স্বার্থ** ছিল **রাষ্ট্রের ঋণগ্রস্ততায়।**

---

* ভোটাধিকারী। — সম্পাঃ

সরকারী ঘাটতিই ছিল সেটার ফাটকাবাজির প্রধান ক্ষেত্রে ও সমৃদ্ধিসাধনের মূল উৎস। বৎসরান্তে নতুন এক ঘাটতি। চার পাঁচ বছর পর পর নতুন এক ঋণ। আর নতুন ঋণমাত্রই ফিনান্স অভিজাতবর্গের অভিনব সুযোগ যোগাত রাষ্ট্রকে ঠকাবার, এ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম পন্থায় ঠেলে রাখা হত দেউলিয়াপনার সীমানায়, সব থেকে প্রতিকূল অবস্থাতেই একে ফয়সালা করতে হত ব্যাঙ্কমালিকদের সঙ্গে। প্রতিটি নয়া ঋণই এনে দিত আরো একটা সুযোগ, যে সাধারণ লোকেরা সরকারী বন্ডে তাদের পুঁজি নিয়োগ করত, ফাটকাবাজারী কারচুপি মারফত তাদেরও উপর লুণ্ঠনের সুযোগ, সে সব কারচুপির রহস্যে অবগতকরণে হত সরকার ও পরিষদের সংখ্যাধিক দলকে। সাধারণভাবে, সরকারী ক্রেডিটের অস্থির চরিত্রের দরুন এবং সরকারী গোপন তথ্যাদি আয়ত্তে রাখার ফলে ব্যাঙ্কাররা আর পরিষদদুটি ও রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাদের সহযোগীদের পক্ষে সরকারী সিকিউরিটির দর হঠাৎ অস্বাভাবিক ওঠানো-নামানো সম্ভব ছিল সবসময়েই; এর অবধারিত পরিণতি দাঁড়াত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতম পুঁজিপতির সর্বনাশ ও বড় বড় ফাটকাবাজারীদের অবিশ্বাস্য দ্রুত ধনবৃদ্ধি। সরকারী ঘাটতির সঙ্গে বুর্জোয়াদের শাসক অংশটির প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষ ক'বছরের জরুরী সরকারী খরচ কেন যে নেপোলিয়নের সময়কার জরুরী সরকারী খরচে দ্বিগুণের মাত্রাও অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়, ফ্রান্সের মোট গড়পড়তা বাৎসরিক রপ্তানী যেখানে কদাচিৎ ৭৫ কোটি ফ্র্যাঙ্কের কোঠায় উঠত, সেখানে ঐ খরচ পেঁছাল বাস্তবিকপক্ষে বছরে প্রায় ৪০ কোটি ফ্র্যাঙ্কে। তার উপরে, এইভাবে যে বিপুল অর্থ সরকারের হাত দিয়ে যেত, তাতে মাল সরবরাহের জুয়াচুরি কণ্ট্রাক্ট, ঘুষ, তহবিল তছরূপ ও সবরকমের অপকর্মের সুযোগও হত। ঋণের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রতারণা করা হত পাইকারীভাবে, আবার পূর্তবিভাগের কাজে সে প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি চলত খুচরো খুচরো দফায়। পরিষদ ও সরকারের ভিতরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ঘটত, প্রতিটি সরকারী দপ্তর ও ব্যক্তিগত **শিল্পোদ্যোগীদের** সম্পর্কের বেলাতেও তাই পল্লবিত হয়ে উঠত।

সাধারণভাবে সরকারী খরচ ও সরকারী ঋণের বেলাতেও শাসক শ্রেণী যেমন শুষত তেমনই শোষণ করত **রেলপথ নির্মাণের** ব্যাপারেও। পরিষদ

আসল বোঝাটা চাপাত রাষ্ট্রের কাঁধে, আর ফাটকাবাজ ফিনান্স অভিজাতবর্গের জন্য ব্যবস্থা করে দিত সোনালী ফসলের। মনে পড়ে প্রতিনিধি-পরিষদের সেই কেলেঙ্কারির কথাটা, যখন দৈবক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে, জনকয়েক মন্ত্রীসমেত সংখ্যাধিক দলের সব ক'জন সদস্যই শেয়ার-মালিক হিসেবে ঠিক সেই রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেই স্বার্থসম্পন্ন, যেটা আইনপ্রণেতা হিসেবে পরে তারা সম্পন্ন করিয়ে নেয় সরকারী খরচে।

অপরপক্ষে, তুচ্ছতম আর্থিক সংস্কারও বানচাল হয়ে যেত ব্যাঙ্কারদের প্রভাবের চাপে। যেমন ধরা যাক **ডাকবিভাগের সংস্কার**। আপত্তি জানালেন রথচাইল্ড। যে রাজস্ব থেকে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ গুণতে হবে, রাষ্ট্রকে কি তার সংস্থান খর্ব করতে দেওয়া চলতে পারে?

জুলাই রাজতন্ত্র ছিল ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ শোষণের একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি মাত্র। তার লভ্যাংশ ভাগাভাগি হত মন্ত্রিবর্গ, পরিষদ সদস্য, ২,৪০,০০০ ভোটদাতা ও তাদের লেজুদের মধ্যে। লুই ফিলিপ ছিলেন ঐ কোম্পানির পরিচালক — সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রবের মাকের। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা, শিল্প, কৃষি, জাহাজে চলাচল, শিল্প বুর্জোয়াদের স্বার্থ ক্রমাগত বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হতে বাধ্য ছিল। জুলাই দিনগুলিতে নিজেদের পতাকায় শিল্প বুর্জোয়ারা যে বাণী লিখে নিয়েছিল সেটা হল — সস্তায় রাজ্যশাসন, gouvernement à bon marché।

যেহেতু ফিনান্স অভিজাতবর্গই বানাতে আইন, রাষ্ট্রশাসনের নায়কতা করত, প্রভুত্ব খাটাত সব ক'টি সংগঠিত সাধারণী কর্তৃপক্ষের উপরে, বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ও সংবাদপত্র মারফত জনমতের উপরে করত আধিপত্য, তাই রাজ দরবার থেকে শুরু করে Café Borgne* পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি চলেছিল একইরকমের বেশ্যাবৃত্তির একই নির্লজ্জ জুয়াচুরির, বড়লোক হওয়ার সেই একই বাতিকের — বড়লোক হওয়া উৎপাদনের ভিতর দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্থ করে। প্রতি মুহূর্তে এমন কি বুর্জোয়া আইনকানুনেরই বিরুদ্ধতা করে ব্যাধিত ও অসংযত প্রবৃত্তির এক

---

* Café Borgne: ফ্রান্সে সন্দেহজনক চরিত্রের কাফেগুলির এই নাম দেওয়া হত। — সম্পাঃ

নিরঙ্কুশ উন্দামতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে — এমন সব ভোগবাসন যার ভিতরে জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বতঃই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে আনন্দ পরিণত হয় ব্যভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরামি ও রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে তেমনই ভোগবিলাসে ফিনান্স অভিজাতবর্গ আসলে **বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের পুনর্জন্ম** ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফরাসী বুর্জোয়াদের যে চক্রগুলি শাসক গোষ্ঠীর বাইরে ছিল তারা সোরগোল তুলল: **দুর্নীতি!** ১৮৪৭ সালে বুর্জোয়া সমাজের প্রধানতম রঙ্গমঞ্চে যখন সেইসব দৃশ্যাই প্রকাশ্যে অভিনীত হতে লাগল যা লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের নিয়মিত ঠেলে দেয় বেশ্যালয়ে, নিঃস্বাশ্রমে ও উন্মাদাগারে, বিচারকের দরবারে, কারাকক্ষে ও ফাঁসিকাঠে তখন জনসাধারণও রব তুলল: 'À bas les grands voleurs! À bas les assassins!'* শিল্প বুর্জোয়ারা দেখল তাদের স্বার্থ বিপন্ন; পেটি বুর্জোয়ার নৈতিক ক্রোধে আবিষ্ট হল; অপমানিত হল জনসাধারণের কল্পনা; প্যারিস শহর ছেয়ে গেল 'রথচাইল্ড রাজবংশ', 'মহাজনরা এই যুগের রাজা' প্রভৃতি নানা পুস্তিকায় সেগুলির মাধ্যমে ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন ধিক্কৃত ও নিন্দিত হতে লাগল কমবেশি রসিকতার সাহায্যে।

Rien pour la gloire!** গৌরব ধুয়ে মুনাফা মেলে না! La paix partout et toujours!*** যুদ্ধ শতকরা তিন আর চার পার্সেন্টের কাগজের দর নামিয়ে দেয়! — ফাটকা কারবারীদের ফ্রান্স তার পতাকায় খোদিত করেছিল এইসব নীতি। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি তাই নিঃশেষ হল ফরাসী জাতীয় অভিমানে পর পর অপমানজনক ঘা খেয়ে। ক্রাকোভের অস্ট্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির ফলে (৪৪) যখন পোল্যান্ড ধর্ষণ সমাপ্ত হয় এবং সুইজারল্যান্ডে সন্ডারবুন্ড (৪৫) যুদ্ধে গিজো যখন সক্রিয়ভাবে পবিত্র মিতালীর পক্ষে দাঁড়ান, তখন সে অভিমানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল আরও প্রবলভাবে। এই

---

* 'চোরের সর্দারেরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক আততায়ীরা!' — সম্পাঃ

** গৌরবের জন্য কানাকড়িও নয়। — সম্পাঃ

*** সর্বত্র ও সর্বদাই শান্তি। — সম্পাঃ

নকল লড়াইয়ে সুইশ উদারপন্থীদের জয়লাভে ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষের আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল; পালের্মোয় রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের উপরে কাজ করল তড়িতাঘাতের মতন এবং জাগিয়ে তুলল তাদের মহান বৈপ্লবিক স্মৃতি ও আবেগ।*

সাধারণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ অবশেষে ত্বরান্বিত হল এবং বিদ্রোহের মনোভাব পেকে উঠল **দু'টি অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক ঘটনায়।**

১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের **আলু-মড়ক ও ফসলের অজন্মা** জনসাধারণের ভিতরে সাধারণ আলোড়ন বাড়িয়ে তোলে। ১৮৪৭ সালের আকাল ফ্রান্স তথা ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্যত্রও রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। ফিনান্স অভিজাতবর্গের নির্লজ্জ বিলাসব্যসনের উল্টোপিঠে জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের দাবিতে জনতার সংগ্রাম! ব্যুজাঁসে (Buzançais) ভুখ হাঙ্গামাকারীদের প্রাণদণ্ড (৪৬); প্যারিসে বিচারশালার হাত থেকে রাজপরিবার কর্তৃক ভূরিভোজী **জুয়াচোরদের** (escrocs) উদ্ধার!

দ্বিতীয় যে মস্ত অর্থনৈতিক ঘটনা বিপ্লবের বিস্ফোরণকে ত্বরান্বিত করে সেটি হল ইংলণ্ডে **সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্প সংকট।** ১৮৪৫ সালের শরৎকালেই রেলওয়ে শেয়ারের ফাটকাবাজদের পাইকারী বিপর্যয়ে ইতিমধ্যে যার সূচনা, শস্য শুল্কের আসন্ন বিলোপের মতো কয়েকটি ঘটনার ফলে ১৮৪৬ সালে যা ঠেকা দেওয়া হয়েছিল, অবশেষে ১৮৪৭-এর শরৎকালে সেই সংকটের বিস্ফোরণ ঘটল লণ্ডনে পাইকারী মুদিদের দেউলিয়াপনায়, যার পিছনে পিছনেই এল ভূমি-ব্যাংকগুলির দেউলিয়াপনা ও ইংলণ্ডের শিল্পপ্রধান এলাকাগুলিতে কারখানা বন্ধের পালা। ইউরোপীয় মহাদেশে এই সংকটের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া নিঃশেষ হতে না হতেই শুরু হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

---

* ১৮৪৬ সালের ১১ নভেম্বর রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার সঙ্গে ক্রাকোভ-কে অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার চুক্তি। — সুইজারল্যাণ্ডের সন্ডারবুণ্ড যুদ্ধ: ১৮৪৭ সালের ৪ থেকে ২৮ নভেম্বর। — ১৮৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি পালের্মোর অভ্যুত্থান; জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে শহরটির উপর নেপ্‌ল্‌সবাসীদের নয় দিন ধরে গোলাবর্ষণ। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

অর্থনৈতিক মহামারীজনিত শিল্প-ব্যবসাগত বিপর্যয় আরও অসহ্য করে তুলল ফিনান্স অভিজাতবর্গের স্বৈরাচারকে। গোটা ফরাসী দেশ জুড়ে বুর্জোয়া বিরোধীপক্ষ **ভোজসভাগুলিতে আলোড়ন** চালাতে লাগল **নির্বাচন সংস্কারের** জন্য, যার ফলে তারা পরিষদে সংখ্যাধিক্য লাভ করবে ও উৎখাত হবে ফাটকাবাজারের মন্ত্রিসভা। এর উপরে আবার প্যারিসে শিল্পসংকটের বিশেষ এক ফল দাঁড়াল এই যে, বহু কারখানা-মালিক ও বড় ব্যবসায়ী তখনকার অবস্থায় বিদেশী বাজারে কারবার চালাতে অপারগ হয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে আশ্রয় নিল। তারা পত্তন করল বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর প্রতিযোগিতা ঢালাওভাবেই সর্বস্বান্ত করল ক্ষুদে মুদি (épiciers) ও দোকানীদের (boutiquiers)। তারই ফলে প্যারিসে বুর্জোয়াদের এই অংশের মধ্যে অসংখ্য লোক দেউলিয়া হয়ে গেল, সেজন্যই ফেব্রুয়ারি মাসে এদের বৈপ্লবিক তৎপরতা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে গিজো ও পরিষদ কিভাবে সংস্কার প্রস্তাবের জবাব দিলেন; কিভাবে লুই ফিলিপ বারোর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন বড় বেশি দেরি করে; অবস্থা কেমন করে জনসাধারণ ও সৈন্যদলের মধ্যে হাতাহাতি সংগ্রামের পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছল; জাতীয় রক্ষিদলের নিষ্ক্রিয় আচরণের ফলে সৈন্যবাহিনী কিভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ল; জুলাই রাজতন্ত্রকে কিভাবে একটা অস্থায়ী সরকারকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল — এসবই সুবিদিত।

ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যারিকেড থেকে যে **অস্থায়ী সরকার** উদ্ভূত হয় স্বভাবতই তার সংবিন্যাসে প্রতিফলিত হল জয়লাভে অংশীদার তরফগুলি। জুলাই সিংহাসনকে যারা একযোগে উল্টে ফেলে অথচ যাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী এমন **বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোসরফা** ছাড়া সেটার অন্য কিছু হতে পারি নি। তার সদস্যদের মধ্যে **বিপুল সংখ্যাধিক্য** ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দের। প্রজাতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি রইলেন লেদ্রু-রলাঁ ও ফ্লকোঁ; প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে থাকলেন 'National' পত্রিকার (৪৭) লোকেরা; রাজবংশভক্ত বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধি হলেন ক্রেমিও, দ্যুপোঁ দ্য ল'এর প্রভৃতিরা। শ্রমিক শ্রেণীর ছিলেন দুজন মাত্র প্রতিনিধি, লুই ব্লাঁ ও আলবের। সর্বশেষে অস্থায়ী সরকারের মধ্যে

লামার্তিন — এ প্রথমে কোন বাস্তব পক্ষ নয়, কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নয়; এ যেন খাস ফেব্রুয়ারি বিপ্লবই, তার মায়াজাল, তার কবিতা, তার স্বপ্নময় আধেয় ও তার বাগভঙ্গি সমেত যৌথ অভ্যুত্থান। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের এই মুখপাত্রটি অবস্থিতি ও মতামতের দিক থেকে ছিলেন **বুর্জোয়াদেরই** একজন।

রাজনৈতিক কেন্দ্রিকতার দরুন প্যারিস যেমন ফ্রান্সে আধিপত্য করে থাকে তেমনই বৈপ্লবিক ভূমিকম্পের মুহূর্তে প্যারিসে আধিপত্য করে শ্রমিকেরা। অস্থায়ী সরকারের জীবনের প্রথম কাজ হল উন্মত্ত প্যারিস থেকে সুস্থির ফ্রান্সের কাছে এক আবেদন মারফত এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। লামার্তিন ব্যারিকেড সংগ্রামীদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অধিকারে আপত্তি জানালেন এই যুক্তিতে যে, তাতে অধিকারী শুধু ফরাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই; তাদের ভোটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যেন জবরদখল দিয়ে তাদের বিজয়কে কলঙ্কিত না করে। প্রলেতারিয়েতের একটিমাত্র জবরদখল বুর্জোয়ারা মেনে নিতে প্রস্তুত — লড়বার জবরদস্তি।

২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল না; অথচ মন্ত্রিদপ্তরগুলি সবই ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া মহলে এবং 'National'-এর সেনাপতি, ব্যাঙ্কার ও উকীলদের মধ্যে। কিন্তু ১৮৩০ সালের জুলাইয়ের মতন ধাপ্পাবাজি আর সহ্য না করতে শ্রমিকেরা এবার ছিল কৃতসংকল্প। ফের লড়াই শুরু করে অস্ত্রের জোরে প্রজাতন্ত্র আদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিল তারা। এই বাণী নিয়ে **রাস্পাই** গেলেন টাউন হল্-এ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের তরফে তিনি অস্থায়ী সরকারকে **হুকুম দিলেন** প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্য; জনসাধারণের এই নির্দেশ দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপালিত না হলে তিনি ফিরে আসবেন দুই লক্ষ মানুষের অগ্রভাগে। নিহতদের দেহ তখনও শীতল হয়ে যায় নি, ব্যারিকেড হয় নি অপসারিত, শ্রমিকেরা তখনও অস্ত্রত্যাগ করে নি, আর তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র যে শক্তি তখন প্রয়োগ করা যেত তা হল জাতীয় রক্ষিদল। এহেন অবস্থায় অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত সংশয় ও বিবেকের আইনগত কুণ্ঠা অকস্মাৎ দূরীভূত হল। দুই ঘণ্টার মেয়াদ

তখনও অতিক্রান্ত হয় নি এমন সময় প্যারিসের সমস্ত প্রাচীর ঝলমল করে উঠল এই ইতিহাসবিশ্রুত মহীয়ান বাণী:

République française!
Liberté, Egalité, Fraternité!*

যে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুর্জোয়াদের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে ঠেলে দিয়েছিল তার স্মৃতি পর্যন্ত মুছে গেল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়। গুটিকয়েক মাত্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে ফরাসী সমাজের সব ক'টি শ্রেণীই হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল, বক্স, স্টল, গ্যালারি ছেড়ে তারা নিজেরাই অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দূর হল বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত এক রাষ্ট্রশক্তির রূপমূর্তি এবং সেই রূপমূর্তি যে সব গৌণ সংগ্রামগুলির অবতারণা করেছিল তার সমগ্র ধারাটিও!

অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফত গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে পুরোভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় সমস্ত বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, সেটা হল তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।

ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রকে প্রথম যে কাজ করতে হয় তা হল ফিনান্স অভিজাতবর্গের পাশাপাশি **সব ক'টি সম্পত্তিবান শ্রেণীকে** রাষ্ট্রক্ষমতার এলাকায় প্রবেশাধিকার দিয়ে **বুর্জোয়া শাসনকেই পূর্ণ করে তোলা**। জুলাই রাজতন্ত্র বৃহৎ জমিদারদের বিপুল অংশ লেজিটিমিস্টদের যে রাজনৈতিক নাস্তিতায় বিড়ম্বিত রেখেছিল তা থেকে তারা উদ্ধার পেল। বিরোধীপক্ষের পত্রিকাগুলির সঙ্গে একযোগে 'Gazette de France' (৪৮) খামাকাই প্রচার আন্দোলন চালায় নি; ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি-পরিষদের অধিবেশনে

* ফরাসী প্রজাতন্ত্র। মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। — সম্পাঃ

লা রশজাকর্লা বিপ্লবের পক্ষ সমর্থন করেন শুধু শুধুই নয়। নামেমাত্র সম্পত্তি মালিক, ফরাসী জনসমষ্টির যারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, সেই **কৃষকেরা** সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে উন্নীত হল ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে। যে রাজমুকুটের আড়ালে পুঁজি এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র অবশেষে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করে তুলল বুর্জোয়া শাসনকে।

জুলাইয়ের দিনগুলিতে শ্রমিকেরা যেমন লড়ে পেয়েছিল **বুর্জোয়া রাজতন্ত্র**, তেমনই ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে তারা লড়ে পেল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র**। জুলাই রাজতন্ত্রকে যেমন নিজেকে ঘোষণা করতে হয়েছিল **প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত রাজতন্ত্র হিসেবে**, ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রকেও তেমনই বাধ্য হয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে হল **সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবেষ্টিত প্রজাতন্ত্র রূপে**। এই সুবিধাটাও **জোর করে আদায় করেছিল** প্যারিসের প্রলেতারিয়েত।

মার্শ নামে জনৈক শ্রমিকের নির্দেশ-করা একটা ডিক্রি অনুসারে সদ্যগঠিত অস্থায়ী সরকার মেহনত করে শ্রমিকদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ, সমস্ত নাগরিকদের কর্মসংস্থান, প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি দিল। আর দিনকয়েক বাদে সরকার প্রতিশ্রুতির কথাটা যখন ভুলে গেল ও প্রলেতারিয়েত যেন তাদের চোখেই পড়ছিল না, তখন ২০,০০০ শ্রমিকের এক জনতা টাউন হল্-এ অভিযান করল এই স্লোগান তুলে: **শ্রম সংগঠিত কর! বিশেষ শ্রম দপ্তর গড়!** অনিচ্ছুকভাবে ও দীর্ঘ আলোচনান্তে অস্থায়ী সরকার এক স্থায়ী বিশেষ কমিশন মনোনীত করে, তার উপর দায়িত্ব পড়ল মেহনতী শ্রেণীগুলির অবস্থা উন্নয়নের উপায় **অনুসন্ধানের**। এই কমিশন গঠিত হল প্যারিসের কারিগর সংঘগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে, এর সভাপতিত্ব করতেন লুই ব্লাঁ ও আলবের। এর বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট হয় লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাসিত হলেন অস্থায়ী সরকারের পীঠ থেকে, সরকারের বুর্জোয়া অংশটা প্রকৃত রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভার একচ্ছত্রভাবেই রেখে দিল নিজেরই মুঠোয়; অর্থ ও ব্যবসাবাণিজ্য আর পূর্ত মন্ত্রিদপ্তরের **পাশাপাশি**, ব্যাঙ্ক ও ফটকাবাজারের **পাশাপাশি** দেখা দিল এক **সমাজতান্ত্রিক মন্দির**, যার চাঁই মোহান্ত লুই ব্লাঁ ও আলবেরের কাজ হল

আশীর্বাদী ভূমিটির আবিষ্কার, নতুন সৎসমাচার প্রচার, এবং প্যারিসের শ্রমিকদের কাজ যোগানো। ঐলৌকিক কোন রাষ্ট্রশক্তির মতন তাঁদের হেফাজতে না ছিল কোনো বাজেট, না ছিল কোন নির্বাহী কর্তৃত্ব। ধরে নেওয়া হল যে, বুর্জোয়া সমাজের স্তম্ভগুলিকে তাঁরা নিজেদের মাথা ঠুকেই চুরমার করবেন। লুক্সেমবুর্গে যখন পরশপাথরের তল্লাস চলছিল তখন টাউন হল্-এ অপরপক্ষ তৈরি করে চলল চলতি মুদ্রা।

তবু প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের দাবি যে পরিমাণে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাতে সেটা লুক্সেমবুর্গের নীহারিকাবস্থা ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে নি।

বুর্জোয়াদের সঙ্গে একযোগে শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল, এবং বুর্জোয়াদের পাশাপাশি তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাও করে, ঠিক যেমন তারা অস্থায়ী সরকারের ভিতরে বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে একজন শ্রমিককেও ঢোকায়। **শ্রম সংগঠিত কর!** কিন্তু মজুরি-শ্রম, সেটাই হল শ্রমের বিদ্যমান, বুর্জোয়া সংগঠন। সেটাকে বাদ দিলে না পুঁজি, না বুর্জোয়া, না বুর্জোয়া সমাজ, কিছুই থাকে না। **বিশেষ শ্রম দপ্তর!** কিন্তু অর্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পূর্ত দপ্তর — এগুলি কি শ্রমের **বুর্জোয়া** মন্ত্রিদপ্তর নয়? আর এ সবের **পাশাপাশি প্রলেতারিয়ান** শ্রম দপ্তর তো অক্ষমতার মন্ত্রিদপ্তর, ফাঁকা সদিচ্ছার মন্ত্রিদপ্তর, একটা লুক্সেমবুর্গ কমিশন না হয়েই পারে না। শ্রমিকেরা যেমন ভেবেছিল যে, বুর্জোয়াদের পাশাপাশি নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারবে, ঠিক তেমনই তারা মনে করল যে, ফ্রান্সের জাতীয় সীমানার মধ্যে, বাকি সব বুর্জোয়া জাতিদের পাশাপাশি তারা সম্পূর্ণ করে ফেলবে একটা প্রলেতারিয়ান বিপ্লব। কিন্তু ফরাসী উৎপাদন-সম্পর্কাদি ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্য, বিশ্ববাজারে তার স্থান ও সেটা থেকে উদ্ভূত নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; বিশ্ববাজারের স্বৈরাধীশ্বর ইংলন্ডকে আঘাত হানবে এমন এক বৈপ্লবিক ইউরোপীয় যুদ্ধ ছাড়া ফ্রান্স সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে কী করে?

সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থ যে শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত সেটা যেই মাথা তুলে দাঁড়ায় অমনি আপন পরিস্থিতির ভিতরেই সেটা সরাসরি খুঁজে পায় বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মর্মবস্তু ও উপকরণ: যে সব শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে

হবে, সংগ্রামের চাহিদা মাফিক গ্রহণ করতে হবে যে সব ব্যবস্থা, আপন কর্মফলই সেটাকে ঠেলে নিয়ে চলে সামনের দিকে। আপন কাজ সম্পর্কে তত্ত্বগত কোন সন্ধান সেটা চালায় না। ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু এই পর্যায়ে পেঁছিতে পারে নি; স্বীয় বিপ্লব সাধনে সেটা তখনো অক্ষম।

শিল্প প্রলেতারিয়েতের বিকাশ সাধারণত শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশের উপরেই নির্ভর করে। একমাত্র তাদের শাসনেই প্রলেতারিয়েত এমন ব্যাপক জাতীয় সত্তা লাভ করে যা সেটার বিপ্লবকে উন্নীত করতে পারে জাতীয় স্তরে, সেটা নিজেই সৃষ্টি করে আধুনিক উৎপাদনের উপায়, যা সেই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় সেটা বৈপ্লবিক মুক্তিলাভেরই উপায়। একমাত্র তাদের শাসনই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক মূল পর্যন্ত উৎপাটিত ক'রে এমনভাবে মাটি সমান করে দেয় যার উপরেই শুধু সম্ভব প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব। ইউরোপের মূলভূমির বাকি অংশের তুলনায় ফরাসী শিল্প উন্নততর এবং সেখানকার বুর্জোয়াদের চেয়ে ফরাসী বুর্জোয়ারা বেশি বিপ্লবী। কিন্তু ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কি সরাসরি ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয় নি? তার থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে, শিল্প বুর্জোয়ারা ফ্রান্সে শাসন করত না। শিল্প বুর্জোয়ারা শাসক হতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে আধুনিক শিল্প সেটার নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী সমস্ত মালিকানা-সম্পর্ক ঢেলে সাজায়; তেমন শক্তি আবার শিল্প অর্জন করতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে সেটা বিশ্ববাজার জয় করে, কারণ জাতীয় চৌহদ্দি সেটার বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অথচ ফরাসী শিল্প এমন কি অভ্যন্তরীণ বাজারের উপরেও দখল বহুলাংশে রেখেছিল কমবেশি মাত্রায় সংশোধিত সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা মারফতেই। তাই বিপ্লবের মুহূর্তে ফরাসী প্রলেতারিয়েত যদিবা প্যারিসে এমন প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে থাকে যা তাকে তার সাধ্যের বাইরে ধাবিত করায়, তবু বাদবাকি ফ্রান্সে সেটা ছিল পৃথক পৃথক বিক্ষিপ্ত শিল্পকেন্দ্রগুলিতে পুঞ্জীভূত, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া সংখ্যাধিক্যের মাঝে প্রায় নিমজ্জিত। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণত আধুনিক রূপ, সে সংগ্রামের নির্ধারক দিক, শিল্প বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শিল্পের মজুরি-খাটা শ্রমিকদের সংগ্রাম ফ্রান্সের ক্ষেত্রে একটা আংশিক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারির দিনগুলির পরে তার পক্ষে তাই আরো বেশি অসম্ভব

ছিল বিপ্লবের জাতিগত অন্তর্বস্তু যোগানো, কেননা পংজির গৌণ শোষণপদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সুদখোরি ও বন্ধকীর বিরুদ্ধে কৃষকদের, কিংবা পাইকার, ব্যাংকার ও কারখানা-মালিকদের বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়াদের সংগ্রাম, এককথায় দেউলিয়া অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তখনও পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে সাধারণ অভ্যুত্থানের অন্তরালে। সুতরাং প্যারিসের প্রলেতারিয়েত যে তার আপন স্বার্থটাকেই সমাজের বৈপ্লবিক স্বার্থরূপে জোর করে হাসিল না করে বুর্জোয়ার স্বার্থসাধনের **পাশাপাশি** তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিল, **লাল** ঝাণ্ডাকে রাখতে দিয়েছিল **তেরঙ্গা** ঝাণ্ডার (৪৯) নিচে, এর চেয়ে সহজবোধ্য ব্যাপার আর কিছুই নেই। বিপ্লবের গতিপ্রবাহ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে অবস্থিত জাতির অধিকাংশ জনসমষ্টিকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে যতদিন পর্যন্ত ঐ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে না উত্থিত করে তুলছে এবং তাদের মুখপাত্রস্বরূপ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে বাধ্য না করছে, ততদিন ফরাসী শ্রমিকেরা এক-পাও অগ্রসর হতে পারে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। জুন মাসের প্রচণ্ড পরাজয়ের (৫০) মূল্যেই শুধু শ্রমিকেরা অর্জন করতে পারে সেই বিজয়।

প্যারিস শ্রমিকদের সৃষ্টি এই লুক্সেমবুর্গ কমিশন ইউরোপব্যাপী মঞ্চ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের মূলকথা — **প্রলেতারিয়েতের মুক্তির** কথাটা — উদ্‌ঘাটিত করেছিল, সে কৃতিত্ব সেটাকে দিতেই হবে। যে 'উন্মত্ত প্রলাপ' তখন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের অপ্রামাণিক রচনাগুলিতে তলিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে শুধু বুর্জোয়াদের কানে পেঁছিত দূরবর্তী আধা-ভয়াবহ আধা-হাস্যকর রূপকথা হিসেবে, তাকেই সরকারীভাবে প্রচার করতে বাধ্য হয়ে 'Moniteur' (৫১) পত্রিকা লাল হয়ে উঠল। বুর্জোয়া তন্দ্রা থেকে সচকিত হয়ে জেগে উঠল ইউরোপ। সুতরাং, যে প্রলেতারিয়ানরা ফিনান্স অভিজাতবর্গকে গুলিয়ে ফেলেছিল গোটা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মনে; সাচ্চা সেকেলে যে প্রজাতন্ত্রীরা শ্রেণীর অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করত না, অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ফলেই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, বড়জোর এই কথা মানত তাদের কল্পনায়; এযাবৎ ক্ষমতার আসনে ঠাঁই পায় নি যে সব বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের কপট বুলিতে — প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে

সঙ্গে যেন বিলুপ্ত হল **বুর্জোয়া শাসন**। তখন সব রাজতন্ত্রীই যেন প্রজাতন্ত্রীতে এবং প্যারিসের সব লক্ষপতিই যেন শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। যে কথাটার সঙ্গে শ্রেণী-সম্পর্কের এই কাল্পনিক বিলুপ্তির মিল ছিল সেটি হল fraternité — সার্বজনীন মৈত্রীসাধনা ও সৌভ্রাত্র। শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে এই প্রীতিকর অপসারণ, পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের এই ভাবপ্রবণ আপোস, শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে এই কাল্পনিক অধিরোহণ, এই fraternité হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আসল ধরতাই বুলি। নিছক **ভুল বোঝাবুঝির** দরুনই নাকি সমাজ শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত, তাই ২৪ ফেব্রুয়ারি লামার্তিন অস্থায়ী সরকারকে অভিসিঞ্চিত করে নাম ছিলেন — 'un gouvernement qui suspende ce *malentendu terrible qui existe entre les différentes classes*'*। সৌভ্রাত্রের এই উদার উন্মত্ততায় মাতাল হল প্যারিসের প্রলেতারিয়েত।

সেইমাত্র প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে অস্থায়ী সরকার বাধ্য হল তখন সেটা চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের ও প্রদেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য করে নিতে। রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের (৫২) রক্তাক্ত বিভীষিকাকে অস্বীকার করা হল; সংবাদপত্র উন্মুক্ত হল সব মতামতের কাছে; সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সেনাবাহিনী, বিচারালয় ও শাসন-ব্যবস্থা রইল সাবেকী মহামহিমদের মুঠোর মধ্যে; জুলাই রাজতন্ত্রের বাঁধা-বাঘা অপরাধীদের একজনকেও বিচারের জন্য হাজির করা হল না। 'National'-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রী নাম ও পোশাকের বদলে পুরনো প্রজাতন্ত্রী নামে ও পোষাকে সেজে আমোদ পেল। তাদের কাছে প্রজাতন্ত্র হল পুরনো বুর্জোয়া সমাজেরই একটা নতুন বল্‌-নাচের পোশাক। নবীন প্রজাতন্ত্র ত্রাস জাগিয়ে নয় বরং নিজেই সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে, এবং নিজ সত্তাকে মৃদুভাবে মেনে নেওয়া ও প্রতিরোধ না করার সাহায্যে অস্তিত্ব বজায় রাখা ও প্রতিরোধকে নিরস্ত্র করার ভিতরে তার প্রধান কৃতিত্ব খুঁজল। দেশের বিশেষ অধিকারভোগী

---

* 'বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার এই ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার সরকার।' — সম্পাঃ

শ্রেণীদের কাছে, বিদেশে স্বেচ্ছাচারী শক্তিগুলির নিকটে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল যে প্রজাতন্ত্রটি শান্তিপ্রবণ। সেটার ঘোষিত মূলমন্ত্র হল — বাঁচো ও বাঁচতে দাও। এর উপরে জার্মান, পোল, অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান ও ইতালিয়ানরা — প্রত্যেকটি জাতি নিজের তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী — বিদ্রোহ করল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরেই। রাশিয়া ও ইংলন্ড অবশ্য প্রস্তুত ছিল না — শেষোক্তটি নিজেই তখন আলোড়িত, প্রথমটি ভয়ভীত। প্রজাতন্ত্রের তাই এমন কোন **জাতীয়** শত্রু ছিল না, যার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। ফলে এমন কোন বিরাট বৈদেশিক জটিলতাও ছিল না যা কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত, অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করতে পারত এগিয়ে যেতে কিংবা উচ্ছেদ হতে। প্রজাতন্ত্রকে আপন সৃষ্টি মনে করে স্বভাবতই প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই অভিনন্দিত করল যা বুর্জোয়া সমাজে সরকারের পাকা আসন প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করল। প্যারিসে সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তারা কসিদিয়েরের নির্দেশে পুলিসের কাজে নিযুক্ত হতে রাজী হল, ঠিক যেমন লুই ব্লাঁ-কে তারা দিল শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের সালিসি করতে। ইউরোপের চোখে প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া মর্যাদাটাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা যেন তারা আপন সম্মানের ব্যাপার (point d'honneur) করে তুলল।

দেশে বা বিদেশে প্রজাতন্ত্রকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এতে করে সেটা নিরীহ হয়ে পড়ল। তখন আর দুনিয়ার বৈপ্লবিক রূপান্তর নয়, বুর্জোয়া সমাজের সম্পর্কগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোই হল সেটার কাজ। এই কাজে অস্থায়ী সরকারের উন্নত আতিশয্যের সব থেকে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য হল সেটার **আর্থিক ব্যবস্থাবলি**।

স্বভাবতই ঘা খেয়েছিল **সরকারী** ও **ব্যক্তিগত ক্রেডিট**। **সরকারী ক্রেডিট** নির্ভর করে এই আস্থার উপরে যে রাষ্ট্র নিজেকে ফিনান্স জগতের শ্বাপদদের দ্বারা শোষিত হতে দেবে। কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্র অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল আর বিপ্লবও সর্বোপরি চালিত হয়েছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই। বিগত ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংকটের আলোড়ন তখনও স্তব্ধ হয় নি। তখনও একের পর এক চলেছে দেউলিয়াপনা।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে তাই **ব্যক্তিগত ক্রেডিট পঙ্গু,** পণ্য সঞ্চালন সংকুচিত ও উৎপাদন অচল হয়েছিল। বৈপ্লবিক সংকটের ফলে ঘনীভূত হল বাণিজ্য সংকট। আর ব্যক্তিগত ক্রেডিট যদি নির্ভর করে এই বিশ্বাসের উপরে যে, সেটার সম্পর্কাদির সমগ্র পরিধির ভিতরে বুর্জোয়া উৎপাদনের, বুর্জোয়া ব্যবস্থার গায়ে হাত পড়বে না, তা অলঙ্ঘনীয়ই থাকবে, তাহলে যে বিপ্লব বুর্জোয়া উৎপাদনের ভিত্তি সম্পর্কেই, প্রলেতারিয়েতের আর্থিক দাসত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলে, ফাটকাবাজারের বিরুদ্ধে খাড়া করে লুক্সেমবুর্গের নৃসিংহকে, তার ফল কী দাঁড়াবে? প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের অর্থই হচ্ছে বুর্জোয়া ক্রেডিটের অবসান; কারণ এটা হল বুর্জোয়া উৎপাদন ও তার বিধি ব্যবস্থার অবসান। সরকারী ও ব্যক্তিগত ক্রেডিট হল সেই আর্থনীতিক তাপমানযন্ত্র যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় বিপ্লবের তীব্রতা। **ক্রেডিট যতই নিচের দিকে নামে ততই উপরে ওঠে বিপ্লবের উদ্দীপনা ও সৃজনীশক্তি।**

অস্থায়ী সরকার চাইল প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়াবিরোধী চেহারা ঘোচাতে। আর তাই সেটাকে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করতে হয়েছিল এই নয়া ঢং-এর রাষ্ট্রটির **বিনিময়-মূল্যকে,** ফাটকাবাজারে ঘোষিত তার **হাঁকাদরকে** বেঁধে রাখার জন্য। ব্যক্তিগত ক্রেডিট কাজেই আবার চড়তে লাগল ফাটকাবাজারে প্রজাতন্ত্রের চলতি দর হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

রাজতন্ত্র যে সব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছিল, অস্থায়ী সরকার তার দায় গ্রহণ করবে না অথবা গ্রহণ করতে পারবে না এমন **সন্দেহমাত্রের**ও নিরসন ঘটাবার জন্য ও প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান ও পরিশোধ ক্ষমতায় আস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার যে আস্ফালনের আশ্রয় নিল তা যেমন খেলো তেমনই বালকসুলভ। রাষ্ট্রের পাওনাদারদের শতকরা ৫, ৪·৫ ও ৪ হারের বন্ডের উপরে সরকার সুদ দিয়ে দিল আইনগত পরিশোধ তারিখের **আগেই**। বুর্জোয়া নিশ্চিন্ততা, পুঁজিপতিদের আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ জেগে উঠল যখন তারা দেখল কী ব্যগ্র দ্রুততায় তাদের আস্থা ক্রয়ের চেষ্টা চলেছে।

এই যে নাটকীয় কান্ডটায় অস্থায়ী সরকারের নগদ টাকার তহবিল শূন্য হল, তাতে স্বভাবতই সেটার আর্থিক বিভ্রাট হ্রাস পায় নি। টাকার টানাটানিটা আর গোপন রাখা গেল না, এবং রাষ্ট্রের পাওনাদারদের প্রীতিকর

চমক দেওয়ার যে আয়োজন হয়েছিল তার মূল্য দিতে হল **পেটি বুর্জোয়া, বাড়ির চাকর ও শ্রমিকদের।**

ঘোষণা করা হল **সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা** থেকে একশ ফ্র্যাংকের বেশি পরিমাণ টাকা তোলা যাবে না। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল ও একটা ডিক্রি মারফত রূপান্তরিত হল অশোধনীয় সরকারী ঋণে। পূর্ব থেকেই বিষম বিপন্ন **পেটি বুর্জোয়ারা** এর ফলে প্রজাতন্ত্রের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতার বদলে যেহেতু সে পেল সরকারী ঋণের সার্টিফিকেট, তাই তাকে বাধ্য হয়ে ফাটকাবাজারে যেতে হল সেগুলি বেচার জন্য; তাতে করে নিজেকে সঁপে দিতে হল সেই ফাটকাবাজারদের হাতেই যাদের বিরুদ্ধে সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে যে ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন চলেছিল তাদের দেবালয় ছিল **ব্যাঙ্ক**। সরকারী ক্রেডিটের ওপর যেমন ফাটকাবাজারের কর্তৃত্ব, **বাণিজ্য ক্রেডিটের** ওপরেও তেমনি ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব।

ব্যাঙ্কের শুধু কর্তৃত্ব নয়, অস্তিত্ব পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিপন্ন হওয়ার দরুন, গোড়া থেকেই সেটার চেষ্টা ছিল ক্রেডিটের অভাবকে সর্বব্যাপী করে প্রজাতন্ত্রকে খেলো করে ফেলা। হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দেয় ব্যাঙ্কার, কারখানা-মালিক ও ব্যাপারীদের ক্রেডিট। এতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিপ্লবের সৃষ্টি না হওয়ায় এই কৌশলের অনিবার্য উল্টো ফল ফলেছিল ব্যাঙ্কের উপরেই। ব্যাঙ্কের কোষাগারে যে টাকা পুঁজিপতিরা জমা রেখেছিল তা তারা তুলে নিল। ব্যাঙ্কনোটের মালিকেরা টাকা তোলার দপ্তরে ছুটল নোট ভাঙিয়ে সোনা-রুপো পাবার জন্য।

অস্থায়ী সরকার জবরদস্তি হস্তক্ষেপ না করেও আইনসম্মতভাবে ব্যাঙ্ককে **দেউলিয়া** হতে বাধ্য করতে পারত; শুধু দরকার হত চুপচাপ থাকা ও ব্যাঙ্ককে তার কপালে যা আছে তার উপরে ছেড়ে দেওয়া। **ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অবস্থা** হত এমন এক প্লাবন যা নিমেষের মধ্যে ফরাসী দেশের মাটি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত প্রজাতন্ত্রের সব থেকে শক্তিশালী ও মারাত্মক শত্রু জুলাই রাজতন্ত্রের স্বর্ণপাদপীঠ ফিনান্স অভিজাতবর্গকে। আর ব্যাঙ্ক যেইমাত্র দেউলিয়া হত তখন সরকার যদি জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়ত ও জাতীয় ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের ভার দিত জাতিরই হাতে, তাহলে বুর্জোয়ারা

নিজেরাই এই ব্যবস্থাকে বিপদত্রাণের শেষ মরিয়া চেষ্টা বলেই গণ্য করতে বাধ্য হত।

অস্থায়ী সরকার কিন্তু উল্টে ব্যাঙ্কনোটের এক **বাধ্যতামূলক বাজারদর** নির্দিষ্ট করে দিল। উপরন্তু করল আরও কিছু। সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার রূপান্তরিত করল ব্যাঙ্ক দ্য' ফ্রান্সের (Banque de France) শাখায় এবং অনুমতি দিল গোটা ফ্রান্সে ঐ ব্যাঙ্কের জাল বিস্তার করার। পরে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নেওয়া একটা ঋণের জামিন হিসেবে সরকার ব্যাঙ্কের কাছে **সরকারী বনভূমিগুলি** বাঁধা দেয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব কর্তৃক যে ব্যাঙ্কতন্ত্রের উচ্ছেদ করার কথা ছিল তাকেই সেটা এইভাবে সরাসরি শক্তিশালী ও বর্ধিত করে তুলল।

ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকার ক্রমবর্ধমান ঘাটতির পীড়নে কাতরাতে আরম্ভ করে। বৃথাই সেটা মিনতি জানাল দেশপ্রেমী আত্মত্যাগের জন্য। সেটাকে ভিক্ষা ছুঁড়ে দিল শুধু শ্রমিকেরাই। একটা বীরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বনের, **নতুন কর** চাপানোর শরণ নেবার প্রয়োজন হল। কিন্তু কার উপরে চাপানো যায় সেই কর? ফাটকাবাজারের নেকড়েদের উপরে, ব্যাঙ্ক সম্রাট, সরকারের মহাজন, লভ্যাংশজীবী (rentiers) বা শিল্পপতিদের উপরে? প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের অনুগ্রহভাজন করার উপায় তো তা নয়। তার অর্থ হত একদিকে সরকারী ও ব্যবসাগত ক্রেডিটকে বিপন্ন করা, যখন অন্যদিকে চেষ্টা চলছিল মস্ত ক্ষতিস্বীকার ও লাঞ্ছনার মূল্যে সেগুলোকে কিনে নেওয়ার। কিন্তু কড়ি তো যোগাতে হবে কাউকে। বুর্জোয়া ক্রেডিটের বেদিতে বলি দেওয়া হল কাকে? Jacques le bonhomme,* **কৃষককে।**

অস্থায়ী সরকার চারটি প্রত্যক্ষ করের উপরে ফ্র্যাঙ্ক পিছু ৪৫ সাঁতিম (centime) অতিরিক্ত কর চাপাল। সরকারী খবরের কাগজগুলি স্তোকবাক্য দিয়ে প্যারিসের শ্রমিকদের বিশ্বাস করাল যে, এই করের বোঝা প্রধানত পড়বে নাকি বড় বড় জমির মালিকদের উপরে, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে (Restoration) (৫৩) মঞ্জুর-করা শত কোটি ফ্র্যাঙ্কের অধিকারীদের উপরে। আসলে কিন্তু এর আঘাতটা সর্বোপরি পড়ল **কৃষক শ্রেণীর** উপর, অর্থাৎ

* সাদাসিধে মানুষ জাক; ফরাসী ভূস্বামীরা অবজ্ঞাভরে কৃষকদের এই নাম দেয়। — সম্পাঃ

ফরাসী জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরে। **ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল এদেরই**; এদের মধ্যেই প্রতিবিপ্লব পেল তার প্রধান উপাদান। ফরাসী কৃষকের পক্ষে ৪৫ সাঁতিমের করটা জীবন-মরণ সমস্যা; প্রজাতন্ত্রের পক্ষেও সে এটাকে জীবন-মরণ সমস্যা করে তুলল। সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসী কৃষকের কাছে **প্রজাতন্ত্রের** অর্থ হল **৪৫ সাঁতিমের কর**, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত তার চোখে প্রতীয়মান হল এমন এক অপব্যয়ী বলে যে তার ঘাড় ভেঙে নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছে।

১৭৮৯ সালের বিপ্লব যেখানে শুরু করেছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্ততান্ত্রিক বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮-এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা জানালে নয়া এক কর বসিয়ে, যাতে পুঁজি বিপন্ন না হয় এবং তার রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে চালু থাকতে পারে।

একটিমাত্র উপায়ে অস্থায়ী সরকার এত সব ঝামেলা দূর করতে ও এক ধাক্কায় রাষ্ট্রকে ঠেলে তুলতে পারত পুরনো খানা থেকে — **রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা** মারফত। সকলেরই মনে আছে, ফাটকাবাজারের শ্বাপদ, বর্তমানে ফরাসী অর্থসচিব ফুল্দ্-এর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রস্তাব লেদ্রু-রলাঁ যে কত নৈতিক রোষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তিনি পরবর্তী কালে আবৃত্তি করেন জাতীয় পরিষদে। এদিকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ফুল্দ্।

সাবেকী বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুণ্ডি পেশ করেছিল তাকে মান্য করে অস্থায়ী সরকার নতিস্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। বহু বছরের বৈপ্লবিক ঋণ যাকে আদায় করতে হবে এমন এক পীড়ক উত্তমর্ণ হিসেবে বুর্জোয়া সমাজের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে অস্থায়ী সরকার সেই সমাজেরই এক পীড়িত অধমর্ণ হয়ে দাঁড়াল। নড়বড়ে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি তাকে সংহত করতে হল এমন সব বাধ্যবাধকতার দায় মেটানোর জন্য যা পূরণ করা সম্ভব শুধু সে সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যেই। ক্রেডিট হয়ে দাঁড়াল সেটার জীবনধারণের শর্ত, আর প্রলেতারিয়েতকে যে সব সুবিধা দিতে হয়েছিল, যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এখন পরিণত হল **শৃঙ্খলে**, যা না খসালেই **নয়**। এমন কি একটা **কথার কথা** হিসেবেও শ্রমিকদের মুক্তি নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে হয়ে উঠল অসহনীয় বিপদ, কারণ চালু

অর্থনীতিক শ্রেণী-সম্পর্কের অবিচল ও নির্বিঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর, সেই ক্রেডিট ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাবি হল এক স্থায়ী প্রতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে পড়ল **শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাবার।**

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সেনাবাহিনীকে প্যারিস-ছাড়া করেছিল। একমাত্র শক্তি ছিল জাতীয় রক্ষিদল, অর্থাৎ নানা স্তরের বুর্জোয়া। তবু একা একা সেটা নিজেকে প্রলেতারিয়েতের **সমকক্ষ** মনে করে নি। তাছাড়া, প্রবল বিরুদ্ধতা ও হাজারো বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা খাড়া করা সত্ত্বেও সেটা বাধ্য হয় ক্রমশ একে একে তার বাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত করতে ও সেখানে **সশস্ত্র** প্রলেতারিয়ানদের প্রবেশাধিকার দিতে। ফলে একটিমাত্র পথ বাকি রইল: **প্রলেতারিয়েতের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া।**

এই উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার প্রত্যেকটিতে এক হাজার করে ১৫ থেকে ২০ বছরের যুবকদের নিয়ে ২৪টি ব্যাটালিয়নের এক **সচল রক্ষিদল** (Mobile Guards) গঠন করল। এদের অধিকাংশই ছিল **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত,** সব বড় শহরেই যারা শিল্পক্ষেত্রের প্রলেতারিয়েত থেকে সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র এক জনতা, চোর ও সবরকমের অপরাধীদের যোগান আসে যাদের মধ্য থেকে; সমাজের উচ্ছিষ্টজীবী এমন সব লোক যাদের নির্দিষ্ট কোন বৃত্তি নেই; যারা ভবঘুরে, চাল নেই, চুলোও নেই (gens sans feu et sans aveu); যে জাতির তারা অন্তর্ভুক্ত তার সভ্যতার মাত্রা অনুযায়ী যাদের ভিতরে ইতরবিশেষ থাকলেও যারা কিছুতেই তাদের লাজারোনি (৫৪) চরিত্র হারায় না; একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্থায়ী সরকার এদের বাহিনীভুক্ত করেছিল যখন নির্ভীকতম কার্যকলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগও যেমন, তেমনই আবার জঘন্যতম গুন্ডামি ও নিকৃষ্টতম দুর্নীতি — সবই এদের পক্ষে ছিল সম্ভব। অস্থায়ী সরকার এদের প্রতিদিন ১ ফ্র্যাঙ্ক ৫০ সাঁতিম করে দিত, অর্থাৎ এদের কিনে নেওয়া হল। এদের পৃথক একটা বিশিষ্ট উর্দিও সরকার দিল, অর্থাৎ ঢিলেজামা (blouse) পরা শ্রমিকদের থেকে এদের বাহ্যত পৃথক করে রাখা হল। এদের নায়কত্ব করার জন্য কিছু কিছু অফিসার সরকার নিয়ে এল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী থেকে; কিছুটা আবার এরাই এমন সব তরুণ বুর্জোয়া সন্তানদের নিজেরাই অফিসার নির্বাচন করে নিল, যাদের পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতি

আনুগত্য সম্পর্কিত লম্বাই-চওড়াই বুলিতে এরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়ে।

কাজেই, প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তাদেরই ভিতর থেকে যোগাড় করা ২৪,০০০ তরুণ জোয়ান ও গোয়ারগোবিন্দ মানুষের এক সেনাবাহিনী। প্যারিসের ভিতর দিয়ে এরা কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার সময়ে প্রলেতারিয়েতও জয়ধ্বনি দিত সচল রক্ষিদলের। তারা এদের স্বীকার করে নিল নিজেদের অগ্রণী ব্যারিকেড যোদ্ধা হিসেবে। বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদলের বিপরীতে তারা একে মনে করল **প্রলেতারীয়** রক্ষিদল। তাদের ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য।

সচল রক্ষিদল ছাড়াও সরকার স্থির করল তার চারিদিকে শিল্প শ্রমিকদের এক বাহিনীর সমাবেশ করবে। সংকট ও বিপ্লবের ফলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে এমন একলক্ষ শ্রমিককে মন্ত্রী মারি তথাকথিত জাতীয় কর্মশালায় (ateliers) নাম লেখান। এই জাঁকালো নামের আড়ালে ২৩ সু(sou) মজুরিতে ক্লান্তিকর একঘেয়ে অনুৎপাদনশীল **মাটি কাটার কাজে** শ্রমিকদের লাগানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। **খোলা আকাশের নীচে ইংরেজী শ্রমনিবাস** (৫৫) — এই হল জাতীয় কর্মশালা। অস্থায়ী সরকার ভাবল এরই মধ্য দিয়ে সেটা **শ্রমিকদেরই বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক প্রলেতারিয়ান বাহিনী** গড়েছে। বুর্জোয়ারা এখানে জাতীয় কর্মশালার ব্যাপারে ভুল করল, ঠিক যেমন শ্রমিকেরা ভুল করেছিল সচল রক্ষিদলের ক্ষেত্রে। ওরা সৃষ্টি করে দিল **বিদ্রোহের এক বাহিনী।**

একটি উদ্দেশ্য তবু সফল হয়।

লুই ব্লাঁ লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদ থেকে যে জন-কর্মশালার কথা প্রচার করেছিলেন তার নাম ছিল **জাতীয় কর্মশালা।** লুক্সেমবুর্গের প্রত্যক্ষ **বিরোধিতাকল্পে** উদ্ভাবিত মারি-র **কর্মশালা** একই নামকরণের কল্যাণে এমন এক প্রমাদ-নাটোর উপলক্ষ যোগাল যা স্পেনীয় ভৃত্য-সংক্রান্ত ভুলের প্রহসনের উপযোগী। অস্থায়ী সরকার নিজেই গোপনে গোপনে এই খবর ছড়াল যে, এই জাতীয় কর্মশালাগুলি লুই ব্লাঁ-এরই আবিষ্কার; এটা আরও বেশি সম্ভব মনে হল এইজন্য যে, জাতীয় কর্মশালার প্রচারক লুই ব্লাঁ ছিলেন অস্থায়ী সরকারেরই একজন সদস্য। আর প্যারিসের বুর্জোয়াদের আধা-সরলমতি, আধা-ইচ্ছাকৃত বিভ্রমের নিকটে, ফ্রান্সের তথা ইউরোপের কৃত্রিমভাবে সংগঠিত

মতামতের কাছে এই শ্রমনিবাসগুলিই মনে হল সমাজতন্ত্রের প্রথম রূপায়ণ, যে সমাজতন্ত্রকে তাতে করে তোলা হল অবজ্ঞা-উপহাসের পাত্র।

অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে না হলেও, নামকরণের দিক দিয়ে **জাতীয় কর্মশালা** ছিল বুর্জোয়া শিল্প, বুর্জোয়া ক্রেডিট ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের মূর্ত প্রতিবাদ। বুর্জোয়াদের সমস্ত ঘৃণাও তাই উদ্যত হল এগুলির উপরে। এদের মধ্যেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল সেই লক্ষ্য যার বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারির মায়াজাল ছিঁড়ে খোলাখুলি বেরিয়ে আসার মতো শক্তিসঞ্চয় করা মাত্র তারা শুরু করতে পারে আক্রমণ। **পেটি বুর্জোয়াদেরও** সমস্ত অসন্তোষ, সকল বিরাগ এই জাতীয় কর্মশালারূপী সাধারণ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হল। সত্যকার ক্রোধ নিয়ে তারা হিসাব করতে বসল শ্রমিক নিষ্কর্মারা কী পরিমাণ গ্রাস করছে, যখন তাদের নিজেদের অবস্থা দিনের পর দিন দাঁড়াচ্ছে অসহ্য। মনে মনে তারা গজরাতে লাগল — ভুয়ো মেহনতের জন্য সরকারী পেনশন — এই হল তাহলে সমাজতন্ত্র! নিজেদের দুর্গতির কারণ তারা খুঁজল জাতীয় কর্মশালার ভিতরে, লুক্সেমবুর্গের গলাবাজির মধ্যে, প্যারিসের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মিছিলে। আর কমিউনিস্টদের তথাকথিত কারসাজি নিয়ে পেটি বুর্জোয়াদের মতন কেউই অত উদগ্র ছিল না — দেউলিয়ার কিনারে অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিল এরা।

এইভাবে, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আসন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় (mêlée) সকল সুযোগ-সুবিধা, সমস্ত নির্ধারক অবস্থান, সমাজের সব কটি মধ্যবর্তী স্তর এল বুর্জোয়াদের হাতে, যখন একই সময়ে সমগ্র মহাদেশের উপর দিয়ে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল উত্তাল; প্রত্যেকটি নতুন ডাক বিপ্লবের নয়া খবর আনছিল কখনও ইতালি থেকে, কখনও জার্মানি থেকে, কখনওবা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সুদূরতম প্রান্ত থেকে, যে বিজয় ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছে তারই সাক্ষ্য তাদের কাছে অবিরাম বহন করে [illegible]।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার পক্ষপুটে যে বিরাট শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রথম খণ্ডযুদ্ধ দেখা গেল **১৭ মার্চ** এবং **১৬ এপ্রিল** তারিখে।

১৭ মার্চ প্রলেতারিয়েতের সেই অনিশ্চিত অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে, যার ফলে কোন চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্ভব হয় নি। সেদিনের মিছিলের গোড়ার

উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী সরকারকে পুনরায় বিপ্লবের পথে ঠেলে আনা, অবস্থা অনুযায়ী সরকারের বুর্জোয়া সদস্যদের বহিষ্কার করা, এবং জাতীয় পরিষদ ও জাতীয় রক্ষিদলের নির্বাচনের দিন পিছিয়ে দেওয়া। কিন্তু ১৬ মার্চ জাতীয় রক্ষিদলের বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে একটা বৈরভাবাপন্ন মিছিলের আয়োজন করেছিল। 'À bas Ledru-Rollin!'* এই জিগির তুলে তারা চড়াও হয়েছিল টাউন হল্-এ। তাই জনতা ১৭ মার্চ বাধ্য হল রব তুলতে: 'লেদ্রু-রলাঁ দীর্ঘজীবী হোন! অস্থায়ী সরকার জিন্দাবাদ!' তাদের মনে হয়েছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র বিপন্ন, সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধাচরণ** করতে বাধ্য হয় তারা। অস্থায়ী সরকারকে নিজেদের আয়ত্ত করার বদলে সেটাকে তারা মজবুত করে দিল। ১৭ মার্চ অতিবাহিত হল অতিনাটকীয় ভাবে, প্যারিসের প্রলেতারিয়েত সেদিন তার অতিকায় আয়তন আবার দেখিয়ে দিলেও অস্থায়ী সরকারের ভিতরকার ও বাইরের বুর্জোয়ারা সেটাকে ধ্বংস করতে হল আরও বেশি বদ্ধপরিকর।

১৬ এপ্রিলে হল একটি **ভুল বোঝাবুঝি** যা অস্থায়ী সরকার ঘটায় বুর্জোয়ার সঙ্গে যোগসাজশে। মার্স ময়দান ও হিপোড্রোমে শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিল জাতীয় রক্ষিদলের সেনাপতিমণ্ডলী নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য। হঠাৎ সারা প্যারিসময়, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎগতিতে এক গুজব রটে গেল যে লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, কাবে ও রাস্পাই-এর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা মার্স ময়দানে সমবেত হয়েছে অস্ত্রহাতে, সেখান থেকে টাউন হল্-এ অভিযান, অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও কমিউনিস্ট সরকার ঘোষণার উদ্দেশ্যে। সাধারণ বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজানো হল — লেদ্রু-রলাঁ, মারাস্ত ও লামার্তিন পরে এটি সূচনা করার সম্মান নিয়ে লড়ালড়ি করেন — আর এক ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রসজ্জিত হল ১,০০,০০০ লোক; টাউন হল্-এর সব ক'টি ঘাঁটি দখল করে বসল জাতীয় রক্ষিদল; সারা প্যারিস জুড়ে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল: 'কমিউনিস্টরা নিপাত যাক! লুই ব্লাঁ, ব্লাঙ্কি, রাস্পাই ও কাবে নিপাত যাক!' অসংখ্য প্রতিনিধিদল অস্থায়ী সরকারের প্রতি

* 'লেদ্রু-রলাঁ নিপাত যাক!' — সম্পাঃ

বশ্যতা জানাল, সবাই প্রস্তুত পিতৃভূমি ও সমাজকে রক্ষার জন্য। শ্রমিকেরা অবশেষে যখন টাউন হল্-এ পেঁছিল, মার্স ময়দানে তারা যে দেশপ্রেমিক চাঁদা তুলেছিল অস্থায়ী সরকারের হাতে তা-ই তুলে দিতে, তখন পরম বিস্ময়ে তারা জানল যে, বুর্জোয়া প্যারিস এক সযত্ন পরিকল্পিত নকল লড়াইয়ে তাদের ছায়াকে পরাস্ত করে ফেলেছে। ১৬ এপ্রিলের ভয়াবহ প্রচেষ্টা **প্যারিসে সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে আনার** ছুতো যোগাল — অতি স্থূলভাবে অভিনীত প্রহসনের এটাই ছিল আসল মতলব, — ছুতো যোগাল প্রদেশে প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল ফেডারেলিস্ট মিছিলেরও।

৪ মে **সরাসরি সাধারণ নির্বাচনের ফল জাতীয় সভার*** অধিবেশন হল। সাবেকী ঢংয়ের প্রজাতন্ত্রীরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আরোপ করত সে শক্তি বস্তুত সেটার ছিল না। তারা গোটা ফ্রান্সে, অন্তত ফরাসী জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে দেখত **সমস্বার্থসম্পন্ন**, সমভাবী ইত্যাদি নাগরিকদের (citoyens)। এই ছিল তাদের **জনতাপূজা**। তাদের **কাল্পনিক** মানুষের বদলে নির্বাচন গোচরে আনল **প্রকৃত** জনসাধারণকে, অর্থাৎ যে সব নানা শ্রেণীতে জনসাধারণ বিভক্ত তাদের প্রতিনিধিদেরই। আমরা দেখেছি কেন কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াকে ভোট দিতে হল সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল বুর্জোয়া ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অধীন বৃহৎ ভূস্বামীদের নেতৃত্বে। তবে প্রজাতন্ত্রী মাতব্বরেরা সর্বজনীন ভোটাধিকারকে যা ভেবেছিল তা সেরকম অলৌকিক যাদুদণ্ড না হলেও অন্য একটা অতুলনীয় উচ্চতর গুণ তার ছিল — শ্রেণী-সংগ্রামকে শৃঙ্খলমুক্ত করা, বুর্জোয়া সমাজের নানা মধ্যবর্তী স্তরগুলির দ্রুত মোহমুক্তি ঘটানো ও নৈরাশ্য কাটিয়ে তোলা, এক ধাক্কায় শোষক শ্রেণীর সব ক'টি অংশকে রাষ্ট্রের শীর্ষে তুলে দেওয়া ও তাতে করে তাদের বিভ্রান্তিজনক মুখোসটা কেড়ে নেওয়া, যখন রাজতন্ত্র সেটার সম্পত্তিগত ভোটাধিকার-বলে বুর্জোয়াদের বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীকেই শুধু বদনামের ভাগী হতে দেয়, অন্যদের লুকিয়ে থাকতে দেয় পর্দার আড়ালে, তাদের সাধারণ সরকার-বিরোধিতার গৌরবে মণ্ডিতও রাখে।

---

* এখানে এবং পরে ১১১ পৃষ্ঠা অবধি জাতীয় সভা বলতে বোঝান হয়েছে ১৮৪৮ সালের ৪ মে থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় সংবিধান-সভা (Constituanta)। — সম্পাঃ

৪ মে যে জাতীয় সংবিধান-সভার অধিবেশন হল তাতে প্রাধান্য ছিল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের,** 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের। গোড়ায় গোড়ায় লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদের মুখোস পরেই শুধু মুখ দেখাবার সাহস পেত। প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো তখন সম্ভব ছিল শুধু প্রজাতন্ত্রের দোহাই পেড়েই।

প্রজাতন্ত্রের সূচনা ৪ মে তারিখ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নয়, অর্থাৎ সেই প্রজাতন্ত্রের যাকে স্বীকার করেছিল ফরাসী জনসাধারণ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের উপরে যে প্রজাতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রজাতন্ত্র, ব্যারিকেড সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি — এ সেই প্রজাতন্ত্র নয়। জাতীয় সভা কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র বৈধ প্রজাতন্ত্রটি হল এমন এক প্রজাতন্ত্র যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী কোন বৈপ্লবিক হাতিয়ার নয়, বরঞ্চ সেই ব্যবস্থারই রাজনৈতিক পুনর্গঠন, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্সংহতি, এককথায় **একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।** জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ধ্বনিত হল এই কথাটাই এবং সমস্ত প্রজাতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া সংবাদপত্রে শোনা গেল তারই প্রতিধ্বনি।

আর ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র কেন আসলে **বুর্জোয়া** প্রজাতন্ত্র ছাড়া কিছু ছিল না এবং তা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাও আমরা দেখেছি। দেখেছি তাসত্ত্বেও কিভাবে অস্থায়ী সরকার প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ তাড়নায় বাধ্য হয়েছিল সেটাকে **সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বলিত প্রজাতন্ত্র** রূপে ঘোষণা করতে; প্যারিসের প্রলেতারিয়েত কিভাবে **স্বপ্নে, কল্পনায়** ছাড়া তখনও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করতে অপারগ ছিল; সত্যসত্যই কাজের সময় এলে কেমন করে তারা সর্বক্ষেত্রে তার সেবা করেছে; তাদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কিভাবে নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অসহনীয় বিপদের কারণ হয়ে উঠল; সাময়িক সরকারের সমগ্র জীবনধারাই কী করে হয়ে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম — এ সবই আমরা দেখেছি।

জাতীয় সভায় গোটা ফ্রান্স বিচার করতে বসেছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের। সভা কালক্ষেপ না করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সামাজিক মোহজাল অপসারিত করল; স্পষ্ট ঘোষণা জানাল **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের,**

নিছক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের। সভা যে নির্বাহী কমিশন নিয়োগ করে তার থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি লুই ব্লাঁ ও আলবেরকে সরাসরি বাদ দেওয়া হল। বিশেষ এক শ্রম দপ্তরের প্রস্তাব সভা নাকচ করল এবং 'প্রশ্ন এখন শুধু **শ্রমকে আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা'** মন্ত্রী ত্রেলার এই বিবৃতিকে গ্রহণ করল সোল্লাসে।

এতেও কিন্তু যথেষ্ট হল না। শ্রমিকেরা ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র অর্জন করেছিল বুর্জোয়ার নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায়। সঠিকভাবেই প্রলেতারিয়ানরা নিজেদের ভেবেছিল ফেব্রুয়ারি বিজয়ী এবং বিজয়ীসুলভ উদ্ধত দাবিও তারা তুলেছিল। তাই দরকার পড়ল তাদের রাস্তার লড়াইয়ে পরাস্ত করার, তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে বুর্জোয়াদের **সঙ্গে** একযোগে লড়াইয়ের বদলে বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** লড়তে গেলেই তাদের হার মানতে হবে। ঠিক যেমন সমাজতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম, তেমনই প্রজাতন্ত্রকে সমাজতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** প্রাধান্য সরকারীভাবে কার্যকরী করতে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় এক সংগ্রামের। প্রলেতারিয়েতের দাবি নাকচ করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীকে অস্ত্র ধরতে হল। **ফেব্রুয়ারির বিজয় নয়, জুনের পরাভবই** হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভব ক্ষেত্র।

প্রলেতারিয়েত সমাধানটা ত্বরান্বিত করল যখন ১৫ মে তারা চড়াও হয় জাতীয় সভায়, ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের বৈপ্লবিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, এবং তাতে করে তাদের সব থেকে উদ্যোগী নেতাদেরই শুধু তুলে দেয় বুর্জোয়াদের কারারক্ষকদের হাতে (৫৬)। Il faut en finir! এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে! — এই জিগির তুলে জাতীয় সভা প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করার সংকল্প প্রকাশ করল। নির্বাহী কমিশন জনসাধারণের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি কতকগুলি প্ররোচনামূলক ডিক্রি জারি করল একের পর এক। জাতীয় সংবিধান-সভার মঞ্চ থেকে সরাসরি শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া হল, তাদের উপরে বর্ষিত হতে লাগল অপমান ও বিদ্রূপ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল **জাতীয় কর্মশালাগুলি**। চড়া সুরে সংবিধান-সভা এগুলির

প্রতি নির্বাহী কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কমিশন অবশ্য শুধু জাতীয় সভার অনুজ্ঞার ভিতরে নিজস্ব পরিকল্পনারই ঘোষণা শোনার অপেক্ষায় ছিল।

নির্বাহী কমিশন শুরু করল জাতীয় কর্মশালায় প্রবেশ কঠিনতর করে তুলে, দিনমজুরিকে ফুরন মজুরিতে রূপান্তরিত করে, এবং প্যারিসে জন্ম নয় এমন সব শ্রমিকদের মাটি কাটার অছিলায় সলোন-এ নির্বাসন দিয়ে। মাটি কাটার কাজটি যে তাদের নির্বাসনের উপরে প্রলেপ দেওয়ার এক আলংকারিক ধুয়ামাত্র, মোহমুক্ত শ্রমিকেরা ফিরে এসে তাদের সহকর্মীদের তা জানায়। সর্বশেষে, ২১ জুন 'Moniteur' পত্রিকায় একটা ডিক্রি জারি হল যাতে জাতীয় কর্মশালা থেকে সমস্ত অবিবাহিত মজুরদের জবরদস্তি বহিষ্করণ অথবা তাদের সৈন্যদলভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত্যন্তর রইল না শ্রমিকদের; হয় তাদের অনশন করতে হবে, নয়ত লড়তে হবে। ২২ জুন তারা প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে এর জবাব দিল, যার ভিতরে বর্তমান সমাজ যে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের মধ্যকার প্রথম বৃহৎ লড়াই সংঘটিত হয়। এ লড়াই **বুর্জোয়া** ব্যবস্থার হয় সংরক্ষণ অথবা তার উচ্ছেদের জন্য। প্রজাতন্ত্র যার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল সেই আবরণ।

বিনা নেতৃত্বে, সাধারণ কোন পরিকল্পনা বাদে, রসদ ছাড়া ও অধিকাংশ সময়ে হাতিয়ারের অভাবের মধ্যেও শ্রমিকেরা অতুলনীয় নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনশক্তির জোরে কিভাবে পাঁচ দিন ধরে সৈন্যবাহিনী, সচল রক্ষিদল, প্যারিসের ভিতরকার ও প্রদেশ থেকে স্রোতের মতো আগত জাতীয় রক্ষিদলকে ঠেকিয়ে রাখে তা সকলেই জানে। এও সুপরিচিত কিভাবে বুর্জোয়ারা তাদের প্রাণান্তিক ত্রাসভোগের শোধ তোলে অশ্রুতপূর্ব নৃশংসতা চালিয়ে, ৩,০০০-এরও বেশি বন্দী হত্যা করে।

ফরাসী গণতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধিরা প্রজাতান্ত্রিক মতাদর্শে এতদূর আচ্ছন্ন ছিল যে, কয়েক সপ্তাহ কাটলে পরে তবেই তারা জুনের লড়াইয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেতে শুরু করে। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ছিল বারুদের ধোঁয়ায়, যার মধ্যে মিলিয়ে যায় তাদের কল্পনার প্রজাতন্ত্র।

জুন পরাভবের খবর আমাদের উপরে যে ছাপ ফেলেছিল, পাঠকদের অনুমতি নিয়ে আমরা তার বর্ণনা দেব 'Neue Rheinische Zeitung'-এর ভাষায়:

'ঘটনাবলির গুরুত্বের মুখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শেষ সরকারী অবশেষ নির্বাহী কমিশন শূন্যে বিলীন হয়েছে ছায়ামূর্তির মতো। লামার্তিনের আতসবাজি রূপান্তরিত হয়েছে কাভেনিয়াকের সামরিক হাউইয়ে। এই হল fraternité– ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরবিরোধী শ্রেণী যার ভিতরে একে অন্যের উপরে শোষণ চালায়, এমন fraternité– ভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে, প্যারিসের ললাটে, প্রত্যেক কারাগারে, প্রত্যেকটি ব্যারাকে তা লেখা হয়েছিল বড় বড় হরফে, সে ভ্রাতৃত্বের সত্যকার, নিখাদ, সাদামাটা রূপ হল **গৃহযুদ্ধ**, সব থেকে ভয়ংকর রকমের গৃহযুদ্ধ, শ্রম ও পুঁজির যুদ্ধ। ২৫ জুন সন্ধ্যায় প্যারিসের সমস্ত জানলার সম্মুখে এই ভ্রাতৃত্বই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, যখন বুর্জোয়াদের প্যারিসে চলল দীপালি উৎসব; আর অগ্নিশিখায়, রক্তক্ষয়ে, আর্তস্বরে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল প্রলেতারিয়েতের প্যারিস। ভ্রাতৃত্ব টিকে ছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ বুর্জোয়াদের স্বার্থের মিল ছিল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সঙ্গে।

'১৭৯৩ সালের পুরনো বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের বিদ্যা-দিগ্‌গজেরা; সমাজতন্ত্রী সুসম্বদ্ধকারীরা, যারা জনসাধারণের হয়ে ভিক্ষা চেয়েছে বুর্জোয়াদের দ্বারে দ্বারে, এবং প্রলেতারিয়ান সিংহকে যতদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল ততদিন পর্যন্ত যাদের অনুমতি দেওয়া হত লম্বা-চওড়া বাণী প্রচারের ও নিজেদের খেলো প্রতিপন্ন করার; মুকুটপরা মাথাটি বাদে পুরনো বুর্জোয়া ব্যবস্থার সবটুকু দাবি করত যে প্রজাতন্ত্রীরা; বিরোধীদের ভিতরে রাজবংশের অনুগামিবৃন্দ, ঘটনাচক্রে যাদের ঘাড়ে এসে পড়ে মন্ত্রিপরিবর্তনের বদলে রাজবংশের উচ্ছেদ; লেজিটিমিস্ট সম্প্রদায় যারা উর্দি ছাড়তে চায় নি, চেয়েছিল শুধু তার ছাঁট পাল্টাতে — এমন সব মিত্রদের নিয়েই জনসাধারণ ঘটিয়েছিল তাদের ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল **মনোরম** বিপ্লব, সর্বজনীন সহানুভূতির বিপ্লব, কারণ তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা জ্বলে উঠেছিল তা ছিল **অপরিণত** অবস্থায় সুপ্ত, পাশাপাশি অবস্থানে সুসমঞ্জস, কারণ যে সামাজিক সংগ্রাম ছিল তার পটভূমি

সেটা শুধু এক বায়বীয় অস্তিত্ব, বুলি ও কথার অস্তিত্বই অর্জন করেছিল। **জুন বিপ্লব হল কুৎসিৎ** বিপ্লব, জঘন্য বিপ্লব, কারণ কথার বদলে কাজ এসে দাঁড়াল, কারণ যে মুকুট রাক্ষসের মাথাকে রক্ষা ও আড়াল করে রেখেছিল, সেটাকে ঘা মেরে সরিয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র সেই মাথাটাই অনাবৃত করে দিল। গিজো-র রণধ্বনি ছিল **শৃঙ্খলা**! ওয়ারশ যখন রুশ কবলে পড়ল তখন গিজো-র শিষ্য সেবাস্তিয়ানি রব তুলেছিলেন — **শৃঙ্খলা!** ফরাসী জাতীয় সভা ও প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের নৃশংস প্রতিধ্বনি তুলে কাভেনিয়াক-ও হাঁক পাড়ছেন — **শৃঙ্খলা!** শ্রমিকদের দেহ বিদীর্ণ করার সময়ে তাঁর গ্রেপ-শটের বজ্রনির্ঘোষেও শোনা গেল — **শৃঙ্খলা!** ১৭৮৯ সালের পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়াদের বহু বিপ্লবের কোনটিই **শৃঙ্খলার** উপরে আক্রমণ করে নি; কারণ তারা শ্রেণী-প্রভুত্ব চলতে দেয়, শ্রমিকদের দাসত্ব চলতে দেয়, বেঁচে থাকতে দেয় **বুর্জোয়া** শৃঙ্খলাকে — সেই প্রভুত্ব ও সেই দাসত্বের রাজনৈতিক ধাঁচ যতবারই বদলাক না কেন। এই শৃঙ্খলাকেই লঙ্ঘন করেছে জুন। হতভাগা জুন!' ('Neue Rheinische Zeitung', ২৯ জুন, ১৮৪৮।)*

হতভাগা জুন! প্রতিধ্বনি করেছে ইউরোপ।

বুর্জোয়ারা প্যারিসের প্রলেতারিয়েতকে জুনের অভ্যুত্থান ঘটাতে **বাধ্য করেছিল**। তার পতনের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। নিজেদের আশু ঘোষিত দাবিদাওয়ার তাড়নায় প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদের সংগ্রামে নামে নি; এর উপযুক্ত শক্তিও তাদের ছিল না। 'Moniteur' পত্রিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়েছিল যে, প্রলেতারিয়েতের মায়ার কাছে মাথা নুইয়ে তটস্থ হবার কাল প্রজাতন্ত্রের গত হয়েছে। শুধু পরাজয়েই প্রলেতারিয়েতের মনে এই সত্য সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাল যে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **ভিতরে** তাদের অবস্থার সামান্যতম উন্নতিও হচ্ছে **আকাশকুসুম**, এ আকাশকুসুম বাস্তব হয়ে ওঠার উপক্রম করলেই পরিণত হয় অপরাধে। রূপের দিক থেকে উচ্ছল কিন্তু সারবত্তার মাপকাঠিতে তুচ্ছ, এমন কি তখনো বুর্জোয়া গণ্ডিভুক্ত সব দাবিদাওয়ার জায়গায়, যে সব দাবিদাওয়ার মঞ্জুরি তারা চেয়েছিল ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে আদায় করতে, সেগুলির

---

* ক. মার্কস, 'জুনের বিপ্লব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জায়গায় এবার দেখা দিল বৈপ্লবিক সংগ্রামের নির্ভীক স্লোগান: **বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ! শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব!**

প্রলেতারিয়েতের তার কবরকে **বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের** জন্মস্থানে পরিণত ক'রে সেই প্রজাতন্ত্রকে বাধ্য করল অবিলম্বে আত্মপ্রকাশ করতে সেটার বিশুদ্ধ রূপে — পুঁজির কর্তৃত্ব ও শ্রমের দাসত্ব কায়েম রাখা, যার স্বীকৃত লক্ষ্য এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে। চোখের সামনে নিরন্তর ক্ষতচিহ্নিত, আপোসহীন, অপরাজেয় এক শত্রুর উপস্থিতির ফলে — অপরাজেয়, কেননা সেটার অস্তিত্ব বুর্জোয়ার আপন জীবনধারণেরই শর্ত — নিরঙ্কুশ বুর্জোয়া শাসন অবিলম্বে **বুর্জোয়া সন্ত্রাসে** পরিণত হতে বাধ্য ছিল। আসর থেকে সাময়িকভাবে প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকৃতিলাভের ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী স্তর — পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হতে হল প্রলেতারিয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বৈরবিরোধ হতে থাকল তীব্রতর। ঠিক যেমন আগে তাদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পেতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মাঝে, তেমনই এখন তারা সেটার সন্ধান পেল প্রলেতারিয়েতের পরাজয়ের মধ্যে।

জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যদি সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বুর্জোয়াদের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, জনসাধারণের বিপক্ষে তাদের সামন্ত রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মিলাতে প্রণোদিত করে থাকে, তবে সেই জোট বাঁধার প্রথম বলি হল কারা? ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা নিজেরাই। তাদের শাসন সংহত করা, এবং আধা-তুষ্ট আধা-ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সব থেকে নিচের ধাপে থামিয়ে রাখার ব্যাপারে বাদ সাধল জুনের পরাজয়।

সর্বশেষে জুনের পরাভব ইউরোপের স্বৈরাচারী শক্তিদের কাছে এই গুপ্ততথ্য উদ্ঘাটিত করে দিল যে, দেশে গৃহযুদ্ধ চালাতে হলে ফ্রান্সকে অন্য দেশের সঙ্গে যেকোন মূল্যে শান্তি রক্ষা করতেই হবে। কাজেই, যে সব জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেছিল তাদের সঁপে দেওয়া হল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিপুলতর শক্তির কাছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতীয় বিপ্লবগুলির ভাগ্যকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্যাধীন হতে হল; তাদের বাহ্য আত্মকর্তৃত্ব, মহান সমাজ-বিপ্লব থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য

খোয়া গেল। শ্রমিকের দাসত্ব যতদিন না ঘুচবে ততদিন না হাঙ্গেরিয়ান, না পোল্, না ইতালিয়ান, কেউই মুক্তি পাবে না!

শেষ পর্যন্ত পবিত্র মিতালীর জয়লাভের ফলে ইউরোপের চেহারা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে ফ্রান্সে প্রত্যেকটি নতুন প্রলেতারীয় অভ্যুত্থানকে সরাসরি এক **বিশ্বযুদ্ধের** সমকালীন হতে হবে। নতুন ফরাসী বিপ্লব বাধ্য হবে অবিলম্বে সেটার জাতীয় এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে **ইউরোপীয় ভূখণ্ড জয় করতে**। একমাত্র এইখানেই সমাধা হতে পারবে উনিশ শতকের সমাজ-বিপ্লব।

সুতরাং, শুধু জুনের পরাভবই এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে ফ্রান্স ইউরোপীয় বিপ্লব সাধনের **উদ্যোগ** গ্রহণ করতে পারে। শুধু **জুন বিদ্রোহীদের** রক্তে রঞ্জিত হয়েই তেরঙ্গা ঝাণ্ডা পরিণত হল ইউরোপীয় বিপ্লবের পতাকায় — **লাল ঝাণ্ডায়!**

আর আমরা বলি: **বিপ্লব মৃত! — দীর্ঘজীবী হোক বিপ্লব!**

২

১৩ জুন, ১৮৪৯

১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ফ্রান্সকে এনে দেয় **প্রজাতন্ত্র**, ২৫ জুনে তার উপরে চাপাল **বিপ্লব**। আর জুনের পর বিপ্লবের অর্থ হল: **বুর্জোয়া সমাজের উচ্ছেদ**, যেখানে ফেব্রুয়ারির আগে তার অর্থ ছিল: **রাষ্ট্রের আকৃতির উৎপাদন**।

জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিল বুর্জোয়াদের **প্রজাতান্ত্রিক** গোষ্ঠী; জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের ভাগে। অবরোধের অবস্থার দরুন কণ্ঠরুদ্ধ প্যারিস বিনা প্রতিরোধে পড়ে রইল তাদের পায়ের কাছে। আর প্রদেশগুলিতে চালু হল এক নৈতিক অবরোধের অবস্থা, বুর্জোয়াদের জয়ের আশঙ্কাজনক নৃশংস ঔদ্ধত্য ও কৃষকদের সম্পত্তিসংশ্লিষ্ট অবাধ উন্মাদনা। অতএব **নিচ থেকে** আশঙ্কা রইল না কোন বিপদের!

শ্রমিকদের বৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের**, অর্থাৎ **পেটি-বুর্জোয়া** অর্থে যারা প্রজাতন্ত্রী তাদের

রাজনৈতিক প্রভাব, এদের প্রতিনিধিত্ব করতেন নির্বাহী কমিশনে লেদ্রু-রলাঁ, জাতীয় সংবিধান-সভায় 'পর্বত' এবং সংবাদপত্র জগতে 'Reforme' পত্রিকা (৫৭)। ১৬ এপ্রিল (৫৮) বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে এরা প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, জুনের দিনগুলিতে তাদেরই সঙ্গে জুটে এরা লড়াই করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে। এইভাবে, এরা নিজেরাই সেই পটভূমিকা দীর্ণবিদীর্ণ করল যার উপরে এদের তরফটা দাঁড়িয়েছিল একটি শক্তি হিসেবে, কারণ বুর্জোয়াদের প্রতি পেটি বুর্জোয়ারা বৈপ্লবিক মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে ততক্ষণই, যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারিয়েত। এদের এখন তাড়ানো হল। অস্থায়ী সরকার ও নির্বাহী কমিশনের যুগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও মনে কিন্তু ভাব রেখে এদের সঙ্গে যে ভুয়া মৈত্রী রচিত হয়, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই তা চুরমার করে দিল। মিত্র হিসেবে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হয়ে এরা তেরঙ্গা-ঝাণ্ডাওয়ালাদের দালালের পর্যায়ে নেমে গেল। তাদের কাছ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধাই এরা আদায় করতে পারে নি, অথচ যেই প্রজাতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির হাতে সে আধিপত্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত বিপন্ন বলে মনে হয়েছে, তখনই সে আধিপত্য এদের সমর্থন করতে হয়েছে। শেষত, এই গোষ্ঠীগুলি, অর্থাৎ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট দল একেবারে গোড়ার থেকেই সংখ্যালঘু ছিল জাতীয় সংবিধান-সভায়। জুনের দিনগুলির আগে তারা শুধু বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার মুখোসের আড়ালেই কাজকর্ম করার ভরসা পেত; গোটা বুর্জোয়া ফ্রান্স ক্ষণিকের জন্য কাভেনিয়াককে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে অভিনন্দন জানাতে পেরেছিল জুন বিজয়ের ফলে; আর জুনের দিনগুলির অল্প কিছুকাল পরে যখন প্রজাতন্ত্রবিরোধী তরফ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে তখন সামরিক একনায়কত্ব ও প্যারিসের অবরোধের অবস্থায় সে তরফ শুধু খুবই সন্ত্রস্ত ও সতর্কভাবেই শুঁড় বাড়াতে পেরেছিল।

১৮৩০ সাল থেকে **বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক** গোষ্ঠীটি, তার লেখক, তার মুখপাত্র, তার প্রতিভাধর ও উচ্চাশাপোষ, তার প্রতিনিধি, সেনাপতি, ব্যাঙ্কার ও উকীলদের মারফত সবাই 'National' নামে এক প্যারিসীয় পত্রিকার চারিদিকে জড়ো হয়। এই পত্রিকার শাখা কাগজ চলত প্রদেশে প্রদেশে।

'National' -এর এই চক্রই ছিল **তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রের রাজবংশ**। সে চক্র তৎক্ষণাৎ দখল করে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্মানিত পদ — মন্ত্রিদপ্তরের আসন, পুলিস দপ্তর, ডাকঘরের পরিচালক আপিস, শাসনকর্তা ও যে সব সেনাবাহিনীর উচ্চতর অফিসারের পদ তখন খালি পড়েছিল। নির্বাহী ক্ষমতার শীর্ষে রইলেন সেটার জেনারেল **কাভেনিয়াক;** পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মারাস্ত স্থায়ী সভাপতি হলেন জাতীয় সংবিধান-সভার। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানকর্তা হিসেবে তিনি তাঁর অভ্যর্থনাকক্ষে শিষ্টাচার জানাতে লাগলেন সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের তরফে।

বিপ্লবী ফরাসী লেখকেরা পর্যন্ত যেন প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্যে অভিভূত হয়েই এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করেছেন যে, জাতীয় সংবিধান-সভায় আধিপত্য রাজতন্ত্রীদের। বরং তার বিপরীতে, জুনের দিনগুলির পরে জাতীয় সংবিধান-সভা **পুরোপুরি বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতারই প্রতিনিধি** হয়ে রইল এবং তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব সভার বাইরে যতই বিধ্বস্ত হতে থাকে ততই দৃঢ়ভাবে এই দিকটির উপরে জোর দিয়ে যায় সেই সভা। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের **রূপ** বজায় রাখাটাই যদি প্রশ্ন হত তাহলে সভার হাতে ছিল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের ভোট; কিন্তু যদি প্রশ্নটা হয় **মর্মবস্তু** বজায় রাখা নিয়ে, তাহলে কথাবার্তার ধরনে পর্যন্ত আর রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের থেকে সেটার কোন পার্থক্য রইল না, কেননা বুর্জোয়াদের স্বার্থ, তাদের শ্রেণীগত প্রভুত্ব ও শ্রেণীগত শোষণের বৈষয়িক অবস্থাই হচ্ছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মর্মবস্তু।

এইভাবে, রাজতান্ত্রিকতা নয়, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতাই এই সংবিধান-সভার জীবন ও কার্যকলাপের মধ্যে রূপ লাভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই সভা মরে নি, মারাও পড়ে নি, শুধু ক্ষয়ে যায়।

তার সমগ্র শাসনকাল জুড়ে, যতদিন রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে জমকালো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি চলে, ততদিন পিছনের দিকে সম্পন্ন হচ্ছিল এক অবিশ্রান্ত বলিদান পর্ব — সামরিক বিচারালয়ে ধৃত জুন বিদ্রোহীদের অবিরাম দন্ডদান অথবা বিনাবিচারে তাদের নির্বাসন। সংবিধান-সভার স্বীকার করতে বাধে নি যে, জুন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তারা অপরাধীদের বিচার নয়, শত্রুনিধনই করছিল।

জাতীয় সংবিধান-সভার প্রথম কাজ হল জুন মাস ও ১৫ মে-র ঘটনাবলি এবং সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পার্টির নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে এক **তদন্ত কমিশন** বসানো। এই তদন্তের সরাসরি লক্ষ্য হলেন লুই ব্লাঁ, লেদ্রু-রলাঁ ও কসিদিয়ের। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তাদের ঝাল ঝাড়ার পক্ষে রাজবংশপন্থী বিরোধীদলের প্রাক্তন নেতা, উদারনীতির প্রতিমূর্তি, অন্তঃসারশূন্য গাম্ভীর্যের প্রতীক, শ্রীযুক্ত **অদিলোঁ বারোর** চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি তাদের আর জুটত না। এই নিতান্ত ফাঁপা লোকটির রাজবংশের হয়ে প্রতিহিংসা সাধনই শুধু নয়, নিজের প্রধানমন্ত্রিত্ব বানচাল করার জন্যও বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা ফয়সালা করার কথা। তাঁর নির্মমতার এ এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেই বারো তাই তদন্ত কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি খাড়া করলেন এক পুরোদস্তুর আইনমাফিক মামলা, যাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে: ১৭ মার্চ — **মিছিল;** ১৬ এপ্রিল — **ষড়যন্ত্র;** ১৫ মে — **হামলা;** ২৩ জুন — **গৃহযুদ্ধ!** তিনি তাঁর বিদগ্ধ অপরাধবিজ্ঞানীর গবেষণাজাল একেবারে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানলেন না কেন? 'Journal des Débats' (৫৯) জবাব দিল: ২৪ ফেব্রুয়ারি, সে তো হল **রোম প্রতিষ্ঠার** দিন। রাষ্ট্রের উদ্ভব বৃত্তান্ত পুরা-কাহিনীতে চাপা, যা বিশ্বাস্য, কিন্তু আলোচ্য নয়। লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরকে আদালতের হাতে সঁপে দেওয়া হল। জাতীয় সভা ১৫ মে যে আত্মশোধন শুরু করেছিল তার ঘটল সমাপ্তি।

বন্ধকী কর হিসেবে পুঁজির উপরে কর বসানোর যে পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকার ফেঁদেছিল এবং গুদশো যার পুনরায়োজন করেছিলেন, সেটাকে নাকচ করল সংবিধান-সভা; যে আইন শ্রম-সময়কে দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করেছিল তা বাতিল হয়ে গেল; ঋণের জন্য পুনঃপ্রবর্তিত হল কারাদণ্ড; ফরাসী জনসাধারণের যে বিপুল অংশ লিখতে-পড়তে পারে না তাদের বাদ দেওয়া হল জুরির কাজ থেকে। ভোটাধিকার থেকেই বা নয় কেন? পত্রিকাগুলিকে আবার জামানত রাখতে হল; সীমাবদ্ধ হল সংগঠনের অধিকার।

পুরাতন বুর্জোয়া সম্পর্কাদিতে আগের নিশ্চিতি এনে দেওয়া ও

বৈপ্লবিক তরঙ্গের রেখে-যাওয়া প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলার তাড়াহুড়োয় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা কিন্তু এমন এক প্রতিরোধ পেল যা তাদের এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন করল।

সম্পত্তি রক্ষা ও ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জুনের দিনগুলিতে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়াদের মতন কেউই অত মরিয়া হয়ে লড়ে নি — কাফে ও রেস্তোরাঁর মালিক, marchands de vins,* ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানী, ক্ষুদে কারিগর প্রভৃতি। রাস্তাঘাট থেকে দোকান অবধি গমনাগমন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দোকানীরা সেদিন জড়তা ঝেড়ে ফেলে ব্যারিকেডের বিপক্ষে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু ব্যারিকেডের পিছনে ছিল খরিদ্দার ও দেনাদার; তার সামনে ছিল দোকানের পাওনাদারেরা। তাই ব্যারিকেড যখন ধুলোয় মিশল, পর্যুদস্ত হল শ্রমিকেরা, আর বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত দোকানীরা ফিরে গেল তাদের নিজ নিজ দোকানে, তখন তারা দেখল যে, তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে এক সম্পত্তিরক্ষক, ক্রেডিট ব্যবস্থারই এক সরকারী প্রতিনিধি, যে তাদের উপরে জারি করল নানা হুঁশিয়ারী নোটিস: মেয়াদ পেরনো প্রমিসরি নোট বাবদ পাওনা! বাড়িভাড়া বাবদ পাওনা! বণ্ড বাবদ পাওনা! দোকানের সর্বনাশ! দোকানীর সর্বনাশ!

সম্পত্তিরক্ষা! তবে যে বাড়িতে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পত্তি নয়; যে দোকান তারা চালায় সেটাও তাদের সম্পত্তি নয়; যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পত্তি নয়। তাদের ব্যবসাপত্র, তাদের খাবার থালাটা, তাদের শোবার বিছানাটারও আর তারা মালিক নয়। তাদের হাত থেকেই **এই সম্পত্তিকে রক্ষা করতে হবে** — যে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, যে ব্যাঙ্কার প্রমিসরি নোট গ্রহণ করেছে, যে পুঁজিপতি নগদ টাকা আগাম দিয়েছে, যে কারখানা-মালিক তার পণ্য বিক্রয়ের ভার দিয়েছে খুচরো বিক্রেতাদের, যে পাইকারী ব্যবসায়ী এইসব কারিগরদের কাঁচামাল যুগিয়েছে তাদের জন্য। **ক্রেডিটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা**! ক্রেডিট কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েই এক পরাক্রান্ত ও জেদী দেবতা রূপে নিজেকে জাহির করল, দেনদার টাকা শুধতে না পারলে সে তাকে স্ত্রী-পুত্রসমেত ঘরছাড়া করল, তার ভুয়া সম্পত্তি

* মদ বিক্রেতা। — সম্পাঃ

সঁপে দিল পুঁজির হাতে, আর লোকটাকে ঠেলে দিল দেনদারদের জেলখানায় — জুন বিদ্রোহীদের শবের উপরে আবার যে জেলখানা মাথা তুলেছিল বিভীষিকার মতো।

সভয়ে পেটি বুর্জোয়া লক্ষ্য করল যে, শ্রমিকদের খতম করে তারা বিনা প্রতিরোধে নিজেদের তুলে দিয়েছে পাওনাদারদের হাতে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাদের যে দেউলিয়াপনা একটানা চলছিল ও বাহ্যত উপেক্ষিত হচ্ছিল, জুনের পর তা ঘোষিত হল প্রকাশ্যেই।

সম্পত্তির নামে যতক্ষণ এদের রণক্ষেত্রে চালিত করার প্রয়োজন ছিল ততদিন তাদের **নামমাত্র সম্পত্তিতে** হাত দেওয়া হয় নি। এখন যখন প্রলেতারিয়েত নিয়ে গুরুতর ব্যাপারটারই সুরাহা হয়ে গেল, তখন পরের পালায় দোকানদারী সংক্রান্ত **ক্ষুদে সমস্যার সমাধান** হতে বাধা থাকল না। প্যারিসে তমসুকী কাগজের বকেয়া পাওনা দাঁড়িয়েছিল ২,১০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের বেশি, প্রদেশগুলিতে তার পরিমাণ ১,১০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের বেশি। প্যারিসে ৭,০০০-এর বেশি ফার্ম-মালিক ফেব্রুয়ারির পর থেকে ঘরভাড়া দেয় নি।

জাতীয় সভা ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে শুরু করে **রাজনৈতিক অপরাধ** সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল, পেটি বুর্জোয়ারা সেখানে তাদের দিক থেকে এখন দাবি তুলল ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত **দেওয়ানী ঋণের** ব্যাপারে তদন্তের জন্য। দলে দলে তারা ফাটকাবাজার হল্-এ জড় হল। বিপ্লবজনিত অচলাবস্থার দরুনই শুধু সর্বস্বান্ত হয়েছে ও ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যবস্থা ভালোই চলেছিল এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীর তরফ থেকে ভয় দেখিয়ে তারা দাবি করল যে, একটা বাণিজ্য আদালতের আদেশ জারী করে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে হবে, এবং পরিমিত অনুপাত পরিশোধ করতে পারলেই আবশ্যিকভাবে পাওনাদারের দাবিদাওয়া চুকে যাবে। বিধানিক প্রস্তাবরূপে এই প্রশ্ন জাতীয় সভায় আলোচিত হল concordats à l'amiable* হিসেবে। সভা ইতস্তত করতে লাগল। হঠাৎ জানা গেল যে, এই সময়েই বিদ্রোহীদের হাজার হাজার স্ত্রী-পুত্র পোর্ট সাঁ দেনি-তে মার্জনা প্রার্থনার এক দরখাস্ত তৈরি করেছে।

* আপোসে মিটমাট। — সম্পাঃ

জুনের পুনরুজ্জীবিত বিভীষিকার সামনে কেঁপে উঠল পেটি বুর্জোয়ারা এবং জাতীয় সভা ফিরে পেল তার অনমনীয় মনোভাব। দেনাদার-পাওনাদারের মধ্যে আপোসে মিটমাট প্রস্তাবের সব থেকে জরুরী অংশগুলিই নাকচ হয়ে গেল।

এইভাবে, জাতীয় সভার ভিতরে পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক প্রতিহত হওয়ার অনেক পরে এই আইনসভাগত বিচ্ছেদটি তার বুর্জোয়া, তার প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য লাভ করল দেনদাররূপী পেটি বুর্জোয়াকে পাওনাদাররূপী বুর্জোয়ার হাতে সঁপে দিয়ে। প্রথমোক্তদের বিপুল এক অংশ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, আর বাকিদের ব্যবস্থা চালাতে দেওয়া হল এমন শর্তে যার ফলে তারা হয়ে দাঁড়াল পুঁজির ষোলো আনা গোলাম। ১৮৪৮ সালের ২২ আগস্ট জাতীয় সভা আপোসে মিটমাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অবরোধের অবস্থার মধ্যেই প্যারিসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন প্রিন্স লুই বোনাপার্ট ও ভাঁসেন-এর বন্দী কমিউনিস্ট রাস্পাই। বুর্জোয়ারা অবশ্য নির্বাচিত করল সুদখোর, টাকার কারবারী ও অর্লিয়ান্সী ফুল্দ্-কে। সবদিক থেকেই তাই একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা ধ্বনিত হল জাতীয় সংবিধান-সভার বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, কাভেনিয়াকের বিরুদ্ধে।

প্যারিসের পেটি বুর্জোয়াদের ভিতরে ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থার ফলাফল যে সে অবস্থার যারা অব্যবহিত শিকার তাদের গণ্ডি বহুদূর ছাড়িয়ে যেতই, আর জুন বিদ্রোহের ব্যয়ভারে সরকারী ঘাটতি যখন আবার নতুন করে ফেঁপে উঠেছিল অথচ ব্যাহত উৎপাদন, সংকুচিত পরিভোগ ও পড়তি আমদানির দরুন রাজস্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল ঠিক তখন যে তা বুর্জোয়া বাণিজ্যকে আর একবার তোলপাড় করতই, একথা বোঝাবার জন্য কোন যুক্তি অবতারণার প্রয়োজন নেই। নতুন এক ঋণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভার আর কোন গতি রইল না, সে ঋণ তাঁদের বাধ্য করল আরো বেশি মাত্রায় ফিনান্স অভিজাতবর্গের খপ্পরে গিয়ে পড়তে।

জুন বিজয়ের ফলস্বরূপ যখন পেটি বুর্জোয়াদের কপালে জুটেছিল দেউলিয়াপনা ও কারবার গোটানোর আদালতী ডিক্রি, কাভেনিয়াকের জ্যোনিসেরি (৬০), **সচল রক্ষিদল** তখন পুরস্কার লাভ করছিল বারবিলাসিনীদের কোমল বাহুপাশে, আর 'সমাজের নবীন পরিত্রাতা' হিসেবে তারা সবরকম সমাদরই পাচ্ছিল তেরঙ্গা ঝাণ্ডার নাইট (gentilhomme) মারাস্ত-এর অভ্যর্থনা কক্ষে, যিনি সেই সঙ্গেই মহিমময় প্রজাতন্ত্রের বদান্য পৃষ্ঠপোষক ও চারণ। ইতিমধ্যে এই ধরনের সামাজিক পক্ষপাতিত্ব এবং সচল রক্ষিদলের বেমানান মাত্রার উচ্চ বেতন ক্ষুব্ধ করে তুলল **সেনাবাহিনীকে,** আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতা তার পত্রিকা 'National'-এর মারফত যে জাতীয়তার মোহজাল বিস্তার ক'রে লুই ফিলিপ আমলের সেনাবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর এক অংশের আনুগত্য জয় করেছিল, সে সমস্তই দূর হয়ে যায়। **উত্তর ইতালিতে** কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভা সালিশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইংলন্ডের সঙ্গে জুটে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে অঞ্চল অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, ফলে তার একদিনের রাজত্বেই নষ্ট হয়ে গেল 'National'-এর আঠারো বছরের প্রতিপক্ষ ভূমিকা। 'National'-এর সরকারের চেয়ে কম জাতীয় ভাবাপন্ন সরকার দেখা যায় না; তার চেয়ে ইংলন্ডের উপরে বেশি নির্ভরশীল সরকার আর কখনও হয় নি, যদিও লুই ফিলিপের আমলে এই 'National'-ই প্রতিদিন কেটোর বচন — Carthaginem esse delendam,* এই মন্ত্রের নতুন ভাষ্য আবৃত্তি করে টিকে ছিল। এই সরকারের চেয়ে পবিত্র মিতালীর বেশি পদলেহী কেউ ছিল না, যদিও গিজোর 'National'-এর দাবি ছিল ভিয়েনা চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে। ইতিহাসের পরিহাসে 'National'-এর বৈদেশিক বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক বাস্তিদ হয়ে দাঁড়ালেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, যাতে তিনি তাঁর প্রতিটি নির্দেশপত্রে নিজেরই প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে খণ্ডন করতে পারেন।

ক্ষণিকের জন্য সৈন্যবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধ ও গৌরবও বুঝি

* কার্থেজ ধ্বংস করতে হবেই। — সম্পাঃ

এবার ফ্রান্সে রেওয়াজ হয়ে উঠল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের উপরে তলোয়ারের একনায়কত্ব ছিলেন না কাভেনিয়াক; তিনি ছিলেন তলোয়ারের সাহায্যে বুর্জোয়া একনায়কত্ব। সৈনিক বলতে তারা এখন চাইল কেবল সশস্ত্র পুলিস। সাবেকী প্রজাতান্ত্রিক আনুগত্যের গুরুগম্ভীর চেহারার আড়ালে কাভেনিয়াক গোপন রেখেছিলেন বুর্জোয়া পদাধিকারের অপমানজনক শর্তের কাছে নিছক বশ্যতা। L'argent n'a pas de maître! অর্থের কোন উপরিওয়ালা নেই! তিনি ও সাধারণভাবে সংবিধান-সভা সমাজের তৃতীয় মন্ডলীর (tiers état) সেই পুরনো নির্বাচনী বুলিটিকে আদর্শায়িত করেন এই রাজনৈতিক উক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে: বুর্জোয়াদের কোন রাজা নেই; তাদের শাসনের প্রকৃত রূপ হল প্রজাতন্ত্র।

আর জাতীয় সংবিধান-সভার 'বিরাট মৌলিক কাজ' হল এই **রূপেরই** পরিস্ফুটন, প্রজাতান্ত্রিক **সংবিধান** রচনা। এই সংবিধান বুর্জোয়া সমাজে যে পরিবর্তন ঘটাল বা ঘটাবে মনে করা হল, আবহাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি তারতম্য ঘটায় নি খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকা হিসেবে, সাধু বার্থলমিউ-এর সাধু রবেস্‌পিয়েরর হিসেবে নতুন নামকরণ। **সাজবদলের** গন্ডির বাইরে এই সংবিধান যা গেছে তাতে শুধু চালু ঘটনাটাকেই বিধিবদ্ধ করা হয়। এইভাবেই, সংবিধান গম্ভীরভাবে লিপিবদ্ধ করল প্রজাতন্ত্রের ঘটনা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ঘটনা, এবং দুইটি সীমাবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক কক্ষের বদলে একটি সার্বভৌম জাতীয় সভার ঘটনা। এইভাবেই, স্থাণু দায়িত্বহীন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের জায়গায় চলিষ্ণু দায়ী নির্বাচিত রাজতন্ত্র, অর্থাৎ একটা চতুর্বার্ষিক রাষ্ট্রপতিত্বের ব্যবস্থা দিয়ে সংবিধান বিধিবদ্ধ ও নিয়মিত করল কাভেনিয়াকের একনায়কত্বের ঘটনাকে। এইভাবেই, ১৫ মে ও ২৫ জুনের বিভীষিকার পর জাতীয় সভা নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে তার সভাপতিকে রক্ষাকবচ হিসেবে যে অসামান্য ক্ষমতায় ভূষিত করেছিল, সেই ঘটনাকেও সংবিধান একেবারে মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলতে ছাড়ল না। সংবিধানের বাকি অংশ হল পরিভাষার খেলা। পুরনো রাজতন্ত্রের ঠাট থেকে রাজতান্ত্রিক নামচিহ্ন ছিঁড়ে ফেলে সেখানে এঁটে দেওয়া হল প্রজাতান্ত্রিক লেবেল। 'National'-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, বর্তমানে সংবিধানের প্রধান সম্পাদক মারাস্ত এই পন্ডিতী কাজে প্রতিভার পরিচয়ই দিলেন।

সংবিধান-সভা ছিল চিলি দেশের সেই কর্মচারীটির জুড়ি, যিনি এক জরিপের ব্যবস্থা করে ভূসম্পত্তির সম্পর্কাদি আরো দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল সেই মুহূর্তে যখন ভূগর্ভের গুরুগুরু গর্জন ইতিমধ্যেই এমন অগ্ন্যুৎপাতের ঘোষণা জানিয়েছে যা তোলপাড় করে দেবে তাঁর পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত। বুর্জোয়া শাসন যে রূপের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক পরিভাষা পরিগ্রহ করে তাকে সংবিধান-সভা তত্ত্বের দিক থেকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করলেও, আসলে সে শাসন বজায় রইল শুধু সমস্ত সূত্রের বিলোপ ঘটিয়ে, নিছক জবরদস্তি করে, **অবরোধের অবস্থা** চালিয়ে। সংবিধানের কাজে হাত দেবার দু-দিন আগে সভা অবরোধের অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়েছে বিপ্লবের সামাজিক প্রক্রিয়া স্থিতিলাভ করা মাত্র; সদ্যগঠিত শ্রেণী-সম্পর্কাদি প্রতিষ্ঠা পাওয়া মাত্র এবং শাসক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী অংশগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই চালান যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অবসন্ন জনসাধারণকে দূরে রাখা চলে এমন এক আপোস-নিষ্পত্তিতে পেঁাছন মাত্র। এই সংবিধান কিন্তু কোন সমাজ-বিপ্লবকে মঞ্জুর করল না; মঞ্জুর করল বিপ্লবের উপরে পুরনো সমাজের সাময়িক জয়লাভটাই।

জুনের দিনগুলির আগে রচিত সংবিধানের পয়লা খসড়ায় (৬১) তখনও পর্যন্ত ছিল 'droit au travail', কাজের অধিকারের কথা, প্রাথমিক যে আনাড়ি সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক দাবি। সেটাকে এখন রূপান্তরিত করা হল 'droit à l'assistance'-এ, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারে, অথচ কোন না কোন উপায়ে সর্বস্বান্তদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে না কোন্ আধুনিক রাষ্ট্র? বুর্জোয়া অর্থে কাজের অধিকার হচ্ছে একটা অবাস্তবতা, শোচনীয় এক সদিচ্ছামাত্র। কিন্তু কাজের অধিকারের পিছনে থাকে পুঁজির উপরে আধিপত্য; পুঁজির উপরে আধিপত্যের পিছনে থাকে উৎপাদনের উপকরণগুলি দখল করে সেগুলিকে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর সেই হেতু মজুরি-শ্রমের অবসান, পুঁজির অবসান, দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান। **'কাজের অধিকারে'র** পিছনে ছিল জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে সংবিধান-সভা বস্তুত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে hors la loi, বেআইনী

করে তুলেছিল সেটাকে নীতি গত-ভাবেই **প্রলেতারীয়** সূত্রটাকে বিধানের বিধান, সংবিধান থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হল, অভিসম্পাত বর্ষাতে হল 'কাজের অধিকারের' উপরে। কিন্তু সেখানেও তার ক্ষান্তি হল না। প্লেটো যেমন তাঁর প্রজাতন্ত্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন তেমনই সভা প্রজাতন্ত্র থেকে চিরতরে নির্বাসন দিল **ক্রমবর্ধিষ্ণু করকে**। অথচ ক্রমবর্ধিষ্ণু কর একটা বুর্জোয়া ব্যবস্থা যা কমবেশি মাত্রায় চালু উৎপাদন-সম্পর্কের আওতাতেই কার্যকরী করা যায়, শুধু তাই নয়; এটি ছিল বুর্জোয়া সমাজের মধ্য স্তরকে 'শিষ্ট' প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রাখার, সরকারী ঋণহ্রাসের, বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রজাতন্ত্রবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠকে সামলে রাখার একমাত্র হাতিয়ার।

আপোসে মিটমাটের ব্যাপারে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আসলে বড় বুর্জোয়াদের খাতিরে পেটি বুর্জোয়াদের বলি দিয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে তারা নীতির পর্যায়ে উন্নীত করল ক্রমবর্ধিষ্ণু কর বেআইনী করে দিয়ে। বুর্জোয়া সংস্কারটাকে তারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমপর্যায়ভুক্ত করল। কিন্তু এর পরে কোন্ শ্রেণী থাকল তাদের প্রজাতন্ত্রের মূল খুঁটি হিসেবে? বড় বুর্জোয়ারাই। এদের অধিকাংশই কিন্তু ছিল প্রজাতন্ত্রবিরোধী। অর্থনৈতিক জীবনের পুরনো সম্পর্ক পুনঃসংহত করার জন্য 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে এরা অন্যদিকে পুনঃসংহত সমাজ-সম্পর্ককে আশ্রয় করে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রিক কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই ভাবছিল। ইতিমধ্যে, অক্টোবরের গোড়াতেই কাভেনিয়াক তাঁর আপন পার্টির নির্বোধ নীতিবাগীশদের চেঁচামেচি, ধমকাধমকি সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছিলেন লুই ফিলিপের প্রাক্তন মন্ত্রী দ্যুফোর ও ভিভিয়ে-কে প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী হিসেবে বরণ করতে।

তেরঙ্গা সংবিধান পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে যেকোন আপোসরফা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নতুন ধরনের সরকারের প্রতি সমাজের কোন নতুন অংশেরই আনুগত্য জয় করতে পারল না। অথচ সংবিধান এমন এক সংস্থার হাতে তার সনাতনী অলঙ্ঘনীয়তা ফিরিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠল, যা ছিল সাবেকী রাষ্ট্রের সব থেকে একরোখা ও উগ্র সমর্থক। অস্থায়ী সরকার **বিচারকদের অনপসারণীয়তা** সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল, সংবিধান কিন্তু তাকেই

মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলল। এক রাজাকে সেটা অপসারণ করেছিল, আর আইনের অনপসারণীয় এই অভিশংসকদের মূর্তিতে সে উঠে দাঁড়াল গণ্ডায় গণ্ডায়।

শ্রীযুক্ত মারাস্তের সংবিধানের অসঙ্গতি ফরাসী সংবাদপত্রগুলি নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করেছে, যেমন জাতীয় সভা ও রাষ্ট্রপতি এই দুই সার্বভৌম কর্তৃত্বের সহাবস্থান প্রভৃতি।

অবশ্য এই সংবিধানের প্রধানতম স্ববিরোধ হল এইখানে: প্রলেতারিয়েত, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, এই যে শ্রেণীগুলির সামাজিক দাসত্ব সংবিধানে কায়েম রাখার কথা, সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফত সংবিধান তাদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী করল। আর যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাবেকী সামাজিক শক্তি এতে মঞ্জুর করা হয়েছে তার কাছ থেকে সে ক্ষমতার রাজনৈতিক নিশ্চিতি সংবিধান প্রত্যাহার করল। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক শাসনকে তা বাধ্য করল গণতান্ত্রিক শর্তে, যা প্রতিমুহূর্তে বিরুদ্ধ শ্রেণীগুলিকে সহায়তা করবে জয়লাভে এবং বুর্জোয়া সমাজের মূল পর্যন্ত বিপন্ন করে দেবে। একপক্ষের কাছে সংবিধান দাবি জানাল যে তারা যেন রাজনৈতিক থেকে সামাজিক মুক্তির দিকে না এগোয়; অন্যপক্ষের কাছে তার দাবি তারা যেন সামাজিক থেকে রাজনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে না পিছোয়।

এসব স্ববিরোধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের উদ্বেগ ঘটাল যৎসামান্যই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে পুরনো সমাজের শুধু মাতব্বর হিসেবেই তারা অপরিহার্য ছিল, তাদের এ **অপরিহার্যতা** যে পরিমাণে ফুরিয়ে গেল সেই পরিমাণেই জয়লাভের কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের অবস্থা একটা **তরফ** থেকে নেমে এল **গোষ্ঠীর** স্তরে। সংবিধানটাকে তারা প্রকাণ্ড একটা **কারসাজি** হিসেবে দেখল। এর ভিতর দিয়ে বিধিবদ্ধ করতে হবে সর্বোপরি এই গোষ্ঠীর শাসনকেই। রাষ্ট্রপতি হবেন প্রলম্বিত কাভেনিয়াক; বিধান-সভা হবে প্রলম্বিত সংবিধান-সভা। তারা আশা করেছিল জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তারা পর্যবসিত করবে ক্ষমতার আভাসে এবং সেই ভুয়ো ক্ষমতাটাকে নিয়েই এমনভাবে খেলাবে যাতে অধিকাংশ বুর্জোয়াদের উপরে অবিশ্রাম ঝুলে থাকে জুনের দিনগুলির দোটানার খাঁড়া: *'National'*-এর রাজত্ব না নৈরাজ্যের আমল।

সংবিধান রচনার কাজ ৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হল ২৩ অক্টোবর। ২ সেপ্টেম্বর সংবিধান-সভা স্থির করেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানের পরিপূরক মৌলিক আইনগুলি বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ সেটা ভেঙে যাবে না। তবু সেটা স্থির করল যে সেটার অতি স্বকীয় সৃষ্টি রাষ্ট্রপতি-পদে প্রাণসঞ্চার করতে হবে ১০ ডিসেম্বর তারিখেই, সেটার আপন ক্রিয়াকলাপ শেষ হবার অনেক আগেই। সভা ভারি নিশ্চিন্ত ছিল যে সংবিধানের হমুন্কুলাস-এর মধ্যেই সে মায়ের ছেলেকে অভিনন্দন জানাতে পারবে। সতর্কতার জন্য ব্যবস্থা রইল যে, যদি কোন প্রার্থীই বিশ লক্ষ ভোট না পান তাহলে নির্বাচন জাতির হাত থেকে সংবিধান-সভার হাতে চলে আসবে।

ব্যর্থ সতর্কতা! সংবিধান কার্যকর করার প্রথম দিনটিই হল সংবিধান-সভার শাসনের শেষ দিন। ভোটবাক্সের অতলেই ছিল তার মৃত্যুদণ্ড। সে চেয়েছিল 'মায়ের ছেলেকে' আর পেল 'খুড়োর ভাইপোকে'। সল কাভেনিয়াক পেলেন দশ লক্ষ ভোট কিন্তু ডেভিড নেপোলিয়ন পেলেন ষাট লক্ষ। ছয় গুণ হার হল সল্ কাভেনিয়াকের (৬২)।

১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর হল **কৃষক অভ্যুত্থানের** দিন। কেবল এই তারিখ থেকেই শুরু হল ফরাসী কৃষকদের ফেব্রুয়ারি। বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদের প্রবেশ সূচিত করল যে প্রতীক — সেই স্থূল ধূর্ত, পাষণ্ড-বাতুল, মূঢ়মহীয়ান, এক সুচিন্তিত কুসংস্কার, এক করুণ প্রহসন, সুচতুর নির্বোধ এক কালব্যতিক্রম, এক বিশ্ব ঐতিহাসিক ভাঁড়ামি, এবং সভ্যমানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য পাঠোদ্ধারের অতীত এক সাংকেতিক লিপি -- সেই প্রতীকের চেহারায় সংশয়াতীত ছাপ ছিল সেই শ্রেণীর, সভ্যতার অভ্যন্তরে যে শ্রেণী বর্বরতার প্রতিনিধি। প্রজাতন্ত্র এই শ্রেণীর কাছে আত্মজ্ঞাপন করেছিল **কর সংগ্রাহক** পাঠিয়ে: প্রজাতন্ত্রের কাছে এ শ্রেণী নিজের জানান দিল **সম্রাট** মারফত। নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৭৮৯ সালে নবোদ্ভূত কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্পনার সর্বাঙ্গীণ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রজাতন্ত্রের প্রচ্ছদপত্রে তাঁরই নাম লিখে এ শ্রেণী বিদেশে যুদ্ধ ও স্বদেশে নিজ শ্রেণী স্বার্থ সবলে সিদ্ধির সংকল্প ঘোষণা করল। কৃষকদের কাছে নেপোলিয়ন কোন ব্যক্তি নন, তিনি হলেন এক কর্মসূচি। ঝাণ্ডা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে ও তূর্য নিনাদ করতে করতে তারা ভোটকেন্দ্রের দিকে অভিযান করল এই

জিগির তুলে: 'Plus d'impôts, à bas les riches, à bas la république, vive l'Empereur!'– 'আর কর নয়, বড় লোকেরা নিপাত যাক, নিপাত যাক প্রজাতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোন সম্রাট!' সম্রাটের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল কৃষক সংগ্রাম। যে প্রজাতন্ত্রকে তারা ভোট দিয়ে হটাল সে ছিল **বড়লোকদের প্রজাতন্ত্র।**

১০ ডিসেম্বর হল **কৃষকদের** কূদেতা, তার ফলে উচ্ছেদ হল চাল্ সরকার। আর যখন তারা ফ্রান্সে এক সরকার সরিয়ে আর এক সরকারকে বসাল, সেই দিন থেকেই তাদের অবিচল দৃষ্টি রইল প্যারিসের উপরে। ক্ষণিকের তরে বৈপ্লবিক নাটকের সক্রিয় নায়ক হওয়ামাত্র তাদের আর কোরাস দলের নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য ভূমিকায় ঠেলে রাখা অসম্ভব।

অন্য শ্রেণীরাও সহায়তা করেছিল কৃষকদের নির্বাচনী জয়লাভ সম্পূর্ণ করতে। **প্রলেতারিয়েতের** কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান-সভার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিকতার অপসারণ, জুন বিপ্লবের খন্ডন। **পেটি বুর্জোয়ার** কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের আধিপত্য। **বড় বুর্জোয়াদের** অধিকাংশের কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের তাৎপর্য হল, সাময়িকভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে হয়েছে অথচ যাদের সাময়িক অবস্থিতিকে এক সাংবিধানিক সংহতি দিতে চাওয়া মাত্রই যে গোষ্ঠী তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল তারই সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ। এই অধিকাংশের কাছে কাভেনিয়াকের বদলে নেপোলিয়নের অর্থ প্রজাতন্ত্রের স্থানে রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, অর্লিয়াপন্সের প্রতি সলজ্জ এক ইঙ্গিত, ভায়োলেট ফুলের আড়ালে প্রচ্ছন্ন লিলি ফুল (৬৩)। সর্বশেষে, **সৈন্যবাহিনী** নেপোলিয়নকে ভোট দিল সচল রক্ষিদলের বিরুদ্ধে, শান্তি কাবোর বিরুদ্ধে, যুদ্ধের সপক্ষে।

'Neue Rheinische Zeitung' যা বলেছিল, এইভাবে দাঁড়াল যে, ফ্রান্সের সব থেকে সরলমতি লোকটাই সব থেকে বিচিত্র তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠল। সে কিছুই নয় বলেই নিজের ছাড়া সবকিছুরই দ্যোতক হতে পারে সে। ইতিমধ্যে, নেপোলিয়নের নামের ব্যঞ্জনা বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিচিত্র ধরনের হলেও এই নাম নিয়েই সবাই তার ভোটের উপরে লিখল: 'National'-এর পার্টি নিপাত যাক, কাভেনিয়াক নিপাত যাক, সংবিধান-সভা নিপাত যাক,

নিপাত যাক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।' মন্ত্রী দ্যুফোর সংবিধান-সভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন: '১০ ডিসেম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় ২৪ ফেব্রুয়ারি।'

প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা en bloc* নেপোলিয়নকে **ভোট দিয়েছিল** কাভেনিয়াকের **বিরুদ্ধে** ভোট দেবার জন্য এবং তাদের ভোট একত্র করে সংবিধান-সভার কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। দুই শ্রেণীরই অগ্রণী অংশেরা অবশ্য তাদের নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সমস্ত তরফের **সাধারণ নাম** ছিল নেপোলিয়ন; আর **লেদ্রু-রলাঁ** ও **রাস্পাই** হল **ব্যক্তিবাচক নাম**, প্রথম জন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার, শেষোক্ত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের। প্রলেতারিয়ানরা ও তাদের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্ররা সোচ্চার ঘোষণা করেছিল, রাস্পাই-এর পক্ষের ভোট হল শুধু প্রদর্শন, যেকোন রাষ্ট্রপতিত্বের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংবিধানেরই বিরুদ্ধে অতগুলি প্রতিবাদ. এতগুলি ভোট লেদ্রু-রলাঁর বিরুদ্ধে — এই হল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক তরফ হিসেবে প্রলেতারিয়েতের প্রথম কাজ, যার দ্বারা তারা গণতান্ত্রিক তরফ থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করল। অন্যদিকে ওই পার্টিটা, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার সংসদীয় প্রতিনিধি, 'পর্বত' দল, লেদ্রু-রলাঁর প্রার্থিত্বের উপরে সমস্ত গুরুত্বই আরোপ করেছিল, যেভাবে গাম্ভীর্য সহকারে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে সেটা অভ্যস্ত। তাছাড়া প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে নিজেকে এক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে খাড়া করার এই তার শেষ চেষ্টা। শুধু প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া তরফ নয়, গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তার 'পর্বত' দলও পরাস্ত হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর।

ফ্রান্সের এখন জুটল একটা **'পর্বতের'** পাশাপাশি এক **নেপোলিয়ন**, এতে প্রমাণিত হল যে, যে বিরাট বাস্তবতার নাম তারা বহন করছিল, এই উভয়ে সেটার নিষ্প্রাণ ব্যঙ্গচিত্রমাত্র। সম্রাটের টুপি ও ঈগল পাখির প্রতীক সমেত লুই নেপোলিয়ন যেমন সাবেকী নেপোলিয়নের একটা করুণ প্যারোডি, এই 'পর্বত' দলও তেমনি ১৭৯৩-এর বুলি ধার করে বাগাড়ম্বরী ঢঙে পুরনো 'পর্বতের' কম করুণ প্যারোডি নয়। এইভাবে, ঐতিহ্যগত ১৭৯৩ সালের সংস্কারও ছিন্ন হল ঐতিহ্যমণ্ডিত নেপোলিয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই।

* দল বেঁধে। — সম্পাঃ

বিপ্লব তার **স্বকীয়**, তার **মূলগত** নাম অর্জন করেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, আর এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু তখনই যখন আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রম-শিল্পের প্রলেতারিয়েত পুরোভাগে প্রবলরূপে এসে দাঁড়ায়। বলা যেতে পারে ১০ ডিসেম্বর 'পর্বতের' হতচকিত ও বিভ্রান্ত করে দিল আর কিছু না হলেও অন্তত এই কারণেই যে, ঐ দিনটি সহাস্যে একটা বাঁকা চাষাড়ে রসিকতা করে পুরনো বিপ্লব নিয়ে চিরায়ত তুলনা থামিয়ে দেয়।

কাভেনিয়াক ২০ ডিসেম্বর তাঁর দপ্তর ছাড়লেন এবং সংবিধান-সভা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করল লুই নেপোলিয়নকে। সভা তার একচ্ছত্র রাজত্বের শেষদিন ১৯ ডিসেম্বর জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ২৭ জুনের যে ডিক্রি অনুসারে বিচার বিভাগীয় দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই পরিষদ ১৫,০০০ বিদ্রোহীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, সে ডিক্রি প্রত্যাহারের অর্থ কি জুন সংগ্রামকেই নাকচ করা নয়?

লুই ফিলিপের শেষ মন্ত্রী অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রথম মন্ত্রী। লুই নেপোলিয়ন যেমন তাঁর শাসনের তারিখ ধরতেন ১০ ডিসেম্বর থেকে নয়, ১৮০৪ সালের সেনেটের একটা ডিক্রি থেকে (৬৪), তেমনই তিনি প্রধানমন্ত্রীও যোগাড় করলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর মন্ত্রিত্ব শুরুর তারিখ ধরতেন ২০ ডিসেম্বর থেকে নয়, ২৪ ফেব্রুয়ারির এক রাজকীয় ফরমান থেকে। লুই ফিলিপের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে লুই নেপোলিয়ন সরকার বদলের কাজটা নরম করে আনলেন সাবেকী মন্ত্রিত্ব বজায় রেখে; তাছাড়া সে মন্ত্রিত্ব ভোঁতা হওয়ার সময়ই পায় নি, কারণ সেটার জীবন শুরু করারই ফুরসত মেলে নি।

রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির নেতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল এই বাছাইয়ের ব্যাপারে। পুরাতন রাজবংশপন্থী বিরোধীপক্ষের নেতা, অজ্ঞাতসারে যিনি 'National'-এর প্রজাতন্ত্রীদের উৎক্রমণস্বরূপ হয়েছিলেন, পরিপূর্ণ জ্ঞাতসারেই তিনি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রে উৎক্রমণস্বরূপ হওয়ার পক্ষে আরো বেশি যোগ্য।

অদিলোঁ বারো ছিলেন এমন এক পুরনো বিরোধী পার্টির নেতা যা মন্ত্রিত্বের দপ্তর লাভের জন্য সর্বদাই নিষ্ফলভাবে সচেষ্ট হলেও তখনও পর্যন্ত রিক্ত হয়ে যাবার সময় পায় নি। বিপ্লব দ্রুত পরম্পরায় সব ক'টি পুরনো

বিরোধী পার্টিকে রাষ্ট্রের চূড়োয় ঠেলে দিয়েছিল যাতে তারা তাদের আগেকার বুলি অস্বীকার করতে, খন্ডন করতে বাধ্য হয় — শুধু কাজে নয়, এমন কি কথার মধ্যেও, — এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ যাতে সবাইকেই এক জঘন্য তালগোল পাকিয়ে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করতে পারে। কোন ডিগবাজিই বাদ দেন নি এই বারো, বুর্জোয়া উদারনীতির এই প্রতিমূর্তি, আঠারো বছর ধরে যিনি তাঁর মনের শয়তানী অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছিলেন দেহের গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলনের আড়ালে। যদি কোন কোন মুহূর্তে হাল আমলের কাঁটা ও সাবেক কালের জয়মালার অতি প্রকট বৈপরীত্য ঐ মানুষটিকেও সচকিত করে থাকে, তবে আয়নার দিকে একবার তাকালেই তিনি ফিরে পেতেন তাঁর মন্ত্রিশোভন আত্মসংবরণ ও মানবশোভন আত্মশ্লাঘা। আয়নায় যে মুখ তাঁর দিকে ঝলমলিয়ে উঠত সে মুখ গিজো-র, যাঁকে তিনি সর্বদাই হিংসা করতেন, যিনি সর্বদাই তাঁকে দাবিয়ে রেখেছিলেন, সেই স্বয়ং গিজোই, তবে অদিলোঁ অলিম্পীয় ললাটসমেত গিজো। যা তাঁর নজর এড়িয়ে যেত তা হল মিডাসের কান দুটি।

২৪ ফেব্রুয়ারির বারো প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন ২০ ডিসেম্বরের বারো-র মধ্যে। অর্লিয়ান্সী ও ভলটেয়ারপন্থী বারো-র সহযোগী হলেন ধর্মমন্ত্রী হিসেবে লেজিটিমিস্ট ও জেশুইট ফালু।

কয়েকদিন পরে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রিত্বের ভার দেওয়া হল ম্যালথাসপন্থী লেওঁ ফশে-কে। আইন, ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র! বারো-র মন্ত্রিসভায় এসব তো রইলই, তার উপরে আবার থাকল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সমাহার। অভাব ছিল শুধু বোনাপার্টপন্থীর। বোনাপার্ট তখনও পর্যন্ত তাঁর নেপোলিয়নী শখ গোপন রেখেছিলেন, কারণ **সুলুক** তখনও পর্যন্ত তুসাঁ-লুভের্তুর ভূমিকায় নামেন নি।

'National'-এর পার্টি যেসব বড় বড় পদে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল সেখান থেকে অবিলম্বে তাদের সরানো হল। পুলিস দপ্তর, ডাক ব্যবস্থা পরিচালকমণ্ডলী দপ্তর, প্রধান সরকারী উকিলের অফিস, প্যারিসের মেয়রের দপ্তর — সবই পূর্ণ করা হল রাজতন্ত্রের সেকেলে জীবদের দিয়ে। লেজিটিমিস্ট শাঙ্গার্নিয়ে সেন্ জেলার জাতীয় রক্ষিদল, সচল রক্ষিদল ও প্রথম সামরিক ডিভিশনের সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ

সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লাভ করলেন; অর্লিয়ান্সী ব্যজো নিযুক্ত হলেন আলপাইন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। বারো সরকারের আমলে এই কর্মাধ্যক্ষ পরিবর্তন অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। তাঁর মন্ত্রিত্বের প্রথম কাজ ছিল পুরনো রাজতান্ত্রিক প্রশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চকিতে সরকারী রঙ্গমঞ্চ রূপান্তরিত হয়ে গেল — দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাচন, অভিনেতা, বাড়তি চরিত্র, মূক অভিনেতৃবর্গ, প্রম্পটার, বিভিন্ন পক্ষের অবস্থিতি, নাটকের বিষয়বস্তু, সংঘাতের সারবস্তু, সমগ্র পরিস্থিতিটাই বদলে গেল। একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক সংবিধান-সভাই তখনও রয়ে গেল নিজের জায়গায়। কিন্তু জাতীয় সভা বোনাপার্টকে, বোনাপার্ট বারো ও বারো শাঙ্গার্নিয়েকে গদিতে বসানোর সময় থেকেই ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে প্রবেশ করল প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের পর্বে। আর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সংবিধান-সভার স্থান কোথায়? পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর স্বর্গে পালানো ছাড়া সৃষ্টিকর্তার আর কোন কাজই ছিল না। সংবিধান-সভা পণ করল তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে না; বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক তরফের শেষ আশ্রয়ই ছিল জাতীয় সভা। নির্বাহী ক্ষমতার সব কলকাঠি সেটার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হলেও সাংবিধানিক সর্বশক্তিমত্তা কি সেটারই হাতে রয়ে গেল না? সেটার প্রথম চিন্তা হল, যে সার্বভৌমত্ব আয়ত্তে ছিল তা যেকোন অবস্থাতেই আঁকড়ে থাকা ও সেইখান থেকেই হারানো জমি পুনর্দখল করা। একবার বারো মন্ত্রিত্বের জায়গায় 'National'-এর মন্ত্রিত্ব বসাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রী কর্মচারিবৃন্দকে শাসন-ব্যবস্থার ঘাঁটি ছাড়তেই হবে, আর বিজয়গর্বে আবার সেখানে ঢুকবে তেরঙ্গা আমলার দল। জাতীয় সভা স্থির করল মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং মন্ত্রিসভা নিজেই আক্রমণের এমন একটা সুযোগ যোগাল যার চেয়ে ভালো সুযোগ সংবিধান-সভা উদ্ভাবন করতেই পারত না।

মনে রাখতে হবে, কৃষকদের কাছে লুই বোনাপার্টের তাৎপর্য ছিল: কর বরবাদ! রাষ্ট্রপতির আসনে তিনি বসলেন ছ-দিন, এবং সাতদিনের দিন, ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মন্ত্রিসভা **লবণ কর চালু রাখার** প্রস্তাব করল, যে কর বাতিল করার সিদ্ধান্ত করেছিল অস্থায়ী সরকার। পুরনো ফরাসী আর্থিক ব্যবস্থার যত দোষ নন্দ ঘোষে বর্তানোর দিক থেকে লবণ কর ছিল মদ্য করের জুড়ি, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে। **লবণ কর ফের চালু!** — কৃষকদের

নির্বাচিত মানুষটির মুখে নির্বাচকদের প্রতি এর চেয়ে তীব্রতর শ্লেষ বারো মন্ত্রিসভা আর কিছুই বসাতে পারত না। নিমক করের সঙ্গে বোনাপার্ট হারালেন তাঁর বিপ্লবী নিমক — কৃষক অভ্যুত্থানের নেপোলিয়ন প্রেতের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলেন এবং কিছুই রইল না রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া চক্রান্তের মধ্যস্থিত বিরাট অজানা ব্যক্তিটি ছাড়া। আর, বারো মন্ত্রিসভা যে অসতর্কিত রূঢ় এই মোহমুক্তির কাজটাকেই রাষ্ট্রপতির প্রথম সরকারী কাজ করে তুলল, সেটা বিনা অভিসন্ধিতে নয়।

সংবিধান-সভাও মন্ত্রিসভা উচ্ছেদকল্পে এবং কৃষকদের নির্বাচিত প্রতিভূর বিরুদ্ধে নিজেকে কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে খাড়া করার দুনো সুযোগ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরল। সভা অর্থসচিবের প্রস্তাব নাকচ করল, আগে লবণ করের পরিমাণ যা ছিল তার একতৃতীয়াংশে ঐ করকে নামাল, যার ফলে ছাপ্পান্ন কোটি অঙ্কের সরকারী ঘাটতির উপরে আরো চাপল ছ-কোটি, এবং এই **অনাস্থা ভোটের** পরে শান্তভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল মন্ত্রিসভার পদত্যাগের জন্য। চারদিকের নতুন দুনিয়া ও নিজের পরিবর্তিত অবস্থা বিষয়ে কত কম সেটার জ্ঞান। মন্ত্রিসভার পিছনে ছিলেন রাষ্ট্রপতি, আর রাষ্ট্রপতির পিছনে ছিল ষাট লক্ষ মানুষ যারা ভোটের বাক্সে ফেলেছিল সংবিধান-সভার বিরুদ্ধেই ঠিক অতগুলো অনাস্থার ভোট। সংবিধান-সভা জাতিকে ফিরিয়ে দিল তার অনাস্থার ভোট। আজগুবি লেনদেন! সভার খেয়াল হয় নি যে এখন আর তার ভোট বাজারে কাটবে না। লবণ কর প্রত্যাখ্যান শুধু ঘনিয়ে তুলল বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত যে সংবিধান-সভাকে **'খতম করতে হবে'।** শুরু হল সেই সুদীর্ঘ সংঘাত যা চলল সংবিধান-সভার জীবনের সমগ্র শেষার্ধ জুড়ে। **২৯ জানুয়ারি,** ২১ মার্চ ও ৮ মে হচ্ছে এই সংকটের journées, চরম দিনগুলি, **১৩ জুনের** একটা অগ্রদূত।

ফরাসীরা, যেমন লুই ব্লাঁ, ২৯ জানুয়ারিকে ধরেছেন এক সাংবিধানিক বিরোধ উদ্ভবের দিন হিসেবে — সর্বজনীন ভোটাধিকারপ্রসূত সার্বভৌম যে জাতীয় সভাকে ভেঙে দেওয়া চলে না তার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির বিরোধ — যে রাষ্ট্রপতি সংজ্ঞা ধরলে সভার কাছে দায়ী বটে, কিন্তু বাস্তবতা ধরলে যিনি অনুরূপভাবে সর্বজনীন ভোটে সমর্থিত শুধু তাই নয়, তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে

জাতীয় সভায় সদস্যদের মধ্যে যত ভোট শত শত টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত ছিল সেই সমস্ত ভোট একা তাঁর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ, তদুপরি কার্যনির্বাহের সমস্ত ক্ষমতাটাও পুরোপুরি তাঁর মুঠোয়, যার উপরে জাতীয় সভা ভাসমান কেবলমাত্র এক নৈতিক শক্তি হিসেবেই। ২৯ জানুয়ারির এই ব্যাখ্যায় বক্তৃতা মঞ্চে, সংবাদপত্রে ও ক্লাবগুলিতে ব্যবহৃত সংগ্রামের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃত স্বরূপকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতীয় সংবিধান-সভার বিরুদ্ধে লুই বোনাপার্ট — এটা একপক্ষের সাংবিধানিক শক্তির বিরুদ্ধে অপর পক্ষের সাংবিধানিক শক্তি নয়, বিধানিক শক্তির বিপক্ষে কার্যনির্বাহক শক্তি নয়; এ হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের নির্মাণ যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াদের যে বৈপ্লবিক অংশ সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল ও এখন বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করছে যে তাদের গড়া প্রজাতন্ত্রের চেহারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের মতনই এবং সেইজন্য স্বীয় শর্ত, বিভ্রম, ভাষা ও ব্যক্তিবর্গ সহ তার সংবিধান পর্বটাকে জোর করে প্রলম্বিত করতে, সুপরিণত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটির পরিপূর্ণ ও বিশিষ্ট রূপের অভ্যুদয় আটকাতে ইচ্ছুক — বুর্জোয়াদের সেই বিপ্লবী অংশের উচ্চাভিলাষী চক্রান্ত ও মতাদর্শগত দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এ হল খোদ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রটাই। জাতীয় সংবিধান-সভা যেমন ছিল কাভেনিয়াকের প্রতিনিধি যিনি তার মধ্যেই গিয়ে পড়েছিলেন, তেমনই বোনাপার্ট হলেন সেই জাতীয় বিধান-সভার প্রতিনিধি যা তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার।

বোনাপার্টের নির্বাচনের একমাত্র ব্যাখ্যা মেলে **একটি** নামের জায়গায় তার বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে বসালে, নতুন জাতীয় সভা নির্বাচনে সে নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি দিয়েই। ১০ ডিসেম্বর পুরনো সভার হুকুমনামা নাকচ করে দেয়। সুতরাং ২৯ জানুয়ারি **একই** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সভা মুখোমুখি দাঁড়ায় নি — দাঁড়িয়েছিল উদ্ভবকালীন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভা ও উদ্ভূত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের জীবনধারার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই পর্বের প্রতিমূর্তি দুই শক্তি। একদিকে, বুর্জোয়াদের সেই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী, একমাত্র যারাই সক্ষম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে, রাস্তার লড়াই ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নিতে এবং সংবিধানের ভিতরে লিখে রাখতে তারই আদর্শ মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে;

অন্যদিকে, সমস্ত রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া-সাধারণ, একমাত্র যারাই এই প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে শাসন চালাতে, সংবিধানের মতাদর্শগত ঝালরগুলিকে ছেঁটে দিতে, এবং নিজস্ব বিধানিক ও প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে দমনে রাখবার অপরিহার্য শর্তগুলিকে কার্যকরী করতে সক্ষম।

যে ঝঞ্ঝার বিস্ফোরণ হল ২৯ জানুয়ারি সেটার শক্তি সঞ্চয় চলছিল সারা জানুয়ারি মাস ধরেই। সংবিধান-সভা বারো মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে ঠেলে দিতে চেয়েছিল অনাস্থা ভোট দিয়ে। অপর পক্ষে বারো মন্ত্রিসভা সংবিধান-সভার কাছে প্রস্তাব করল যে, সভাকেই নিজের উপরে চূড়ান্ত অনাস্থা ভোট জানাতে হবে, আত্মহত্যার জন্য মনস্থির করতে হবে, নির্দেশ দিতে হবে **নিজেকে ভাঙবার।** ৬ জানুয়ারি সভার জনৈক অতি অখ্যাত প্রতিনিধি রাতো মন্ত্রিসভার নির্দেশে সেই সংবিধান-সভার সামনেই এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, সভা গত অগস্ট মাসেই স্থির করেছিল সংবিধানের পরিপূরক পুরো একরাশ মৌলিক আইন যতদিন না তারই হাতে পাস হচ্ছে ততদিন নিজেকে ভেঙে দেবে না। মন্ত্রিসভার সমর্থক ফুল্দ্ স্পষ্টই সভাকে জানালেন যে **'বিপর্যস্ত ক্রেডিট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য'** তাকে ভেঙে দেওয়া দরকার। আর অস্থায়ী অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করে, এবং বারো-র সঙ্গে সঙ্গে আবার বোনাপার্ট সম্পর্কে ও বোনাপার্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে সভা কি ক্রেডিট বিপর্যস্ত করে নি? দেবতুল্য বারো, প্রজাতন্ত্রীরা একদা এক দশক অর্থাৎ দশমাস ধরে যে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত পকেটস্থ সেই পদ সবেমাত্র দু-হপ্তা ভোগের পরই আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখে হয়ে উঠলেন এক উন্মত্ত রোল্যান্ড। হতভাগ্য সভার সম্মুখীন হয়ে বারো স্বৈরাচারে ছাড়িয়ে গেলেন খোদ স্বৈরাচারীকেই। তাঁর সব থেকে নরম বুলি হল, 'এর কোন ভবিষ্যৎ নেই'। আর বাস্তবিকই সভা ছিল শুধু অতীতেরই প্রতীক। শ্লেষভরে তিনি বললেন, 'প্রজাতন্ত্রের সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদি যোগাতে এই সভা অসমর্থ।' অসমর্থই বটে! প্রলেতারিয়েতের প্রতি ঐকান্তিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বুর্জোয়া উদ্যোগ ভেঙে পড়ে, আর রাজতন্ত্রীদের প্রতি বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম লাভ করেছিল সেটার প্রজাতান্ত্রিক উচ্ছ্বাস। সুতরাং দু-দিক দিয়েই সভা উপযোগী প্রতিষ্ঠান দিয়ে সংহত করতে অসমর্থ

ছিল সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে, যেটাকে সেটা আর বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাতো-র প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রিসভা সারা দেশজুড়ে **দরখাস্তের এক ঝড়** বইয়ে দেয়, এবং ফ্রান্সের সব কোণ থেকেই প্রত্যহ সংবিধান-সভার মাথা লক্ষ্য করে ধেয়ে আসতে থাকে গোছা গোছা billets doux*, যাতে মোটের উপর স্পষ্ট করেই সভাকে অনুরোধ জানানো হল **ভেঙে যেতে** ও নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্র সম্পন্ন করতে। সংবিধান-সভাও পাল্টা দরখাস্তের ব্যবস্থা করল, যাতে সে নিজেকে অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা করল যেন সেটা বেঁচে থাকে। বোনাপার্ট ও কাভেনিয়াকের নির্বাচনী লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হল জাতীয় সভা ভাঙার পক্ষে বা বিপক্ষের দরখাস্ত সংগ্রামের মধ্যে। দরখাস্তগুলিকে হয়ে দাঁড়াতে হল ১০ ডিসেম্বর সম্পর্কে বিলম্বিত মন্তব্য। এই আন্দোলন চলল গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে।

সংবিধান-সভা ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘাতে সংবিধান-সভা তার উদ্ভব হিসেবে সাধারণ নির্বাচনের নজির টানতে পারে নি, কারণ আবেদন উঠেছিল সভার বিরুদ্ধে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নামেই। কোন যথাযথভাবে বিধিবদ্ধ শক্তির উপরে সেটা দাঁড়াতে পারল না, কারণ আইনসম্মত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল প্রশ্ন। অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে সভা মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করতে পারল না — সে চেষ্টা করা হয়েছিল আবার ৬ ও ২৬ জানুয়ারি — কারণ মন্ত্রিসভা তার আস্থার প্রত্যাশী ছিল না। একটিমাত্র পথ তার বাকি রইল, **অভ্যুত্থানের** পথ। অভ্যুত্থানের সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় রক্ষিদলের প্রজাতান্ত্রিক অংশ, সচল রক্ষিদল****, এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ঘাঁটি — **ক্লাবগুলি**। ডিসেম্বর মাসে বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল সচল রক্ষিদল, জুনের দিনগুলির সেই বীরেরা, ঠিক যেমন জুনের আগে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি ছিল **জাতীয় কর্মশালাগুলি**।*** সংবিধান-সভার নির্বাহী কমিশন যেমন জাতীয় কর্মশালাগুলির উপরেই তার নৃশংস অভিযান পরিচালিত করেছিল যখন তাকে খতম করতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবিদাওয়া,

* প্রেমপত্র। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ১০৪-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** এই খণ্ডের ১১০-১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তেমনই যখন খতম করতে হল বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশের অসহ্য হয়ে ওঠা দাবিদাওয়া তখন বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা আক্রমণ চালাল সচল রক্ষিদলের উপরে। মন্ত্রিসভা নির্দেশ দিল **সচল রক্ষিদলকে ভেঙে দিতে হবে**। সচল রক্ষিদলের অর্ধেককে ছাঁটাই করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, বাকি অর্ধেককে নতুনভাবে সংগঠিত করা হল গণতান্ত্রিক কেতার বদলে রাজতান্ত্রিক কায়দায়, এবং তাদের মাইনে কমিয়ে সৈন্যবাহিনীর সাধারণ বেতনের সমান করা হল। সচল রক্ষিদল দেখতে পেল তাদের হাল দাঁড়িয়েছে জুন বিদ্রোহীদের মতন; আর প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে লাগল **প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি**, যাতে তারা জুনের ঘটনার জন্য নিজেদের দোষ স্বীকার করে সেটা ক্ষমা করার জন্য প্রলেতারিয়েতকে অনুনয় জানাতে লাগল।

আর **ক্লাবগুলি**? যে মুহূর্তে সংবিধান-সভা বারো মারফত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে, আর রাষ্ট্রপতি মারফত বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে, এবং বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের মারফত সাধারণভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলল, তৎক্ষণাৎ ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ত্র গড়ার সমস্ত উপাদান অনিবার্যভাবে এসে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল — এল সেই সমস্ত তরফ যারা চাইছিল বর্তমান প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং হিংস্র এক পশ্চাদ্‌গতি প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রেণীস্বার্থ ও নীতির ধারক এক প্রজাতন্ত্রে তার রূপান্তর। ওমলেট ফের ডিম হয়ে উঠল; বৈপ্লবিক আন্দোলনের দানাবাঁধা বিভিন্ন রূপ পুনরায় হয়ে উঠল তরল। যার জন্য লড়াই, সেটা আবার সেই ফেব্রুয়ারির দিনগুলির অনির্দিষ্ট প্রজাতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল, যাকে সুনির্দিষ্ট করার ভার প্রত্যেক তরফ রাখল নিজের হাতেই। মুহূর্তের জন্য বিভিন্ন তরফ ফের ফেব্রুয়ারির দিনের সেই পুরনো অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াল, ফেব্রুয়ারির বিভ্রান্তির অংশীদার না হয়ে। 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা আবার 'Réforme'-এর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভর করল, আর প্রবক্তা হিসেবে তাদের ঠেলে দিল পার্লামেন্টারি সংগ্রামের পুরোভাগে। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীরা আবার ভর করল সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রীদের উপরে — ২৭ জানুয়ারি এক প্রকাশ্য ইস্তাহারে ঘোষিত হল তাদের পুনর্মিলন ও ঐক্য — এবং ক্লাবে ক্লাবে চালাল তাদের অভ্যুত্থানী পৃষ্ঠপটের প্রস্তুতি। মন্ত্রিসভা-সমর্থক সংবাদপত্রজগৎ সঠিকভাবেই 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীদের গণ্য করল

পুনরুজ্জীবিত জুন বিদ্রোহী হিসেবেই। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে নিজেদের স্থান বজায় রাখার জন্য তারা প্রশ্ন তুলল খোদ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই। ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রী ফশে সংগঠনের অধিকার সম্পর্কে এক আইনের প্রস্তাব করলেন, যার প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হল **'ক্লাবগুলি নিষিদ্ধ হল'।** তিনি আর্জি জানালেন যে, জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে এই বিল অবিলম্বে আলোচিত হোক। সংবিধান-সভা জরুরী প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাব নাকচ করল এবং ২৭ জানুয়ারি লেদ্রু-রলাঁ ২৩০টি স্বাক্ষরযোগে এক প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন সময়ে যখন তা বিচারকের, অর্থাৎ সভাস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অক্ষমতাই আনাড়ির মতো উন্মোচিত করে দেবে, অথবা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠেরই বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের নিষ্ফল প্রতিবাদ-মাত্রে পর্যবসিত হবে, — পরবর্তী 'পর্বত' দল এখন থেকে সংকটের প্রতিটি চরম মুহূর্তে এই মস্ত বৈপ্লবিক চালই চালতে লাগল। নিজ নামের ভারেই মারা পড়ল বেচারা 'পর্বত'!

১৫ মে ব্লাঙ্কি, বার্বে, রাস্পাই প্রভৃতি সংবিধান-সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে সেটার অধিবেশন প্রকোষ্ঠে জবরদস্তি প্রবেশ করে। সেই সভার জন্যই বারো এক নৈতিক ১৫ মে-র বন্দোবস্ত করলেন, যখন তিনি সেটার আত্মলোপের নির্দেশ ও দরজায় তালা দিতে চাইলেন। এই সভাই বারো-কে নির্দেশ দিয়েছিল মে মাসের আসামীদের সম্পর্কে সরকারী তদন্ত চালাতে। আজ যখন তিনি সভার সামনে হাজির হলেন এক রাজতন্ত্রী ব্লাঙ্কি হিসেবে, যখন বারো-র বিরুদ্ধে সভা সহায় খুঁজছিল ক্লাবের ভিতরে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, ব্লাঙ্কির পার্টিতেই, সেই মুহূর্তে নির্মম বারো কিনা তাকে জ্বালাতন করলেন এই প্রস্তাব নিয়ে যাতে মে মাসের বন্দীদের জুরীর সুযোগ সম্বলিত দায়রা আদালত থেকে সরিয়ে নিয়ে হাই কোর্টের, 'National'-এর পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত haute cour-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশ্চর্য! মন্ত্রিত্বের গদি হারাবার আতঙ্কে বারো-র মাথা থেকে এমন প্যাঁচ বেরল যা বমার্শে-এরই যোগ্য! বহু টালবাহানার পর জাতীয় সভা মেনে নিল তাঁর প্রস্তাব। মে প্রয়াসের স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে সভা ফিরে গেল সেটার স্বাভাবিক চরিত্রে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সভা যেমন বাধ্য হচ্ছিল সশস্ত্র **অভ্যুত্থানের** দিকে এগোতে, তেমনই জাতীয় সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীরাও বাধ্য হলেন কুদেতার দিকে এগুতে, কেননা সভা ভেঙে দেবার কোন আইনসম্মত পন্থা তাঁদের হাতে ছিল না। কিন্তু সংবিধান-সভা হল সংবিধানের জননী, আর তেমনি সংবিধান হল জন্মদাত্রী রাষ্ট্রপতির। কুদেতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি টুকরো টুকরো করেন সংবিধানটাকে, ঘুচিয়ে দেন তাঁর প্রজাতান্ত্রিক বৈধ স্বত্ব। তখন তিনি বাধ্য হন তাঁর বাদশাহী বৈধ স্বত্ব টেনে বার করতে, কিন্তু সে স্বত্ব খুঁচিয়ে জাগায় অর্লিয়ান্সী বৈধ স্বত্বকে, আবার এই দুইই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে লেজিটিমিস্ট বৈধ স্বত্বের কাছে। বৈধ প্রজাতন্ত্রের পতনের ফলে উপরে ঠেলে ওঠা সম্ভব শুধু সেটার চরম বিপরীতের, লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্রেরই, এমন এক মুহূর্তে যখন অর্লিয়ান্সী তরফ ছিল শুধু ফেব্রুয়ারির বিজিত পক্ষ আর বোনাপার্ট ছিলেন কেবল ১০ ডিসেম্বরের বিজয়ী, উভয়েই যখন প্রজাতান্ত্রিক ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারতেন শুধু নিজেদের একইভাবে জবরদখল করা রাজতান্ত্রিক স্বত্ব। লেজিটিমিস্টরা এই শুভলগ্ন সম্পর্কে সজাগ ছিল, তারা চক্রান্ত চালাল প্রকাশ্যেই। জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে তারা তাদের **মঙ্ক** হিসেবে পাওয়ার আশা করতে পারত। **শ্বেত রাজতন্ত্রের** আসন্নতার কথা তাদের ক্লাবে ঠিক তেমনই প্রকাশ্যে ঘোষিত হল যেমন প্রলেতারিয়ানদের ক্লাবগুলিতে হল **লাল প্রজাতন্ত্রের** কথা।

একটা অভ্যুত্থান দমন করার সৌভাগ্য জুটলে মন্ত্রিসভা সমস্ত অসুবিধার অবসান ঘটাতে পারত। আদিলোঁ বারো তাই আর্তনাদ করেছিলেন, 'বৈধতাই আমাদের মরণ।' অভ্যুত্থান মন্ত্রিসভাকে সুযোগ দিত জনকল্যাণের (salut public) অজুহাতে সংবিধান-সভা ভেঙে দিতে, সংবিধানের স্বার্থেই সংবিধান লংঘন করতে। জাতীয় সভায় আদিলোঁ বারো-র নৃশংস আচরণ, ক্লাব ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব, হৈ-হুল্লোড় করে ৫০ জন তেরঙ্গা জেলা-কর্তার (prefects) অপসারণ ও তাদের জায়গায় রাজতন্ত্রীদের বসানো, সচল রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া, তাদের নেতাদের প্রতি শাঙ্গার্নিয়ের দুর্ব্যবহার, এমন কি গিজো-র আমলেও যে অধ্যাপককে অসহ্য মনে করা হত সেই লের্মিনিয়ের পুনর্নিয়োগ, লেজিটিমিস্টদের লম্বা-চওড়া বুলি সহ্য করা — এ সবই হল শুধু বিদ্রোহেরই

প্ররোচনা। কিন্তু নির্বাক রইল বিদ্রোহ। মন্ত্রিসভার কাছ থেকে নয়, সংবিধান-সভার কাছ থেকেই সেটা সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত এল ২৯ জানুয়ারি। রাতোর প্রস্তাব বিনা শর্তে নাকচের জন্য মাতিয়ে (দা লা দ্রম) কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সেদিন সিদ্ধান্ত নেবার কথা। লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, বোনাপার্টপন্থী, সচল রক্ষিদল, 'পর্বত', ক্লাব, সবাই এদিনে চক্রান্ত করল প্রতীয়মান শত্রুর বিরুদ্ধে যতটা, প্রতীয়মান মিত্রের বিপক্ষেও ততটাই। ঘোড়ায় চড়ে বোনাপার্ট সৈন্যবাহিনীর একাংশকে জড়ো করলেন Place de la Concorde-এ; শাঙ্গার্নিয়ে রণকৌশলের খেল দেখিয়ে অভিনয় করলেন। সংবিধান-সভা দেখল তার বাড়িটি সামরিক বাহিনীর দখলে। সমস্ত পরস্পরবিরোধী আশা, আশঙ্কা, প্রত্যাশা, বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও চক্রান্তের কেন্দ্র এই সিংহবিক্রম সভা বিশ্বচৈতন্যের [Weltgeist] সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না। সেটার অবস্থা হল সেই যোদ্ধার মতো যে তার নিজের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে শঙ্কিত শুধু তাই নয়, উপরন্তু শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা করাও কর্তব্যজ্ঞান করে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সভা স্বাক্ষর দিল নিজ মৃত্যু পরোয়ানায় এবং নাকচ করল রাতোর বিনা শর্তে নাকচের প্রস্তাব। নিজেই এখন অবরোধের অবস্থায় পড়ে সভা সেই সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপের সীমা নির্দেশ করে দিল যার প্রয়োজনীয় কাঠামোই ছিল প্যারিসের অবরোধের অবস্থা। উপযুক্ত প্রতিহিংসাই সভা গ্রহণ করল যখন পরের দিন সেটা ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা যে ত্রাস ভোগ করিয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করে। 'পর্বত' বৈপ্লবিক উদ্যম ও রাজনৈতিক বোধের দৈন্যই প্রকাশ করল এই বিরাট চক্রান্তের প্রহসনে, 'National'-এর পার্টির হাতে নিজেকে সেই প্রতিযোগিতার ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিয়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের উন্মেষকালে যে একচ্ছত্র শাসন আয়ত্তে ছিল, প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে সেই ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করল 'National'-এর পার্টি। ভরাডুবি হল তার।

জানুয়ারি সংকটে যেখানে প্রশ্ন ছিল সংবিধান-সভার অস্তিত্ব সম্পর্কে, ২১ মার্চ সেখানে প্রশ্ন উঠল সংবিধানেরই অস্তিত্ব নিয়ে — প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্ন 'National'-এর পার্টির ব্যক্তিবর্গ নিয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার আদর্শ সম্পর্কেই। বলাই বাহুল্য যে, মান্যগণ্য প্রজাতন্ত্রীরা তাঁদের আদর্শের উচ্ছ্বাস

অনেক সস্তায় ছেড়ে দিলেন সরকারী ক্ষমতার পার্থিব সম্ভোগের তুলনায়।

২১ মার্চ জাতীয় সভার আলোচ্য সূচীতে ছিল সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে ফশে-র প্রস্তাব: **ক্লাব দমন**। সংবিধানের ৮ম ধারা সকল ফরাসীকে সংগঠনের অধিকার দিয়েছিল। সুতরাং ক্লাবগুলির নিষিদ্ধকরণ হল সংবিধানের পরিষ্কার লঙ্ঘন, আর সংবিধান-সভাকেই অনুমোদন করতে হবে তার দেবতার এই লাঞ্ছনা। কিন্তু ক্লাবগুলি তো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ কেন্দ্র, তাদের চক্রান্তের ঘাঁটি। জাতীয় সভাই তো স্বয়ং নিষিদ্ধ করেছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জোট। আর ক্লাবগুলি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর জোট ছাড়া, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক রাষ্ট্র গঠন ছাড়া আর কী? ওগুলি কি প্রলেতারিয়েতের অতগুলি সংবিধান-সভা মাত্র নয়, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অতগুলি বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী নয়? সংবিধানকে সর্বোপরি যা বিধিবদ্ধ করতে হবে সেটা বুর্জোয়াদের শাসন। সংগঠনের অধিকার দ্বারা সংবিধান তাই স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছিল শুধু এমন সংগঠন, যা বুর্জোয়া আধিপত্যের সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তত্ত্বগত শোভনতার খাতিরে যদি-বা কথাটা ঢালাওভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ করা ও প্রয়োগের জন্য সরকার ও জাতীয় সভা কি নেই? আর প্রজাতন্ত্রের আদি শৈশবের পর্বে ক্লাবগুলি যদি প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হয়ে থাকে অবরোধের অবস্থার দরুন, তবে সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে কি সেগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হবে না আইনের সাহায্যেই? তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা সংবিধানের এই গদ্যময় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আর কিছুই খাড়া করতে পারল না সংবিধানের বাগাড়ম্বরী বুলিগুলি বাদে। পানিয়ের, দ্যুক্লের প্রভৃতি তাদেরই একাংশ মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিল ও তার দ্বারা সেটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যোগাল। অন্যেরা দেবদূত কাভেনিয়াক ও ধর্মগুরু মারাস্তের নেতৃত্বে ক্লাব নিষিদ্ধ করার ধারাটি গৃহীত হবার পর লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বতের' সঙ্গে একযোগে এক বিশেষ কমিটি কক্ষে সরে পড়লেন 'এবং সলাপরামর্শ চালালেন'। অচল হয়ে পড়ল জাতীয় সভা; তার আর কোরাম রইল না। যথাসময়ে কমিটি কক্ষে শ্রীযুক্ত ক্রেমিও-র মনে পড়ল যে, সেখান থেকে পথটা সরাসরি রাস্তার দিকে, আর সেটা তখন আর ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি নয়, ১৮৪৯ সালের

মার্চ মাস। সহসা দৃষ্টিলাভ করে 'National'-এর পার্টি জাতীয় সভার অধিবেশন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল, পিছু পিছু এল পুনঃপ্রতারিত 'পর্বত'। এই শেষোক্তরা যেমন অবিশ্রাম বৈপ্লবিক কামনাপীড়িত, ঠিক তেমনই অবিশ্রাম সাংবিধানিক সম্ভাবনাগুলিকে আঁকড়ে ধরার জন্য চেষ্টিত এবং তখনও বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে থাকার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের পেছনে থাকতে। এইভাবেই অভিনীত হল প্রহসনটি। আর সংবিধান-সভা নিজেই তো বিধান দেয় যে, সংবিধানের ভাষা লঙ্ঘনেই তার মর্মের একমাত্র সিদ্ধি।

একটিমাত্র ব্যাপার নিষ্পত্তি করা বাকি রইল: ইউরোপীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিধিবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক, তার **বৈদেশিক নীতি**। যার আয়ুষ্কাল কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হবার কথা সেই সংবিধান-সভায় অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হল ১৮৪৯ সালের ৮ মে। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর রোম আক্রমণ, রোমানদের হাতে তার পরাজয়, তার রাজনৈতিক কলঙ্ক ও সামরিক অপমান, ফরাসী প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রোমান প্রজাতন্ত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বোনাপার্টের প্রথম ইতালি অভিযান — এই হল তখনকার কর্মসূচি। 'পর্বত' আবার একবার ছাড়ল তার মস্ত তুরুপের তাস; রাষ্ট্রপতির সামনে লেদ্রু-রলাঁ সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী অভিযোগপ্রস্তাব আনলেন, আর এবার সেটা বোনাপার্টের বিরুদ্ধেও।

৮ মে-র সংকল্পের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল পরে ১৩ জুনের সংকল্প হিসেবে। এখন রোম অভিযান সম্পর্কে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

ইতিপূর্বেই, ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাভেনিয়াক চিভিতাভেকিয়ায় এক নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন পোপ-কে* রক্ষা করার জন্য এবং তাঁকে জাহাজে তুলে ফ্রান্সে নিয়ে আসার জন্য। কথা ছিল পোপ শিষ্ট প্রজাতন্ত্রকে মন্ত্রপূত এবং কাভেনিয়াকের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পোপকে নিয়ে কাভেনিয়াক চেয়েছিলেন পাদ্রীদের, পাদ্রীদের নিয়ে কৃষকদের, এবং কৃষকদের নিয়ে রাষ্ট্রপতিত্ব হাত করতে। কাভেনিয়াকের অভিযানের আশু লক্ষ্য নির্বাচনী বিজ্ঞাপন হলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে ওটি ছিল

* ৯ম পায়েস। — সম্পাঃ

রোমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন। ভ্রূণাকারে তার মধ্যে ছিল পোপের সপক্ষে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ।

অস্ট্রিয়া ও নেপ্‌ল্‌সের সহযোগিতায় রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোপের হয়ে এই হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয় ২৩ ডিসেম্বর, বোনাপার্টের মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনে। মন্ত্রিসভায় ফাল্যুর অবস্থান ছিল রোমে পোপ থাকার এবং পোপেরই রোমে পোপ থাকার শামিল। কৃষকদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য বোনাপার্টের এখন আর পোপের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু পোপের সংরক্ষণ তাঁর দরকার ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে কৃষকদের সংরক্ষণের জন্যই। তাদের আস্থাপ্রবণতাই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছিল। ধর্মবিশ্বাস গেলে তারা আস্থাপ্রবণতা হারাবে, আর পোপ গেলে হারাবে ধর্মবিশ্বাস। আর ছিল অর্লিয়ান্সীদের ও লেজিটিমিস্টদের জোট, যারা শাসন চালাচ্ছিল বোনাপার্টের নামে! রাজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রয়োজন ছিল যে-শক্তি রাজার অভিষেক করে সেটার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাদের রাজানুগত্যের কথা ছেড়ে দিলেও -- পোপের লৌকিক শাসনাধীন পুরনো রোম না থাকলে পোপ থাকে না; পোপ না থাকলে ক্যাথলিকতন্ত্র থাকে না; ক্যাথলিকতন্ত্র ছাড়া ফরাসী ধর্ম থাকে না; আর ধর্মই বাদ দিলে কী গতি হবে পুরনো ফরাসী সমাজের? স্বর্গীয় সম্পত্তির উপরে কৃষকদের যে বন্ধকী খত আছে, সেটাই যে কৃষকদের সম্পত্তির উপরে বুর্জোয়াদের বন্ধকী খতকে সুনিশ্চিত করে। রোমান বিপ্লব তাই ছিল সম্পত্তির উপরে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপরে এক হামলা, জুন বিপ্লবের মতোই ভয়ংকর। ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শাসনের পক্ষে প্রয়োজন ছিল রোমে পোপের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি রোমান বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আঘাত ফরাসী বিপ্লবীদের মিত্রবর্গের বিরুদ্ধে আঘাত; প্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রতিবৈপ্লবিক শ্রেণীগুলির মৈত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই পরিপূরণ করা হয়েছিল পবিত্র মিত্রালীর সঙ্গে, নেপ্‌ল্‌স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মৈত্রী দিয়ে। মন্ত্রিসভার ২৩ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত সংবিধান-সভার পক্ষে কিছু গোপন ব্যাপার ছিল না। ৮ জানুয়ারিতেই লেদ্রু-রলাঁ মন্ত্রিসভাকে প্রশ্ন করেছিলেন এ প্রসঙ্গে; মন্ত্রিসভা কথাটা অস্বীকার করে, আর জাতীয় সভা তখনকার কর্মসূচি ধরে কাজ চালিয়ে যায়। মন্ত্রিসভার কথা কি বিশ্বাস করেছিল সভা? আমরা জানি

সারা জানুয়ারি মাস সেটা কাটিয়েছিল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট জানাতেই। কিন্তু মিথ্যাভাষণ যদি মন্ত্রিসভার ভূমিকার অঙ্গ হয়ে থাকে, তবে জাতীয় সভার ভূমিকার অঙ্গ ছিল সে মিথ্যায় বিশ্বাসের ভান করা এবং এই উপায়ে প্রজাতান্ত্রিক ঠাট (dèhors) বজায় রাখা।

ইতিমধ্যে পিয়েমোঁ পরাস্ত হল, চার্লস-আলবার্ট গদি ছাড়লেন এবং অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী করাঘাত করল ফ্রান্সের দরজায়। লেদ্রু-রলাঁ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করলেন ভীমবেগে। মন্ত্রিসভা প্রমাণ করল যে, তারা উত্তর ইতালিতে শুধু কাভেনিয়াকেরই কর্মনীতি চালিয়ে গেছে, আর কাভেনিয়াক চালিয়েছিলেন কেবল অস্থায়ী সরকারের অর্থাৎ লেদ্রু-রলাঁরই কর্মনীতি। এবারে মন্ত্রিসভা এমন কি আস্থাসূচক ভোটই যোগাড় করে ফেলল জাতীয় সভার কাছ থেকে। তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল উত্তর ইতালিতে সাময়িকভাবে কোন উপযুক্ত স্থান দখল করার, যাতে সার্ডিনিয়া অঞ্চলের অখণ্ডতা ও রোম সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আপোস-মীমাংসায় সাহায্য হয়। ইতালির ভাগ্য উত্তর ইতালির যুদ্ধক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, এ কথা সবাই জানে। সুতরাং লম্বার্ডি ও পিয়েমোঁ-র সঙ্গে রোমেরও পতন হবে, নয়তো ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ও তার ফলে ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবেরই বিপক্ষে। জাতীয় সভা কি হঠাৎ বারো-র মন্ত্রিসভাকে পুরনো জননিরাপত্তা কমিটি ঠাওরাল? অথবা নিজেকে মনে করল কনভেন্শন (৬৫)? তাহলে উত্তর ইতালির স্থানবিশেষে সামরিক দখল কেন? আসলে এই স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা রইল রোমের বিরুদ্ধে অভিযান।

১৪ এপ্রিল উদিনো-র নেতৃত্বে ১৪,০০০ সৈন্য সমুদ্রযাত্রা করল চিভিতাভেকিয়ার উদ্দেশ্যে; ১৬ এপ্রিল জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে ১২,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক মঞ্জুর করল ভূমধ্যসাগরে তিন মাসের জন্য এক হস্তক্ষেপের ফরাসী নৌবাহিনী রাখার জন্য। এইভাবে সভা মন্ত্রিসভাকে রোমের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সবরকম হাতিয়ার যোগাল, যদিও এই ভড়ং করে রইল যেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেই তাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সভা দেখল না মন্ত্রিসভা কী করছে, শুধু শুনে গেল মন্ত্রিসভা কী বলছে। ইসরায়েলেও অমন বিশ্বাস মেলে নি; প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র কী করবে তা জানার সাহস নেই, এমনি এক অবস্থায় পৌঁছেছিল সংবিধান-সভা।

অবশেষে ৮ মে প্রহসনের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল; জাতীয় সভা মন্ত্রিসভাকে সনির্বন্ধ তাগাদা জানাল ইতালি অভিযানকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সেই সন্ধ্যায়ই বোনাপার্ট 'Moniteur' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করলেন, তাতে তিনি বিপুল প্রশংসা বর্ষণ করেন উদিনো-র উপরে। ১১ মে জাতীয় সভা বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করল। আর 'পর্বত' যে এই ছলনা জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার বদলে সংসদীয় প্রহসনকে মর্মান্তিকভাবেই গ্রহণ করল যাতে তার মধ্যে সে ফুকিয়ে-তেঁভিলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সেটা কি কনভেনশনের ধার-করা সিংহচর্মের তলায় তার স্বভাবজাত পেটি বুর্জোয়া গোবৎস চর্মটাই প্রকাশ করে ফেলে নি।

সংবিধান-সভার জীবনের শেষার্ধ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়: ২৯ জানুয়ারি সভা স্বীকার করে যে, সেটার সংবদ্ধ প্রজাতন্ত্রে রাজতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীরাই হল স্বাভাবিক কর্তা; ২১ মার্চ সভা মেনে নিল যে, সংবিধান লঙ্ঘনই হচ্ছে তার রূপায়ণ; এবং ১১ মে সভা মত দিল যে, সংগ্রামী জাতিগুলির সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের শব্দাড়ম্বরে ঘোষিত নিষ্ক্রিয় মৈত্রীর অর্থ ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে তার সক্রিয় মৈত্রী।

এই শোচনীয় সভা রঙ্গমঞ্চ ছাড়ল সেটার ৪ মে তারিখের জন্মবার্ষিকীর দু-দিন আগে, জুন বিদ্রোহীদের মার্জনার প্রস্তাব নাকচ করে আনন্দ লাভের পর। বিধ্বস্ত তার শক্তি, জনসাধারণের প্রচণ্ড ঘৃণার পাত্র, যে বুর্জোয়ার সে হাতিয়ার তার দ্বারাই প্রতিহত, দুর্ব্যবহার পীড়িত ও ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষিপ্ত, তার জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধকে অস্বীকার করতে বাধ্য, তার প্রজাতান্ত্রিক স্বপ্নজালরিক্ত, অতীতে মহৎ কিছু সৃষ্টির অনধিকারী, ভবিষ্যতের আশাবিহীন, ক্রমে ক্রমে মুমূর্ষু তার জীবন্ত দেহের প্রতি অঙ্গ — এই সভা তার শবে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিল শুধু বারবার জুন বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে ও স্মরণ করে, অভিশপ্তের উপরেই বারবার অভিশাপ হেনে নিজের জানান দিয়ে। জুন বিদ্রোহীদের রক্তশোষক পিশাচ!

সভা পিছনে রেখে গেল এক সরকারী ঘাটতি, যার অঙ্ক স্ফীত করেছিল জুন বিদ্রোহের খরচ, লবণ কর সংশ্লিষ্ট ক্ষতি, নিগ্রো দাসত্ব রদের

দরুন বাগিচা মালিকদের ক্ষতিপূরণ, রোম অভিযানের ব্যয়, মদ্য কর সংশ্লিষ্ট লোকসান -- এ আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত যখন সে নিল তখন তার শেষ অবস্থা; বিদ্বেষপরায়ণ এক বৃদ্ধ সে, হাস্যমুখ উত্তরাধিকারীর উপরে মানরক্ষার এক ঝঞ্ঝাটে ঋণ চাপিয়ে যে খুশি।

মার্চের শুরু থেকে **জাতীয় বিধান-সভার** নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুটি প্রধান দল — **শৃঙ্খলা পার্টি** (৬৬) আর **গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক** বা **লাল পার্টি**। এ দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াল **সংবিধান সুহৃদেরা,** যে নামে 'National'-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা একটা পার্টি খাড়া করার চেষ্টা করল। **শৃঙ্খলা পার্টি** গঠিত হয় ঠিক জুনের দিনগুলির পরেই; ১০ ডিসেম্বরে 'National'-এর গোষ্ঠী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের গোষ্ঠীটাকে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পাবার পরেই শুধু তার অস্তিত্বের গোপন রহস্যটুকু — **অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের এক পার্টিতে** জোট বাঁধার এই কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে, যারা একের পর এক একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করেছিল — **বৃহৎ ভূস্বামীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের** (৬৭) আমলে এবং **ফিনান্স অভিজাতবর্গ ও শিল্প বুর্জোয়ারা জুলাই রাজতন্ত্রের** সময়ে। একটা গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম ছিল **বুরবোঁ,** অপর গোষ্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম **অর্লিয়ান্স। প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগৎটাই** হল একমাত্র স্থান যেখানে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জন না করেই দুই গোষ্ঠীই সমভাবে তাদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারত। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যদি সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ ও সুপ্রকট শাসন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে লেজিটিমিস্টদের সহযোগে অর্লিয়ান্সী শাসন এবং অর্লিয়ান্সীদের সহযোগে লেজিটিমিস্টদের শাসন ছাড়া, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্রের সমন্বয়** ছাড়া আর কিছু কি সেটা হতে পারত? 'National'-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা তাদের শ্রেণীর মধ্যে অর্থনীতিভিত্তিক কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত না। রাজতন্ত্রের আমলে, দুই বুর্জোয়া গোষ্ঠী যেখানে শুধু তাদের নিজস্ব **রাজত্ববিশেষকেই** বুঝত সেখানে তাদের উল্টোদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ রাজত্বের উপরে, **প্রজাতন্ত্রের নামহীন জগতের** উপরে জোর দেওয়ার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক

দাবিই শুধু তাদের ছিল — এ নির্বিশেষ জগৎকে তারা আদর্শায়িত ও সেকেলে অলঙ্করণে সজ্জিত করেছিল, কিন্তু তার ভিতরেও সবার আগে তারা অভিনন্দিত করেছিল তাদের স্বমণ্ডলীর শাসন। 'National'-এর পার্টি তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের দেখে যদি বিভ্রান্ত বোধ করে থাকে, তবে রাজতন্ত্রীরাও কম আত্মপ্রতারণা করে নি তাদের ঐক্যবদ্ধ শাসনের ব্যাপারে। তারা বোঝে নি যে তাদের দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র করে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তারা উভয়ে রাজতান্ত্রিক হলেও তাদের রাসায়নিক সংযোগের ফলাফলটা অনিবার্যভাবেই হবে **প্রজাতান্ত্রিক**; শ্বেত ও নীল রাজতন্ত্র পরস্পরকে ব্যর্থ করে দেবে তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রেই। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত এবং তাকে কেন্দ্র করে মাঝামাঝি শ্রেণীগুলির যে ক্রমবর্ধমান ভিড় জমছিল তার প্রতি বিরুদ্ধতার চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা পার্টির দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিই, উভয়ের মিলিত শক্তির উদ্বোধন ও সেই মিলিত শক্তিজাত সংগঠনকে রক্ষার জন্যই, অপর পক্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও শব্দাড়ম্বর ঔদ্ধত্যের পাল্টা হিসেবে তাদের যুক্ত শাসন, অর্থাৎ বুর্জোয়া শাসনের **প্রজাতান্ত্রিক রূপটাকেই** জোর করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়। আমরা তাই দেখি যে এই রাজতন্ত্রীরা গোড়ায় গোড়ায় ছিল রাজতন্ত্রের আশু পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসী, পরে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক গালিগালাজ করতে করতে তারা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোটাই বজায় রাখছে, আর শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করছে যে, পরস্পরকে তারা সইতে পারবে শুধু প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে দিয়ে। মিলিত শাসন ব্যাপারটা দুটি গোষ্ঠীকেই শক্তিশালী করল বটে, এবং অপর পক্ষের কাছে এ নতিস্বীকার অর্থাৎ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উভয়কেই আরও বেশি অপারগ ও অনিচ্ছুক করে তুলল।

শৃঙ্খলা পার্টি তার নির্বাচনী কর্মসূচিতে সরাসরি ঘোষণা করল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের কথা, অর্থাৎ তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত: **সম্পত্তি, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা** সংরক্ষণের কথা! স্বভাবতই সে তার শ্রেণী-শাসন ও সেই শ্রেণী-শাসনের শর্তগুলিকে তুলে ধরল সভ্যতারই কর্তৃত্ব হিসেবে এবং বৈষয়িক উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও সেই সঙ্গে

তার থেকে উদ্ভূত সামাজিক লেনদেন সম্পর্কেরও আবশ্যক শর্ত হিসেবে। শৃঙ্খলা পার্টির হাতে ছিল অজস্র টাকার সংস্থান; সারা ফ্রান্স জুড়ে তার শাখা সংগঠিত হল। সাবেকী সমাজের সমস্ত মতাদর্শবিদেরা ছিলেন তার বেতনভুক; চালু সরকারী যন্ত্রের প্রভাব ছিল তারই হেফাজতে; সমগ্র পেটি-বুর্জোয়া জনতা ও কৃষকদের মধ্যে এক অবৈতনিক অনুচরবাহিনী ছিল তার আয়ত্তে, যারা তখনও পর্যন্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাতে সম্পত্তির মালিক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই তাদের তুচ্ছ সম্পত্তি ও তার তুচ্ছ বদ্ধধারণার স্বাভাবিক প্রতিনিধিদের সন্ধান পেত। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ক্ষুদে রাজা ছিল যার প্রতিনিধি সেই পার্টি দলীয় প্রার্থীদের প্রত্যাখানকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হিসেবে দন্ড দিতে পারত, কর্মচ্যুত করতে পারত বিদ্রোহী শ্রমিকদের, অবাধ্য ক্ষেতমজুরকে, ভৃত্য, লিপিকর রেলকর্মচারী, কেরানি, বেসামরিক ক্ষেত্রে অধীন সমস্ত কর্মচারীকেই। সর্বোপরি এখানে-ওখানে সেটা এই বিভ্রান্তিও বজায় রাখতে পারত যেন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভাই ১০ ডিসেম্বরের বোনাপার্টকে বাধা দিয়েছে তাঁর আশ্চর্য ফলপ্রদ শক্তির প্রকাশে। শৃঙ্খলা পার্টি প্রসঙ্গে আমরা বোনাপার্টপন্থীদের উল্লেখ করি নি। তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল না; তারা ছিল বরং সেকেলে কুসংস্করাচ্ছন্ন পঙ্গুদের এবং তরুণ অবিশ্বাসী ভাগ্যান্বেষীদের সমাবেশ মাত্র। নির্বাচনে জয়ী হল শৃঙ্খলা পার্টি; বিধান সভায় তারা পাঠাল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি।

সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীর যে অংশ ইতিমধ্যে বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাদের স্বভাবতই নিজেদের যুক্ত করতে হল বৈপ্লবিক স্বার্থের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। আমরা দেখেছি পার্লামেণ্টে পেটি বুর্জোয়ার গণতান্ত্রিক মুখপাত্র, অর্থাৎ 'পর্বত' তাদের পার্লামেণ্টে পরাজয়ের ফলে কিভাবে বাধ্য হয়ে প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী মুখপাত্রদের দিকে ভেড়ে, এবং কিভাবে পার্লামেণ্টের বাইরেকার আসল পেটি বুর্জোয়ারা আপোসে মিটমাটের ঠেলায়, বুর্জোয়া স্বার্থের পাশব জবরদস্তি ও দেউলিয়া ঘোষণার চাপে আসল প্রলেতারিয়ানদের দিকে ভেড়ে। ২৭ জানুয়ারি 'পর্বত' ও সমাজতন্ত্রীরা তাদের সমঝোতার উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিল, ১৮৪৯ সালের

ফেব্রুয়ারির বিরাট ভোজসভায় তারা পুনর্ঘোষিত করল তাদের মৈত্রী। সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পার্টির, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়ার পার্টির মিলনে গঠিত হল **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি** বা **লাল** পার্টি।

জুনের দিনগুলির পরবর্তী যন্ত্রণায় সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পর ফরাসী প্রজাতন্ত্র, অবরোধের অবস্থার অবসানের পর থেকে, ১৯ অক্টোবর থেকে অবিশ্রাম এক একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আসছিল। প্রথমে রাষ্ট্রপতিত্ব নিয়ে সংগ্রাম; তারপর রাষ্ট্রপতি ও সংবিধান-সভার লড়াই; ক্লাবের জন্য লড়াই; বুর্জে-র (৬৮) বিচার পর্ব যা রাষ্ট্রপতি, সম্মিলিত রাজতন্ত্রী, গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক 'পর্বত' ও প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের খর্বাকৃতি মূর্তির তুলনায় প্রলেতারিয়েতের প্রকৃত বিপ্লবীদের প্রতিপন্ন করল এমন সব আদিম অতিকায় প্রাণী বলে, যা একমাত্র প্রলয়ের পরেই সমাজদেহে থেকে যায় অথবা সামাজিক প্রলয়ের পূর্বাহ্নেই কেবল দেখা দিতে পারে; নির্বাচনী প্রচার আন্দোলন; ব্রেয়ার (৬৯) হত্যাকারীদের মৃত্যুদন্ড; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম মামলা; ভোজসভাগুলির উপর পুলিসের হামলার সাহায্যে সরকারের হিংস্র হস্তক্ষেপ; উদ্ধত রাজতান্ত্রিক প্ররোচনা; লাঞ্ছনা-মঞ্চে লুই ব্লাঁ ও কসিদিয়েরর ছবি প্রদর্শন; সংস্থাপিত প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান-সভার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত প্রতিমুহূর্তেই যা বিপ্লবকে ঠেলে আনছিল তার উৎসমুখে, দণ্ডে দণ্ডে যা বিজেতাকে বিজিত ও বিজিতকে বিজেতায় রূপান্তরিত করছিল ও পলকের মধ্যে পার্টি ও শ্রেণীর অবস্থান, তাদের বিচ্ছেদ ও মিলনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল; ইউরোপীয় প্রতিবিপ্লবের দ্রুত অভিযান; গৌরবোজ্জ্বল হাঙ্গেরীয় সংগ্রাম; জার্মানির সশস্ত্র অভ্যুত্থানসমূহ; রোম অভিযান; রোমের কাছে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর কলঙ্কজনক পরাজয় --- গতির এই ঘূর্ণাবর্তে, ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যের এই তান্ডবে, বৈপ্লবিক আবেগ ও আশা নিরাশার এই নাটকীয় জোয়ার-ভাঁটায় ফরাসী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে তাদের বিকাশ পর্বের হিসাব কষতে হচ্ছিল সপ্তাহের মাপে, আগে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দীর মাপ। কৃষক ও প্রদেশগুলির মধ্যে অনেকখানি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। নেপোলিয়নের ব্যাপারেই শুধু যে তারা নিরাশ হয়েছিল তাই নয়; পরন্তু লাল পার্টি তাদের দিতে চাইল নামের বদলে সারবস্তু, করের

হাত থেকে ভুয়া মুক্তির বদলে লেজিটিমিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া একশ' কোটি মুদ্রা পুরিশোধ, বন্ধকগুলির বন্দোবস্তু এবং সুদখোরির অবসান।

খাস সৈন্যবাহিনীতেও বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সংক্রামিত হয়। বোনাপার্টকে ভোটের মারফত তারা জয়ের জন্য ভোট দিয়েছিল, আর তিনি তাদের দিলেন পরাজয়। তাঁর মারফত তারা ভোট দিয়েছিল ক্ষুদে কর্পোরালকে, যার পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে বৃহৎ বিপ্লবী সেনানায়ক; আর তিনি ফের আবার তাদের দিলেন বৃহৎ সেনানায়কদের যাদের আড়ালে আশ্রয় নিলেন পোষাকী কর্পোরাল। সংশয় রইল না যে, লাল পার্টি অর্থাৎ সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পার্টি চূড়ান্ত বিজয় না হলেও অন্তত বড় সাফল্য অর্জন করবেই, প্যারিস ও সৈন্যবাহিনী এবং অনেকগুলি প্রদেশ ভোট দেবে তাকেই। 'পর্বতের' নেতা **লেদ্রু-রলাঁ** পাঁচ পাঁচটি প্রদেশের দ্বারা নির্বাচিত হলেন; শৃঙ্খলা পার্টির কোন নেতা এ ধরনের জয়লাভ করতে পারেন নি, খাঁটি প্রলেতারীয় পার্টির কোন প্রার্থীও পারে নি। গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক পার্টির রহস্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে এই নির্বাচন। একদিকে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার সংসদীয় প্রবক্তা 'পর্বত' যেমন বাধ্য হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রী তত্ত্বাগীশদের সঙ্গে হাত মেলাতে, তেমনি জুনের ভয়ানক বাস্তব পরাজয়ের ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক জয়লাভের সাহায্যে ফের উত্থানের চেষ্টা করতে বাধ্য হয়ে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের মারফত তখনও পর্যন্ত বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্র অর্জন করতে না পেরে প্রলেতারিয়েতকে তার মুক্তির তত্ত্বাগীশদের, সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের কোলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিপ্লবী কৃষক, সেনাবাহিনী ও প্রদেশগুলি ভিড়ল 'পর্বতের' পিছনে, যে 'পর্বত' তাই হয়ে দাঁড়াল বৈপ্লবিক সেনাশিবিরের একাধিপতি প্রভু, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরুন বৈপ্লবিক পার্টির ভিতরে সকল বিরুদ্ধতার অবসান ঘটিয়েছিল তারা। সংবিধান-সভার জীবনের শেষার্ধে 'পর্বত'ই সভার প্রজাতান্ত্রিক উদ্দীপনার প্রতিনিধিত্ব করত; এতে করে অস্থায়ী সরকার, কার্যনির্বাহক কমিশন ও জুনের দিনগুলির সময়কার তার পাপ বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জন করিয়ে নেয়। 'National'-এর পার্টি তার দোটানা প্রকৃতির দরুন যে পরিমাণে রাজতান্ত্রিক মন্ত্রিসভার দ্বারা নিজেকে অবদমিত হতে দিল, 'National'-এর একচ্ছত্রতার যুগে যাকে

একপাশে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই 'পর্বত' ততই উঠে দাঁড়াল ও আত্মপ্রকাশ করল বিপ্লবের সংসদীয় প্রতিনিধি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য সব, অর্থাৎ রাজতন্ত্রী গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ ও আদর্শবাদী গলাবাজি ছাড়া 'National'-এর পার্টির কিছুই দাঁড় করাবার ছিল না। অপরপক্ষে 'পর্বতের' বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দোদুল্যমান এক জনতার প্রতিনিধিত্ব করত, এমন এক জনতা যাদের বৈষয়িক স্বার্থের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি আবশ্যক। কাভেনিয়াক ও মারাস্তদের তুলনায় লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বত'ই তাই প্রকৃত বিপ্লবের প্রতিনিধি ছিলেন, আর এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁরা ততই সাহসী হয়ে উঠেছিলেন, যতই বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকছিল সংসদীয় আক্রমণ, অভিযোগ প্রস্তাব আনয়ন, ভীতি প্রদর্শন, উচ্চকণ্ঠ, বজ্রনির্ঘোষময় বক্তৃতা ও শুধু চরম কথাবার্তার মধ্যেই। কৃষকদের অবস্থা ছিল প্রায় পেটি বুর্জোয়াদেরই মতো; তারা যে সামাজিক দাবি তুলছিল তাও ছিল মোটের উপর একই। তাই সমাজের সমস্ত মধ্যবর্তী স্তরই বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিতরে যতখানি এসে পড়েছিল ততখানি পর্যন্ত তারা লেদ্রু-রলাঁ-র ভিতরেই দেখতে পেল তাদের নায়ককে। লেদ্রু-রলাঁই হলেন গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার প্রধান মানুষ। শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বপ্রথমে এই শৃঙ্খলার আধা-রক্ষণশীল, আধা-বৈপ্লবিক ও পুরোদস্তুর ইউটোপীয় সংস্কারকদের পুরোভাগে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

'National'-এর পার্টি, 'সংবিধানেরই প্রকৃত সুহৃদ', খাঁটি প্রজাতন্ত্রীগণ নির্বাচনে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। বিধান-সভায় তাদের ক্ষুদ্র এক সংখ্যাল্প দল ঢুকল; তাদের সব থেকে নামজাদা নেতারা, এমন কি প্রধান সম্পাদক ও সম্মানীয় প্রজাতন্ত্রের অর্ফিয়ুস মারাস্ত পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করলেন।

২৮ মে বিধান-সভার অধিবেশন শুরু হয়। ১১ জুন ৮ মে-র সংঘাতের পুনরভিনয় ঘটল এবং 'পর্বতের' নামে লেদ্রু-রলাঁ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক অভিশংসন প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য, রোমের উপর গোলাবর্ষণের জন্য। ১১ মে সংবিধান-সভা যেমন নাকচ করেছিল, তেমনি ১১ জুন বিধান-সভাও নাকচ করল অভিশংসন প্রস্তাব। কিন্তু প্রলেতারিয়েত এবার 'পর্বতকে' বাধ্য করল রাস্তায় নামতে, অবশ্য রাস্তার

লড়াইয়ে নয়, শুধু এক রাস্তার মিছিলে। এ আন্দোলনের শীর্ষে ছিল 'পর্বত', এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে আন্দোলন পরাস্ত হয়েছিল এবং ১৮৪৯-এর জুন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের যেমন হাস্যকর তেমনই জঘন্য এক প্রহসন। ১৩ জুনের বিরাট পশ্চাদপসরণকে শুধু ছাপিয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক উদ্ভাবিত মহাপুরুষ শাঙ্গার্নিয়েরের বিপুলতর যুদ্ধ রিপোর্ট। হেলভেশিয়াস যা বলেছেন — প্রত্যেক সামাজিক যুগেরই প্রয়োজন পড়ে নিজস্ব মহাপুরুষের, সে মহাপুরুষ না থাকলে তাকে উদ্ভাবন করে নেয়।

২০ ডিসেম্বর সংবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আধখানার মাত্র অস্তিত্ব ছিল: **রাষ্ট্রপতি**; ২৮ মে সেটি সম্পূর্ণ হল অন্য আধখানা, অর্থাৎ **বিধান-সভার** দ্বারা। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংবিধায়ক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে এক অকথ্য সংগ্রাম মারফত এবং ১৮৪৯ সালের জুন মাসে সংবিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে এক অনুচ্চারণীয় প্রহসন মারফত তাদের নাম গ্রথিত করল ইতিহাসের জন্মপঞ্জিতে। ১৮৪৯-এর জুন হল ১৮৪৮ সালের জুনের নেমেসিস, ১৮৪৯ সালের জুন মাসে শ্রমিকেরা পরাস্ত হয় নি, পাতিত হল শ্রমিক ও বিপ্লবের মধ্যে দণ্ডায়মান পেটি বুর্জোয়া। ১৮৪৯-এর জুন মজুরি ও পুঁজির মধ্যে একটা রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি নয়, বরঞ্চ দেনাদার পাওনাদারদের জেলভর্তি করা শোচনীয় এক নাটক। জয়যুক্ত হল শৃঙ্খলা পার্টি, সেটা হল সর্বশক্তিমান; এখন সেটার স্বরূপ দেখানোর পালা।

৩

১৮৪৯-এর ১৩ জুনের ফলাফল

২০ ডিসেম্বরে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের** জেনাস-মাথার শুধু একটি মুখই দেখা গিয়েছিল তখন পর্যন্ত, তার লুই বোনাপার্টের আবছায়া, সাদামাঠা আদলসহ কার্যনির্বাহক মুখ। ১৮৪৯ সালের ২৮ মে সেটার দ্বিতীয় মুখ দেখা গেল — রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জুলাই রাজতন্ত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা

যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল তার দ্বারা কলঙ্কিত সেটার **বিধানিক** মুখটি। জাতীয় বিধান-সভার সঙ্গে সঙ্গে **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হল, সম্পন্ন হল সরকারের সেই প্রজাতান্ত্রিক রূপ, যার ভিতরে বিধিবদ্ধ হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন, সুতরাং যে দুটি বৃহৎ রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিয়ে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী গঠিত তাদের উভয়েরই শাসন, মিলিত লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের, **শৃঙ্খলা পার্টির** শাসন। ফরাসী প্রজাতন্ত্র এইভাবে যেমন রাজতান্ত্রিক পার্টিদের এক জোটের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল, প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিপুঞ্জের ইউরোপীয় জোটও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মার্চ বিপ্লবের শেষ আশ্রয়স্থানগুলির বিরুদ্ধে এক সাধারণ জেহাদ শুরু করল। রাশিয়া হাঙ্গেরি আক্রমণ করল; যে বাহিনী রাইখ সংবিধান রক্ষা করছিল তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাল প্রাশিয়া, আর রোমের উপরে গোলাবর্ষণ করলেন উদিনো। ইউরোপীয় সংকট স্পষ্টতই পৌঁছচ্ছিল এক নির্ধারক সন্ধিক্ষণে; গোটা ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্যারিসের উপরে আর সমগ্র প্যারিসের চোখ ছিল **বিধান-সভার** উপরে।

১১ জুন সভার বক্তৃতা-মঞ্চে উঠলেন লেদ্রু-রলাঁ। তিনি কোন বক্তৃতা করলেন না; মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তিবিধানের দাবি জানালেন — অনাবৃত, অশোভিত তথ্যনিষ্ঠ, সংহত ও জোরালো এক দাবি।

রোম আক্রমণ হল সংবিধানের উপরেই আক্রমণ; রোম প্রজাতন্ত্রের উপরে হামলা — ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপরেই হামলা। সংবিধানের পঞ্চম ধারায় আছে: 'ফরাসী প্রজাতন্ত্র কখনও কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করবে না,' অথচ রোমান স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্য নিয়োগ করছেন রাষ্ট্রপতি। জাতীয় সভার* বিনা অনুমতিতে কার্যনির্বাহক শক্তির তরফ থেকে যেকোন যুদ্ধ ঘোষণা নিষিদ্ধ করেছে সংবিধানের চুয়ান্ন ধারা। সংবিধান-সভার ৮ মে-র সিদ্ধান্ত মন্ত্রীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে অতি সত্বর রোম অভিযানকে সেটার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

* এখানে এবং পরে জাতীয় সভা বলতে বোঝান হয়েছে ১৮৪৯ সালের ২৮ মে থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্ষমতাসীন জাতীয় বিধান-সভা (Legislativa)। — সম্পাঃ

করে আনতে হবে; সুতরাং সমান স্পষ্টভাবেই সে নির্দেশে রোমের উপরে হামলা নিষিদ্ধ; অথচ রোমের উপরে গোলা ফেলছেন উদিনো। লেদ্রু-রলাঁ এইভাবে বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী মানলেন খোদ সংবিধানকেই। জাতীয় সভার রাজতন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি সংবিধানের মুখপাত্র হিসেবে তিনি এই সতর্কবাণী হানলেন: 'সংবিধানকে মান্য করতে শিখিয়ে দেবে প্রজাতন্ত্রীরা সবরকম পন্থায়, এমন কি অস্ত্রের জোরেও!' **'অস্ত্রের জোরে!'** 'পর্বতের' শতগুণ প্রতিধ্বনিতে পুনরাবৃত্তি হল এই ধ্বনির। সংখ্যাগুরু পক্ষ এর জবাব দিল প্রচণ্ড হট্টগোল তুলে; জাতীয় সভার সভাপতি লেদ্রু-রলাঁকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে বললেন। লেদ্রু-রলাঁ পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁর সংগ্রামী ঘোষণার ও শেষ পর্যন্ত সভাপতির টেবিলে রাখলেন বোনাপার্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব। ৩৬১ — ২০৩ ভোটে জাতীয় সভা সাব্যস্ত করল রোমের উপরে গোলাবর্ষণ প্রসঙ্গ থেকে আলোচ্য সূচীর পরবর্তী দফায় যাওয়া হবে।

লেদ্রু-রলাঁ কি বিশ্বাস করতেন যে তিনি সংবিধানের সাহায্যে জাতীয় সভাকে ও জাতীয় সভার সাহায্যে রাষ্ট্রপতিকে হারাতে পারবেন?

একথা ঠিক যে, সংবিধানে বিদেশী জাতিগুলির স্বাধীনতার উপরে আক্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী রোমে যার উপরে আক্রমণ চালাচ্ছিল, মন্ত্রিসভার মতে তা 'স্বাধীনতা' নয় বরঞ্চ 'নৈরাজ্যের স্বেচ্ছাচার'। সংবিধান-সভার সমস্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 'পর্বত' কি তখনও পর্যন্ত এ কথা বোঝে নি যে, সংবিধানের ব্যাখ্যাকার তার স্রষ্টারা নয়, সেটা শুধু তারাই যারা সংবিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে? সংবিধানের কথাগুলিকে বুঝতে হবে তার সজীব অর্থে, এবং বুর্জোয়া ব্যাখ্যাই হল তার একমাত্র সজীব অর্থ? বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার রাজতান্ত্রিক সংখ্যাগুরু অংশই হল সংবিধানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার, যেমন পাদ্রী হচ্ছেন বাইবেলের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার এবং বিচারক আইনের? সাধারণ নির্বাচন থেকে সদ্যোদ্ভূত জাতীয় সভার কি উচিত মৃত সংবিধান-সভার অন্তিমপত্রের শর্ত মানতে বাধ্য বোধ করা, যখন জীবিত অবস্থাতেই তার ইচ্ছা লঙ্ঘন করে গেছেন এক অদিলোঁ বারো? লেদ্রু-রলাঁ যখন সংবিধান-সভার ৮ মে প্রস্তাবের নজির দেখাচ্ছিলেন তখন কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে সেই সংবিধান-সভাই ১১ মে তারিখে বোনাপার্ট ও

মন্ত্রীদের অভিযুক্ত করার তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ করেছিল, রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের অব্যাহতি দিয়েছিল, রোমের উপরে আক্রমণও তাই 'সংবিধানসঙ্গত' বলেই মঞ্জুর করেছিল? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইতিমধ্যে যে-রায় দেওয়া হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে তিনি একটি আপিল করেছেন মাত্র; আর শেষ কথা, তাঁর সে আপিল হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান-সভার কাছ থেকে রাজতান্ত্রিক বিধান-সভার কাছে? সংবিধানই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্য নেবার ব্যবস্থা করেছিল বিশেষ একটি ধারায় সমস্ত নাগরিকদের সংবিধান রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়ে। লেদ্রু-রলাঁ এই ধারাটাকে ভিত্তি করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে, সরকারী কর্তৃপক্ষ কি সংবিধান রক্ষার জন্যই সংগঠিত নয়, আর সংবিধান লঙ্ঘন তো শুধু সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় যখন একটি বৈধ সরকারী কর্তৃপক্ষ আর একটি বৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? অথচ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সভার মধ্যে সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ মতৈক্যই তো বর্তমান।

১১ জুন 'পর্বত' যা করতে চেয়েছিল সেটা '**বিশুদ্ধ যুক্তির চৌহদ্দির মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানো**', অর্থাৎ একটি নিছক **সংসদীয় অভ্যুত্থান**। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হয়ে যেন বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের মারফত আপন শক্তি ও নিজস্ব নির্বাচনের তাৎপর্য বিনষ্ট করবে। বারো-ফালু মন্ত্রিসভার পদচ্যুতির জন্য অতি নাছোড়বান্দা জেদ করার সময়ে সংবিধান-সভা কি অনুরূপভাবে বোনাপার্টের নির্বাচনটাই নাকচ করার চেষ্টা করে নি?

কনভেনশনের সময় থেকে এমন সংসদীয় অভ্যুত্থানের নজিরেরও অভাব হয় নি যা অকস্মাৎ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, আর প্রাক্তন 'পর্বত' যেখানে সফল হয়েছিল সেখানে নবীন 'পর্বত' কি ব্যর্থ হতে পারে? সে সময়ের সম্পর্কাদিও এরূপ প্রচেষ্টার প্রতিকূল মনে হয় নি। প্যারিসে জনসাধারণের বিক্ষোভ আশঙ্কাজনকভাবে এক উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল; নির্বাচনের ভোট দেখে মনে হয়েছিল সৈন্যবাহিনী সরকারের প্রতি প্রসন্ন নয়; বিধান-সভার সংখ্যাগুরু অংশও সুসংহত হওয়ার পক্ষে তখনও পর্যন্ত অতি অপরিণত, তার উপরে তারা হল প্রবীণ ভদ্রলোকের দল। 'পর্বত' যদি সংসদীয় অভ্যুত্থানে সফল হয় তবে রাষ্ট্রের হাল সরাসরি

এসে পড়বে তাদেরই মুঠোয়। গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা তাদের দিক থেকে বরাবরের মতোই, এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছুরই কামনা করে নিয়ে শূন্যে তাদের মাথার উপরে সংসদের গতায়ু ছায়া-মূর্তিদের মধ্যে লড়াই চলুক। সর্বোপরি, সংসদীয় অভ্যুত্থান মারফত গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া ও তাদের প্রতিনিধি, 'পর্বত' উভয়েই প্রলেতারিয়েতের লাগাম না ছেড়ে বা পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া তাদের হাজির হতে না দিয়ে বুর্জোয়া শক্তি চূর্ণ করার মহান লক্ষ্য সাধন করবে; প্রলেতারিয়েতকে ব্যবহার করা হবে, অথচ তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।

জাতীয় সভার ১১ জুনের ভোটের পরে 'পর্বতের' কিছু সদস্য ও গুপ্ত শ্রমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন হয়। শেষোক্তেরা তাগিদ দিল সেই সন্ধ্যাতেই আক্রমণ শুরু হোক। 'পর্বত' এ পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে নাকচ করল। কোনক্রমেই মুঠো থেকে নেতৃত্ব ফস্কে যেতে দিতে রাজি ছিল না তারা; শত্রুদের মতো মিত্ররাও তাদের কাছে সমান সন্দেহভাজন ছিল, এবং তা ঠিকই। ১৮৪৮ সালের জুন মাসের স্মৃতি আগের চেয়ে প্রবলভাবেই তরঙ্গায়িত হচ্ছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েত মহলে। তবুও তারা শৃঙ্খলিত ছিল 'পর্বতের' সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে। এলাকাগুলির অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করত 'পর্বত'; সৈন্যবাহিনীতে নিজেদের প্রভাব তারা বাড়িয়ে দেখত; জাতীয় রক্ষিদলের গণতান্ত্রিক অংশ ছিল তাদের হাতে; দোকানীদের নৈতিক শক্তিও ছিল তাদের পিছনে। 'পর্বতের' ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার উপরে আবার কলেরায় হ্রাসপ্রাপ্ত ও বেকারির ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্যারিস থেকে চলে-যাওয়া প্রলেতারিয়েতের পক্ষে এই মুহূর্তে অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থ হত ১৮৪৮-এর জুনের দিনগুলির অর্থহীন পুনরাবৃত্তি, সেই মরীয়া লড়াই বাধ্য হয়ে যে পরিস্থিতিতে চালাতে হয়েছিল সেটা ছাড়াই। শ্রমিক প্রতিনিধিরা একমাত্র যুক্তিযুক্ত কাজটাই করল। 'পর্বতকে' তারা **বেকায়দায় পড়তে**, অর্থাৎ তাদের অভিশংসন প্রস্তাব বাতিল হলে সেক্ষেত্রে সংসদীয় সংগ্রামের চৌহদ্দি থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে বলে বাধ্য করে রাখল। গোটা ১৩ জুন ধরে তারা এই সংশয়পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখে, আর গণতান্ত্রিক জাতীয় রক্ষিদল ও সৈন্যদলের মধ্যে গুরুতর আপোসহীন mêlée-র* জন্য

* হাঙ্গামা। — সম্পাঃ

প্রতীক্ষা করে, যাতে তখন তারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ও বিপ্লবকে ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে সেটার পেটি বুর্জোয়া-নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাপিয়ে। জয়লাভের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই প্রলেতারীয় কমিউন তৈরী ছিল, যা স্থান নেবে বৈধ সরকারের পাশেই। ১৮৪৮-এর জুনের রক্তাক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েছিল প্যারিসের শ্রমিক।

১২ জুন স্বয়ং মন্ত্রী লাক্রস বিধান-সভায় প্রস্তাব হাজির করলেন অবিলম্বেই অভিশংসন প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হোক। রাত্রিতেই সরকার প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল; জাতীয় সভার সংখ্যাগুরু অংশ বিদ্রোহী সংখ্যালঘুদের ঠেলে রাস্তায় নামাবার জন্য কৃতসংকল্প ছিল; সংখ্যালঘুরও আর পিছু হটার জো ছিল না; পাশার দান ফেলা হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ প্রস্তাব নাকচ হল ৩৭৭—৮ ভোটে। ভোটদানে বিরত 'পর্বত' ক্ষুব্ধচিত্তে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' প্রচার প্রকোষ্ঠে, 'Démocratie pacifique' (৭০) সংবাদপত্রের দপ্তরে।

সংসদ ভবন থেকে নিষ্ক্রমণ সেটার শক্তি নাশ করে দিল, ঠিক যেমন মৃত্তিকা থেকে বিচ্ছেদের ফলে মৃত্তিকার অতিকায় সন্তান আণ্টিয়সের শক্তি নষ্ট হয়েছিল। বিধান-সভার এলাকার মধ্যে স্যামসন হলেও, 'শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রের' এলাকায় এরা ছিল কূপমণ্ডূক মাত্র। শুরু হল এক সুদীর্ঘ, কোলাহলপূর্ণ এলোমেলো বিতর্ক। 'পর্বত' সংকল্প করেছিল সর্ববিধ উপায়ে সংবিধানের মর্যাদা রাখতে তারা সবাইকে বাধ্য করবে **'শুধু অস্ত্রের জোরে ছাড়া'**। এই সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করল 'সংবিধান সুহৃদদের' এক ইস্তাহার (৭১) ও তাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল। 'National' গোষ্ঠীর, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক পার্টির ধ্বংসাবশেষ নিজের নামকরণ করেছিল 'সংবিধান সুহৃদ'। তার বাকি সংসদীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ছ-জন যেখানে অভিযুক্তদের বিচার প্রস্তাব নাকচ করার **বিরুদ্ধে** ভোট দেয়, অন্যেরা দল বেঁধে ভোট দেয় প্রস্তাব নাকচ করার **পক্ষেই, কাভেনিয়াক** যেখানে শৃঙ্খলা পার্টির হাতে তুলে দেন তাঁর তলোয়ার, সেখানে গোষ্ঠীর বৃহত্তর, সংসদ বহির্ভূত অংশ তাদের রাজনৈতিক ভাগাড়ের অবস্থা থেকে নির্গত হওয়ার ও গণতান্ত্রিক পার্টির ঝাঁকে ভিড়ে পড়ার সুযোগ আঁকড়ে ধরল লুব্ধচিত্তেই। যে পার্টি আত্মগোপন করেছে তাদেরই ঢালের পিছনে, তাদেরই **নীতির** আড়ালে,

সংবিধানের অন্তরালে, এমন পার্টির স্বাভাবিক ঢাল-বরদার বলে তারাই কি প্রতিভাত হবে না?

ভোর অবধি গর্ভযন্ত্রণা চলল 'পর্বতের'। ফলে জন্ম হল **'জনসাধারণের উদ্দেশে ঘোষণার'**, যেটি ১৩ জুন সকালে দুটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকায় (৭২) ন্যূনাধিক সলজ্জ একটা স্থান পেল। তাতে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ ও বিধান-সভার অধিকাংশকে **'সংবিধান বহির্ভূত'** (hors la Constitution) ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় রক্ষিদল, সৈন্যদল ও সর্বশেষে জনসাধারণকে আহ্বান জানান হয় 'উঠে দাঁড়াবার'। **'দীর্ঘজীবী হোক সংবিধান!'** এই স্লোগানই তারা তুলল, যে স্লোগানের তাৎপর্য **'বিপ্লব নিপাত যাক!'** ছাড়া আর কিছুই নয়।

'পর্বতের' সাংবিধানিক ঘোষণা অনুসারে ১৩ জুন পেটি বুর্জোয়াদের একটি তথাকথিত **শান্তিপূর্ণ মিছিল** বের হল; অর্থাৎ প্রধানত নিরস্ত্র জাতীয় রক্ষিদল ও তার সঙ্গে গুপ্ত শ্রমিক সংস্থাগুলির কিছু সদস্যের সংমিশ্রণ, ৩০,০০০ লোকের এই রাস্তার মিছিল **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** জিগির তুলে Château d'Eau থেকে বুলভারগুলো দিয়ে এগোল। শোভাযাত্রার লোকেরাই সে ধ্বনি উচ্চারণ করছিল যান্ত্রিক ও নিরুত্তাপভাবে, কলুষিত বিবেক নিয়ে; উত্তাল বজ্রনির্ঘোষে পরিণত না হয়ে সে আওয়াজ পাশের হাঁটাপথে ভিড় করে আসা জনতার প্রতিধ্বনিতে ফেরত আসছিল শ্লেষভরে। বহুকণ্ঠের সঙ্গীতে অভাব ঘটেছিল জলদ গম্ভীর স্বরগুলির। আর মিছিল যখন 'সংবিধান সুহৃদদের' সভাকক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং ছাতের উপরে দেখা গেল সংবিধানের জনৈক ভাড়াটে দূত, তার ক্ল্যাকার টুপি প্রবলবেগে আকাশে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড কলিজার জোরে **'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!'** এই ধরতাই বুলি যেন তীর্থযাত্রীদের মাথায় শিলাবর্ষণের মতো বর্ষিত হতে দিল, তখন পরিস্থিতির হাস্যকরতা উপলব্ধি করে মিছিলের লোকেরাই যেন সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। মিছিল de la Paix রাস্তার কাছে পৌঁছলে শাঙ্গার্নিয়ের ঘোড়সওয়ারেরা কিভাবে বুলভারগুলোয় একেবারেই অ-সংসদীয় কেতায় তার অভ্যর্থনা করল, কিভাবে পলকের মধ্যে মিছিল চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ও যাবার সময় পিছন পানে বারকয়েক 'অস্ত্র ধর' হাঁক দিয়ে গেল শুধু যাতে ১১ জুনের সংসদীয় অস্ত্রধারণের আহ্বান পূর্ণ হতে পারে -- এসব কথা সকলেই জানে।

Du Hasard রাস্তায় সমবেত 'পর্বতের' অধিকাংশ সদস্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন যখন শান্তিপূর্ণ মিছিলের এই হিংস্র বিতাড়ন, বুলেভারগুলোয় নিরস্ত্র নাগরিক হত্যার চাপা গুজব, আর রাস্তায় ক্রমবর্ধমান কোরগোল যেন আসন্ন অভ্যুত্থানেরই ইঙ্গিত জানাচ্ছিল। সভা-প্রতিনিধিদের ছোট একটি দলের নেতৃত্বে লেদ্রু-রলাঁ রাখলেন 'পর্বতের' সম্মান। জাতীয় প্রাসাদে সমবেত প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনীর আশ্রয়ে তাঁরা বৃত্তি ও ব্যবসায় মিউজিয়মে গিয়ে উঠলেন, সেখানে জাতীয় রক্ষিদলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর আসার কথা। কিন্তু 'পর্বতের' সদস্যরা বৃথাই প্রতীক্ষা করল পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর জন্য; হিসাবী এই জাতীয় রক্ষী সৈন্যরা পথে বসাল তাদের প্রতিনিধিদের; প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনীই আবার জনসাধারণের ব্যারিকেড গড়ায় বাধা দিল; অরাজক বিশৃঙ্খলায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না; সঙ্গীন বাগিয়ে লাইনের সৈন্যরা এগোতে লাগল; কিছু প্রতিনিধি বন্দী হল, আর অন্যেরা গেল পালিয়ে। ১৩ জুনের সমাপ্তি ঘটেছিল এইভাবে।

১৮৪৮ সালের ২৩ জুন যদি হয়ে থাকে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, তবে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন ঘটল গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যে যে শ্রেণী এই দুই অভ্যুত্থানের বাহন, তাদের চিরায়ত বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল এগুলির প্রত্যেকটিতে।

একমাত্র লিয়োঁ শহরে তা একরোখা রক্তাক্ত সংঘাতে পৌঁছয়। এইখানে, শিল্প বুর্জোয়া ও শিল্প প্রলেতারিয়েত যেখানে সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, যেখানে শ্রমিক আন্দোলন প্যারিসের মতো সাধারণ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত নয় ও তার দ্বারাই নির্ধারিত নয়, এইখানেই ১৩ জুনের প্রতিক্রিয়ায় সেটার আদি চরিত্র খোয়া যায়। প্রদেশগুলিতে অন্য যেখানেই অভ্যুত্থান হয় তা আগুন জ্বালায় নি, নিরুত্তাপ বিদ্যুতের ঝিলিক দেয় মাত্র।

১৮৪৯ সালের ২৮ মে তারিখে বিধান-সভার প্রথম বৈঠক থেকে যার স্বাভাবিক অস্তিত্ব শুরু, সেই নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের প্রথম পর্বে ছেদ টানল ১৩ জুন। ভূমিকার এই গোটা পর্বটি পরিপূর্ণ ছিল শৃঙ্খলা পার্টি ও 'পর্বতের' কোলাহলময় সংগ্রামে, বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার সংগ্রামে, -- এই পেটি বুর্জোয়া বৃথাই লড়ে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সংহতির বিরুদ্ধে যার জন্য তারা নিজেরাই অস্থায়ী সরকার ও

নির্বাহী কমিশনে অবিশ্রাম চক্রান্ত করেছিল, যার জন্য জুনের দিনগুলিতে উন্মত্তের মতো লড়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। ১৩ জুন চূর্ণ করল তার সেই প্রতিরোধ এবং সম্মিলিত রাজতন্ত্রীদের **বিধানিক একনায়কত্বকে** নিষ্পন্ন ব্যাপারে (fait accompli) পরিণত করল। এই মুহূর্ত থেকে জাতীয় সভা হয়ে পড়ল **শৃঙ্খলা পার্টির জননিরাপত্তা কমিটি** মাত্র।

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ ও জাতীয় সভার সংখ্যাধিক অংশকে প্যারিস **'অভিশংসিত অবস্থায়'** দাঁড় করাল; তারা প্যারিসকে ফেলল **'অবরোধের অবস্থায়'**। বিধান-সভার সংখ্যাধিকদের 'পর্বত' **'সংবিধান বহির্ভূত'** ঘোষণা করেছিল; সংখ্যাধিকেরা 'পর্বতকে' সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য হাই কোর্টের হাতে তুলে দিল এবং তার মধ্যে তখনও যেটুকু সজীব ছিল তা সব নিষিদ্ধ করল। মুণ্ডহীন হৃদয়হীন এক কবন্ধে পরিণত হল সেটা। সংখ্যালঘুরা **সংসদীয় অভ্যুত্থানের** স্পর্ধা করে; সংখ্যাগুরুরা তাদের **সংসদীয় স্বেচ্ছাচারকে** তুলে ধরল আইনের পর্যায়ে। তারা জারী করল নতুন **স্থায়ী বিধি**; তার ফলে খতম হয়ে গেল বাক্‌স্বাধীনতা, আর জাতীয় সভার সভাপতিকে অধিকার দেওয়া হল বিধিলঙ্ঘনের জন্য প্রতিনিধিদের নিন্দা, জরিমানা, বেতনবন্ধ, সভাপদ মুলতুবি, কারাদণ্ড, ইত্যাদি শাস্তিবিধানের। 'পর্বতের' কবন্ধাংশের উপরে তারা তলোয়ার নয়, বেত্র ঝুলিয়ে রাখল। মর্যাদার খাতিরে 'পর্বতের' বাকি সদস্যদের উচিত ছিল সকলে মিলে বেরিয়ে আসা। তাহলে ত্বরান্বিত হত শৃঙ্খলা পার্টির বিলুপ্তি। সেটাকে একত্রে রাখার মতো বিরোধিতার আভাসমাত্র না থাকলে সে পার্টি এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত সেটার মৌলিক উপাদানগুলিতে।

সংসদীয় শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ার **সশস্ত্র** শক্তিও হরণ করা হল প্যারিসের গোলন্দাজ বাহিনী ও জাতীয় রক্ষিদলের ৮ম, ৯ম ও ১২শ বাহিনী ভেঙে দিয়ে। অন্যদিকে টাকার কুমিরদের যে বাহিনী ১৩ জুন বুলে ও রু-এর ছাপাখানাগুলিতে হামলা করে, মুদ্রণযন্ত্র ভাঙে, প্রজাতান্ত্রিক পত্রিকার দপ্তরগুলি তচনচ করে ও খেয়াল-খুশিমতো গ্রেপ্তার করে সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্রক, চালান-কেরানী ও পিয়নদের, সেটাকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন জানানো হল জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে। প্রজাতান্ত্রিক

মনোভাবের সন্দেহে জাতীয় রক্ষিদল ছত্রভঙ্গ করার ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটল সারা ফ্রান্স জুড়ে।

নতুন **মুদ্রণ আইন**; নতুন **সভা-সমিতি সংক্রান্ত আইন**; নতুন **অবরোধের অবস্থার আইন**; প্যারিস বন্দিশালা ভরপুর; রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের বিতাড়ন; 'National'-এর সীমানা অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি পত্রিকা বন্ধ; লিয়োঁ ও তার চতুর্দিকের পাঁচটি এলাকাকে সামরিক যথেচ্ছাচারের নৃশংস পীড়নের হাতে সমর্পণ; আদালতের সর্বব্যাপকতা এবং বহুবার পরিশুদ্ধ কর্মচারী বাহিনীর আর একবার পরিশুদ্ধি — জয়যুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার তরফে এগুলো হল অনিবার্য, অবিরাম সংঘটিত **মামুলী ব্যাপার,** জুন হত্যাকান্ড ও নির্বাসনের পরে এর উল্লেখ প্রয়োজন শুধু এজন্যই যে, এবার আঘাত পড়ল শুধু প্যারিসের উপরে নয়, জেলাগুলির উপরেও, শুধু প্রলেতারিয়েতের উপরে নয়, বরং সব থেকে বেশি করে মধ্য শ্রেণীগুলির উপরেই।

জুন, জুলাই ও অগস্ট মাসে জাতীয় সভার সমস্ত আইন প্রণয়নের তৎপরতা ব্যয়িত হল দমন বিধি রচনায়, যার দ্বারা অবরোধের অবস্থা ঘোষণার অধিকার ছেড়ে দেওয়া হল সরকারী মর্জির উপরে, সংবাদপত্রের আরো কঠোর কণ্ঠরোধ ঘটল এবং বিলুপ্ত হল সভা-সমিতির অধিকার।

তবু এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হল বিজয় কাজে লাগাবার ব্যাপারে — সেটা **বাস্তবে** নয়, **নীতির দিক থেকে;** জাতীয় সভার সিদ্ধান্তে নয়, সে সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি অবতারণায়; বিষয়টা দিয়ে নয়, কথায়; কথায় নয়, কথা যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গিতে। অসঙ্কোচে নির্লজ্জ **রাজতান্ত্রিক মনোভাব** প্রকাশ; প্রজাতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক অভিজাতশোভন অপমানবর্ষণ; রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য সম্পর্কে লীলা-চপল প্রগল্‌ভতা; এক কথায় **প্রজাতান্ত্রিক শিষ্টাচারের** সদম্ভ লঙ্ঘন যুগিয়েছিল এ পর্বের বিশিষ্ট আমেজ ও রঙ। 'সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!' ১৩ জুনের **বিজিত পক্ষের** এই ছিল রণধ্বনি। **বিজয়ীদের** তাই সাংবিধানিক, অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক বাগবিস্তারের কপটতার দায় রইল না। প্রতিবিপ্লব পদানত করেছিল হাঙ্গেরি, ইতালি ও জার্মানিকে; তাদের বিশ্বাস যে, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দোরগোড়ায় এসে গেছে। শৃঙ্খলা পার্টির উপদলগুলির নাটের

গুরুদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল 'Moniteur' পত্রিকায় দলিলরূপে তাদের রাজতান্ত্রিকতার প্রমাণ দাখিল এবং রাজতন্ত্রের আমলে যদি দৈবক্রমে কোন উদারনৈতিক পাপ স্পর্শে থাকে তার জন্য ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপস্বীকার, অনুতাপ ও মার্জনা ভিক্ষার এক খাঁটি প্রতিযোগিতা। এমন একদিনও গেল না যেদিন জাতীয় সভার মঞ্চ থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে জাতীয় অভিশাপ বলে ঘোষণা করা হল না, কোন নগণ্য প্রাদেশিক লেজিটিমিস্ট জমিদার যেদিন গম্ভীরভাবে বলল না যে সে কোনদিনই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নি, যেদিন জুলাই রাজতন্ত্রের কোন কাপুরুষ দলত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কেউ না কেউ বীরোচিত কাজকর্মের বিলম্বিত ফিরিস্তি দেয় নি, যার সম্পাদন থেকে তাকে নাকি নিরস্ত রেখেছিল শুধু লুই ফিলিপের বদান্যতা অথবা অন্য কোন ভুল বোঝাবুঝি। ফেব্রুয়ারির দিনগুলিতে যা তারিফ করার মতো তা বিজয়ী জনসাধারণের ঔদার্য নয়, সেটা হল রাজতন্ত্রীদের আত্মত্যাগ ও সংযম, তারা জনসাধারণকে বিজয়ী হতে দিয়েছিল। জনসাধারণের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করল যে, ফেব্রুয়ারিতে আহতদের জন্য সাহায্যদানের টাকার কিয়দংশ **পৌর রক্ষীদের** জন্য খরচের খাতে চালান করা হোক, পিতৃভূমির কাছ থেকে ভালো আচরণ পাবার যোগ্যতা সে সময় কেবল এরাই দেখিয়েছিল। আর একজন চাইল Plase du Carrousel-এ ডিউক অভ্ অর্লিয়ান্সের একটি অশ্বারোহী মূর্তির ব্যবস্থা হোক। সংবিধানকে নোংরা কাগজের টুকরো আখ্যা দিলেন তিয়ের। বক্তৃতা-মঞ্চে একের পর এক দেখা গেল অর্লিয়ান্সীদের, যারা আত্মধিক্কার দিল বৈধ (লেজিটিমিস্ট) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য; দেখা গেল লেজিটিমিস্টদের, যারা অবৈধ রাজতন্ত্রের প্রতিরোধ মারফত সাধারণভাবে রাজতন্ত্র উচ্ছেদকেই ত্বরান্বিত করেছে বলে আত্মসমালোচনা করল; দেখা গেল তিয়েরকে, যিনি মলে-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য অনুতাপ করলেন; দেখা গেল মলে-কে, যিনি গিজো-র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য আক্ষেপ জানালেন; বারো-কে দেখা গেল, যিনি খেদ করলেন তিনজনের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করেছিলেন বলে। 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনিকে সংবিধানবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল; 'প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' এই ধ্বনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক অপবাদের। ওয়াটার্লু যুদ্ধের বার্ষিকী দিবসে

একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করল: 'ফ্রান্সে বিপ্লবী আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশের থেকে আমি কম ভয় পাই প্রুশীয় আক্রমণকে।' লিয়োঁ ও প্রতিবেশী জেলাগুলিতে যে সন্ত্রাস সংগঠিত করা হয়েছিল তার সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে বারাগে দ'ইলিয়ে জবাব দেন, 'লাল সন্ত্রাসের চেয়ে আমি পছন্দ করি শ্বেত সন্ত্রাস ('J'aime mieux la terreur blanche que la terreur rouge')। আর যখনই কোন বক্তার মুখ থেকে শ্লেষোক্তি নির্গত হল প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্র বা পবিত্র মিতালীর স্বপক্ষে, অমনি সভা উন্মত্তের মতো সাধুবাদ জানাল প্রতিবারেই। নেহাত খুঁটিনাটি প্রজাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতার প্রতিটি লঙ্ঘনেই, যেমন প্রতিনিধিদের citoyens* নামে সম্বোধন লঙ্ঘনে উৎসাহে ভরে উঠত শৃঙ্খলার যোদ্ধারা।

অবরোধের অবস্থা ও প্রলেতারিয়েতের বড় একটা অংশের ভোটদানে বিরতির মধ্যে প্যারিসে ৮ জুলাইয়ের উপনির্বাচন, ফরাসী বাহিনী কর্তৃক রোম দখল, রোমে রক্তাম্বর মহিমাময়দের প্রবেশ (৭৩) ও তাদের পিছু পিছু ইঙ্কিউজিশন ও পাদ্রীমার্কা সন্ত্রাসের আবির্ভাব, এই সবে জুন বিজয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিজয় যোগ হল এবং উন্মাদনা আরো বাড়িয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টির।

অবশেষে, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি অর্ধেকটা সদ্য সংগঠিত জেলা কাউন্সিলগুলিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ও অর্ধেকটা বহুমাসব্যাপী অভিসন্ধিপরায়ণ হুল্লোড়ের অবসাদের দরুন রাজতন্ত্রীরা দু-মাসের জন্য জাতীয় সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। অকপট পরিহাসের সঙ্গে তারা লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সীদের সেরা লোকজন, যেমন মলে ও শাঙ্গার্নিয়ে ইত্যাদিকে নিয়ে পঁচিশজন প্রতিনিধির এক কমিশন রেখে গেল জাতীয় সভার বদলি ও প্রজাতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে। তারা যা ভেবেছিল তার থেকে পরিহাসটা দাঁড়াল আরও গুরুতর। যে রাজতন্ত্রকে এরা ভালোবাসত তারই উচ্ছেদে সহায়তা করার ইতিহাসনির্দিষ্ট নিয়তি হল তাদের, আর ইতিহাসের দ্বারাই আবার তারা নির্দিষ্ট হল সেই প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য, যার প্রতি তারা পোষণ করত বিদ্বেষ।

---

* নাগরিক। — সম্পাঃ

নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, সেটার দুরন্তপনার রাজতান্ত্রিক পর্ব শেষ হল বিধান-সভা **স্থগিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে।**

আবার ঘুচল প্যারিসের অবরোধের অবস্থা, আবার চালু হল সংবাদপত্রের কাজকর্ম। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পত্রিকা বন্ধের সময়ে, দমন আইন ও রাজতান্ত্রিক তর্জন-গর্জনের যুগে **রাজতান্ত্রিক সংবিধানপন্থী পেটি বুর্জোয়াদের** পুরনো সাহিত্যিক প্রতিনিধি 'Siècle' (৭৪) নিজেকে **প্রজাতান্ত্রিক করে নিল; বুর্জোয়া সংস্কারপন্থীদের** পুরনো সাহিত্যিক মুখপত্র 'Presse' (৭৫) নিজেকে আরো **গণতান্ত্রিক করে নিল;** আর **প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার** পুরনো চিরায়ত মুখপত্র 'National' নিজেকে **করে নিল সমাজতান্ত্রিক।**

প্রকাশ্য ক্লাব যে পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, পরিসরে ও প্রাবল্যের দিক থেকে ঠিক সেই মাত্রায় বাড়তে লাগল **গুপ্ত সমিতিগুলি**। নিছক ব্যবসায়ী কমিটি হিসেবে যাদের সহ্য করা হত **শ্রমিকদের** সেই শিল্প **সমবায়গুলি** অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কোন কাজের না হলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার বাহন হয়ে দাঁড়াল। ১৩ জুন বিভিন্ন আধা-বৈপ্লবিক পার্টির সরকারী মাথাগুলি খসে যায়; সাধারণ যে লোক বাকি রয়ে গেল তারা নিজস্ব মাথা জোগাড় করল। লাল প্রজাতন্ত্রের সন্ত্রাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে শৃঙ্খলার বীরপুঙ্গবেরা ভয় দেখাত; হাঙ্গেরি, বাডেন ও রোমে বিজয়ী প্রতিবিপ্লবের জঘন্য অমিতাচার ও অস্বাভাবিক নৃশংসতা **'লাল প্রজাতন্ত্রকে'** ধুয়ে শাদা করে তুলল। আর ফরাসী সমাজের অতৃপ্ত মধ্য শ্রেণীগুলি সম্ভাব্য সন্ত্রাস সমেত লাল প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকেই পছন্দ করতে শুরু করল বাস্তব নৈরাশ্য সমেত লাল রাজতন্ত্রের সন্ত্রাসের চেয়ে। ফ্রান্সে কোন সমাজতন্ত্রী **হাইনাউ-এর** চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক প্রচার চালায় নি। A chaque capacité selon ses œuvres!*

ইতিমধ্যে লুই বোনাপার্ট জাতীয় সভার বিরতির সুযোগ নিয়ে রাজোচিত পরিভ্রমণ করলেন প্রদেশগুলিতে; সব থেকে উগ্র লেজিটিমিস্টরা তীর্থযাত্রা করল এম্‌স্‌-এ — সাধু লুই-এর পৌত্রের (৭৬) কাছে; এবং

---

* প্রতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির পাওনা হবে তার কর্ম অনুসারে (সাঁ-সিমোঁ-র সুবিদিত সূত্রের শব্দান্তর)। — সম্পাঃ

শৃঙ্খলা পার্টির অধিকাংশ জনপ্রতিনিধিরা ঘোঁট করতে থাকল সদ্য সমবেত জেলা কাউন্সিলগুলিতে। প্রয়োজন ছিল তাদের দিয়ে বলানো সেই কথা যা তখনও পর্যন্ত জাতীয় সভার সংখ্যাগুরুও উচ্চারণ করতে ভরসা পায় নি — **সংবিধানের আশু সংশোধনের জন্য জরুরী প্রস্তাবের** কথা। সংবিধান অনুসারে ১৮৫২ সালের আগে সংবিধান সংশোধন করা চলে না, আর তাও সে কাজ করতে পারে শুধু সেই উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহূত এক জাতীয় সভাই। কিন্তু অধিকাংশ জেলা কাউন্সিল যদি এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে জাতীয় সভা কি বাধ্য নয় ফ্রান্সের কণ্ঠস্বরের কাছে সংবিধানের সতীত্ব বলি দিতে? এই জেলা কাউন্সিলগুলি সম্পর্কে জাতীয় সভা সেই ধরনেরই আশা পোষণ করছিল যা ভলটেয়ারের 'Henriade' সন্ন্যাসিনীরা করেছিল পাণ্ডুরের (৭৭) সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদে জাতীয় সভার পটিফারদের মোকাবেলা করতে হল প্রদেশের অতগুলি জোসেফের সঙ্গে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধরতেই চাইল না এই একান্ত একরোখা ইঙ্গিত। সংবিধান সংশোধন আটকে গেল ঠিক সেই হাতিয়ারের ফলেই যার সহায়তায় তা সংঘটনের কথা, অর্থাৎ জেলা কাউন্সিলের ভোটে। ফ্রান্সের কণ্ঠ, বাস্তবিক-পক্ষে বুর্জোয়া ফ্রান্সেরই কণ্ঠ ধ্বনিত হল, ধ্বনিত হল সংশোধনের বিরুদ্ধেই।

অক্টোবরের গোড়ায় জাতীয় বিধান-সভা আর একবার বসল — tantum mutatus ab illo!* সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল সেটার চেহারা। জেলা কাউন্সিলের তরফে অপ্রত্যাশিতভাবে সংশোধন প্রত্যাখ্যান সেটাকে আবার সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই ঠেলে দিল এবং সূচিত করল সেটার আয়ুষ্কালের সীমানা। অর্লিয়ান্সীরা লেজিটিমিস্টদের এম্‌স্‌-এ তীর্থযাত্রার ফলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল; লেজিটিমিস্টরা আবার সন্দিগ্ধ হয়েছিল লণ্ডনের সঙ্গে অর্লিয়ান্সীদের আলাপ-আলোচনার দরুন (৭৮); দুই গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি আগুনে ইন্ধন যোগাল, আর দাবিদারদের পারস্পরিক দাবিদাওয়ার মাপ করতে বসল। অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্ট উভয় গোষ্ঠী একযোগে বিক্ষোভ জানাল বোনাপার্টপন্থীদের কারসাজিতে, যার প্রকাশ দেখা গেল রাষ্ট্রপতির রাজোচিত পরিভ্রমণে, তাঁর প্রায় স্বচ্ছ মুক্তি প্রয়াসে,

* কী পরিবর্তনই না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে! (ভার্জিল, 'এনেইড')। — সম্পাঃ

বোনাপার্টপন্থী পত্রিকাগুলির উদ্ধত ভাষায়; লুই বোনাপার্ট বিক্ষোভ জানালেন জাতীয় সভা সম্পর্কে, যা শুধু লেজিটিমিস্ট-অর্লিয়ান্সী চক্রান্তকেই বৈধস্থান করত; আর মন্ত্রিসভা সম্পর্কেও যারা কৃতঘ্নের মতো বারবার তাঁকে সঁপে দিচ্ছিল সেই জাতীয় সভার কাছেই। শেষত, মন্ত্রিসভা নিজেও বিভক্ত ছিল রোম সম্পর্কিত নীতি ও মন্ত্রী পাসি কর্তৃক প্রস্তাবিত আয়করের ব্যাপারে, যেটিকে রক্ষণশীলেরা নিন্দা করল সমাজতান্ত্রিক বলে।

পুনঃসমবেত বিধান-সভায় বারো মন্ত্রিসভার প্রথম কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি হল ডাচেস অভ্ অর্লিয়ান্সকে বৈধব্য ভাতা দানের জন্য, ৩,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক ক্রেডিটের দাবি। জাতীয় সভা এটি মঞ্জুর করল এবং ফরাসী জাতির ঋণের তালিকায় যোগ করল সত্তর লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক। এইভাবে লুই ফিলিপ যখন সার্থকভাবে pauvre honteux-এর, সলজ্জ ভিক্ষুকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, তখন মন্ত্রিসভাও ভরসা পেল না বোনাপার্টের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে এবং সভাকেও সে প্রস্তাবে মঞ্জুরি দিতে ইচ্ছুক মনে হল না। আর বরাবরের মতো লুই বোনাপার্ট দোল খেতে থাকলেন দোটানায়: Aut Caesar aut Clichy!*

রোম অভিযানের ব্যয় নির্বাহ বাবত নব্বই লক্ষ ফ্র্যাঙ্কের দ্বিতীয় ক্রেডিটের জন্য মন্ত্রিসভার দাবি একদিকে বোনাপার্ট এবং অন্যদিকে মন্ত্রিসভা ও জাতীয় সভার মধ্যে মনকষাকষি বাড়িয়ে তুলল। লুই বোনাপার্ট তাঁর সামরিক সহকারী এদগার নে-র কাছে লেখা একটি চিঠি 'Moniteur' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করান, যাতে তিনি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিতে শর্তবদ্ধ করলেন পোপ সরকারকে। পোপ তাঁর নিজের দিক থেকে এক ঘোষণা motu proprio (৭৯) প্রকাশ করলেন, যাতে তিনি অগ্রাহ্য করলেন তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনে কোন সীমার আরোপ। বোনাপার্টের চিঠি স্বেচ্ছাকৃত অবিবেচনার সাহায্যে তুলে ধরল তাঁর মন্ত্রিসভার আবরণী, যাতে দর্শকদের চোখে তিনি প্রতিপন্ন হতে পারেন সদিচ্ছাপ্রবণ প্রতিভা হিসেবে, যাঁকে নাকি

---

* হয় সিজার নয় ক্লিচি। (ক্লিচি — দেউলিয়া দেনদারদের জন্য প্যারিসের জেলখানা।) ('Aut Caesar aut nihil' — 'হয় সিজার, নইলে কিছু না', এই সুবিদিত বচনের শব্দান্তর।) — সম্পাঃ

ভুল বোঝা ও আটক রাখা হচ্ছিল তাঁর আপন ঘরেই। 'মুক্ত আত্মার গোপন বিহার'* নিয়ে তাঁর লীলা-খেলা এই প্রথম নয়। কমিশনের বক্তা তিয়ের পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন বোনাপার্টের এই বিহার এবং পোপের ভাষণ ফরাসীতে তরজমা করেই তুষ্ট করলেন নিজেকে। মন্ত্রিসভা নয়, **ভিক্তর হ্যুগোই** রাষ্ট্রপতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন দৈনিক কর্মসূচিতে একটি প্রস্তাব তুলে, যাতে জাতীয় সভাকে মতৈক্য ঘোষণা করতে হয় নেপোলিয়নের চিঠির সঙ্গে। 'Allons donc! Allons donc!'** অপমানকর এই চপল চিৎকারে সংখ্যাগুরুরা ডুবিয়ে দিল হ্যুগোর প্রস্তাব। রাষ্ট্রপতির নীতি? রাষ্ট্রপতির চিঠি? রাষ্ট্রপতি স্বয়ং? 'Allons donc! Allons donc!' শ্রীযুক্ত বোনাপার্টের কথা au sérieux*** ধরে কোন্ হতভাগা? শ্রীযুক্ত ভিক্তর হ্যুগো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমরা বিশ্বাস করি আপনি বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রপতিকে? 'Allons donc! Allons donc!'

শেষ পর্যন্ত বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যেকার বিচ্ছেদ আরও ত্বরান্বিত হল **অর্লিয়ান্সী ও ব্যুরবোঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা** সম্পর্কে আলোচনার ফলে। মন্ত্রিসভার অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির জ্ঞাতি ভাই, ওয়েস্টফালিয়ার প্রাক্তন রাজার পুত্র**** এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী দাবিদারদের বোনাপার্টপন্থী দাবিদারের সঙ্গে একস্তরে নামানো ছাড়া, অথবা বোনাপার্টীয় দাবিদারের **নিচে** তাদের টেনে আনা ছাড়া — তিনি বাস্তবক্ষেত্রে অন্ততঃ রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অশিষ্টতা এতদূর গেল যে, **বিতাড়িত রাজতন্ত্রী পরিবারগুলির প্রত্যাগমন ও জুন বিদ্রোহীদের মার্জনা** তিনি একই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করলেন। পূত ও অপবিত্র, রাজার জাত ও প্রলেতারীয় সন্তানপাল, সমাজের ধ্রুবনক্ষত্র ও তার জলাজমির আলেয়াকে এইরকম অসম্মানজনকভাবে একত্র গ্রথিত করার জন্য সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের

---

* জার্মান কবি হেরভেগ-এর 'পাহাড় থেকে' কবিতার লাইন। — সম্পাঃ

** 'সরে পড়ুন। সরে পড়ুন!' — সম্পাঃ

*** গুরুত্বসহকারে। — সম্পাঃ

**** নেপোলিয়ন জোসেফ বোনাপার্ট, জেরোম বোনোপার্টের পুত্র। — সম্পাঃ

ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইতে এবং প্রস্তাব-দুটির যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট করতে বাধ্য করল। সংখ্যাধিকেরা সোৎসাহে রাজবংশীয়দের ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং লেজিটিমিস্টদের ডেমোস্থিনিস, **বেরিয়ে** এই ভোটের তাৎপর্য সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখলেন না। সিংহাসনের দাবিদারদের সাধারণ নাগরিকদের স্তরে নামিয়ে আনা — প্রস্তাবটার লক্ষ্য হল এই! তাদের জ্যোতি, যে অন্তিম মহিমা তখনও তাদের অবশিষ্ট ছিল সেই **নির্বাসনের মহিমা** হরণ করাই হল এর অভিপ্রায়। বেরিয়ে গর্জন করলেন, সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যিনি তাঁর মহৎ কুলগর্ব ভুলে এখানে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বসবাস করতে ফিরে আসবেন, কী ভাবা হবে তাঁর সম্পর্কে? এর থেকে স্পষ্ট করে লুই বোনাপার্টকে আর জানানো যেত না যে তিনি তাঁর উপস্থিতির ফলে কিছুই জেতেন নি; রাজতন্ত্রীদের জোটের কাছে তাঁর প্রয়োজন এখানে, ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির গদিতে আসীন **নিরপেক্ষ লোক** হিসেবে, আর সিংহাসনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিদারদের রাখতে হবে অপবিত্র দৃষ্টি থেকে দূরে নির্বাসনের কুয়াশার আড়ালে।

১ নভেম্বর লুই বোনাপার্ট বিধান-সভাকে জবাব দিলেন এক বাণী পাঠিয়ে, যাতে বেশ রূঢ়ভাবেই ঘোষণা করা হল বারো মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও নতুন এক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা। বারো-ফালু মন্ত্রিসভা ছিল রাজতান্ত্রিক জোটের মন্ত্রিত্ব; দ'অপুল মন্ত্রিসভা হল বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা, বিধান-সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির এক হাতিয়ার, **কেরানিদের মন্ত্রিসভা।**

বোনাপার্ট তখন আর ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের নিতান্ত **নিরপেক্ষ মানুষটি** নন। কার্যনির্বাহের ক্ষমতা আয়ত্তে থাকায় বেশ কিছু স্বার্থসাধক মহল তাঁর চারিদিকে ভিড় করেছিল; অরাজকতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শৃঙ্খলা পার্টিই বাধ্য হয়েছিল তাঁর প্রভাব বাড়াতে; আর তিনি যদি-বা এখন আর জনগণের প্রিয় না থেকেও থাকেন, তবে শৃঙ্খলা পার্টিই ছিল জনগণের বিরাগভাজন। তিনি কি আশা করতে পারতেন না যে, অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের বাধ্য করতে পারবেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারফত এবং কোন না কোন ধরনের রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার দরুন **নিরপেক্ষ দাবিদারকেই** স্বীকার করে নিতে?

১৮৪৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে শুরু হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের

জীবনের তৃতীয় পর্ব, যে পর্ব শেষ হয় ১৮৫০ সালের ১০ মার্চে। নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মবাঁধা খেলা, যার অত ভক্ত ছিলেন গিজো, কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়ন শক্তির সেই লড়াই এবার শুরু হল। তার চেয়েও বেশি। ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতার স্বত্ব প্রজাতন্ত্রকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব সেই প্রজাতন্ত্রকে; অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টরা, এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে status quo*, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রকে। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও নিজস্ব in petto** লালিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতাদখল ও বিদ্রোহের লালসার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করল বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা **প্রজাতন্ত্রকেই,** যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে।

কাণ্ট যেমন প্রজাতন্ত্রকে, এই রাজতন্ত্রীরা তেমনই **রাজতন্ত্রকেই** রাষ্ট্রের একমাত্র যুক্তিযুক্ত রূপ হিসেবে, ব্যবহারিক বিচারের এমন এক প্রকল্প হিসেবে দাঁড় করাল, যার বাস্তব রূপায়ণে কখনও পৌঁছানো যাবে না, অথচ সর্বদাই তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে ও মনে মনে তাকে মেনে চলতে হবে লক্ষ্য বলে।

এইভাবে, নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের হাতে একটা ফাঁকা মতাদর্শগত সূত্র থেকে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্ত্রীদের হাতে হয়ে দাঁড়ায় সারগর্ভ ও প্রাণবান একটা রূপ। তাই তিয়ের যখন বললেন, 'আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ,' তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।

মৈত্রীবদ্ধ মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ও কেরানিদের মন্ত্রিসভার অভ্যুদয়ের একটা দ্বিতীয় তাৎপর্য রয়েছে। এর অর্থসচিব ছিলেন ফুল্দ্। অর্থসচিব হিসেবে

---

* স্থিতাবস্থা। — সম্পাঃ

** মনে মনে। — সম্পাঃ

ফুল্দ্ থাকার অর্থ সরকারীভাবে ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ ফাটকাবাজারের কাছে সঁপে দেওয়া, ফাটকাবাজার কর্তৃক ও ফাটকাবাজারের স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ব্যবস্থাপন। ফুল্দ্‌কে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গে ফিনান্স অভিজাতবর্গ 'Moniteur' পত্রিকায় তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ঘোষণা করল। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্বভাবতই অন্যান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই পরিপূরণ করল, যেগুলি হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিকলের অতগুলি কড়ামাত্র।

লুই ফিলিপ কখনও কোন খাঁটি ফাটকাবাজারী হাঙরকে (loup-cervier) অর্থসচিব করার ভরসা পান নি। ঠিক যেমন তাঁর রাজতন্ত্র ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া শাসনের আদর্শ নাম, তেমনই তাঁর মন্ত্রিসভায় বিশেষ অধিকারভোগী স্বার্থসাধকদের ধারণ করতে হত মতাদর্শগতভাবে স্বার্থহীন নাম। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সেইসব ব্যাপারকে সর্বক্ষেত্রে সামনে টেনে আনল, লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী উভয় রাজতন্ত্রই যা পিছনে রেখেছিল সংগোপনে। ওরা যাকে স্বর্গীয় করে রেখেছিল, প্রজাতন্ত্র তাকে করে তুলল পার্থিব। সাধুদের নামের জায়গায় তারা বসাল প্রাধান্যশালী শ্রেণীস্বার্থের নির্দিষ্ট বুর্জোয়া নামগুলিকে।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় প্রজাতন্ত্র কিভাবে জন্মের প্রথম দিন থেকে ফিনান্স অভিজাতবর্গকে উচ্ছেদ নয়, সংহতই করছিল। কিন্তু যে সব সুযোগ-সুবিধা সেটাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল নিয়তির বিধান, যার কাছে নতিস্বীকার করতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও। ফুল্দের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উদ্যোগ ফিরে এল ফিনান্স অভিজাতবর্গের হাতে।

প্রশ্ন করা হবে, ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়ারা কী করে মেনে নিল বা সহ্য করল ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসন, লুই ফিলিপের আমলে যে শাসন নির্ভর করেছিল অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বহিষ্করণ বা অধীন করার উপরে?

এর সহজ উত্তর রয়েছে।

প্রথমত, ফিনান্স অভিজাতবর্গ নিজেই হচ্ছে সেই রাজতান্ত্রিক জোটেরই এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষীয় অংশ যার সাধারণ সরকারী শক্তির নাম প্রজাতন্ত্র। অর্লিয়ান্সীদের মুখপাত্র ও মাতব্বরেরা কি ফিনান্স অভিজাতবর্গের পুরনো সহচর ও দুষ্কর্মসঙ্গী নয়? ফিনান্স অভিজাতেরাই কি অর্লিয়ান্সপন্থার স্বর্ণ বাহিনী নয়? আর লেজিটিমিস্টরা তো ইতিপূর্বে

লুই ফিলিপের আমলেই ফাটকাবাজার এবং খনি ও রেলের শেয়ারের ফাটকার সমস্ত ফুর্তিতে কার্যত অংশীদার ছিল। সাধারণভাবে, বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও ফিনান্স অভিজাতবর্গের যোগাযোগ তো **স্বাভাবিক ঘটনা। প্রমাণ ইংলন্ড,** প্রমাণ এমন কি **অস্ট্রিয়াও।**

ফ্রান্সের মতো যে দেশে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জাতীয় ঋণের অঙ্কের অনুপাতে বিসদৃশ ধরনের নিচু মাত্রায়, যেখানে সরকারী বণ্ডই হল ফাটকার সব থেকে প্রকৃষ্ট বিষয়, আর অনুৎপাদী উপায়ে যে পুঁজি লাভবান হতে চায় তা লগ্নী করার প্রধান বাজারই যেখানে ফাটকাবাজার, সেরকম দেশে পুরো বুর্জোয়া বা আধা-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির অসংখ্য মানুষের স্বার্থ থাকবেই সরকারী ঋণে, ফাটকাবাজারের জুয়ায়, ফিনান্সে। এইসব স্বার্থসাধক ছোটোবাবুরা কি তাদের স্বাভাবিক খুঁটি বা সর্দার খুঁজে পায় না সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই যেটা এই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তার ব্যাপকতম রূপরেখায়, তার সমগ্রতায়?

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ফিনান্স অভিজাতবর্গের হাতে গিয়ে জমা হবার কারণ কী? রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দেনা। আর রাষ্ট্রের দেনার কারণ? রাষ্ট্রের আয় থেকে ব্যয়ের নিয়মিত আধিক্য — যে বৈষম্য একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ঋণ ব্যবস্থার কারণ ও ফল।

এই ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় রাষ্ট্রকে ব্যয়সংকোচ ঘটাতে হবে, অর্থাৎ সরকারী যন্ত্রের সরলতাসাধন ও সংকোচন করতে হবে, যথাসম্ভব কম শাসন চালাতে হবে, যথাসম্ভব কম লোক নিয়োগ করতে ও বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে যত কম সম্ভব সম্পর্ক গড়তে হবে। শৃঙ্খলা পার্টির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ অসম্ভব; সেটার দমন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নামে সরকারী হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্র-যন্ত্রের মারফত সর্বব্যাপকতা সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য, যে-পরিমাণে সেটার শাসন ও শ্রেণী-অস্তিত্বের শর্তগুলিকে বিপন্ন করার মতো মহলের সংখ্যা বেড়ে চলবে। ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপরে হামলা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে সশস্ত্র পুলিসের (gendarmerie) সংখ্যা হ্রাস করা চলে না।

অথবা রাষ্ট্রকে ঋণের দায় এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ও বাজেটের একটা আশু যদিও সাময়িক সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে সব থেকে বিত্তশালী শ্রেণীগুলির উপরে **বিশেষ কর** চাপিয়ে। কিন্তু ফটকাবাজার কর্তৃক জাতীয়

সম্পদের শোষণ বন্ধ করার জন্য পিতৃভূমির বেদী-তলে শৃঙ্খলা পার্টি কি উৎসর্গ করবে তার নিজের সম্পদ? Pas si bête!*

সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রে পুরোপুরির বিপ্লব না ঘটলে ফরাসী রাষ্ট্রীয় বাজেটের বিপ্লব সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্রীয় বাজেটের সঙ্গে স্বভাবতই জড়িত রাষ্ট্রীয় ঋণ, আর রাষ্ট্রীয় ঋণের সঙ্গে অবশ্যই চলে রাষ্ট্রীয় ঋণ নিয়ে কারবারের প্রভুত্ব, সরকারের পাওনাদার, ব্যাঙ্কার, টাকার কারবারী ও ফাটকাবাজারের নেকড়েদের প্রভুত্ব। শৃঙ্খলা পার্টির একটিমাত্র গোষ্ঠীর, **কারখানা-মালিকদের** প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্ছেদে — আমরা মাঝারিদের, শিল্পে নিযুক্ত ছোটখাটোদের কথা বলছি না, আমরা বলছি শিল্প স্ব-কুলে অধিপতি নৃপতিদের কথা, লুই ফিলিপের আমলে রাজবংশগত বিরোধিতার যারা ছিল ব্যাপক ভিত্তি। নিঃসন্দেহে তাদের স্বার্থ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসে, আর তাই উৎপাদনের মধ্যে যা প্রবেশ করে সেই কর হ্রাসে, আর তাই যে ঋণের সুদ করের মধ্যে ঢোকে সেই সরকারী ঋণ হ্রাসে, সুতরাং ফিনান্স অভিজাতবর্গের উচ্ছেদে।

সব থেকে বড় বড় ফরাসী শিল্পপতিরা তাদের ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় পেটি বুর্জোয়া মাত্র, সেই ইংলণ্ডে আমরা সত্যই দেখতে পাই যে শিল্পপতিরা, একজন কবডেন, একজন ব্রাইট ব্যাঙ্ক ও ফাটকাবাজারের অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদের নায়কতা করছেন। ফ্রান্সে নয় কেন? ইংলণ্ডে শিল্পই প্রধান, ফ্রান্সে প্রাধান্য কৃষির। ইংলণ্ডে শিল্পের প্রয়োজন অবাধ বাণিজ্যের; ফ্রান্সে প্রয়োজন রক্ষণ-শুল্কের, অন্যান্য একচেটিয়ার পাশাপাশি জাতীয় একচেটিয়ার। ফরাসী উৎপাদনে ফরাসী শিল্পের প্রাধান্য নেই; কাজেই ফরাসী শিল্পপতিরাও ফরাসী বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রধান নয়। অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের বিপক্ষে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজদের মতো তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে আপন স্বার্থকে সামনে আনতে পারে না; তাদের চলতে হয় বিপ্লবের পিছু পিছু, আর এমন সব স্বার্থের সেবা করতে হয় যা তাদের শ্রেণীর যৌথ স্বার্থের বিরোধী। ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অবস্থান তারা ভুল বুঝেছিল; ফেব্রুয়ারি তাদের বুদ্ধিকে পাকিয়ে

* অত বোকা সে নয়। — সম্পাঃ

তুলল। আর নিয়োগকর্তা, শিল্প পুঁজিপতিদের চেয়ে আর কে বেশি শ্রমিকদের দ্বারা সরাসরি বিপন্ন? সুতরাং স্বভাবতই ফ্রান্সে কারখানা-মালিকেরা হল শৃঙ্খলা পার্টির সব থেকে উগ্র সদস্য। ফিনান্সের হাতে তার **মুনাফা** হ্রাস — **প্রলেতারিয়েতের হাতে মুনাফানাশের তুলনায় সেটা আর এমন কী?**

শিল্প বুর্জোয়ার স্বভাবত যা করার কথা, ফ্রান্সে তা করে পেটি বুর্জোয়া; পেটি বুর্জোয়ার যা স্বাভাবিক কাজ সেটা করে শ্রমিকেরা; আর শ্রমিকদের কাজ, সেটা কে করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মাত্র হয়। জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে, যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু হয় সেই মুহূর্তে যখন বিশ্বযুদ্ধ মারফত প্রলেতারিয়েতকে ঠেলে দেওয়া হয় বিশ্ববাজারের মাতব্বরদের পুরোভাগে, ইংলণ্ডের পুরোভাগে। এক্ষেত্রে যে-বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে না, ঘটে সাংগঠনিক সূত্রপাত, সেটা স্বল্পস্থায়ী বিপ্লব নয়। বর্তমান পুরুষ-পর্যায় হচ্ছে ইহুদীদের মতো, মুসা যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মরুভূমির মধ্য দিয়ে। একে এক নতুন দুনিয়া জয় করতে হবে শুধু তাই নয়, এদের পথ ছেড়ে দিতে হবে তাদের জন্য যারা সামাল দিতে পারবে নতুন দুনিয়ার। ফুল্দ্ প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক।

১৮৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর ফুল্দ্ জাতীয় সভার মঞ্চে উঠলেন ও ব্যাখ্যা করলেন তাঁর আর্থিক নীতির, যা পুরনো কর ব্যবস্থারই সাফাই! মদ্য-কর বজায় রাখা! পাসির আয়কর বর্জন!

পাসিও কিছু বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন লুই ফিলিপের পুরনো মন্ত্রী। দ্যুফোর মার্কা গোঁড়াপন্থী এবং জুলাই রাজতন্ত্রের যিনি যত দোষ নন্দঘোষ, সেই তেস্ত-এর* সব থেকে অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত

* ১৮৪৭ সালের ৮ জুলাই প্যারিসে সম্ভ্রান্ত সংসদের (Chamber of Peers) সামনে লবণ গোলার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজপুরুষদের ঘুষ দেবার জন্য পার্মাঁতিয়ে ও জেনারেল ক্যুবিয়েরের এবং ঐ ঘুষ খাওয়ার জন্য তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী তেস্ত-এর বিচার শুরু হয়। বিচারের সময় শেষোক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সকলেরই মোটা জরিমানা হয়, তেস্ত-এর হয় আরো তিন বছর কারাদণ্ড। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

ছিলেন তিনি। পাসিও পুরনো কর ব্যবস্থার তারিফ করেছিলেন ও মদ্য-কর বজায় রাখার সুপারিশ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি পর্দা খসিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা এড়াতে হলে নতুন একটা কর, আয়-করের প্রয়োজন, এই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ফুল্দ্, যিনি লেদ্রু-রলাঁর কাছে সুপারিশ করেছিলেন সরকারী দেউলিয়াপনার, তিনি বিধান-সভার কাছে সুপারিশ জানালেন রাষ্ট্রীয় ঘাটতির। তিনি ব্যয় সঙ্কোচের প্রতিশ্রুতি দিলেন, যার রহস্য পরে এই ধরনের ব্যাপারে উদ্ঘাটিত হল যেমন, খরচ কমল ছ-কোটি, আর চালু ঋণ বাড়ল বিশ কোটি — সংখ্যা বিন্যাসের, হিসাব সাজানোর হাতসাফাই. শেষ পর্যন্ত যে সবেরই পরিণতি নতুন ঋণে।

অন্য ঈর্ষাপেরায়ণ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি ফিনান্স অভিজাতবর্গ স্বভাবতই ফুল্দের আমলে, লুই ফিলিপের রাজত্বকালের মতো অত নির্লজ্জ দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ চালায় নি। কিন্তু তার অস্তিত্ব বহাল থাকায় ব্যবস্থাটাও একই রকম থেকে গেল: ক্রমাগত ঋণবৃদ্ধি ও ঘাটতি গোপন। আর যথাকালে, ফাটকাবাজারের পুরনো জুয়াচুরিও আরো প্রকাশ্যে দেখা দিল। প্রমাণ: আভিনোঁ রেলপথ সম্পর্কিত আইন, সরকারী সিকিউরিটির রহস্যজনক দর ওঠা-পড়া, অল্প কিছুকালের জন্য যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সারা প্যারিসের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সর্বশেষে ১০ মার্চের নির্বাচন ব্যাপারে ফুল্দ্ ও বোনাপার্টের হতভাগ্য দুরকল্পনা।

ফিনান্স অভিজাতবর্গের সরকারী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জনসাধারণকে আবার একবার সম্মুখীন হতে হল এক ২৪ ফেব্রুয়ারির।

সংবিধান-সভা তার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝোঁকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মদ্য-কর উঠিয়ে দিয়েছিল। পুরনো কর তুলে দিয়ে নতুন ঋণ পরিশোধ করা যায় না। শৃঙ্খলা পার্টির এক নির্বোধ **ক্রেতোঁ** বিধান-সভার অধিবেশন বিরতির আগেই মদ্য-কর বজায় রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভার নামে ফুল্দ্ সেই প্রস্তাব হাজির করলেন এবং বোনাপার্টকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার বার্ষিকীতে, ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সভা **মদ্য-কর পুনঃপ্রবর্তনের** বিধান দিল।

এই পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাবক কোন ফিনান্সপতি নয়, তিনি হলেন জেশুইট নেতা **ম'তালাঁবের**। তাঁর যুক্তি আশ্চর্যরকম সরল: কর ব্যবস্থা হচ্ছে মায়ের বুক, যার স্তন্যপান করে সরকার। সরকার হচ্ছে পীড়নযন্ত্র, কর্তৃত্বের সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, পুলিস; সরকার হল রাজপুরুষ, বিচারক, মন্ত্রী আর **পাদ্রী**। কর ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ হচ্ছে প্রলেতারিয়ান বর্বরদের অনুপ্রবেশ থেকে বুর্জোয়া সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ফসল রক্ষার জন্য যারা পাহারা দেয়, শৃঙ্খলার সেই প্রহরীদের উপরে নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ। সম্পত্তি, পরিবার, শৃঙ্খলা ও ধর্মের পাশাপাশি পঞ্চম দেবতা হচ্ছে কর ব্যবস্থা। আর মদ্য-কর অবিসংবাদীভাবেই কর আর তার উপরে মামুলী নয়, সেটা ঐতিহ্যসম্মত, রাজতন্ত্রঘেঁষা, ভদ্র কর। Vive l'impôt des boissons!* বারবার তিনবারের পরেও আরো একবার জয়ধ্বনি!

ফরাসী কৃষকেরা যখন শয়তানের ছবি আঁকে, তখন তাকে আঁকা হয় কর সংগ্রাহকের বেশে। ম'তালাঁবের যেই কর ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের পর্যায়ে তুললেন, অমনি কৃষক নিরীশ্বর নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল এবং ঝাঁপ দিল শয়তানের কোলে, **সমাজতন্ত্রের** কোলে। শৃঙ্খলার ধর্ম তাকে হারাল, জেশুইটরা তাকে হারাল, তাকে হারালেন বোনাপার্ট। ১৮৪৯-এর ২০ ডিসেম্বর অপরিবর্তনীয়ভাবে খেলো করে দিল ১৮৪৮-এর ২০ ডিসেম্বরকে। 'খুড়োর ভাইপোই' তাঁর পরিবারের প্রথম লোক নন যাঁকে পরাস্ত করল মদ্য-কর, সেই কর, ম'তালাঁবের ভাষায় যা নাকি বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার আহ্বায়ক। সেন্ট হেলেনা-য় আসল মহান নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে, মদ্য-করের পুনঃপ্রবর্তনই তাঁর পতনে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছে, কারণ তার ফলেই দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকেরা বিমুখ হয়ে যায় তাঁর প্রতি। চতুর্দশ লুই-এর আমলেই জনগণের ঘৃণার প্রধান পাত্র (বুয়াগিইবের ও ভবাঁ-এর লেখা দ্রষ্টব্য) ও প্রথম বিপ্লবের ফলে বাতিল এই করটিকে নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রবর্তিত করেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন ফ্রান্সে প্রবেশ করে তখন তার সামনে শুধু কসাকদের (৮০) নাচন নয়, নাচছিল মদ্য-কর বাতিলের প্রতিশ্রুতিও। বড়ঘরের মানুষদের (gentilhommerie) স্বভাবতই দায় পড়ে না, খেয়াল

* মদ্য-কর দীর্ঘজীবী হোক! — সম্পাঃ

খুশিমতো যে লোকের ঘাড়ে কর চাপানো যায় (gens taillables à merci et miséricorde) তার কাছে প্রতিশ্রুতি রাখার। ১৮৩০ সাল প্রতিশ্রুতি দিল মদ্য-কর বাতিলের। যা বলত তাই করা বা যা করত তাই বলা অবশ্য তার ধাতে ছিল না। ১৮৪৮ সাল মদ্য-কর বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সব কিছুরই। সর্বশেষে যে সংবিধান-সভা কোন কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় নি, সে অন্তিম উইলে ব্যবস্থা করে যায় যাতে ১৮৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মদ্য-কর উঠে যায়। আর ১৮৫০-এর ১ জানুয়ারি তারিখের ঠিক দশ দিন আগে বিধান-সভা সেটার পুনঃপ্রবর্তন ঘটাল। ফরাসী জনসাধারণ তাই ক্রমাগত এর পিছনে তাড়া করে যখন দরজা দিয়ে তাকে বার করে দিল, তখন দেখা গেল যে ওটা আবার ফিরে এসেছে জানলা দিয়ে।

মদ্য-করের বিরুদ্ধে জনবিরাগের কারণ হল এই যে, ফরাসী কর ব্যবস্থার সমস্ত জঘন্যতা মিলিত হয়েছিল এর মধ্যে। সেটার সংগ্রহ পদ্ধতি জঘন্য, বণ্টন পদ্ধতি অভিজাত, কারণ সবচেয়ে মামুলী আর সবচেয়ে দামী উভয় মদের উপরেই করের হার ছিল একই; কাজেই, এ করের গুণোত্তর বৃদ্ধি ঘটত মদ্যপায়ীর আয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, এটা ছিল যেন উল্টো ধরনের ক্রমোন্নত একটি কর। তদনুসারে ভেজাল ও নকল মদের আনুকূল্য ক'রে এই কর মেহনতী শ্রেণীগুলির উপরে সরাসরি বিষপ্রয়োগে প্ররোচনা যোগাত। পণ্যের ব্যবহার এর ফলে কমে যেত, কারণ ৪,০০০-এর বেশি অধিবাসীর শহরগুলির ফটকের সামনে তা বসায় octrois*; ফলে যেন ফরাসী মদের বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্ক বসিয়েছে এমন সব পরদেশে রূপান্তরিত হয় তেমন প্রত্যেকটি শহর। বড় মদ্য ব্যবসায়ীরা, তার থেকেও বেশী পরিমাণে ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা (marchands de vins), মদ বিক্রয়কেন্দ্রের মালিকেরা, মদবিক্রয়ের উপর যাদের জীবিকা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, এরা সবাই মদ্য-করের উপরে খড়্গহস্ত। সর্বোপরি, মদের ব্যবহার হ্রাস ক'রে এই কর উৎপাদকের বিক্রয়-ক্ষেত্রের। এই কর যেমন শহুরে শ্রমিকদের মদের দাম দিতে অপারগ করে তোলে, তেমনই মদের জন্য যারা আঙুরের চাষ করে তারাও এর দরুন মদ

---

* স্থানীয় শুল্ক সংগ্রহের দপ্তর। — সম্পাঃ

বিক্রয় করে উঠতে পারে না। অথচ ফ্রান্সে আঙুর-চাষীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এককোটি বিশ লক্ষ। সাধারণভাবে এ ব্যাপারে মানুষের বিদ্বেষ তাই বোঝা যায়, বিশেষ করে বোঝা যায় মদ্য-করের বিরুদ্ধে কৃষকদের উগ্রতা। এর উপরে, তারা এই কর পুনঃপ্রবর্তনের ভিতরে কোন বিচ্ছিন্ন, মোটের উপরে আকস্মিক ঘটনামাত্র দেখে নি। কৃষকদের এক ধরনের স্বকীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে, যেটার ধারা পিতা থেকে পুত্রে প্রবহমান; আর সেই ঐতিহাসিক বিদ্যালয়ে শোনা যায় যে, যখনই কোন সরকার কৃষকদের ঠকাতে চায় তখনই সেটা মদ্য-কর উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং যখনই কৃষকদের প্রতারণা সম্পন্ন হয়ে যায় তখনই করটা বজায় রাখে বা পুনঃপ্রবর্তিত করে। মদ্য-করের মধ্যে কৃষকেরা শুঁকে দেখে সরকারের গন্ধ, সেটার ঝোঁক। ২০ ডিসেম্বর মদ্য-করের পুনঃপ্রবর্তনের অর্থ দাঁড়াল **লুই বোনাপার্টও অন্যদের শামিল**। কিন্তু তিনি তো অন্যদের মতো ছিলেন না; তিনি **কৃষকদেরই এক আবিষ্কার**। আর মদ্য-করের বিপক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষরের দরখাস্ত মারফত তারা যেন ফিরিয়ে নিল সেই ভোট, এক বছর আগে যা তারা দিয়েছিল 'খুড়োর ভাইপোকে'।

মোট ফরাসী জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি গ্রামের মানুষ, তাদের অধিকাংশই তথাকথিত স্বাধীন **জমি-মালিক**। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক বোঝা থেকে বিনা খরচে মুক্তি লাভ করায় এদের প্রথম পুরুষ জমির জন্য কোন দাম দেয় নি। কিন্তু তাদের আধা-ভূমিদাস পূর্বপুরুষদের যা দিতে হত খাজনা, আবওয়াব, বেগারখাটা (corvée) প্রভৃতি খাতে, সেটা উত্তর পুরুষদের দিতে হতে লাগল **জমির দাম** হিসেবে। একদিকে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেল ও অন্যদিকে জমির বিভাজন যেমন বাড়তে থাকল, টুকরো ভাগগুলির দরও তেমন চড়তে লাগল, কারণ যতই টুকরো ছোট হল ততই সেগুলির চাহিদা বেড়ে গেল। কিন্তু জমির টুকরোটার জন্য কৃষকের দেওয়া দাম যে-অনুপাতে বাড়ল, তা সে-জমি সে সরাসরিই কিনুক বা তার সহ-উত্তরাধিকারীদের কাছে তা পুঁজি হিসেবে গণ্য করিয়েই নিক, **কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা** অর্থাৎ **মর্টগেজও** বাধ্য হয়ে ততই বাড়তে লাগল। জমির উপর দায় চাপিয়ে যে ঋণের দাবি তাকেই বলে **মর্টগেজ**, জমির ক্ষেত্রে বন্ধকী খত। মধ্যযুগীয় ভূসম্পত্তির উপরে যেভাবে **বিশেষ অধিকারগুলি** জমে উঠেছিল, তেমনই **মর্টগেজ** জমতে থাকে আধুনিক ক্ষুদে জোতগুলির

উপরে। অপরপক্ষে, জমি বিভাজন ব্যবস্থায় জমি হল সেটার মালিকের একটা নিছক **উৎপাদন হাতিয়ার।** জমির ফলপ্রসূতা আবার জমি বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একই মাত্রায় হ্রাস পায়। জমিতে যন্ত্রের প্রয়োগ, শ্রমবিভাগ. জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচ প্রণালী প্রভৃতি জমির উন্নতিবিধায়ক প্রধান ব্যবস্থাগুলি আরও বেশি পরিমাণে অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর উৎপাদনের হাতিয়ারটারই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির **অনুৎপাদী খরচও** বেড়ে চলে সেই অনুপাতে। এ সবই ঘটে ক্ষুদে জোতের মালিকের হাতে পুঁজি থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যতই বিভাজন বেড়ে যায়, ততই একান্ত শোচনীয় সাজসরঞ্জাম সমেত জমির টুকরোটাই হয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদে জোতের কৃষকদের সমগ্র পুঁজি; ততই জমিতে পুঁজি প্রয়োগ কমতে থাকে; ততই কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ নেওয়ার মতো জমি, টাকা ও শিক্ষার অভাব ঘটে কুটিরবাসী কৃষকের, আর সঙ্গে সঙ্গে অবনতি ঘটতে থাকে ভূমিকর্ষণের। শেষ পর্যন্ত, **মোট পরিভোগ** যেমন বাড়ে সেই অনুপাতে কমতে থাকে **নীট মুনাফা**, কেননা কৃষকের সমগ্র পরিবার তার জোতের টানে অন্য পেশা গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে অথচ তার থেকে তাদের জীবনধারণের উপায় কুলিয়ে ওঠে না।

সুতরাং যে পরিমাণে জনসংখ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বিভাজন বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই **উৎপাদনের সাধিত্র**, জমিও **দুর্মূল্য হতে থাকে** ও **তার উর্বরতা** হ্রাস পায়, **কৃষির অবনতি ঘটে এবং কৃষকের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপে**। আর যা ছিল ফল তাই ঘুরে আবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক পুরুষ পরবর্তী পুরুষকে রেখে যায় আরো ঋণের অতলে; প্রত্যেক নতুন পুরুষ শুরু করে আরও প্রতিকূল, আরও খারাপ অবস্থা থেকে, মর্টগেজ থেকে আরো মর্টগেজের উদ্ভব হয়; আর কৃষকের পক্ষে যখন **নতুন ঋণ** পাওয়ার জন্য তার ক্ষুদে জোত বাঁধা রাখা, অর্থাৎ তার ওপর নতুন মর্টগেজ চাপানো অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন সে সরাসরি শিকার হয়ে পড়ে **সুদখোরির**, আর **সুদখোরী কুসীদের হারও** ততই অপরিমিত হয়ে দাঁড়ায়।

তাই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, ফরাসী কৃষক জমি বন্ধক রাখা **মর্টগেজের সুদ**, এবং **বিনা বন্ধকে সুদখোরেরা যে টাকা কর্জ দেয়** তার সুদ হিসেবে পুঁজিপতির হাতে তুলে দিচ্ছে শুধু ভূমিখাজনা নয়, শুধু শিল্পগত

মুনাফা নয়, এককথায় কেবলমাত্র **সমগ্র নীট মুনাফা** নয়, তুলে দিচ্ছে **মজুরির একাংশ** পর্যন্ত, তাই এইভাবে সে নেমে গেছে **আইরিশ প্রজাচাষীর** সমপর্যায়ে, আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে **ব্যক্তিগত সম্পত্তিমালিক** হওয়ার অছিলায়।

ফ্রান্সে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে ক্রমবর্ধমান **করের বোঝা** ও **আদালতের খরচার দরুন,** যার কিছুটা দরকার পড়ে ফরাসী আইনকানুন ভূমিস্বত্বকে যে আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়েছে সরাসরি তারই কারণে; কিছুটা ভূমিখন্ডগুলি সর্বত্রই পরস্পরকে ঘিরে থাকা ও কাটাকাটি করার ফলে যে অসংখ্য বিরোধ ঘটে তার জন্য; এবং কিছুটা কৃষকদের মামলাবাজির ফলে — এই কৃষকদের সম্পত্তিভোগ সীমাবদ্ধ তাদের কাল্পনিক সম্পত্তির পাট্টা, তাদের **স্বত্বাধিকার** প্রতিষ্ঠার ক্ষেপামিতে।

১৮৪০ সালের এক পরিসংখ্যান বিবৃতি অনুসারে ফরাসী কৃষির মোট উৎপাদন ছিল ৫,২৩,৭১,৭৮,০০০ ফ্র্যাঙ্ক পরিমাণ। যারা খাটে তাদের পরিভোগের পরিমাণ ধরে কৃষির খরচ দাঁড়ায়, ৩,৫৫,২০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক। বাকি থাকে ১,৬৮,৫১,৭৮,০০০ ফ্র্যাঙ্ক পরিমাণের নীট উৎপন্ন, যার থেকে ৫৫,০০,০০,০০০ বাদ দিতে হবে মর্টগেজের সুদ বাবদ, ১০,০০,০০,০০০ ফ্র্যাংক আদালত কর্মচারীদের পাওনা বাবদ, ৩৫,০০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক কর বাবদ, এবং ১০,৭০,০০,০০০ ফ্র্যাংক রেজিস্ট্রি খরচ, স্ট্যাম্প মাসুল, মর্টগেজ ফী প্রভৃতি বাবদ। বাকি থাকে নীট উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৫৩,৮০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক। জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিলে মাথাপিছু ২৫ ফ্র্যাঙ্ক নীট উৎপন্নও পড়ে না (৮১)। স্বভাবতই মর্টগেজ বাদে সুদখোরি বা উকিলের পাওনা প্রভৃতি এই হিসাবে ধরা হয় নি।

প্রজাতন্ত্র পুরনোর উপরে নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবার দরুন ফরাসী কৃষকদের হাল কী দাঁড়াল বুঝতেই পারা যায়। দেখা যায় যে, তাদের উপরে শোষণ শুধু **রূপের** দিক দিয়েই শিল্প শ্রমিকদের উপরে শোষণের থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: **পুঁজি।** ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে **মর্টগেজ ও সুদখোরি** মারফত; গোটা পুঁজিপতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে **সরকারী কর** মারফত। কৃষকের স্বত্বাধিকারই হল সেই কবচ যার দ্বারা পুঁজি এযাবৎ তাকে যাদু করে এসেছে সেই অছিলা যা

তাকে লাগিয়েছে শিল্প শ্রমিকদের বিপক্ষে। একমাত্র পুঁজির পতনেই কৃষকের উন্নতিবিধান সম্ভব; পুঁজিপতি-বিরোধী প্রলেতারীয় সরকারই শুধু অবসান ঘটাতে পারে তার আর্থিক দুর্গতির, তার সামাজিক অবনতির। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** হল তার ঐক্যবদ্ধ শোষকদের একনায়কত্ব, **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক, লাল** প্রজাতন্ত্র হচ্ছে তার মিত্রদের একনায়কত্ব। পাল্লা ওঠে পড়ে আবার ভোটের বাক্সে ফেলা কৃষকের ভোটের সঙ্গে সঙ্গে। তার ভাগ্য স্থির করতে হবে স্বয়ং তাকেই। সমাজতন্ত্রীরা এ কথাই বলছিল পুস্তিকা, বার্ষিকী, দিনপঞ্জী ও নানা ইস্তাহার মারফত। এই ভাষা তার কাছে আরো বোধগম্য হল শৃঙ্খলা পার্টির পাল্টা লেখালেখির ফলে; সে পার্টিও কৃষকের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল এবং স্থূল অত্যুক্তি আর সমাজতন্ত্রীদের অভিপ্রায় ও আদর্শ সম্পর্কে তার ক্রূর ধারণা ও বর্ণনা দ্বারা খাঁটি কৃষকের মনের তারে ঘা দিয়েছিল, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আরও উদ্দীপিত করে তুলেছিল তার তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু সব থেকে বোধগম্য ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষা, যে অভিজ্ঞতা কৃষকেরা সঞ্চয় করেছিল ভোটাধিকার ব্যবহারের ফলে; সবচেয়ে বোধগম্য ছিল মোহভঙ্গগুলো, যা তাকে অভিভূত করে ফেলছিল বৈপ্লবিক গতিতে, আঘাতের পর আঘাতে। **বিপ্লবই হচ্ছে ইতিহাসের ইঞ্জিন।**

কৃষকদের ক্রমিক বৈপ্লবিক রূপান্তর নানা লক্ষণের ভিতর দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিধান-সভা নির্বাচনে ইতিপূর্বেই তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, দেখা গেল লিয়োঁ-র প্রান্তবর্তী পাঁচটি জেলার অবরোধের অবস্থার মধ্যে, দেখা গেল ১৩ জুনের মাস কয়েক পরে জিরোঁদ জেলা কর্তৃক অবিশ্বাস্য পরিষদের* (Chambre introuvable) প্রাক্তন সভাপতির জায়গায় 'পর্বতের' লোকের নির্বাচনে; দেখা গেল মৃত লেজিটিমিস্ট প্রতিনিধির জায়গায় ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর দ্যু গার (du Gard) (৮২) জেলায় এক লাল প্রার্থীর নির্বাচনে, যে এলাকা ছিল লেজিটিমিস্টদের কল্পরাজ্য, ১৭৯৪ ও ১৭৯৫ সালে যা ছিল প্রজাতন্ত্রীদের উপরে ভীষণতম উৎপীড়নের রঙ্গমঞ্চ, এবং

---

* ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় পতনের ঠিক পরেই যে অত্যুগ্র রাজতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচিত হয় ইতিহাসে তার এই নামকরণ হয়েছিল। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

১৮১৫ সালে যা ছিল শ্বেত সন্ত্রাসের কেন্দ্র, যেখানে উদারপন্থী ও প্রটেস্টাণ্টদের হত্যা করা হয়েছিল প্রকাশ্যে। সব থেকে স্থাণু শ্রেণীর এই বৈপ্লবিক রূপান্তর সব থেকে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মদ্য-কর পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে। সরকারী ব্যবস্থাদি এবং ১৮৫০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের আইনগুলি প্রায় একান্তভাবেই প্রযুক্ত হয়েছিল **জেলাগুলি ও কৃষকদের** বিরুদ্ধে। এইটাই তাদের অগ্রগতির সব থেকে পরিষ্কার প্রমাণ।

দ'অপুল বিজ্ঞপ্তি, যার দ্বারা সশস্ত্র পুলিসকে প্রিফেক্ট, সাব-প্রিফেক্ট ও সর্বোপরি মেয়রের ইন্‌কিউজিটর নিয়োগ এবং সুদূরতম গ্রামের গোপন আনাচে-কানাচেও গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা হল; **স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইন,** যার দ্বারা কৃষক শ্রেণীর গুণীজন, মুখপাত্র, গুরু ও ব্যাখ্যাকারেরা হল প্রিফেক্টের স্বৈরাচারী ক্ষমতাধীন, যাতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যকার এই প্রলেতারিয়ানরা একটা থেকে অন্য সম্প্রদায়ে বিতাড়িত জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে ফিরল; **মেয়র-বিরোধী আইন,** যার দ্বারা পদচ্যুতির আশঙ্কারূপী দ্যামোক্লিসের খড়্গ এদের মাথার উপরে ঝোলানো রইল, আর কৃষক-সম্প্রদায়গুলির এই সভাপতিরা প্রতি মুহূর্তেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও শৃঙ্খলা পার্টির বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছিল; সেই **অর্ডিনান্স,** যাতে সতেরোটি সামরিক জেলাকে রূপান্তরিত করা হল চারটি পাশালিক এলাকায় (৮৩) এবং ফরাসীদের উপরে সৈন্য ব্যারাক আর শিবির চাপিয়ে দিল জাতীয় **আড্ডা বৈঠক** হিসেবে; **শিক্ষা আইন,** যার দ্বারা শৃঙ্খলা পার্টি সর্বজনীন ভোটাধিকারের আমলে ফ্রান্সের জীবনের শর্তরূপে যেন ঘোষণা করল তার অজ্ঞানতা ও জবরদস্তি বিমূঢ়তাকেই; এইসব আইন ও ব্যবস্থাদির প্রকৃতিটা কী? শৃঙ্খলা পার্টির তরফে জেলাগুলিকে ও জেলার কৃষকদের পুনরায় জয় করারই মরিয়া চেষ্টা মাত্র।

পীড়ন হিসেবে এগুলি ছিল নিকৃষ্ট পদ্ধতি, যা গলা টিপে মারল নিজের উদ্দেশ্যকেই। মদ্য-কর, ৪৫ সাঁতিম কর বজায় রাখা, শতকোটি ফ্র্যাঙ্ক ফেরত দেবার জন্য কৃষকদের আবেদনগুলিকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি বড় বড় ব্যবস্থা, এইসব আইনী বজ্রাঘাত কেন্দ্র থেকে পাইকারীভাবে একবারই পড়েছিল কৃষক শ্রেণীর উপরে; যে সব আইন ও ব্যবস্থাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা আক্রমণ ও প্রতিরোধকে **সাধারণ** ও প্রতিটি কুটিরের প্রতিদিনের

আলোচ্য বিষয় করে তুলল। প্রতিটি গ্রামে তা বিপ্লবের টিকা দিয়ে দিল; **বিপ্লবকে করে তুলল স্থানীয়ভূত ও কৃষকীভূত।**

পক্ষান্তরে, বোনাপার্টের এই সকল প্রস্তাব ও জাতীয় সভা কর্তৃক সেগুলিকে গ্রহণ কি অরাজকতা দমন, অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শ্রেণী দাঁড়ায় তাদের দমনের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দুই শক্তির ঐক্যই প্রমাণ করে না? **সুলুক** তাঁর অশিষ্ট বক্তব্যের (৮৪) ঠিক পরেই কি বিধান-সভাকে তাঁর dévouement* সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করেন নি তার অব্যবহিত পরবর্তী **কার্লিয়ে**-র বক্তব্য মারফত (৮৫), যে কার্লিয়ে ছিলেন ফুশে-র নোংরা ও নীচ এক ব্যঙ্গমূর্তি, যেমন লুই বোনাপার্ট নিজেই ছিলেন নেপোলিয়নের শূন্যগর্ভ ব্যঙ্গমূর্তি।

শিক্ষা আইন আমাদের দেখাল তরুণ ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রবীণ ভলটেয়ারভক্তদের মৈত্রীর দৃশ্য। ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া শাসন কি জেশুইট-সমর্থক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও লোকদেখানো যুক্তিবাদী জুলাই রাজতন্ত্রের সম্মিলিত স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছু হতে পারত? প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামের সময়ে এক বুর্জোয়া উপদল অন্য উপদলের বিরুদ্ধে যে হাতিয়ার ছড়িয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে; তা কি সেই জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে না যখন শেষোক্তরা তাদের ঐক্যবদ্ধ একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? **জেশুইটবাদের** এই লাস্যময়ী প্রদর্শনীর (étalage) চেয়ে বেশি করে প্যারিসের দোকানীদের আর কিছুই ক্ষুব্ধ করে নি, এমন কি আপোসে মিটমাটের প্রত্যাখ্যানও নয়।

ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন উপদলের মধ্যে এবং জাতীয় সভা ও বোনাপার্টের মধ্যে সংঘাত চলতেই থাকল। জাতীয় সভা মোটেই খুশি হয় নি যে বোনাপার্ট তাঁর হঠাৎ কুদেতার ঠিক পরেই, তাঁর নিজস্ব বোনাপার্টপন্থী মন্ত্রিসভা নিয়োগের পর রাজতন্ত্রের অথর্বদের, সদ্যনিযুক্ত প্রিফেক্টদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর পুনঃনির্বাচনের জন্য তাদের তরফ থেকে সংবিধানবিরুদ্ধ আন্দোলনকেই তাদের চাকরির শর্ত করলেন; সভা খুশি হয় নি যে কার্লিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা

* শৃঙ্খলানুগতা। — সম্পাঃ

উদ্‌যাপন করলেন একটি লেজিটিমিস্ট ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে অথবা বোনাপার্ট তাঁর নিজস্ব এক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন 'Le Napoléon' (৮৬) নামে, যার মধ্যে জনসাধারণের নিকটে প্রকট হতে থাকল রাষ্ট্রপতির গোপন কামনা অথচ বিধান-সভার মঞ্চ থেকে তাঁর মন্ত্রীদের সেকথা অস্বীকার করতে হচ্ছিল। সভা মোটেই খুশি হয় নি যে, বহু অনাস্থা ভোট সত্ত্বেও তাচ্ছিল্যভরে মন্ত্রিসভা বজায় রাখা হল; প্রতিদিন চার সু বাড়তি মাইনে দিয়ে নিম্নস্তরের অফিসারদের অথবা এজেন স্যু-র 'রহস্য'* মেরে দিয়ে মানরক্ষার ঋণ ব্যাঙ্ক যুগিয়ে প্রলেতারিয়েতকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টাতেও খুশি হয় নি সভা। সর্বোপরি, সভা মোটেই খুশি হয় নি সেই ঔদ্ধত্যে, যার মারফত মন্ত্রীদের বাধ্য করা হল বাকি জুন বিদ্রোহীদের আলজিয়েরের্সে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাব করতে, যাতে বিধান-সভার উপরে en gros** জনসাধারণের বিরাগ চাপানো যায়, অথচ রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিবিশেষে মার্জনা বিতরণ করে en détail*** জনপ্রিয়তা মজুত রাখলেন নিজের জন্য। **তিয়ের**-এর মুখ দিয়ে কুদেতা ও হঠকারী কার্যকলাপের (coups de tête) সশঙ্ক কথা বেরিয়ে পড়ল, আর বিধান-সভা বোনাপার্টের উপরে প্রতিশোধ নিল তাঁর নিজের সুবিধার জন্য তিনি যে সব আইনের প্রস্তাব করছিলেন তার প্রত্যেকটিকেই নাকচ ক'রে, এবং সাধারণ স্বার্থে যখনই তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন তার প্রত্যেকটিতে সোচ্চার সংশয়ে এই নিয়ে তদন্ত করে যে, কার্যনির্বাহক ক্ষমতাবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বোনাপার্ট নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বাড়াতে চাইছেন কিনা। এককথায়, সভা **প্রতিশোধ নিচ্ছিল এক অবজ্ঞার চক্রান্ত দিয়ে।**

লেজিটিমিস্ট পার্টি তার দিক থেকে বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল যে, অধিকতর দক্ষ অর্লিয়ান্সীরা আবার প্রায় সব পদ দখল করে ফেলেছে, এবং তারা যেখানে মুক্তির সন্ধান করছিল, প্রধানত **বিকেন্দ্রীকরণে**, সেখানে বেড়েই চলেছে **কেন্দ্রীকরণ।** আর ঘটেছিলও তাই। প্রতিবিপ্লব **কেন্দ্রীকরণ** চালিয়েছিল **বলপ্রয়োগের সাহায্যে,** অর্থাৎ সেটা প্রস্তুত করছিল বিপ্লবেরই যন্ত্রব্যবস্থা। প্যারিস ব্যাঙ্কে ফ্রান্সের সোনারূপাও প্রতিবিপ্লব **কেন্দ্রীভূত**

* বইটির পুরা ইংরেজী নাম হল 'প্যারিস রহস্য'। — সম্পাঃ

** পাইকারীভাবে। — সম্পাঃ

*** খুচরাভাবে। — সম্পাঃ

করেছিল ব্যাঙ্কনোটের বাধ্যতামূলক দর বেঁধে, আর এভাবে সৃষ্টি করেছিল বিপ্লবের **তৈরী যুদ্ধ-তহবিল।**

সর্বশেষে, অর্লিয়ান্সীরা বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল তাদের জারজ নীতির সঙ্গে প্রতিতুলনা টানা হচ্ছে উদীয়মান লেজিটিমিস্ট নীতির, আর নিজেরা তারা প্রতিমুহূর্তে অভিজাত স্বামীর হীনকুল বুর্জোয়া স্ত্রী হিসেবে লাঞ্ছনা ও দুর্ব্যবহার সইছে।

কিছু কিছু করে দেখা গেল কী করে কৃষক, পেটি বুর্জোয়া, সাধারণভাবে মধ্য শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল, বাধ্য হচ্ছিল সরকারী প্রজাতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে, আর প্রজাতন্ত্র তাদের গণ্য করছিল বিপক্ষ হিসেবে। **বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, নিজেদের আন্দোলনের সংস্থা হিসেবে গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য, নির্ধারক বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে জড় হওয়া,** এসবই হল **তথাকথিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পার্টি, লাল প্রজাতন্ত্রের পার্টির** সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিরুদ্ধপক্ষের দেওয়া আখ্যা অনুসারে এই **নৈরাজ্য পার্টিও** ছিল **শৃঙ্খলা পার্টির** মতোই বিচিত্র স্বার্থের জোট। পুরনো সামাজিক বিশৃঙ্খলার তুচ্ছতম সংস্কার থেকে শুরু করে পুরনো সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ অবধি, বুর্জোয়া উদারনীতি থেকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ অবধি, এমনই বিপুল ব্যবধান নৈরাজ্য পার্টির আরম্ভস্থল এবং সমাপ্তিস্থলের চরম অবস্থানের মধ্যে।

রক্ষণ-শুল্কের অবসান — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির **শিল্প** গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারের উপরে এতে আঘাত পড়ে। সরকারী বাজেট নিয়ন্ত্রণ — সমাজতন্ত্র! কারণ এতে ঘা পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির **ফিনান্স** গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে। বিদেশ থেকে মাংস ও শস্যের অবাধ আমদানি — সমাজতন্ত্র! কারণ তার চোট পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির তৃতীয় গোষ্ঠী **বৃহৎ ভূসম্পত্তি-মালিকদের** একচেটিয়া অধিকারের উপরে। অবাধ বাণিজ্য (free-trade) পার্টির (৮৭), অর্থাৎ ইংলণ্ডের সব থেকে অগ্রণী বুর্জোয়া পার্টির দাবিগুলি ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক দাবি বলে প্রতীয়মান হয়। ভলটেয়ারবাদ — সমাজতন্ত্র! কারণ শৃঙ্খলা পার্টির চতুর্থ গোষ্ঠী **ক্যাথলিকেরা** এতে আহত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার, সর্বজনীন সাধারণ

শিক্ষা — **সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র**! সেগুলির আঘাত পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির সাধারণ একচেটিয়ার উপরে।

বিপ্লবের অগ্রগতি অবস্থাটাকে এত দ্রুত পরিণত করে তুলল যাতে সব ধাঁচের **সংস্কার**-বান্ধবেরা, মধ্য শ্রেণীগুলির সব থেকে নরম দাবিগুলিও বাধ্য হল বিপ্লবের সব থেকে চরমপন্থী পার্টির পতাকা, **লাল ঝাণ্ডার** চারিদিকে জড়ো হতে।

তবু, আপন আপন শ্রেণীর অথবা শ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও সেটা থেকে উদ্ভূত সমগ্র বৈপ্লবিক চাহিদা অনুসারে নৈরাজ্য পার্টির বিভিন্ন বড় বড় অংশের **সমাজতন্ত্র** বিচিত্র ঢঙের হলেও **একটি** ব্যাপারে সেগুলির মধ্যে মিল ছিল: নিজেকে **প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের উপায়** বলে, এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিকে নিজ **লক্ষ্য** হিসেবে ঘোষণা করার ব্যাপারে। কারও কারও পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত প্রতারণা; আপন চাহিদা অনুযায়ী রূপান্তরিত দুনিয়াকে যারা সকলের পক্ষেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সব বৈপ্লবিক দাবির সার্থক রূপায়ণ ও সব বৈপ্লবিক সংঘাতের অবসান বলে চালিয়ে থাকে, এমন ধরনের অন্যান্যদের পক্ষে এটা হল আত্মপ্রতারণা।

শুনতে যা একরকমই ঠেকে, **'নৈরাজ্য পার্টির'** সেইসব **সাধারণ** সমাজতান্ত্রিক বুলির পিছনে লুকানো রইল 'National', 'Presse' এবং 'Siècle'-এর **সমাজতন্ত্র**, মোটামুটি স্থিরভাবে যার লক্ষ্য ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গের শাসনের উচ্ছেদ এবং শিল্প-বাণিজ্য তদবধি যে শৃঙ্খলে বাঁধা রইল তা থেকে সেগুলির মুক্তিসাধন। এ হল শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির সমাজতন্ত্র, শৃঙ্খলা পার্টির ভিতরে যাদের মাতব্বরেরা এই স্বার্থগুলিকে অস্বীকার করে যেই তাদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে ওগুলির আর মিল থাকে না। খাস সমাজতন্ত্র, **পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র**, par excellence* সমাজতন্ত্র, সেটা এই **বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র** থেকে স্বতন্ত্র, যেটার কাছে, যেমন যেকোন ঢঙের সমাজতন্ত্রেরই কাছে, শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়াদের একটি অংশ গিয়ে জোটে স্বভাবতই। এই শ্রেণীর ওপর পুঁজি হানা দেয় প্রধানত তার **পাওনাদার** হিসেবে; তাই সে চায় **ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান**। পুঁজি তাকে দমন

---

* সেরা। — সম্পাঃ

করে **প্রতিযোগিতায়**; তাই সে চায় রাষ্ট্রসমর্থিত **সমিতি।** পুঁজি তাকে অভিভূত করে **কেন্দ্রীকরণে**; তাই তার দাবি হল **ক্রমোন্নত কর,** উত্তরাধিকারের সীমাবদ্ধকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্পগুলি গ্রহণ, এবং **পুঁজির বৃদ্ধিতে জোর করে বাধা দেবার** অন্যান্য ব্যবস্থাদি। যেহেতু এই সমাজতন্ত্র স্বপ্ন দেখে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র লাভের — স্বল্পস্থায়ী এক-আধ দিনের দ্বিতীয় এক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব না-হয় মেনে নিয়ে — সেইজন্য আগামী দিনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটা তার কাছে স্বভাবতঃই **বিভিন্ন তন্ত্রের** (systems) **প্রয়োগ** বলেই মনে হয়, যে-তন্ত্র সমাজের চিন্তাবিদেরা, দল বেঁধেই হোক বা একক উদ্ভাবক হিসেবেই হোক, উদ্ভাবন করছেন বা করেছেন। এইভাবে এরা চালু সমাজতান্ত্রিক **তন্ত্রগুলির, নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্রের** পাঁচমিশালী সংগ্রাহক বা ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রলেতারিয়েতের তত্ত্বগত অভিব্যক্তি ছিল শুধু ততদিনই যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী নিজস্ব স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্যে বিকাশলাভ করতে পারে নি।

এই **ইউটোপিয়া,** এই **নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্র** যখন সমগ্র আন্দোলনকে সেটার একটা মুহূর্তের সাপেক্ষ করে রাখে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের জায়গায় স্থান দেয় বিশেষ বিশেষ বিদ্যাবাগীশের মস্তিষ্ক-কর্মকে, এবং, সর্বোপরি, শ্রেণীগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও তার চাহিদাকে কল্পনায় উড়িয়ে দেয় তুচ্ছ ভেল্কিবাজিতে, নয়ত বিপুল ভাবালুতায়; এই নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্র যখন আসলে চালু সমাজকে আদর্শায়িত করে, তার ছবি আঁকে ছায়া বাদ দিয়ে ও বর্তমান সমাজের বাস্তবতার বিপরীতেই হাসিল করতে চায় নিজের আদর্শ। এই সমাজতন্ত্রকে যখন প্রলেতারিয়েত ছেড়ে দেয় পেটি বুর্জোয়াদের হাতে; বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী নেতাদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রাম যখন এর প্রত্যেকটি তথাকথিত তন্ত্রকে অন্যের বিপক্ষে সমাজ-বিপ্লবে উৎক্রমণের অন্যতম যাত্রাস্থলের প্রতি সাড়ম্বর আনুগত্য হিসেবে তুলে ধরে — **প্রলেতারিয়েত** তখন ক্রমাগত বেশি মাত্রায় সমবেত হতে থাকে **বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের** চারিদিকে, **কমিউনিজমের** চারিদিকে, বুর্জোয়ারাই যেটাকে **ব্লাঙ্কি-র** নামাঙ্কিত করেছে। **সাধারণভাবে শ্রেণী বৈষম্য লোপ করার,** যে সব উৎপাদন-সম্পর্কের উপরে সেটার প্রতিষ্ঠা তা লোপ করার, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক লোপ করার,

সেই সমাজ-সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত সমস্ত ধ্যানধারণার বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উৎক্রমণ-স্থান হিসেবে **বিপ্লবের নিরন্তরতা** এবং প্রলেতারিয়েতের **শ্রেণীগত একনায়কত্বের ঘোষণাই** এই সমাজতন্ত্র।

এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা এই রচনার চৌহদ্দির মধ্যে সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি শৃঙ্খলা পার্টিতে যেমন **ফিনান্স আভিজাত্য** অনিবার্যভাবেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, তেমনি **'নৈরাজ্য'** পার্টিতে নেতৃত্ব করল **প্রলেতারিয়েত**। এক বৈপ্লবিক সংঘে ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণী যখন প্রলেতারিয়েতের চারিদিকে সমবেত হতে থাকল, জেলাগুলি যখন ক্রমেই আরো অনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে লাগল, এবং বিধান-সভাও ক্রমেই যখন আরো বিষণ্ণ হতে থাকল ফরাসী সুলুকের* দাবিতে, তখন ১৩ জুনের পর বিতাড়িত 'পর্বতের' সদস্যদের স্থানে বহুবার স্থগিত ও বহুবিলম্বিত বদলি সদস্য উপনির্বাচনের দিন নিকটে এল।

শত্রুদের দ্বারা ঘৃণিত, তথাকথিত বন্ধুদের কাছে দুর্ব্যবহারপীড়িত ও দিনের পর দিন লাঞ্ছিত সরকার এই প্রতিকূল ও অসহ্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটিমাত্র পথ দেখতে পেল — **বিদ্রোহ**। প্যারিসে কোনও বিদ্রোহ ঘটলে প্যারিসে ও জেলাগুলিতে অবরোধের অবস্থা ঘোষণার, আর সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের সুযোগ হবে। পক্ষান্তরে, নৈরাজ্যের উপরে জয়লাভ করেছে এমন এক সরকারের সামনে শৃঙ্খলার বন্ধুরাও সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, যদি না তারা নিজেরাই নৈরাজ্যবাদী প্রতিপন্ন হতে চায়।

কাজ শুরু করল সরকার ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ায় মুক্তি বৃক্ষগুলি (৮৮) কেটে ফেলে জনগণকে প্ররোচিত করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। মুক্তি বৃক্ষ যদি বা স্থানচ্যুত হল, দিশেহারা হয়ে পড়ল সরকার নিজেই এবং নিজের প্ররোচনাতে নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটল। জাতীয় সভা অবশ্য বোনাপার্টের তরফের এই স্থূল বন্ধনছেদের প্রয়াসকে হিমশীতল অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। জুলাই স্তম্ভ থেকে ইম্মর্টেল ফুলের মালা (৮৯) অপসারণও

* নেপোলিয়ন তৃতীয়। — সম্পাঃ

এর থেকে বেশি সফল হল না। সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে এ ঘটনা সুযোগ দেয় বৈপ্লবিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের; আর জাতীয় সভা এতে উপলক্ষ পায় মন্ত্রিসভার প্রতি কমবেশি প্রচ্ছন্ন এক অনাস্থাজ্ঞাপক ভোটের। বৃথাই সরকারী খবরের কাগজগুলি ভয় দেখাল সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকচের ও কসাক আক্রমণের। ব্যর্থ হল খাস বিধান-সভায় বামপন্থীদের উদ্দেশে ঘোষিত দ'অপুলের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের এই আহ্বান — যেন তারা রাস্তায় নেমে দেখে, আর তাঁর এই ঘোষণা যে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার। দ'অপুল সভাপতির কাছ থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ বাদে আর কিছু লাভ করলেন না এবং নীরব বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে শৃঙ্খলা পার্টি বামপন্থীদেরই একজন সদস্যকে বোনাপার্টের জবরদস্তি গদি দখলের লোলুপতাকে বিদ্রূপ করতে দিল। সর্বশেষে ব্যর্থ হল **২৪ ফেব্রুয়ারি** তারিখে নতুন বিপ্লব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। জনসাধারণ যাতে ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে উপেক্ষা করে তা সরকারই ঘটিয়ে দিল।

প্রলেতারিয়েত প্ররোচিত হয়ে **বিদ্রোহ** করে নি, কারণ তারা তখন **বিপ্লব** ঘটাবার মুখে।

যে সরকারী প্ররোচনা চলতি অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে উত্যক্ত মনোভাবকেই আরও তীব্র করে তুলেছিল তার ফাঁদে পা না দিয়ে পুরোপুরি শ্রমিকদের প্রভাবাধীন নির্বাচন কমিটি প্যারিসের জন্য তিনজন প্রার্থী দাঁড় করাল: **দ্য ফ্লত, ভিদাল ও কার্নো**। দ্য ফ্লত ছিলেন জুন মাসে নির্বাসিত এক ব্যক্তি, বোনাপার্টের জনপ্রিয়তা অর্জনের নানা চালের একটির দরুন যাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়ে যায়; তিনি ছিলেন ব্লাঙ্কির বন্ধু এবং ১৫ মে-র প্রচেষ্টায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে' নামক তাঁর গ্রন্থের মারফত কমিউনিস্ট লেখক হিসেবে পরিচিত ভিদাল ছিলেন লুক্সেমবুর্গ কমিশনে লুই ব্লাঁর প্রাক্তন সচিব। কনভেনশনের যে লোকটি জয়লাভ সংগঠিত করেছিলেন তাঁর পুত্র, 'National'-এর পার্টির সব থেকে কম কলঙ্কলিপ্ত সদস্য, অস্থায়ী সরকার ও কার্যনির্বাহক কমিশনের শিক্ষামন্ত্রী কার্নো তাঁর গণতান্ত্রিক জনশিক্ষা প্রস্তাবের দরুন জেশুইটদের শিক্ষা আইনের জীবন্ত প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই তিন প্রার্থী প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনটি মিত্র শ্রেণীর: নেতৃত্বে রইল জুন বিদ্রোহী, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি; তাঁর পরে

নীতিবাগীশ সমাজতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক পেটি পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি; সর্বশেষে তৃতীয় জন ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধি, যে পার্টির গণতান্ত্রিক সূত্রগুলি শৃঙ্খলা পার্টির মুখোমুখি এসে অর্জন করেছিল একটা সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য এবং বহুকাল আগে নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। **ফেব্রুয়ারির মতোই** এটা ছিল **বুর্জোয়া ও সরকারের বিরুদ্ধে এক সাধারণ জোট।** তবে এবার **প্রলেতারিয়েতই ছিল বৈপ্লবিক জোটের নেতৃত্বে।**

সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জয়ী হলেন সমাজতন্ত্রী প্রার্থীরা। সৈন্যবাহিনীই জুন বিদ্রোহীকে ভোট দিল তার আপন যুদ্ধ মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে। হতভম্ব হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। জেলায় জেলায় নির্বাচনও তাদের সান্ত্বনা দিল না, তারা সংখ্যাধিক্য যোগাল 'পর্বতের' সদস্যদেরই।

১৮৫০ সালের ১০ মার্চের নির্বাচন! এটা হল যেন ১৮৪৮ সালের জুনকে বাতিল করার শামিল। জুন বিদ্রোহীদের ঘাতক ও নির্বাসনদাতারা ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল ঘাড় হেঁট করে, নির্বাসিতদের পিছু পিছু ও তাদেরই নীতি আওড়াতে আওড়াতে। **এ হল ১৮৪৯-এর ১৩ জুনেরও খন্ডন:** জাতীয় সভা কর্তৃক বিতাড়িত 'পর্বত' ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল আর বিপ্লবের নায়ক হিসেবে আর নয়, আগুয়ান বাজনদার রূপে। **এতে ১০ ডিসেম্বর নাকচ হল:** মন্ত্রী লা ইতের পরাজয় মারফত পরাস্ত হলেন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের সংসদীয় ইতিহাসে এর একটিমাত্র তুলনার কথা জানা আছে: ১৮৩০ সালে দশম চার্লসের মন্ত্রী দ'অসে-র পরাভব। শেষকথা, ১৮৫০ সালের ১০ মার্চের নির্বাচন নাকচ করল ১৩ মে-র নির্বাচনকে, যে নির্বাচন শৃঙ্খলা পার্টিকে সংখ্যাধিক্য দিয়েছিল। ১০ মার্চের নির্বাচন প্রতিবাদ জানাল ১৩ মে-র সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে। ১০ মার্চ ছিল একটা বিপ্লব। ভোটের কাগজের পিছনে রাস্তাবাঁধানর ইঁটপাথর।

'১০ মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ,' হুঙ্কার ছাড়লেন শৃঙ্খলা পার্টির সবচেয়ে অগ্রণী সদস্যদের অন্যতম, সেগ্যুর দ'আগেসো।

১৮৫০-এর ১০ মার্চের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রবেশ করল নতুন এক পর্বে, **তার ভাঙনের পর্বে।** সংখ্যাধিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী

আবার নিজেদের মধ্যে ও বোনাপার্টের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল; আবার তারা দাঁড়াল শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে; বোনাপার্ট আবার হলেন তাদের **নিরপেক্ষ মানুষ।** তারা যে রাজতন্ত্রী একথা যদি তাদের মনে হয়ে থাকে, তবে তা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের নৈরাশ্য থেকেই; বোনাপার্টের যদি মনে হয়ে থাকে যে তিনি দাবিদার, তবে তার কারণ শুধু রাষ্ট্রপতিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর হতাশা।

শৃঙ্খলা পার্টির হুকুমে বোনাপার্ট জুন বিদ্রোহী **দ্য ফ্লত**-এর নির্বাচনের জবাব দেন **বারোশকে** অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মন্ত্রী নিয়োগ ক'রে — ব্লাঙ্কি, বর্বে, লেদ্রু-রলাঁ ও গিনার-এর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বারোশকে। বিধান-সভা **কার্নোর** নির্বাচনের জবাব দিল শিক্ষা আইন পাস করে ও **ভিদালের** নির্বাচনের জবাব দিল সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র দমন করে। শৃঙ্খলা পার্টি নিজের ভয় তাড়াতে চাইল তার সংবাদপত্রগুলির দুন্দুভি নিনাদে। তার একটি মুখপত্র চেঁচিয়ে উঠল, 'তলোয়ারই পবিত্র!' আর একটি চেঁচাল, 'শৃঙ্খলার রক্ষকদের আক্রমণ চালাতে হবে লাল পার্টির বিপক্ষে!' শৃঙ্খলা পার্টির তিন নম্বর মোরগ ডাক ছাড়ল, 'সমাজতন্ত্র ও সমাজের মধ্যে চলেছে আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ, এ যুদ্ধ ক্ষান্তিহীন, ক্ষমাহীন; এই মরিয়া লড়াইয়ে কোন না কোন পক্ষকে পর্যুদস্ত হতে হবেই; সমাজ যদি সমাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত না করে, তবে সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত করবে সমাজকে।' খাড়া কর শৃঙ্খলার ব্যারিকেড, ধর্মের ব্যারিকেড, পরিবারের ব্যারিকেড! খতম করতেই হবে প্যারিসের ১,২৭,০০০ ভোটদাতাকে (৯০)! সমাজতন্ত্রীদের জন্য ব্যবস্থা হোক এক বার্থলমিউ রাত্রির (৯১)! আর মুহূর্তের জন্য শৃঙ্খলা পার্টি আশ্বস্ত হয়ে উঠল বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনায়।

পত্রিকাগুলি সব থেকে উগ্র বিষোদ্গার করে **'প্যারিসের দোকানীদের'** বিরুদ্ধে। প্যারিসের জুন বিদ্রোহী নির্বাচিত হল প্যারিসের দোকানীদের দ্বারা তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে! তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৮-এর জুন আর সম্ভব নয়; তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৯-এর ১৩ জুনও অসম্ভব; এর অর্থ পুঁজির নৈতিক প্রভাব আজ চূর্ণ; এর অর্থ বুর্জোয়া সভা এখন শুধু বুর্জোয়াদেরই প্রতিনিধি; তার তাৎপর্য হল বৃহৎ সম্পত্তির দফারফা, কেননা

তার বশংবদ ক্ষুদে সম্পত্তি নিজের মুক্তির সন্ধান করছে সম্পত্তিহীনদের শিবিরে।

শৃঙ্খলা পার্টি স্বভাবতই ফিরে গেল তার অনিবার্য **গতানুগতিকতায়।** হাঁক দিল, **'আরও দমন-পীড়ন চাই, দশগুণ দমন-পীড়ন!'** কিন্তু তার দমন-পীড়নের ক্ষমতা যে কমে গেছে দশগুণ, যেখানে প্রতিরোধ বেড়ে গেছে শতগুণ। দমনের মুখ্য হাতিয়ার সৈন্যবাহিনী, সেটাকেই কি দমন করা দরকার নয়? তাই তার শেষ কথা বলে ফেলল শৃঙ্খলা পার্টি: 'শ্বাসরোধী বৈধতার লৌহ-নিগড় ভাঙতেই হবে। **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অসম্ভব।** আমাদের লড়তে হবে নিজেদের আসল হাতিয়ার নিয়ে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা বিপ্লবের সঙ্গে লড়েছি **তারই** অস্ত্র নিয়ে ও **তারই** জমির উপরে; আমরা গ্রহণ করেছি **তারই** প্রতিষ্ঠানগুলিকে; সংবিধান হল এমন এক দুর্গ যা রক্ষা করে শুধু অবরোধকারীদেরই, অবরুদ্ধদের নয়! ট্রোজান ঘোড়ার পেটের মধ্যে ঢুকে আমরা গোপনে পবিত্র ইলিয়নে প্রবেশ করেছি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ Grecs-এর* মতো আমরা বিরোধী শহরকে জয় না করে, নিজেদেরই বন্দীতে পরিণত করেছি।'

সংবিধানের ভিত্তি কিন্তু **সর্বজনীন ভোটাধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকার সংহার** — এই হল শৃঙ্খলা পার্টির, বুর্জোয়া একনায়কত্বের শেষ কথা।

১৮৪৮-এর ৪ মে, ১৮৪৮-এর ২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৯-এর ১৩ মে, ও ১৮৪৯-এর ৮ জুলাই তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকার মেনেছিল যে, তারাই ঠিক। ১৮৫০-এর ১০ মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করল যে, সর্বজনীন ভোটাধিকারটাই ভুল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলাফল হিসেবে বুর্জোয়া শাসন, জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রকাশ হিসেবে বুর্জোয়া শাসন — বুর্জোয়া সংবিধানের অর্থ ত এই-ই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শাসন আর সেই ভোটাধিকারের, সেই সার্বভৌম ইচ্ছার সারবস্তু থাকে না, তখন থেকে সংবিধানের কি আর কোন অর্থ থাকে? বুর্জোয়ার কর্তব্য কি এমনভাবে ভোটাধিকারের নিয়ন্ত্রণ নয় যাতে সে যুক্তিযুক্তটার,

---

* Grecs — এখানে কথার খেলা আছে: এক অর্থ গ্রীকেরা, অপর অর্থ — ঠগ ব্যবসায়ীরা। [১৮৯৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।]

তারই শাসনের অভিপ্রায় জানায়? বারবার চলতি রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে এবং নিজের ভিতর থেকেই নতুন করে সে শক্তির সৃষ্টি করে সর্বজনীন ভোটাধিকার কি সমস্ত সুস্থিতি খতম করে দিচ্ছে না, প্রতিমুহূর্তেই কি এই অধিকার সমস্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলছে না, ধ্বংস করছে না কর্তৃত্ব, নৈরাজ্যকেই কর্তৃত্বের আসনে তোলার বিপদ সৃষ্টি করছে না? ১৮৫০ সালের ১০ মার্চের পরও কে আর সন্দেহ পোষণ করবে এ সম্পর্কে?

যে সর্বজনীন ভোটাধিকারকে তারা নামাবলী করেছিল ও যার থেকে তারা চোষে নিয়েছিল নিজেদের সার্বভৌমত্ব, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রকাশ্যেই স্বীকার করল, **'আমাদের একনায়কত্ব এ পর্যন্ত চালু ছিল জনসাধারণের ইচ্ছার জোরে, এখন সেটাকে সুসংহত করতে হবে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।'** আর তদনুসারেই তারা আর **ফ্রান্সের** ভিতরেই খুঁটি খুঁজে বেড়াবে না, বরং খুঁজবে বাইরে, বিদেশে, **বিদেশ থেকে অভিযানের** মধ্যেই।

অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের মধ্যেই আসনপ্রাপ্ত এই দোসরা নম্বর কবলেনৎস (৯২) নিজের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলবে সমস্ত জাতীয় আবেগ। সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে আক্রমণের দ্বারা সেটা নতুন এক বিপ্লবের **সাধারণ অছিলা** যোগাবে, আর বিপ্লবের প্রয়োজন তেমন এক অছিলার। প্রতিটি **বিশেষ** অজুহাতই বৈপ্লবিক জোটের গোষ্ঠীগুলিকে বিভক্ত করে দেবে, এবং প্রকট করে তুলবে তাদের মতানৈক্যকেই। **সাধারণ** অজুহাত বিহ্বল করে দেয় আধা-বিপ্লবী শ্রেণীদের; আসন্ন বিপ্লবের **সুনিশ্চিত চরিত্র** সম্পর্কে, নিজেদের কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে তাদের আত্মপ্রতারণা করার অবকাশ এনে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রয়োজন এক ভোজসভার সওয়ালের। নতুন বিপ্লবের সেই সওয়াল হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

জোটবদ্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির মন্দভাগ্য কিন্তু অবধারিত হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই, কারণ তারা তাদের **ঐক্যবদ্ধ** শক্তির একমাত্র সম্ভাব্য রূপ, তাদের **শ্রেণী-প্রভুত্বের** সব থেকে কার্যকরী ও সম্পূর্ণ রূপ **নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** থেকে পালায় **রাজতন্ত্রের** অপকৃষ্ট, অসম্পূর্ণ ও দুর্বলতর রূপেরই দিকে। তাদের হাল এখন সেই বৃদ্ধের মতো যে তারুণ্যশক্তি পুনরার্জন করার জন্য নিজের বাল্যকালের জামা-কাপড় খুঁজে বের ক'রে তার মধ্যে আপন

শীর্ণ দেহ ঢোকাবার চেষ্টায় নাজেহাল হয়। তাদের প্রজাতন্ত্রের একমাত্র গুণ ছিল **বিপ্লবের জননকক্ষ হওয়া।**

১৮৫০-এর ১০ মার্চের গায়ে মুদ্রিত ছিল এই লিপি:

Après moi le déluge!*

৪

১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন

(আগের তিনটি অধ্যায়ের পরিপূরক লেখাটি 'Neue Rheinische Zeitung' পত্রিকার শেষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'Revue'-তে পাওয়া যায়। এখানে, ১৮৪৭ সালে ইংলণ্ডে যে বিরাট ব্যবসায় বাণিজ্য সংকটের উদ্ভব হয় প্রথমে তার বর্ণনা দেওয়া হয় এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে রাজনৈতিক জটিলতার চরমে ওঠার ব্যাপারটিকে এই সংকটের প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর দেখানো হয়েছিল ১৮৪৮-এর ঘটনাপ্রবাহের সময়ে ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমৃদ্ধির আবার সূত্রপাত হল, এবং যা আরো বৃদ্ধি পেল ১৮৪৯ সালে, সেই সমৃদ্ধি কিভাবে বৈপ্লবিক জোয়ারকে পঙ্গু করে দেয় ও সম্ভব করে তোলে প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগপৎ জয়লাভ। বিশেষ করে ফ্রান্স প্রসঙ্গে তারপরে বলা হয়:)**

১৮৪৯ সাল থেকে, বিশেষ করে ১৮৫০-এর গোড়ার দিক থেকে এই একই লক্ষণ দেখা দিয়েছে **ফ্রান্সে**। প্যারিসের শিল্পগুলি পূর্ণ গতিতে কাজ করেছে, এবং রুয়েঁ ও ম্যুলহাউজেন-এর কাপড়কলগুলিও বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে, যদিও ইংলণ্ডের মতো এখানেও কাঁচামালের চড়া দরের ফলে একটা

---

* আমার পরেই প্রলয় (যেন এই কথাগুলি পনেরো লুই বলেছেন)। — সম্পাঃ

** ১৮৯৫ সালের সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস ভূমিকা হিসেবে এই অনুচ্ছেদটি লেখেন। — সম্পাঃ

মন্দীভবনের প্রভাব আছে। এ ছাড়াও ফ্রান্সে সমৃদ্ধির বিকাশ বিশেষ করেই উদ্দীপিত হয়েছে স্পেনের সর্বাঙ্গীণ শুল্ক সংস্কার ও মেক্সিকোয় বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যের উপরকার শুল্ক হ্রাসের ফলে; দুই বাজারেই ফরাসী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। ফ্রান্সে পুঁজি ফেঁপে ওঠায় পরের পর কতগুলি ফটকাবাজি দেখা গেছে, যার ছুতো হিসেবে কাজ করেছে কালিফোর্নিয়া স্বর্ণখনির ব্যাপক উপযোগ। ঝাঁকে ঝাঁকে কোম্পানি গজিয়ে উঠেছে, যাদের স্বল্পমূল্য শেয়ার এবং সমাজতান্ত্রিক ছোপের অনুষ্ঠানপত্র পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের তহবিলকে সরাসরি আকৃষ্ট করে, অথচ যার সবগুলিরই পরিণতি ঘটে সেই ধরনের একটা নিছক জুয়াচুরিতে, যা শুধু ফরাসী ও চীনাদেরই বৈশিষ্ট্য। এমন কি এদের মধ্যে একটি কোম্পানির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করছে সরকারই। ১৮৪৮ সালের প্রথম নয় মাসে ফ্রান্সে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ছিল ৬,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাংক, ১৮৪৯-এ — ৯,৫০,০০,০০০ ফ্র্যাংক, ও ১৮৫০ সালে ৯,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাংক। এর উপরে ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমদানি শুল্কের পরিমাণ ১৮৪৯ সালের ঐ মাসের তুলনায় আবার বেড়ে গেল দশ লক্ষেরও বেশি। রপ্তানিও বাড়ল ১৮৪৯ সালে এবং আরও বেশী মাত্রায় ১৮৫০-এ।

পুনরুজ্জীবিত সমৃদ্ধির সব থেকে চমকপ্রদ প্রমাণ হচ্ছে ১৮৫০ সালের ৬ অগস্টের আইনে ব্যাঙ্কের তরফে ধাতুমুদ্রায় পাওনা পরিশোধ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ১৮৪৮-এর ১৫ মার্চ ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তেমন পরিশোধ স্থগিত রাখার। সে সময়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমেত তার চালু নোটের পরিমাণ ছিল ৩৭,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক (১,৪৯,২০,০০০ পাউন্ড)। ১৮৪৯-এর ২ নভেম্বর চালু নোটের পরিমাণ দাঁড়াল ৪৮,২০,০০,০০০ ফ্র্যাংক বা ১,৯২,৮০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বেড়ে গেল ৪৩,৬০,০০০ পাউন্ড; আবার ১৮৫০-এর ২ সেপ্টেম্বরে পরিমাণটা দাঁড়াল ৪৯,৬০,০০,০০০ ফ্র্যাংক বা ১,৯৮,৪০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বাড়ল প্রায় ৫০,০০,০০০ পাউন্ড। এর আনুষঙ্গিক হিসেবে কিন্তু নোটের মূল্যহ্রাস ঘটল না, পক্ষান্তরে চালু নোটের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলল ব্যাঙ্কের কুঠুরিতে মজুত সোনা-রুপারও স্থিরগতি বৃদ্ধি, যার ফলে ১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে ব্যাঙ্কের সোনা-রুপার মজুতের পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় ১,৪০,০০,০০০ পাউন্ড, ফ্রান্সের

পক্ষে এক অভূতপূর্ব পরিমাণ। এর ফলে ব্যাঙ্ক এমন অবস্থায় পৌঁছল যার ফলে সেটার পক্ষে চলতি নোট ও সেই সঙ্গে তার সক্রিয় পুঁজির পরিমাণ ১২,৩০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক বা ৫০,০০,০০০ পাউন্ড বাড়ানো সম্ভব হল — এই ঘটনাটা আমাদের পত্রিকার আগেকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত এই স্পষ্ট অভিমতের যাথার্থ্য লক্ষণীয়ভাবেই প্রমাণ করে* যে, ফিনান্স অভিজাতবর্গ বিপ্লবের ফলে উৎখাত তো হয়ই নি, বরঞ্চ সেটার শক্তিবৃদ্ধি পর্যন্ত ঘটেছে। এই ফলাফল আরও বেশি স্পষ্টপ্রতীয়মান হয় গত কয়েক বছরের ফরাসী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নিম্নলিখিত পর্যালোচনা থেকে। ১৮৪৭-এর ১০ জুন ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল ২০০ ফ্র্যাঙ্ক নোট ছাড়ার — এযাবৎ ক্ষুদ্রতম রাশিটি ছিল ৫০০ ফ্র্যাঙ্ক। ১৮৪৮-এর ১৫ মার্চের এক ডিক্রি ব্যাঙ্ক অভ্ ফ্রান্স-এর নোটকে বিহিত অর্থ (legal tender) ঘোষণা করল এবং ধাতু মুদ্রায় দায় খালাসের বাধ্যবাধকতা থেকে ব্যাংককে অব্যাহতি দিল। ব্যাঙ্কের নোট ছাড়ার সীমানা নির্দিষ্ট হল ৩৫,০০,০০,০০০ ফ্র্যাংক। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হল ১০০ ফ্র্যাংক নোট ছাড়বার। ২৭ এপ্রিলের ডিক্রি ব্যাংক অভ্ ফ্রান্স-এ জেলা ব্যাঙ্কগুলির অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করল; ১৮৪৮-এর ২ মে-র আর একটা ডিক্রি ব্যাঙ্কের নোট ছাড়ার সীমা বাড়িয়ে তুলল ৪৪,২০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কে। ১৮৪৯-এর ২২ ডিসেম্বরের একটা ডিক্রি নোট ছাড়ার চরম সীমা ওঠাল ৫২,৫০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্কে। সর্বশেষে ১৮৫০-এর ৬ অগস্টের আইন ধাতু মুদ্রার সঙ্গে নোটের বিনিময়সাধ্যতা পুনঃপ্রবর্তিত করে। নোট ছাড়ার ক্রমিক বৃদ্ধি; ব্যাঙ্কের হাতে সমগ্র ফরাসী ক্রেডিটের কেন্দ্রীকরণ, ও ব্যাঙ্কের কুঠুরিতে ফ্রান্সের সমস্ত সোনা-রূপা মজুত — এই তথ্যগুলি শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ-কে এই সিদ্ধান্তে ঠেলে নিয়ে যায় যে, ব্যাংককে এখন সাপের পুরনো খোলস ছাড়তে হবেই এবং নিজেকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রুধোঁমার্কা গণ-ব্যাঙ্কে। ১৭৯৭ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের (৯৩) ইতিহাস পর্যন্ত তাঁর জানার দরকার হল না; তিনি শুধু যদি একবার দৃষ্টি ফেরাতেন চ্যানেলের ওপারে তাহলেই দেখতে পেতেন যে, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাসে তাঁর পক্ষে অভূতপূর্ব এই ঘটনা একটা মামুলি

* এই খণ্ডের ১৭৪-১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বুর্জোয়া ব্যাপার বই আর কিছুই নয় — কেবল ফ্রান্সে এখন এটা ঘটল সর্বপ্রথম। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিপ্লবী বলে অভিহিত যে তাত্ত্বিকরা অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্যারিসে আসর গরম করেছিলেন তাঁরা সেই সরকারের ভদ্রলোকদেরই মতন গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে সমানই অজ্ঞ ছিলেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সাময়িকভাবে যে সমৃদ্ধি ভোগ করছে তা সত্ত্বেও কিন্তু বিপুল জনসাধারণকে, আড়াই কোটি কৃষককে সইতে হচ্ছে বিরাট এক মন্দার দুর্গতি। গত কয়েক বছরের ভালো ফসল শস্যের দর নামিয়ে দিয়েছে ইংলণ্ডেরও নিচে, আর সে অবস্থায় ঋণগ্রস্ত, সুদখোরির শোষণে জর্জর ও করের চাপে বিধ্বস্ত কৃষকদের হাল মোটেই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। গত তিন বছরের ইতিহাস অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ যুগিয়েছিল যে জনসমষ্টির ভিতরে এই শ্রেণী কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগ গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ।

ইংলণ্ডের তুলনায় ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডে যেমন সংকটের পর্ব বিলম্বে দেখা দেয়, সমৃদ্ধির বেলায়ও তাই ঘটে থাকে। আদি প্রক্রিয়াটা সবসময়েই ঘটে ইংলণ্ডে; বুর্জোয়া ব্রহ্মাণ্ডের এই হল আদ্যাশক্তি। চক্রের যে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে বুর্জোয়া সমাজ ক্রমাগত নতুন করে ধাবমান, ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডে তা ঘটে থাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার রূপে। প্রথমত, ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ড যেকোন দেশের চেয়ে ইংলণ্ডেই রপ্তানি করে বেশি। ইংলণ্ডে এই রপ্তানি আবার কিন্তু নির্ভর করে ইংলণ্ডের অবস্থা, বিশেষ করে সমুদ্রপারের বাজার-সংশ্লিষ্ট অবস্থার উপরে। তারপর, ইংলণ্ড সমুদ্রপারের দেশগুলিতে রপ্তানি করে সমগ্র ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের চেয়ে বহুল পরিমাণে বেশি, যার ফলে এই ভূখণ্ড থেকে সেসব দেশে রপ্তানির পরিমাণ সবসময়েই বিদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানির উপরে নির্ভর করে। সুতরাং সংকট ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডে প্রথমে বিপ্লব ঘটালেও সেটার ভিত্তি সবসময়েই গাঁথা হয় ইংলণ্ডেই। স্বভাবতঃই, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বুর্জোয়া দেহের প্রত্যন্তে ঘটবে তার হৃৎপিণ্ডের বদলে, কারণ ওখানকার চাইতে এখানে সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা বেশি। অপরপক্ষে, ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের বিপ্লব কতটা ঘা দিচ্ছে ইংলণ্ডকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এক পরিমাপযন্ত্র, যাতে হদিশ মেলে সে বিপ্লব সত্যসত্যই

বুর্জোয়া জীবনের শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কতখানি অথবা কতটুকু আঘাত করেছে শুধু তার রাজনৈতিক বিন্যাসগুলিকে।

এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজে বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে সত্যকার বিপ্লবের কথা ওঠে না। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন **আধুনিক উৎপাদন-শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো,** এই **উভয় উপাদানের** মধ্যে পারস্পরিক **সংঘাত** লাগে। ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধিরা বর্তমানে যে সব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ যোগান তো দূরের কথা উল্টে তা সম্ভব হচ্ছে সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই। বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা। **নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শুধু নতুন এক সংকটের ফলেই। এ সংকটের মতোই সে বিপ্লব সুনিশ্চিত।**

এবার **ফ্রান্সের** কথায় ফেরা যাক।

পেটি বুর্জোয়াদের সহযোগে জনসাধারণ ১০ মার্চের নির্বাচনে যে জয়লাভ করেছিল সেটা তা নিজেই বাতিল করল যখন সেটা ডেকে আনল ২৮ এপ্রিলের নতুন নির্বাচন। শুধু প্যারিসে নয়, ভিদাল নির্বাচিত হয়েছিলেন নিম্ন রাইনেও। 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের জোরালো প্রতিনিধিত্ব ছিল যে প্যারিস কমিটিতে, সেই কমিটি তাঁকে রাজি করাল নিম্ন রাইনের আসন গ্রহণ করতে। ১০ মার্চের বিজয় আর নির্ধারক হয়ে রইল না; সিদ্ধান্তের তারিখ আর একবার পিছানো হল; জনসাধারণের উত্তেজনা হয়ে হল প্রশমিত; তারা অভ্যস্ত হল বিপ্লবের নয়, আইনগত জয়লাভেই। ১০ মার্চের বৈপ্লবিক তাৎপর্য — জুন অভ্যুত্থানের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা — শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল উচ্ছ্বাসপ্রবণ পেটি বুর্জোয়া সামাজিক-ছিটগ্রস্ত এজেন স্যু-কে প্রার্থী হিসেবে স্থির করাতে — প্রলেতারিয়েত যে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারত বড়জোর রসিকাবিনোদনের উপযোগী তামাসা হিসেবেই। বিপক্ষদলের

দোদুল্যমান নীতিতে সাহস পেয়ে শৃঙ্খলা পার্টি এই ভালোমানুষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে এমন এক প্রার্থী দাঁড় করাল যিনি জুন **বিজয়ের** প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। হাস্যোদ্দীপক সেই প্রার্থী হলেন স্পার্টান ধরনের pater familias* লেক্লের, যাঁর দেহের বীরকবচটুকু ছিন্নভিন্ন করে ফেলল সংবাদপত্রগুলি এবং যিনি নির্বাচনে এক জমকালো ধরনের পরাজয় লাভ করলেন। ২৮ এপ্রিলের নতুন নির্বাচনী বিজয় 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের খুবই উৎফুল্ল করেছিল। ইতিমধ্যেই তারা উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে, বিশুদ্ধ আইনসম্মত পন্থায় ও নতুন এক বিপ্লব মারফত প্রলেতারিয়েতকে আবার পুরোভাগে ঠেলে না দিয়েও তারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে, তারা নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছিল যে, ১৮৫২ সালের নয়া নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে লেদ্রু-রলাঁকে বসানো যাবে রাষ্ট্রপতি পদে এবং সভায় প্রতিষ্ঠিত হবে 'পর্বতের' সংখ্যাধিক্য। ভাবী নির্বাচন, স্যু-র প্রার্থীপদলাভ এবং 'পর্বত' ও পেটি বুর্জোয়াদের মেজাজ লক্ষ্য করে শৃঙ্খলা পার্টি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল যে, যাই ঘটুক না কেন, 'পর্বত' আর পেটি বুর্জোয়ারা শান্ত থাকতেই বদ্ধপরিকর, এবং দুই নির্বাচনী বিজয়ের জবাব দিল এক **নির্বাচনী আইন** দিয়ে, যাতে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

সরকার যথেষ্ট সতর্ক হয়েই নিজ দায়িত্বে এই আইনের প্রস্তাব আনল না। আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাধিকদের কাছে যেন নতিস্বীকার করে নিয়ে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের মানী ব্যক্তিবর্গ বুর্গ্রেভ (৯৪) সতেরো জনের হাতে প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব তুলে দিল। কাজেই সরকার সভার সামনে প্রস্তাব তোলে নি সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্য; সভার সংখ্যাগুরুরাই সে প্রস্তাব আনল নিজেদের কাছেই।

৮ মে প্রস্তাবটি তোলা হল সভায়। সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্র এক হয়ে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, calme majestueux,** নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিনিধিদের উপরে আস্থা রাখার জন্য জনসাধারণে প্রচার চালাল। সেসব পত্রিকার প্রতিটি প্রবন্ধই হল এই স্বীকারোক্তি যে, বিপ্লব সবার আগে খতম

* পরিবার কর্তা। — সম্পাঃ

** শান্ত গাম্ভীর্য। — সম্পাঃ

করবে এই তথাকথিত বৈপ্লবিক সংবাদপত্রগুলিকেই, আর তাই তখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তার আত্মরক্ষার। বৈপ্লবিক নামে অভিহিত সংবাদপত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিল সেটার সমস্ত রহস্য। আপন মৃত্যু পরোয়ানায় সেটা স্বাক্ষর দিল।

২১ মে 'পর্বত' প্রাথমিক আলোচনায় প্রশ্ন তুলল এবং তাতে সংবিধান লঙ্ঘিত হয় বলে গোটা পরিকল্পনা নাকচের প্রস্তাব আনল। শৃংখলা পার্টি জবাব দিল যে, প্রয়োজন হলে সংবিধান লঙ্ঘন করতে হবে, তবে বর্তমানে তার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সংবিধানের সবরকম ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণের অধিকারী একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরাই। তিয়ের ও মঁতালাঁবের-এর অসংযত, বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে 'পর্বত' খাড়া করল ভদ্র ও শালীন মানবতা। তারা দাঁড়াল আইনের জমিতে, আর শৃংখলা পার্টি তাদের দেখিয়ে দিল সেই জমি যাতে আইন জন্মায়, অর্থাৎ বুর্জোয়া সম্পত্তি। 'পর্বত' কান্নার সুরে বলল, তবে কি তারা সত্যসত্যই বলপ্রয়োগ মারফত বিপ্লব ডেকে আনতে চায়? শৃংখলা পার্টি উত্তর দিল, বেশ দেখা যাবে।

২২ মে প্রাথমিক প্রশ্নের নিষ্পত্তি হল ৪৬২—২২৭ ভোটে। যারা অতি সুগম্ভীর প্রগাঢ়ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, জাতীয় সভা ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক ম্যান্ডেট লঙ্ঘন করা হবে যদি তারা ম্যান্ডেটদাতা জনসাধারণকেই অগ্রাহ্য করে, তারাই এখন গদি আঁকড়ে রইল এবং নিজেরা কাজে না নেমে হঠাৎ দেশকেই কাজে নামাতে চাইল — তাও আবার দরখাস্ত মারফতই; আর ৩১ মে যখন ঘটা করে আইন পাস হয়ে গেল তখনও তারা বসে থাকল অবিচলভাবে। তারা শোধ তুলতে চাইল এক প্রতিবাদপত্রে, যাতে তারা সংবিধান ধর্ষণের ব্যাপারে নিজেদের নির্দোষ বলে লিপিবদ্ধ করে রাখল এবং সে প্রতিবাদও তারা প্রকাশ্যে পেশ করল না, পিছন থেকে গুঁজে দিল সভাপতির পকেটে।

প্যারিসে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বাহিনীর উপস্থিতি, বহুদিন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, সংবাদপত্রের তোষণের মনোভাব, 'পর্বত' ও নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের কাপুরুষতা, পেটি বুর্জোয়ার সুগম্ভীর প্রশান্তি, কিন্তু সর্বোপরি বাণিজ্য ও শিল্পগত সমৃদ্ধি প্রলেতারিয়েতের যেকোন বিপ্লবপ্রচেষ্টার গতিরোধ করল।

উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের। অধিকাংশ মানুষ বিকাশের শিক্ষালয় পার হয়ে এসেছিল — বৈপ্লবিক পর্বে শুধু এই কাজটুকু করাই সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে সম্ভব। সেটার অপসারণ ঘটতেই হত বিপ্লবের ফলে অথবা প্রতিক্রিয়ার চাপে।

অল্প কিছুকাল পরে আর একটি উপলক্ষ দেখা দিলে 'পর্বত' আরও বেশি উদ্যোগের পরিচয় প্রদর্শন করে। বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে আখ্যা দেন মারাত্মক সর্বনাশ বলে। 'পর্বতের' যে বক্তারা বরাবরের মতো নৈতিক রোষের তর্জনগর্জনে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল, সভাপতি দ্যুপেঁা তাদের বলতেই দিলেন না। জিরার্দাঁ তৎক্ষণাৎ দল বেঁধে বেরিয়ে যাবার জন্য 'পর্বতের' কাছে প্রস্তাব আনলেন। তার ফল হল এই যে, 'পর্বত' বসেই রইল, কিন্তু দলের মধ্যে থেকে জিরার্দাঁ বিতাড়িত হলেন অযোগ্য বলে।

নির্বাচনী আইনকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তখনও একটি জিনিসের দরকার ছিল — একটি নতুন **সংবাদপত্র আইন।** সেটি আসতেও বেশী দিন লাগল না। শৃংখলা পার্টির সংশোধনগুলোর ফলে আরো উগ্র করে তোলা এক সরকারী প্রস্তাব অনুসারে জামানত বৃদ্ধি পেল; হাল্কা ব্যঙ্গ উপন্যাস প্রকাশের উপরে এক বাড়তি টিকিট চাপান হল (এজেন স্যু-র নির্বাচনের জবাব হল এটি); নির্দিষ্টসংখ্যক পাতা পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক সমস্ত পত্রিকার উপরে কর বসল; এবং সর্বশেষে, ব্যবস্থা হল যে, পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে রচয়িতার স্বাক্ষর থাকা চাই। জামানতের ব্যবস্থায় মারা পড়ল তথাকথিত বৈপ্লবিক পত্র-পত্রিকাগুলি; জনসাধারণ এদের বিলুপ্তিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলোপের ঋণ পরিশোধ হিসেবে দেখল। তবে নয়া কানুনের ঝোঁক বা ফলাফল সংবাদপত্র জগতের শুধু এই অংশটি পর্যন্তই গেল না। যতদিন পর্যন্ত সংবাদপত্রে রচনা বেনামী ছিল, ততদিন সংখ্যাহীন ও নামহীন জনমতের মুখপত্র হিসেবেই ঘটত তার প্রকাশ; সেটা ছিল রাষ্ট্রের তৃতীয় শক্তি। প্রত্যেক প্রবন্ধে স্বাক্ষর থাকার ব্যবস্থার ফলে পত্রিকাগুলি ন্যূনাধিক পরিচিত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক রচনার সমষ্টিমাত্র হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নেমে গেল বিজ্ঞাপনের স্তরে। এযাবৎ খবরের কাগজগুলি প্রচারিত হত জনমতের কাগুজে মুদ্রা হিসেবে; এখন সেগুলি পরিণত হল কতকগুলি

কমবেশি কাঁচা ব্যক্তিগত হুণ্ডিতে, যার মূল্য বা সঞ্চালন নির্ভর করে শুধু সে হুন্ডি যে কাটে তার উপরেই নয়, যে তাকে অনুমোদন করে তার উপরেও। শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকাগুলি শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিলের জন্যই নয়, খারাপ কাগজের বিরুদ্ধে সব থেকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কাজনক বেনামীত্বের জন্য এমন কি ভালো কাগজও শৃঙ্খলা পার্টির কাছে বিরক্তিকর বোধ হত, আরও বেশি হত সে পার্টির বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের কাছে। নিজের তরফ থেকে সেটা চাইত শুধু ভাড়াটে লেখকদের, যাদের নাম, ঠিকানা ও রকম জানা। বৃথাই ভালো কাগজগুলি আক্ষেপ করতে থাকল তাদের সেবার পুরস্কার হিসেবে এই অকৃতজ্ঞতায়। আইন পাস হয়ে গেল; নাম প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ভাল কাগজকেই সব থেকে বেশি আঘাত হানল। প্রজাতন্ত্রী সাংবাদিকদের নাম অবশ্য যথেষ্ট সুপরিচিত ছিল, কিন্তু 'Journal des Débats', 'Assemblée nationale' (৯৫), 'Constitutionnel' (৯৬) প্রভৃতি গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞার লম্বাচওড়া গলাবাজি খুবই কাহিল দেখাল, যখন তাদের রহস্যজনক মণ্ডলী হঠাৎ ভেঙ্গেচুরে পর্যবসিত হল গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াকের মতো বহুদিনের লাইনপিছু এক পেনির ভাড়াটে লেখকে, টাকার লোভে যারা সম্ভাব্য যেকোন ব্যাপারকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে; কিংবা পরিণত হল কাফিগের মতো বুড়ো খোকায়, যারা নিজেদের রাষ্ট্রনায়ক বলে অভিহিত করে, অথবা 'Débats'-এর শ্রীযুক্ত লেমুয়ান-এর মতো রসিক কার্তিকে।

সংবাদপত্র আইনের ওপর বিতর্কের সময়েই 'পর্বত' নৈতিক অধঃপতনের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল যে, লুই ফিলিপের আমলের বৃদ্ধ যশস্বী শ্রীযুক্ত ভিক্তর হুগোর দীপ্ত শ্লেষবাণে হাততালি দেওয়ার ভিতরেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।

নির্বাচনী ও সংবাদপত্র আইন আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক তরফ প্রস্থান করল সরকারী মঞ্চ থেকে। অধিবেশন শেষ হওয়ার অল্প কিছুকাল পর তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের আগে 'পর্বতের' দুই উপদল, সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীরা ও গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রীরা দুটি ইস্তাহার, দুটি

testimonia paupertatis* প্রকাশ করে, যাতে তারা প্রমাণ করল যে, শক্তি ও সাফল্য কখনও তাদের হাতে না এলেও তারা কিন্তু সর্বদাই ছিল চিরন্তন ন্যায় তথা অন্যান্য সব চিরন্তন সত্যের সপক্ষে।

এবার আমরা শৃঙ্খলা পার্টির কথা একটু বিবেচনা করে দেখি। 'Neue Rheinische Zeitung' বলেছিল (৩য় সংখ্যা, ১৬ পৃঃ), 'ঐক্যবদ্ধ অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতার স্বত্ব — প্রজাতন্ত্র; বোনাপার্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টি রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব — প্রজাতন্ত্র। অর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে লেজিটিমিস্টরা এবং লেজিটিমিস্টদের বিরুদ্ধে অর্লিয়ান্সীরা রক্ষা করছে স্থিতাবস্থা — প্রজাতন্ত্র। শৃঙ্খলা পার্টির এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজা ও মনে মনে (in petto) লালিত নিজস্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কামনা রয়েছে, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা-দখল ও বিদ্রোহ-কামনার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করছে বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা — প্রজাতন্ত্র, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুলি নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে... তাই তিয়ের যখন বলেন, 'আমরা, রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভ,' তখন তিনি যা আঁচ করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন।'**

Républicains malgré eux- এর*** এই প্রহসন, স্থিতাবস্থার প্রতি বিরাগ অথচ অবিশ্রাম তারই সংহতিসাধন; বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যকার নিরন্তর সংঘাত; শৃঙ্খলা পার্টির বিভিন্ন অঙ্গ-উপাদানে ভাগ হয়ে যাবার ক্রমাগত নতুন আশংকা, এবং উপদলগুলির ক্রমাগত সংঘটিত পুনর্মিলন; প্রত্যেক উপদলের দিক থেকে সাধারণ শত্রুর উপরে জয়লাভকে তার সাময়িক মিত্রদের পরাজয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা; পারস্পরিক তুচ্ছ ঈর্ষা, ফন্দীফিকির, জ্বালাতন, অবিশ্রাম তরবারি উন্মোচন যা বারবার শেষ হয়

---

* দৈন্যের দলিল। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রী। (মোলিয়ের-এর 'Le Médecin malgré lui' কমেডির পরোক্ষ উল্লেখ।) — সম্পাঃ

লামুরেৎ-এর চুম্বনে (৯৭) — অশ্রদ্ধেয় এই গোটা প্রমাদ প্রহসনটা গত ছয় মাসে যেমন নিখুঁতভাবে পেকে উঠেছিল তেমন আর কখনো হয় নি।

শৃঙ্খলা পার্টি নির্বাচনী আইনকে একইসঙ্গে বোনাপার্টের উপরে জয়লাভ মনে করল। সরকার তার আপন প্রস্তাবের সম্পাদনার ভার ও দায়িত্ব সতেরো জনের কমিশনের হাতে সঁপে দিয়ে কি ক্ষমতা ছেড়ে দেয় নি? আর সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের প্রধান শক্তি কি এইজন্য নয় যে তিনি ছিলেন ষাট লক্ষ লোকের মনোনীত মানুষ? তাঁর দিক থেকে বোনাপার্ট নির্বাচনী আইনকে দেখেছিলেন সভার প্রতি কিছু সুবিধা দান হিসেবে, যা দিয়ে তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহক শক্তির ভিতরে সঙ্গতি হাসিল করতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। পুরস্কার হিসেবে এই ইতর ভাগ্যান্বেষী দাবি জানালেন যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাতা ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ বাড়ানো হোক। ফরাসী জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাধিক অংশকে যে মুহূর্তে জাতীয় সভা অপাংক্তেয় করল, তখনই কি আর সাহস করে সেটা দ্বন্দ্বে নামবে কার্যনির্বাহক শক্তির সঙ্গে? ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সভা; চরমে যাবার ভাব করল; সেটার কমিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল; বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি ভয় দেখাল ও উল্লেখ করল ভোটাধিকারবঞ্চিত, স্বত্বহারা জনসাধারণের; সোরগোল তুলে বহু চেষ্টা চলল একটা ব্যবস্থা করার এবং শেষ পর্যন্ত সভা কার্যত মাথা নোয়াল, কিন্তু শোধ নিল নীতির দিক থেকে। নীতিগতভাবে বছরে ত্রিশ লক্ষ পরিমাণ ভাতা না বাড়িয়ে সভা তাঁর জন্য ২১,৬০,০০০ ফ্র্যাঙ্কের এক বরাদ্দ মঞ্জুর করল। এতেও তুষ্ট না হয়ে সভা এই সুবিধা দিল শুধু তখনই, যখন শৃঙ্খলা পার্টির সেনাপতি ও বোনাপার্টের উপরে চাপানো রক্ষাকর্তা শাঙ্গার্নিয়ে তা সমর্থন করলেন। সুতরাং সভা বিশ লক্ষ মঞ্জুর করল বোনাপার্টকে নয়, শাঙ্গার্নিয়েকেই।

দাক্ষিণ্য বিবর্জিত (de mauvaise grâce) এই উৎকোচ বোনাপার্ট গ্রহণ করলেন দাতার মনোভাব নিয়েই। বোনাপার্টপন্থী কাগজগুলি নতুন করে তর্জন-গর্জন চালাল জাতীয় সভার বিপক্ষে। এবার যখন সংবাদপত্র আইন সম্পর্কিত আলোচনায় নামস্বাক্ষরের ব্যাপারে সংশোধন প্রস্তাব আনা হল, যার অবশ্য বিশেষ লক্ষ্য ছিল গৌণ কাগজগুলি, বোনাপার্টের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিনিধি, তখন প্রধান বোনাপার্টপন্থী পত্রিকা 'Pouvoir' (৯৮) এক

খোলাখুলি ও প্রচণ্ড আক্রমণ প্রকাশ করল জাতীয় সভার বিরুদ্ধে। সভার সামনে মন্ত্রীরা বাধ্য হলেন পত্রিকার দায়িত্ব অস্বীকার করতে; পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত পরিচালককে (gérant) তলব করা হল জাতীয় সভার দরবারে এবং সেটাকে সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড, ৫,০০০ ফ্র্যাঙ্ক জরিমানা করা হল। পরদিন 'Pouvoir' আরও বেশি উদ্ধত এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল সভার বিপক্ষে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিহিংসা হিসেবে সরকারী উকিল সংবিধানলঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করল গোটাকয়েক লেজিটিমিস্ট পত্রিকাকে।

শেষ পর্যন্ত এল সভা স্থগিত রাখার প্রশ্ন। বোনাপার্ট এটা চেয়েছিলেন সভার বাধা এড়িয়ে কাজ করার জন্য। শৃঙ্খলা পার্টি এটা চাইল কিছুটা উপদলীয় চক্রান্ত চালানোর জন্য, কিছুটা সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। উভয়েরই এর প্রয়োজন ছিল প্রদেশগুলিতে প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ আরো সংহত ও প্রসারিত করার জন্য। সভা তাই স্থগিত রইল ১১ অগস্ট থেকে ১১ নভেম্বর অবধি। কিন্তু যেহেতু বোনাপার্ট মোটেই গোপন রাখেন নি যে তাঁর একমাত্র ভাবনা হল জাতীয় সভার বিরক্তিকর খবরদারি থেকে মুক্তিলাভ, তাই সভা আস্থাজ্ঞাপক ভোটের উপরই এঁকে দিল রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থার ছাপ। আটাশ জন সদস্যের যে স্থায়ী কমিশন বিরতিকালের জন্য প্রজাতন্ত্রের ধর্ম রক্ষার অভিভাবক হিসেবে রইল, তা থেকে সমস্ত বোনাপার্টপন্থীদের দূরে রাখা হল (৯৯) তাদের বদলে 'Siècle' আর 'National'- এর কিছু কিছু প্রজাতন্ত্রীদের পর্যন্ত কমিশনে নির্বাচিত করা হল নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সংখ্যাগুরুর আনুগত্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রমাণ করে দেবার জন্য।

সভা স্থগিত রাখার অল্পদিন আগে ও বিশেষ করে তার ঠিক পরেই বোধ হল শৃঙ্খলা পার্টির বড় দুটি উপদল — অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টরা — আবার রফা করতে চাইছে, আর তা চাইছে যে দুটি রাজবংশের পতাকার তলে তারা লড়াই করছিল তাদের পুনর্মিলনের দ্বারাই। কাগজগুলি ভরে উঠল মীমাংসা প্রস্তাবের খবরে, যা নাকি আলোচিত হয়েছিল সেণ্ট লেনার্ডসে, লুই ফিলিপের রোগশয্যায়। এমন সময় লুই ফিলিপের মৃত্যু সহসা অবস্থা সরল করে দিল। লুই ফিলিপ ছিলেন সিংহাসনের অবৈধ দখলদার; পঞ্চম হেনরি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত; পঞ্চম হেনরি অপুত্রক

হওয়ায় অপর পক্ষে কাউন্ট অভ্ প্যারিস হলেন তাঁর সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। দুই রাজবংশীয় স্বার্থের মিলনে আপত্তি তোলার প্রত্যেকটি ছুতা এবার অপসারিত হল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বুর্জোয়াদের দুই উপদল প্রথম আবিষ্কার করল যে, কোন রাজবংশবিশেষের জন্য আগ্রহই তাদের পৃথক করে রাখে নি, বরঞ্চ তাদের পৃথক পৃথক শ্রেণীস্বার্থই ব্যবধান ঘটিয়েছিল দুই রাজবংশের মধ্যে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেমন সেণ্ট লেনার্ডসে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিল তেমনই লেজিটিমিস্টগণ ভিসবাদেন-এ পঞ্চম হেনরির আবাসে গিয়ে শুনল লুই ফিলিপের মৃত্যুর খবর। সঙ্গে সঙ্গে তারা in partibus infidelium এক মন্ত্রিসভা (১০০) গঠন করল, যাতে অধিকাংশই হলেন প্রজাতন্ত্রের ধর্মরক্ষক অভিভাবক সেই কমিশনের সদস্য, এবং পার্টির মধ্যে এক বিসংবাদ উপলক্ষে এই মন্ত্রিসভা ঈশ্বরের কৃপালব্ধ অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ খোলাখুলি এক ঘোষণা দিয়ে বসল। এই ঘোষণায় (১০১) খবরের কাগজে যে কলঙ্কের ঢিঢি পড়ে গেল তাতে উল্লসিত হল অর্লিয়ান্সীরা; তারা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের শত্রুতা গোপন করে নি লেজিটিমিস্টদের প্রতি।

জাতীয় সভা স্থগিত থাকার সময়ে জেলা কাউন্সিলগুলির অধিবেশন হয়। এগুলির অধিকাংশই কমবেশি সীমাবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে মত ঘোষণা করে অর্থাৎ অতি সুনির্দিষ্ট নয় এরূপ এক রাজতান্ত্রিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে, অথবা সমাধানের পক্ষে মত জানায়, আবার সেই সঙ্গে স্বীকারও করে যে সে সমাধান সন্ধানের পক্ষে তারা বড়ই অকর্মণ্য ও কাপুরুষ। বোনাপার্টপন্থী উপদল তৎক্ষণাৎ এই সংশোধন কামনাকে বুঝে নিল বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্ব দীর্ঘায়িত করার অর্থে।

১৮৫২ সালের মে মাসে বোনাপার্টের অবসর গ্রহণ, দেশের সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নতুন রাষ্ট্রপতিত্বের আমলে গোড়ার কয়েক মাসের ভিতরেই একটি সংশোধন পরিষদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন — এই নিয়মতান্ত্রিক সমাধান অবশ্য শাসক শ্রেণীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনটা হবে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক, বৈপ্লবিক, সব ক'টি পরস্পরবিরোধী তরফের জমায়েতের দিন। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সেক্ষেত্রে এক হিংস্র সমাধানে

পেঁছিতে হবে বলপ্রয়োগে। রাজবংশগুলির বাইরে কোন নিরপেক্ষ মানুষের প্রার্থিত্বের চারিদিকে যদি-বা শৃঙ্খলা পার্টি ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়, তবু সে লোকেরও বিরোধিতা করবেন বোনাপার্ট। জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শৃঙ্খলা পার্টিকে বাধ্য হয়ে অনবরত শক্তিবৃদ্ধি করতে হয় কার্যনির্বাহকের। কার্যনির্বাহকের প্রতিটি দফা শক্তিবৃদ্ধিই আবার তার বাহক বোনাপার্টেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে পরিমাণে শৃঙ্খলা পার্টি নিজ যৌথ শক্তিকে বাড়িয়ে যাবে সেই অনুপাতে সেটাকে বোনাপার্টের রাজবংশগত দাবিদাওয়ার সংগ্রামী সঙ্গতি বাড়াতে হয়, বাড়াতে হয় চূড়ান্ত দিনে তৎকর্তৃক বলপ্রয়োগে নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ভণ্ডুল করার সম্ভাবনা। তখন শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানের এক স্তম্ভের ব্যাপারে তাঁর তার চেয়ে বেশি কুণ্ঠা থাকবে না যতটা সে পার্টির ছিল জনসাধারণের বিপক্ষে সংগ্রামে, নির্বাচনী আইন সংশ্লিষ্ট অন্য স্তম্ভটির বেলায়। এমন কি বাহ্যত সভার বিরুদ্ধেও তিনি আবেদন করতে পারবেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের কাছে। এককথায়, নিয়মতান্ত্রিক সমাধান প্রশ্ন ওঠাচ্ছে সমগ্র রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা সম্পর্কেই, আর স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে বুর্জোয়ারা দেখে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, গৃহযুদ্ধ। বুর্জোয়ারা দেখে ১৮৫২ সালের মে মাসের প্রথম রবিবারে তাদের কেনাবেচা, তাদের হুণ্ডি, তাদের বিবাহ, নোটারির কাছে যথাযথভাবে মঞ্জুরীকৃত তাদের চুক্তিপত্র, তাদের মর্টগেজ, তাদের ভূমি খাজনা, বাড়ি ভাড়া, মুনাফা, তাদের সমস্ত ঠিকা ও আয়ের উৎস নিয়েই প্রশ্ন উঠবে, এবং সে ঝুঁকি তারা নিতে পারে না কোনমতেই। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজ ধসে পড়ার আশংকা। বুর্জোয়াদের অর্থে একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হল সমাধান মুলতুবি রাখা। নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে তারা রক্ষা করতে পারে শুধু সংবিধান লঙ্ঘন করে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়েই। সাধারণ কাউন্সিলগুলির অধিবেশনের পরে শৃঙ্খলা পার্টির পত্রিকা জগৎ 'সমাধান' সম্পর্কে যে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর বিতর্কে মেতেছিল তারও শেষ কথা এই। হোমরাচোমরা শৃঙ্খলা পার্টি তাই লজ্জার সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে, তাদেরকে বাধ্য হয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছে হাস্যকর, একান্ত মামুলী এবং তাদের কাছে ঘৃণ্য নকল বোনাপার্টের ব্যক্তিত্বের উপরেই।

যে সব কারণ ক্রমশই এই নীচ ব্যক্তিটিকেও অপরিহার্য ব্যক্তির চরিত্রে মণ্ডিত করে তুলছিল সে সম্পর্কে তিনিও সমান আত্মপ্রতারণা করেছিলেন। বোনাপার্টের ক্রমবর্ধিষ্ণু গুরুত্ব যে অবস্থাগতিকেই ঘটছে এ কথা বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর পার্টির ছিল, তিনি সেখানে বিশ্বাস করতেন যে সে গুরুত্বের একমাত্র কারণ তাঁর নামের যাদু এবং তাঁর ক্রমাগত নেপোলিয়নের হাস্যকর অনুকরণ। দিন দিন আরও বেশী উদ্যোগী হয়ে উঠলেন তিনি। সেণ্ট লেনার্ডস ও ভিসবাদেনের তীর্থযাত্রার শোধ নেবার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ শুরু করলেন সারা ফ্রান্সে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব সম্পর্কে বোনাপার্টপন্থীদের এতই কম আস্থা ছিল যে তারা সর্বত্রই রেলগাড়ি ও যাত্রিবাহী শকট ভর্তি করে পাঠাতে তাঁর সঙ্গে দলে দলে লাগল ক্লাকের (ভাড়াটে ধামাধরা) হিসেবে প্যারিসের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের** সেই সংগঠন ১০ ডিসেম্বর সমিতির লোকেদের (১০২)। তারা তাদের এই পুতুলটির মুখে বক্তৃতা বসিয়ে দিতে লাগল, যা বিভিন্ন শহরে অভ্যর্থনার ধরন অনুসারে রাষ্ট্রপতির নীতির মূলমন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করতে থাকল প্রজাতান্ত্রিক নীতি অথবা চিরস্থায়ী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সবরকম কারসাজি সত্ত্বেও এই সফরগুলিকে মোটেই দিগ্বিজয় যাত্রা বলা চলে না।

বোনাপার্ট যখন ভাবলেন যে এইভাবে তিনি জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন, তখন তিনি শুরু করলেন সৈন্যবাহিনীতে প্রভাববিস্তার। ভার্সাই-এর কাছে, সাতোরির সমতলভূমিতে তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনের ব্যবস্থা করালেন, সেখানে তিনি সৈন্যদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন রসুন-সসেজ, শ্যাম্পেন ও চুরুট ঘুষ দিয়ে। আসল নেপোলিয়ন যেখানে তাঁর বিজয় অভিযানের ক্লেশের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক অন্তরঙ্গতার উচ্ছ্বাসে কেমন করে ক্লান্ত সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করতে হয় তা জানতেন, সেখানে নকল নেপোলিয়ন বিশ্বাস করলেন যে সৈন্যরা বুঝি কৃতজ্ঞতার জন্যই জয়ধ্বনি দিচ্ছে, 'নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন! সসেজ দীর্ঘজীবী হোক!', অর্থাৎ 'সসেজের [Wurst] জয়, আর সঙের [Hanswurst] জয়!'

এই সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন একদিকে বোনাপার্ট ও তাঁর যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল ও অন্যদিকে শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যে বহুদিন ধরে চাপা বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটাল। শাঙ্গার্নিয়ের মধ্যেই শৃঙ্খলা পার্টি তার প্রকৃত নিরপেক্ষ

মানুষের হদিশ পেয়েছিল, তাঁর ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজবংশগত দাবির কোন প্রশ্নই উঠত না। এই পার্টি এ'কে মনোনীত করেছিল বোনাপার্টের উত্তরাধিকারী হিসেবে। তাছাড়া, শাঙ্গার্নিয়ে ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ও ১৩ জুনে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শৃংখলা পার্টির মহান সেনাপতি, ভীরু বুর্জোয়ার দৃষ্টিতে আধুনিককালের এক আলেকজান্ডার যাঁর নৃশংস হস্তক্ষেপেই কর্তিত হয় বিপ্লবরূপী গর্ডিয়ন জট। আদতে বোনাপার্টের মতোই হাস্যাস্পদ এই শাঙ্গার্নিয়ে কিন্তু এইভাবে খুবই সস্তায় একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং জাতীয় সভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপরে নজর রাখার ভার পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই, যেমন ভাতামঞ্জুরির ব্যাপারে, বোনাপার্টকে রক্ষা করার অছিলায় কিছুটা খেলিয়ে নিয়েছিলেন এবং বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্রমশই খাড়া হয়ে উঠছিলেন এক দুর্বার শক্তি হিসেবে। নির্বাচনী আইন উপলক্ষে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশংকা করা হচ্ছিল তখন যুদ্ধমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কোনরকম হুকুম নিতে তিনি তাঁর অফিসারদের নিষেধ করেন। সংবাদপত্রও শাঙ্গার্নিয়ের ব্যক্তিত্বকে বিরাট করে তোলার ব্যাপারে দায়ী ছিল। বিরাট ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাবের দরুন শৃংখলা পার্টি স্বভাবতই বাধ্য হয়েছিল একটি ব্যক্তির উপরেই সেই শক্তি আরোপ করতে যার অভাব ছিল তাদের সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে; তাই সে ব্যক্তিকে ফাঁপিয়ে অসাধারণ করে তোলা ছাড়া তাদেরও উপায় ছিল না। এভাবেই সৃষ্টি হল **'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর'** শাঙ্গার্নিয়ে সংক্রান্ত অতিকথা। যে দাম্ভিক হাতুড়েপনা, সম্ভ্রমের যে রহস্যময় জাঁক দেখিয়ে শাঙ্গার্নিয়ে যেন কৃপা করে দুনিয়ার দায়িত্ব বহন করতেন, তা সাতোরি পরিদর্শনের সময়কার ও তার পরের ঘটনাবলির সঙ্গে অতি হাস্যকর এক বৈপরীত্য রচনা করে — খন্ডনাতীতভাবে তা থেকে প্রমাণ হল যে বুর্জোয়াদের ভয়ের এই কিম্ভূত সন্তান, অতিকায় শাঙ্গার্নিয়েকে তার মাঝারি পরিমাপে ফিরিয়ে আনতে এবং সমাজের এই নির্ভীক রক্ষাকর্তাকে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজন ছিল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোনাপার্টের কলমের শুধু একটি খোঁচার।

কিছুদিন থেকে বোনাপার্ট শাঙ্গার্নিয়ের উপরে শোধ তুলছিলেন এই বিরক্তিকর রক্ষাকর্তার সঙ্গে শৃংখলার ব্যাপারে খিটিমিটি বাধাতে যুদ্ধমন্ত্রীকে

উসকে দিয়ে। সাতোরির শেষ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন পুরনো শত্রুতাকে শেষ পর্যন্ত চরমে তুলল। শাঙ্গার্নিয়ের সাংবিধানিক কোপানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন অশ্বারোহী বাহিনী বোনাপার্টের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন!' এই সংবিধানবিরুদ্ধ ধ্বনি তুলে। সভার আসন্ন অধিবেশনে এই ধ্বনি সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর বিতর্কের পথ আগে থাকতেই রোধ করার জন্য বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুল-কে আলজিয়েসের গভর্ণর নিযুক্ত করে সরিয়ে দিলেন তাঁর জায়গায় তিনি আনলেন সাম্রাজ্যের সময়কার এক বিশ্বস্ত বৃদ্ধ জেনারেলকে, নৃশংসতার দিক থেকে যিনি শাঙ্গার্নিয়েরের পুরোদস্তুর জুড়ি ছিলেন। কিন্তু দ'অপুলের অপসারণ যাতে শাঙ্গার্নিয়েরের প্রতি খানিকটা সুবিধাদান বলে মনে না হয়, তার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহান সমাজত্রাতার দক্ষিণহস্ত জেনারেল নেইমেয়ার-কে বদলি করলেন প্যারিস থেকে নান্তে শহরে। এই নেইমেয়ার শেষ সামরিক পরিদর্শনের সময়ে সমগ্র পদাতিক বাহিনীকে নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারীর পাশ দিয়ে হিমশীতল নীরবতায় কুচকাওয়াজ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। নেইমেয়ার মারফত শাঙ্গার্নিয়ে স্বয়ং আঘাত খেয়ে প্রতিবাদ জানালেন ও ভয় দেখালেন। কিন্তু বৃথাই। দু-দিন আলাপ-আলোচনার পর নেইমেয়ার-এর বদলির নির্দেশ প্রকাশিত হল 'Moniteur' পত্রিকায়, এবং শৃঙ্খলার বীরনেতার পক্ষে শৃঙ্খলা মানা বা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

শাঙ্গার্নিয়েরের সঙ্গে বোনাপার্টের সংঘর্ষ শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে তাঁর সংগ্রামেরই পূর্বানুবৃত্তি। ১১ নভেম্বর জাতীয় সভার পুনরুদ্বোধন তাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটবে। চায়ের পেয়ালায় তুফানের শামিল হবে সে ব্যাপারটি। আসলে চলতেই থাকবে পুরনো খেলা। ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টির সংখ্যাধিক অংশ সেটার বিভিন্ন উপদলের নীতিবাগীশদের হৈচৈ সত্ত্বেও বাধ্য হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে। তেমনই ইতিমধ্যে অর্থাভাবে নরম হয়ে আসা বোনাপার্টও সমস্ত প্রাথমিক প্রতিবাদাদি সত্ত্বেও জাতীয় সভার কাছ থেকে এই ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বীকার করে নেবেন স্রেফ অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে। এইভাবে সমাধান পিছিয়ে যাবে; স্থিতাবস্থা চলতে থাকবে; শৃঙ্খলা পার্টির এক উপদল অপর উপদলের দ্বারা কলঙ্কিত, হতশক্তি ও অসহ্য প্রতিপন্ন হতে থাকবে; সাধারণ শত্রু, জাতির জনগণের

উপর পীড়ন প্রসারিত ও নিঃশোষিত হতে থাকবে যতদিন না অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিই আবার বিকাশের এমন এক স্তরে পৌঁছচ্ছে যখন নতুন এক বিস্ফোরণ সমস্ত বিবদমান তরফগুলিকেই উড়িয়ে দেবে তাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমেত।

বুর্জোয়াদের মানসিক সান্ত্বনার জন্য এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে, বোনাপার্ট ও শৃঙ্খলা পার্টির মধ্যকার কেলেঙ্কারির ফল হল ফটকাবাজারে বহু ক্ষুদে পুঁজিপতির সর্বনাশ ও ফটকাবাজারের বাঘববোয়ালদের কবলে তাদের ধনসম্পত্তির স্থানান্তরণ।

১৮৫০ সালে জানুয়ারি
থেকে ১ নভেম্বরের মধ্যে
মার্কসের লেখা

'Neue Rheinische
Zeitung. Politisch-ökonomische
Revue' পত্রিকার
১৮৫০ সালের ১, ২, ৩, ৫-৬
সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত
স্বাক্ষর কার্ল মার্কস

১৮৯৫ সালের
সংস্করণের সঙ্গে
মিলিয়ে দেখে
ছাপা হল মূল
জার্মান পাঠ অনুসারে

টীকা

(১) পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের যা বৈষয়িক ভিত্তি সেইসব আর্থনীতিক সম্পর্কের সাধারণে বোধগম্য রূপেখা তুলে ধরার কাজটা মার্কস হাতে নেন এই রচনাটিতে। প্রলেতারিয়েতের হাতে তিনি তুলে দিতে চান একখানা তত্ত্ব-অস্ত্র — পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত আধিপত্য এবং শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্বের ভিত্তি সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি। নিজ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের মূল উপাদানগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে মার্কস পুঁজিতন্ত্রের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর আপেক্ষিক এবং আসল গরিবি সম্বন্ধে একটা সাধারণ উপস্থাপনা নির্ধারণ করেন।

১৮৯১ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের সংশোধনের পরে এই রচনা প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) 'Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie' ('নতুন রাইন পত্রিকা। গণতন্ত্রের মুখপত্র') — মার্কসের সম্পাদনায় ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত কলোন-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; এঙ্গেলস — সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। পৃঃ ৭

(৩) **'জার্মান শ্রমিক সমিতি'** — ১৮৪৭ সালে অগস্ট মাসের শেষের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাসেল্‌স্‌-এ; বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটান এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের ভাব-ধারণা প্রচার করা ছিল সেটার উদ্দেশ্য। মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাঁদের সহযোগীদের পরিচালিত এই সমিতিটি বেলজিয়মে বিপ্লবী জার্মান শ্রমিকদের বৈধ সমাবেশ-কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। এই সমিতির সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্যরা কমিউনিস্ট লীগের ব্রাসেল্‌স্‌ শাখারও সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বল্পকাল পরেই ব্রাসেল্‌স্‌-এ জার্মান শ্রমিক

সমিতির' ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়, কেননা সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাসিত করেছিল বেলজিয়মের পুলিস। পৃঃ ৭

(৪) হাঙ্গেরির বুর্জোয়া বিপ্লব দমন করা এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের জন্য ১৮৪৯ সালে হাঙ্গেরিতে জারের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ অভিযানের কথা এখানে বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭

(৫) ১৮৪৯ সালের ২৮ মার্চে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদে গৃহীত, কিন্তু কয়েকটা জার্মান রাজ্যের বাতিল-করা বাদশাহী সংবিধানের সমর্থনে জার্মানিতে ১৮৪৯ সালে মে-জুলাই মাসের বিভিন্ন জন-অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এইসব অভ্যুত্থান দমন করা হয়েছিল ১৮৪৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি। পৃঃ ৭

(৬) 'পুঁজি'-তে মার্কস লিখেছেন: '...যে সব অর্থশাস্ত্র ভি. পেটির সময় থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছে, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বলতে আমি সেটাকেই বুঝি।' ব্রিটেনে চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ্‌ এবং ডেভিড রিকার্ডো। পৃঃ ৯

(৭) 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এ ফ. এঙ্গেলস লিখেছেন: 'সতের শতকের শেষের দিকে অল্প কয়েক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির চিন্তায় নির্দিষ্ট আকারে প্রথমে গড়ে উঠলেও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে, ফিজিওক্রাটদের এবং অ্যাডাম স্মিথের সদর্থক সূত্র অনুসারে অর্থশাস্ত্র মূলত আঠার শতকেরই সন্তান।' পৃঃ ৯

(৮) ১৮৯১ সালে মে দিবস উদ্‌যাপনের কথা বলছেন এঙ্গেলস। কোন কোন দেশে (ব্রিটেন এবং জার্মানিতে) মে দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছিল মে-র প্রথম রবিবারে, সেটা ১৮৯১ সালে ছিল ৩ মে। পৃঃ ১৬

(৯) অতিশয় জটিল এবং গোলমেলে একটা জটের কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রাচীন গ্রীক উপকথায় আছে, ফ্রিজিয়ার রাজা গর্ডিয়ন তাঁর রথদণ্ডের সঙ্গে জোয়াল বেঁধেছিলেন এই জট দিয়ে। এইরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, জট যে খুলতে পারবে সে গোটা এশিয়াকে পদানত করবে। মেসিডনের রাজা আলেকজান্ডর জট খোলার চেষ্টা না করে তরোয়ালের কোপ দিয়ে তা কেটে দেন।

পৃঃ ২৫

(১০) **'কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'টি** মার্কস এবং এঙ্গেলস লিখেছিলেন ১৮৫০ সালে মার্চ মাসের শেষের দিকে, তখনও তাঁরা নতুন বৈপ্লবিক জোয়ার আসবে বলে আশা করছিলেন। ভাবী বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের তত্ত্ব এবং

কর্মকৌশল গড়ে তুলতে গিয়ে মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রলেতারিয়ানদের স্বতন্ত্র পার্টি স্থাপনের, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের থেকে পৃথক হবার আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 'বিবৃতি'টির নির্দেশক মূলভাবটা হল 'নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব'-এর ধারণা, যে-বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের মধ্যে গোপনে বিলি করা হয়েছিল এই 'কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'। লীগের যে সব সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের কারও-কারও কাছ থেকে দলিলখানাকে প্রুশীয় পুলিস হস্তগত করেছিল, সেটা প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে এবং ভের্মুথ্ আর স্টিয়েবের নামে পুলিস কর্মকর্তাদের লেখা একখানা বইয়ে। পৃঃ ৪৯

(১১) **কমিউনিস্ট লীগ** — প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, মার্কস এবং এঙ্গেলস সেটা প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমান ছিল ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ৪৯

(১২) বলা হচ্ছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের কথা, আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর থেকে প্যারিসকে বিপ্লব পয়দা হবার জমিন বলে বিবেচনা করা হত। পৃঃ ৫১

(১৩) **পবিত্র মিতালী** — পৃথক পৃথক দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা এবং সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ১৮১৫ সালে জার-শাসিত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় রাজাদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল জোট। পৃঃ ৫১

(১৪) **ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বামপন্থীরা** — জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পরে আহূত জাতীয় সভার পেটি-বুর্জোয়া বাম বিভাগের কথা বলা হচ্ছে; ১৮৪৮ সালের ১৮ মে মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে শুরু হয়েছিল এই 'সভার' অধিবেশন। জার্মানির রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘুচান এবং সাম্রাজ্যিক সংবিধান রচনা করাই ছিল সেটার প্রধান কাজ। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বামপন্থী বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন 'সভা' সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারক হয় এবং ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে স্থিরনিশ্চিত মতাবস্থান নিতে পারে না। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে 'সভাকে' চলে যেতে হয়েছিল স্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পৃঃ ৫২

(১৫) 'Neue Oder-Zeitung' ('নতুন ওদের পত্রিকা') — ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৫

সাল পর্যন্ত ব্রেস্‌লাউ (ব্রৎস্লাভ)-এ ঐ নামে প্রকাশিত জার্মান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৈনিক। ১৮৫৫ সালে মার্কস ছিলেন সেটার লণ্ডনের সংবাদদাতা। পৃঃ ৫৫

(১৬) ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে মার্কস এবং এঙ্গেলসের এখানে ব্যক্ত অভিমতটি বিপ্লবের সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে করা তাদের সাধারণ মূল্যায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় তখন এই মত পোষণ করতেন (লেনিন যেটা নির্দেশ করেছেন) যে, তখনই পুঁজিতন্ত্র ছিল জরাগ্রস্ত, আর সমাজতন্ত্র ছিল বেশ নাগালের মধ্যে। এটা ধরে নিয়ে তাঁরা 'বিবৃতি'তে বাজেয়াপ্ত-করা ভূমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত করার বিরোধিতা করেন এবং সেটাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে সংঘবদ্ধ গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের শ্রমিক উপনিবেশগুলির ব্যবহারের জন্য দেবার পক্ষে বলেন।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব এবং অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনুসারে লেনিন ভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্নে মার্কসীয় অভিমতটিকে সম্প্রসারিত করেন। অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের বিজয়ের পরে বেশির ভাগ বড় কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার উপযোগিতা লক্ষ্য করে লেনিন লেখেন: 'নিয়মটাকে অতিরঞ্জিত কিংবা বাঁধা ছকে পরিণত ক'রে যে-ভূমি দখলচ্যুত-করা বেদখলদারদের মালিকানায় ছিল সেটার **অংশবিশেষ** নিকটবর্তী ছোট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের বিনা মামুলি অনুদান হিসেবে দেওয়া কখনও মঞ্জুর না-করাটা হবে কিন্তু মস্ত ভুল।' পৃঃ ৬০

(১৭) **কনভেন্‌শন** — আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে ১৭৯২ সালে গঠিত জাতীয় সভার এই নাম ছিল। কনভেনশন চূড়ান্তভাবে সামন্ততন্ত্র দূর করে এবং সমস্ত প্রতিবৈপ্লবিক আর সুবিধাবাদী উপাদান নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে, তাছাড়া বৈদেশিক অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। পৃঃ ৬১

(১৮) **ব্রুমেয়ার** — ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক পঞ্জিকার একটা মাসের নাম। ১৭৯৯ সালের ১৮ ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কুদেতা করে ক্ষমতা দখল করে সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। পৃঃ ৬১

(১৯) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue'-তে '১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ সাল' সাধারণ শীর্ষক একগুচ্ছ প্রবন্ধ নিয়ে মার্কসের **'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'** প্রকাশিত

হল। বস্তুবাদী মতবস্থান থেকে ফ্রান্সের ইতিহাসের একটা গোটা যুগের ব্যাখ্যা দিয়ে এতে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক কর্মকৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'-এ বৈপ্লবিক গণসংগ্রামের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কস বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে নিজ তত্ত্ব বিকশিত করেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করার আবশ্যকতা প্রদর্শন করে মার্কস এখানে এই প্রথম 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' কথাটা ব্যবহার করেছেন এবং বের করেছেন একনায়কত্বের রাজনীতিক, আর্থনীতিক আর ভাবাদর্শগত কাজগুলি। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষককুলের মৈত্রীজোট সংক্রান্ত ধারণাটাকে তিনি স্পষ্ট নির্দিষ্ট আকারে তুলে ধরেছেন। মূল পরিকল্পনা অনুসারে 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম'-এ চারটে প্রবন্ধ থাকার কথা ছিল: '১৮৪৮-এর জুনের পরাজয়', '১৩ জুন, ১৮৪৯', 'ইউরোপীয় মূল ভূমিতে ১৩ জুনের ফলাফল' এবং 'ইংলণ্ডে বর্তমান পরিস্থিতি'। কিন্তু বেরিয়েছিল শুধু তিনটে প্রবন্ধ। ইউরোপের মূল ভূমিতে ঘটনাবলির উপর ১৮৪৯-এর জুনের যে প্রভাব পড়ে তৎসংক্রান্ত এবং ইংলণ্ডের পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্নগুলিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে 'Neue Rheinische Zeitung'-এ অন্যান্য লেখায়, বিশেষত মার্কস এবং এঙ্গেলসের একত্রে লেখা আন্তর্জাতিক পর্যালোচনায়। ১৮৯৫ সালে রচনাটিকে প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত করার সময়ে এঙ্গেলস আরও জুড়ে দেন চতুর্থ পরিচ্ছেদটি, সেটার মধ্যে ছিল ফরাসী ঘটনাবলি নিয়ে লেখা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক পর্যালোচনার' বিভিন্ন অংশ। এঙ্গেলস এই পরিচ্ছেদটির শিরনামা দেন '১৮৫০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন'। এই বইখানায় প্রথম তিনটে পরিচ্ছেদের শিরনামাগুলি দেওয়া হয়েছে পত্রিকাটি অনুসারে, আর ১৮৯৫ সালের সংস্করণ অনুসারে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরনামা। পৃঃ ৬৪

(২০) মার্কসের 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'-এ এঙ্গেলসের ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ১৮৯৫ সালে বার্লিনে রচনাটির পৃথক প্রকাশনার জন্য।

মার্কসের রচনায় ১৮৪৮—১৮৪৯ সালের বিপ্লব এবং সেটার শিক্ষার বিশ্লেষণের বিপুল গুরুত্ব প্রদর্শন করে এঙ্গেলস ভূমিকাটির একটা বড় অংশে প্রলেতারিয়েতের, মুখ্যত জার্মানিতে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামে পাওয়া অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রলেতারিয়েতকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত বৈধ উপায়াদির বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সংযুক্ত করা এবং দ্বিতীয় কাজটাকে প্রথমটার অধীন করার আবশ্যকতার উপর এঙ্গেলস জোর দিয়েছেন।

মূর্ত-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে যথোচিত কর্মকৌশলগত প্রণালী আর সংগ্রামের ধরন প্রয়োগ এবং প্রলেতারিয়েত যা বেশি পছন্দ করে সেই শান্তিপূর্ণ রূপের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জায়গায় শাসক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির বলপ্রয়োগের শরণ নেবার ক্ষেত্রে অ-শান্তিপূর্ণ রূপের বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজন সংক্রান্ত বুনিয়াদী মার্কসীয় মূলনীতিগুলিকে এঙ্গেলস আর একবার প্রদর্শন করেছেন।

ভূমিকাটি প্রকাশিত হবার আগে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নির্বাহকবর্গ রচনাটির 'অতি বৈপ্লবিক' মেজাজটাকে পরিমিত করতে এবং রচনাটিকে অপেক্ষাকৃত সতর্ক পরিণামদর্শী করতে পীড়াপীড়ি করে তাগিদ দিয়েছিল। পার্টির নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ত মতাবস্থান এবং 'সম্পূর্ণভাবে কেবল বৈধতার কাঠামের ভিতরেই সক্রিয় থাকার জন্য' নেতৃত্বের প্রচেষ্টার সুতীব্র সমালোচনা করেছিলেন এঙ্গেলস। তবে, নির্বাহকবর্গের মন্তব্যের সঙ্গে রাজী হতে বাধ্য হয়ে এঙ্গেলস প্রুফে কয়েকটা অংশ বাদ দিতে এবং কোন কোন সূত্রায়ন বদলাতে স্বীকার করেন। (এইসব পরিবর্তন এবং বাদ-দেওয়া অংশগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে পাদটীকায়। যে সব প্রুফ আমাদের হাতে এসেছে তার থেকে এবং আদত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মূল পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।)

তার সঙ্গে সঙ্গে, এই সংক্ষেপিত ভূমিকার ভিত্তিতে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির কোন কোন নেতা এঙ্গেলসকে কেবল যেকোন পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সমর্থক হিসেবে, 'quand néme [যা-ই হোক না কেন] বৈধতার' পূজারী হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ন্যায্য ক্রোধে ভরে উঠে এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকাটিকে কিছু বাদ না দিয়ে 'Neue Zeit' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত পৃথক সংস্করণের জন্য তিনি যা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই আকারেই ভূমিকাটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবু, ঐ সংক্ষেপিত ভূমিকায়ও সেটার বৈপ্লবিক প্রকৃতি বজায় থাকে।

এঙ্গেলসের ঐ ভূমিকাটির অসংক্ষেপিত পাঠ প্রথম প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে — ক. মার্কস, 'ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০'-এর ১৯৩০ সালের সংস্করণে। পৃঃ ৬৪

(২১) 'Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue' ('নতুন রাইন পত্রিকা। রাজনীতিক-আর্থনীতিক সমীক্ষা') —১৮৪৯ সালে ডিসেম্বর মাসে মার্কস এবং এঙ্গেলসের প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকা; কমিউনিস্ট লীগের তত্ত্বগত এবং

রাজনীতিক মুখপত্র। ছাপা হত হাম্‌বুর্গে; বেরিয়েছিল মোট ছ'টা সংখ্যা। জার্মানিতে পুলিসী হয়রানি-নির্যাতন এবং অর্থাভাবের দরুন পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পৃঃ ৬৪

(২২) সম্রাট ১ম ভিলহেলম্ হাম্‌বুর্গের কাছে জাকসেন্‌ভাল্‌দে (সাক্সন অরণ্য)-এ একটা ভূমি-সম্পত্তি দান করেছিলেন বিসমার্ককে, সেটার ঢঙে এঙ্গেলস শ্লেষভরে সরকারী অনুদানের নাম দেন, সেইসব সরকারী অনুদানের কথা এখানে বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬৮

(২৩) In partibus infidelium (আক্ষরিক অর্থে — বিধর্মীদের দেশে) — অখিস্টান দেশে নিছক নামে মাত্র ডায়োসেসে নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের খেতাবে একটা সংযোজন। কোন একটা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিদেশে গঠিত রাজতন্ত্রীদের সরকার প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাগুলিতে প্রায়ই এই কথাটা ব্যবহার করা হয়। পৃঃ ৬৯

(২৪) উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ফরাসী বুর্জোয়াদের দুটো রাজতান্ত্রিক পার্টি অর্লিয়ান্সী এবং লেজিটিমিস্টদের কথা বলা হয়েছে।

লেজিটিমিস্টরা — ১৮০০ সালে উৎখাত 'বৈধ' ('legitimate') বুরবোঁ বংশের অনুগামীরা। এই বংশ বড় বড় ভূমি-সম্পত্তি মালিক অভিজাতদের স্বার্থ দেখত। ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করা রাজত্বকারী অর্লিয়ন্স বংশের (১৮৩০—১৮৪৮) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ সোশ্যাল বাগাড়ম্বরের শরণ নিয়ে বুর্জোয়াদের শোষণ থেকে শ্রমজীবীদের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করত।

অর্লিয়ান্সীরা — বুরবোঁ রাজবংশের কোন কনিষ্ঠ পুত্রের শাখা-বংশ, অর্লিয়ান্সী কুলের সমর্থকেরা; অর্লিয়ন্স বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের সময়ে, সেটা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। অর্লিয়ান্সীরা ছিল ফিনান্স অভিজাতবর্গ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে (১৮৪৮—১৮৫১) লেজিটিমিস্ট এবং অর্লিয়ান্সীরা হয়েছিল সম্মিলিত রক্ষণপন্থী 'শৃঙ্খলা পার্টির' কোষকেন্দ্র। পৃঃ ৭৩

(২৫) ৩য় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স ক্রাইমীয় যুদ্ধে (১৮৫৪—১৮৫৫) অংশগ্রহণ করেছিল, ইতালির জন্য অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল (১৮৫৯), ব্রিটেনের সঙ্গে একত্রে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (১৮৫৬—১৮৫৮ এবং ১৮৬০)

অংশগ্রাহী ছিল, শুরু করেছিল ইন্দোচীন বিজয় (১৮৬০—১৮৬১), সামরিক অভিযান সংগঠিত করেছিল সিরিয়ায় (১৮৬০—১৮৬১) এবং মেক্সিকোয় (১৮৬২—১৮৬৭) আর, শেষে, ১৮৭০—১৮৭১ সালে লড়েছিল প্রাশিয়ার সঙ্গে। পৃঃ ৭৩

(২৬) এঙ্গেলসের প্রয়োগ করা এই অভিধাটায় প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় বোনাপার্টীয় সাম্রাজ্যের (১৮৫২—১৮৭০) শাসক মহলগুলির অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির একটা মূল উপাদান। বিদেশে রাজ্যজয় পরিকল্পনা এবং হঠকারী পররাষ্ট্রনীতির একটা ভাবাদর্শগত আবরণ হিসেবে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির শাসক শ্রেণীগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত তথাকথিত এই **'জাতি সংক্রান্ত নীতি'**। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতির সঙ্গে এটার কোন মিল ছিল না; জাতিবিদ্বেষ চাগানোর জন্য, এবং জাতীয় আন্দোলনগুলিকে, বিশেষত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় আন্দোলনগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিগুলির অনুসৃত প্রতিবৈপ্লবিক কর্মনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এটাকে কাজে লাগান হত। পৃঃ ৭৩

(২৭) ১৮১৫ সালে ৮ জুন ভিয়েনা কংগ্রেসে গঠিত **জার্মান কনফেডারেশন** ছিল সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক জার্মান রাজ্যগুলির একটা পরিমেল; জার্মানিতে রাজনীতিক-আর্থনীতিক বিচ্ছিন্ন অবস্থা বজায় থাকার সহায়ক হয়েছিল; এতে প্রধান ভূমিকায় ছিল অস্ট্রিয়া। পৃঃ ৭৪

(২৮) ১৮৭০—১৮৭১ সালে ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের ফলে যে জার্মান সাম্রাজ্য দেখা দিয়েছিল, অস্ট্রিয়া সেটার মধ্যে ছিল না — তারই থেকে **'ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্য'** নামটা। ৩য় নেপোলিয়নের পরাজয় ফ্রান্সে একটা বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই বিপ্লবে ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট উৎখাত হন এবং ১৮৭০ সালে ৪ সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়। পৃঃ ৭৫

(২৯) **জাতীয় রক্ষিদল** — সশস্ত্র জন-স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, তাতে সেনাপতিরা নির্বাচিত; ফ্রান্সে এবং অন্যান্য পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশে এটা ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবের শুরুতে এটা প্রথম ফ্রান্সে গঠিত হয় ১৭৮৯ সালে; মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে এটা ছিল ১৮৭১ সাল পর্যন্ত। ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে গণতন্ত্রী জনগণের ব্যাপক অংশ শামিল হওয়ায় অধিকতর শক্তিশালী প্যারিসের জাতীয় রক্ষিদল ১৮৭০—১৮৭১ সালে একটা বড় রকমের বৈপ্লবিক ভূমিকায় ছিল। জাতীয় রক্ষিদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত

হয়েছিল ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে; এই কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮৭১ সালে ১৮ মার্চের প্রলেতারিয়ান অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেছিল এবং পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয়ান সরকার হিসেবে কাজ করেছিল (২৮ মার্চ অবধি) ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের প্রারম্ভিক কালপর্যায়ে। প্যারিস কমিউন দমন হবার পরে জাতীয় রক্ষিদল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৭৪

(৩০) **ব্লাঙ্কিপন্থী** — ফরাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসী ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা লুই-অগ্যুস্ত ব্লাঙ্কির অনুগামীরা। লেনিনের কথায়, ব্লাঙ্কিপন্থীরা 'শ্রেণী-সংগ্রামের পথে নয়, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের অল্পাংশের চক্রান্ত মারফত মানবজাতিকে মজুরি-দাসত্ব থেকে উদ্ধারের' আশা করত।

প্রুধোঁপন্থী — একটি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা, এ ধারার প্রবক্তা পিয়ের জসেফ প্রুধোঁর নামে এই নাম। পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধোঁ ব্যক্তিগত ক্ষুদে মালিকানা চিরস্থায়ী করতে চান, 'জন' ব্যাঙ্ক আর 'বিনিময়'-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, এর সাহায্যে শ্রমিকেরা নাকি নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করে কারুজীবীতে পরিণত হবে, আর নিজ নিজ মালের 'ন্যায্য' বাজারের ব্যবস্থা করতে পারবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন, এমন কি প্রলেতারিয়ান রাষ্ট্রের প্রয়োজন তারা অস্বীকার করে নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। পৃঃ ৭৫

(৩১) ১৮৭০—১৮৭১ সালের ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জার্মানিকে ফ্রান্সের দেয় ৫,০০,০০,০০,০০০ ফ্র্যাঙ্ক খেসারতের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ৭৫

(৩২) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে চালু করা হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এই আইন অনুসারে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণসংগঠন এবং শ্রমিকদের পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা চলত, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্যাতন করা হত। শ্রমিক শ্রেণীর গণ-আন্দোলনের চাপে এই আইন রদ করা হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৭৬

(৩৩) ১৮৬৬ সালে উত্তর-জার্মান রাইখস্টাগ নির্বাচনের জন্য এবং ১৮৭১ সালে যুক্ত জার্মান সাম্রাজ্যের রাইখস্টাগ নির্বাচনের জন্য বিসমার্ক সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন। পৃঃ ৭৭

(৩৪) ১৮৮০ সালে হাভ্র-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচিতে মার্কসের লেখা মুখবন্ধের কথা বলছেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৭৭

(৩৫) **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** বিপ্লবী জনগণ লুই বোনাপার্টের সরকার উচ্ছেদ করে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়, আর **১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবরই** জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ব্লাঙ্কিপন্থীরা। পৃঃ ৮২

(৩৬) **ভাগ্রাম্**-এর যুদ্ধ হয়েছিল ১৮০৯ সালে ৫-৬ জুলাই ১৮০৯ সালে অস্ট্রো-ফরাসী যুদ্ধের মধ্যে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরিচালিত ফরাসী সৈন্যদলগুলি আর্চ ডিউক চার্লসের ফৌজকে পরাস্ত করেছিল।

ওয়াটারলু-র যুদ্ধ হয়েছিল ১৮১৫ সালের ১৮ জুন। নেপোলিয়ন পরাস্ত হন। ১৮১৫ সালের সামরিক অভিযানে এই যুদ্ধের নিষ্পত্তিকর গুরুত্ব ছিল; ইউরোপীয় শক্তিগুলির নেপোলিয়নবিরোধী জোটের চূড়ান্ত জয় এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্যের পতন পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে যায় এই যুদ্ধে। পৃঃ ৮৩

(৩৭) মেক্লেনবুর্গ-শ্ভেরিন এবং মেক্লেনবুর্গ-স্ট্রেলিট্স্-এ ডিউক এবং অভিজাতবর্গের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের কথা এঙ্গেলস বলছেন এখানে; এই সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে ১৭৫৫ সালে রস্তক-এ অভিজাতবর্গের বংশগত অধিকার সম্পর্কে একটা নিয়মতান্ত্রিক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিচুক্তিতে অভিজাতবর্গের আগেকার স্বাধীনতা এবং বিশেষ সুবিধাগুলো স্বীকৃত হয় এবং লাণ্টটাখ্গুলোতে তাদের মুখ্য ভূমিকা নিশ্চিত হয়; লাণ্টটাখ্গুলো সংগঠিত ছিল সামাজিক বর্গ নীতি অনুসারে। এই সন্ধিচুক্তিতে তাদের অর্ধেক ভূমির কর মকুব করা হয়, বাণিজ্য আর হস্তশিল্পের উপর কর ধার্য হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে অভিজাতদের লেভি নির্দিষ্ট করা হয়। পৃঃ ৮৫

(৩৮) ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে এখানে। এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার মধ্যে বহুবছর প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে এবং প্রাশিয়ার প্রাধান্যে জার্মানির একীকরণ পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মান কনফেডারেশনের (২৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অস্তিত্ব শেষ হয়, সেটার বদলে অস্ট্রিয়ার অংশগ্রহণ ছাড়াই এবং প্রাশিয়ার প্রাধান্যে উত্তর-জার্মান কনফেডারেশন গঠিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া অধিকার করে হানোভার রাজ্য। হেসে-কাসেল্ প্রদেশ, মহান ডিউক্ডম্ নাসাউ আর স্বাধীন নগর মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্ট। পৃঃ ৮৭

(৩৯) ১৮৯৪ সালে ৫ ডিসেম্বর জার্মান রাইখস্টাগ-এ সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত একটা নতুন বিল্ বিধানমণ্ডলী বাতিল করে দিয়েছিল ১৮৯৫ সালের ১১ মে। পৃঃ ৮৯

(৪০) **১৮৩০ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবে বুরবোঁ রাজবংশ** উচ্ছেদ হয়, সেই কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৯১

(৪১) ডিউক অভ্ অর্লিয়ন্স ফরাসী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন লুই ফিলিপ নামে। পৃঃ ৯১

(৪২) **১৮৩২ সালের ৫-৬ জুন** প্যারিসে একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এতে অংশগ্রাহী শ্রমিকেরা বিভিন্ন ব্যারিকেড খাড়া করেছিল এবং বিপুল সাহসের সঙ্গে দৃঢ়সংকল্প হয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

১৮৩৪ সালের এপ্রিল মাসে লিয়োঁ-তে একটা শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে, এটা হল ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রথম গণ-কর্মকাণ্ডগুলির একটা। অন্যান্য শহরে, বিশেষত প্যারিসে প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থিত এই অভ্যুত্থান নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল।

১৮৩৯ সালের ১২ মে-র প্যারিস অভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকায় ছিল বিপ্লবী শ্রমিকেরা, এটার আয়োজন করেছিল 'ঋতু সমিতি' (soceétc de saisòns) নামে অগুস্ত ব্লাঙ্কি এবং আর্মাঁদ বার্বে-র নেতৃত্বে পরিচালিত একটা প্রজাতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক গুপ্ত সমিতি। সরকারী সৈন্য এবং জাতীয় রক্ষিদল এই অভ্যুত্থান দমন করেছিল। পৃঃ ৯১

(৪৩) **জুলাই রাজতন্ত্র** — লুই ফিলিপের রাজত্বের একটা কাল পর্যায় (১৮৩০-১৮৪৮) — নামটা আসে জুলাই বিপ্লব থেকে। পৃঃ ৯২

(৪৪) অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া আর রাশিয়ার মধ্যে বিভক্ত পোল্যান্ডের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পোলীয় জেলায় জেলায় অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হয়। কিন্তু নিম্ন অভিজাতদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন এবং প্রুশীয় পুলিস অভ্যুত্থানের নেতাদের গ্রেপ্তার করার ফলে সাধারণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় এবং পৃথক পৃথক বৈপ্লবিক ঝলকমাত্র ঘটে। ১৮১৫ সাল থেকে যুক্তভাবে, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া আর প্রাশিয়ার অধীন ক্রাকোভেই ২২ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহীরা জয়ী হয় এবং জাতীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। এই সরকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যতামূলক কাজ বাতিল করার একটা ইস্তাহার প্রকাশ করে। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় ক্রাকোভে অভ্যুত্থান দমন হয়। অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে ক্রাকোভের অন্তর্ভুক্তির একটা চুক্তি ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত হয় অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া আর রাশিয়ার মধ্যে। পৃঃ ৯৫

(৪৫) **সন্ডারবুন্ড** — সুইজারল্যান্ডে প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংস্কার রোধ করা এবং যাজকমণ্ডলী আর জেশুইটদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিরাপদ করার

উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালে অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর সাতটা ক্যাণ্টনের মধ্যে সম্পাদিত একটা পৃথক সন্ধিচুক্তি। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে সুইজারল্যাণ্ডের ডায়েট সান্ধিচুক্তিটাকে বাতিল করে দেয়, এটাকে ছুতো করে জণ্ডারবুণ্ড নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অন্যান্য ক্যাণ্টনের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছিল। ১৮৪৭ সালে ২৩ নভেম্বর ফেডারেল সরকারের ফৌজ জণ্ডারবুণ্ড্-এর সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত-ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পবিত্র মিতালী'র প্রাক্তন সদস্য দুটো প্রতিক্রিয়াপন্থী পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশ অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া ঐ যুদ্ধের সময়ে জণ্ডেরবুণ্ড-এর আনুকূল্য করার জন্য সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছিল; গিজো ঐ দেশ-দুটিকে বস্তুত সমর্থন করেছিলেন, এইভাবে তিনি জণ্ডারবুণ্ডকে নিয়েছিলেন নিজ রক্ষণাধীনে। পৃঃ ৯৫

(৪৬) ১৮৪৭ সালের বসন্তকালে ইণ্ডর জেলায় ব্যুজাঁসে-তে সেখানকার নিকটবর্তী গ্রামগুলির দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মজুরেরা স্থানীয় মুনাফাখোরদের খাদ্যের গুদামগুলোয় চড়াও হয়, তার থেকে জনসাধারণ এবং সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, ফলে রক্তপাত হয়। ব্যুজাঁসে-র ঘটনাবলির দরুন সরকার নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল: হাঙ্গামায় অংশগ্রাহীদের মধ্যে চার জনকে বধ করা হয়েছিল ১৮৪৭ সালে ১৬ এপ্রিল, কঠোর শ্রমদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আরও অনেককে। পৃঃ ৯৬

(৪৭) 'Le National' ('জাতীয় পত্রিকা') — ১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। অস্থায়ী সরকারে তাদের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিরা ছিলেন মারাস্ত, বাস্তিদ এবং গার্নিয়ে-পাজেস। পৃঃ ৯৭

(৪৮) 'La Gazette de France' ('ফ্রান্সের ঘোষপত্র') —১৬৩১ সাল থেকে প্যারিস প্রকাশিত দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে লেজিটিমিস্টদের মুখপত্র, বুরবোঁ রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রবর্তনের সমর্থক। পৃঃ ৯৯

(৪৯) ফরাসী জাতীয় পতাকা বেছে নেবার প্রশ্নটা উঠেছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিনগুলিতেই। প্যারিসের বিপ্লবী শ্রমিকেরা দাবি করেছিল পতাকাটা হওয়া চাই লাল — ১৮৩২ সালে জুন অভ্যুত্থানের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক অধ্যুষিত শহরতলিগুলিতে উত্তোলিত পতাকার রঙ। বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা জিদ ধরেছিল তেরঙা (নীল, শাদা আর লাল পটির) পতাকার জন্য, সেটা ছিল আঠার শতকের শেষের দিকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের আমলের পতাকা। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আগেও তেরঙা পতাকা

ছিল 'National'-এর পত্রিকাটিকে ঘিরে সমবেত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের প্রতীকচিহ্ন। জাতীয় পতাকা তেরঙা হওয়াতেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের রাজি হতে হয়েছিল, তবে তাদের পীড়াপীড়ি অনুসারে পতাকা-দণ্ডে লাগান হয়েছিল একটা কৃত্রিম লাল গোলাপ। পৃঃ ১০৩

(৫০) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বময় একটা অভ্যুত্থান; এটাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল ফরাসী বুর্জোয়ারা। এটা হল ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণী আর বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ১০৩

(৫১) 'Le Moniteur universel' ('সর্বজনীন ঘোষক') — ১৭৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক, বিধিবৎ সরকারী মুখপত্র। পত্রিকাটিতে তাই অবশ্যই ছাপা হত বিভিন্ন সরকারী ডিক্রি, পার্লামেণ্টীয় রিপোর্ট এবং অন্যান্য সরকারী দলিলপত্র। ১৮৪৮ সালে পত্রিকাটিতে আরও প্রকাশিত হয়েছিল লুক্সেমবুর্গ কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকের বিবরণীগুলিও। পৃঃ ১০৩

(৫২) ফ্রান্সে ১৭৯২ থেকে ১৮০৪ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রজাতন্ত্র কায়েম ছিল। পৃঃ ১০৪

(৫৩) আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে অভিজাতদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বাবত খেসারতের জন্য ১৮২৫ সালে ফরাসী রাজার নির্দিষ্ট করা পরিমাণ অর্থের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ১০৮

(৫৪) **লাজারোনিরা** (lazzaroni) — ইতালিতে স্বশ্রেণীচ্যুত, লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের নাম; উদারপন্থী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাজারোনিদের বারবার ব্যবহার করেছিল রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াপন্থীরা। পৃঃ ১১০

(৫৫) ১৮৩৪ সালে ইংলণ্ডে চালু করা দরিদ্র-ত্রাণ আইনে কেবল একরকমের সাহায্যই দেওয়া হত: গরিব মানুষদের রাখা হত শ্রমনিবাসে, সেগুলোতে ব্যবস্থাদি ছিল জেলেরই মতো। সেখানে লোককে অনুৎপাদী একঘেয়ে অতিক্লান্তিকর কাজে খাটান হত। শ্রমনিবাসগুলোকে লোকে ব্যঙ্গ করে বলত 'গরিবদের জন্য বাস্তিল'। পৃঃ ১১১

(৫৬) ১৮৪৮ সালের ১৫ মে একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক আর হস্তশিল্পীরা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ঢুকে পড়েছিল যেখানে সংবিধান-সভার অধিবেশন চলছিল সেই সভাগৃহে, তারা সংবিধান-সভা খতম হল ঘোষণা করে

গড়েছিল একটা বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যরা বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল অচিরেই। ব্লাংক, বার্বে, আলবের, রাসপাই, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন।

পৃঃ ১১৬

(৫৭) **'পর্বত'** — ফরাসী সংবিধান-সভা আর বিধান-সভার একটা উপদল; আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে কনভেন্শনে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক তরফের অর্থাৎ ১৭৯৩—১৭৯৫ সালের 'পর্বত'-এর নামে এই নাম।

'La Réforme' ('সংস্কার')। — ফরাসী দৈনিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রী আর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র। প্যারিসে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২২

(৫৮) ১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপের' দাবি করে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে যাচ্ছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে; সেটাকে থামিয়ে দিয়েছিল বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্যেই জড়ো-করা বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল। পৃঃ ১২২

(৫৯) ১৮৪৮ সালের ২৮ অগস্টের 'Journal des Débats'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে।

'Journal des Débats politiques et littéraires' ('রাজনীতিক-সাহিত্যিক বিতর্ক পত্রিকা') — ১৭৮৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক। জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে এটা ছিল সরকারী পত্রিকা, অর্লিয়ান্সী বুর্জোয়াদের মুখপত্র। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে পত্রিকাটিতে প্রকাশ পায় প্রতিবৈপ্লবিক বুর্জোয়াদের, তথাকথিত শৃঙ্খলা পার্টির অভিমত। পৃঃ ১২৪

(৬০) **জ্যানিসেরি** — সুলতান-শাসিত তুরস্কে চতুর্দশ শতকে গঠিত বিশেষ নিষ্ঠুর স্থায়ী পদাতিক সৈন্যবাহিনী। পৃঃ ১২৮

(৬১) এই সংবিধানের পয়লা খসড়া জাতীয় সভায় পেশ করা হয়েছিল ১৮৪৮ সালের ১৯ জুন। পৃঃ ১৩০

(৬২) বাইবেল অনুসারে, ইসরায়েলের প্রথম রাজা সল্ ফিলেস্টিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজার হাজার শত্রুকে বধ করেছিলেন, আর যাঁর সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বস্থাপন করেছিলেন তাঁর সেই অস্ত্রবাহক ডেভিড বধ করেছিলেন অযুত অযুত শত্রু। সল্ মারা যাবার পরে ডেভিড ইসরায়েলের রাজা হন। পৃঃ ১৩৩

(৬৩) **লিলি ফুল** — বুরবোঁ রাজবংশের একটা কুলচিহ্ন প্রতীকচিহ্ন; **ভায়োলেট ফুল** — বোনাপার্টপন্থীদের একটা প্রতীকচিহ্ন। পৃঃ ১৩৪

(৬৪) ১৮০৪ সালের ১৮ এপ্রিলে সেনেটের একটা ডিক্রিতে ১ম নেপোলিয়নকে ফরাসীদের বংশগত সম্রাটের খেতাব দেওয়া হয়। পৃঃ ১৩৮

(৬৫) **জননিরাপত্তা কমিটি** — ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বৈপ্লবিক সরকারের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৭৯৩ সালের এপ্রিলে গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এই কমিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কনভেন্শন — আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জাতীয় সভা। পৃঃ ১৫০

(৬৬) **শৃঙ্খলা পার্টি** — রক্ষণপন্থী বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৮ সালে। এটা ছিল লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী (২৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) এই দুটো ফরাসী রাজতান্ত্রিক উপদলের জোট। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা পর্যন্ত এটা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান-সভায় প্রধান অবস্থানে ছিল। পৃঃ ১৫২

(৬৭) **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র** — ১৮১৪—১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের দ্বিতীয় বারের রাজত্বের কালপর্যায়। অভিজাতবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থের সমর্থক এই প্রতিক্রিয়াশীল বুরবোঁ রাজত্ব উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ১৫২

(৬৮) ১৮৪৮ সালে ১৫ মে-র ঘটনাবলিতে (৫৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অংশগ্রাহীদের বিচার চলেছিল ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত **বুর্জে-তে**। বার্বে-র যাবজ্জীবন এবং ব্লাঙ্কির দশ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল; আলবের, দা ফ্লত, সোব্রিয়ে, রাস্পাই এবং অন্যান্যের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড কিংবা নির্বাসন-দণ্ড হয়েছিল। পৃঃ ১৫৫

(৬৯) প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের জুন অভ্যুত্থান দমনকারী সৈন্যবাহিনীর একাংশের সেনাপতি জেনারেল ব্রেয়া ১৮৪৮ সালের ২৫ জুন ফন্তেনব্লো-র ফটকে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই ব্যাপারে অভ্যুত্থানের দু'জন অংশগ্রাহীকে বধ করা হয়। পৃঃ ১৫৫

(৭০) **'La Démocratie pacifique'** ('শান্তিময় গণতন্ত্র') — ১৮৪৩—

১৮৫১ সালে প্যারিসে ভিক্তর কন্‌সিদেরান-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত ফুরিয়েপন্থীদের দৈনিক সংবাদপত্র।

১৮৪৯ সালের ১২ জুন সন্ধ্যায় 'পর্বত'-এর ডেপুটিরা এই সংবাদপত্রের কার্যালয়ে একটা সভা করে। এই সভায় অংশগ্রাহীরা অস্ত্রবলের শরণ নিতে নারাজ হয় এবং শান্তিপূর্ণ মিছিল করেই ক্ষান্ত হতে মনস্থ করে। পৃঃ ১৬৩

(৭১) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন ২০৬ নং 'Le Peuple' ('জনগণ') পত্রিকায় প্রকাশিত ইস্তাহারে 'সংবিধান সুহৃদদের গণতান্ত্রিক সমিতি' নির্বাহিক অধিকারীদের 'ধৃষ্ট দাবি'র প্রতিবাদে একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলে শামিল হতে প্যারিসের নাগরিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানায়। পৃঃ ১৬৩

(৭২) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন 'Réforme', 'Démocratie pacifique' এবং প্রুধোঁর 'Peuple' পত্রিকায় ঘোষণাটা প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৬৪

(৭৩) তিন জন কার্ডিনালকে নিয়ে গড়া পোপ ৯ম পাইয়েস-এর কমিশনের কথা বলছেন মার্কস; রোম প্রজাতন্ত্র দমন হবার পরে ফরাসী ফৌজের সমর্থনের উপরে নির্ভর করে এই কমিশন রোমে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঐ কার্ডিনালরা পরত লাল আঙরাখা। পৃঃ ১৬৯

(৭৪) **'Le Siècle'** ('যুগ') — ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৯ সালে প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে পত্রিকাটি পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে যারা পরিমিত নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতেই গণ্ডিবদ্ধ থাকত তাদের অভিমত প্রকাশ করত; ষষ্ঠ দশকে এটা ছিল নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের পত্রিকা। পৃঃ ১৭০

(৭৫) **'La Presse'** ('সংবাদপত্রজগৎ') — ১৮৩৬ সাল থেকে প্যারিসে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে এটা ছিল প্রতিপক্ষীয়; ১৮৪৮—১৮৪৯ সালে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের এবং পরে বোনাপার্টপন্থীদের মুখপত্র। পৃঃ ১৭০

(৭৬) বুরবোঁ রাজবংশের সবচেয়ে পুরনো গোষ্ঠী থেকে ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবিদার কাউন্ট শাঁবর, যিনি নিজেকে বলতেন ৫ম হের্নরি তাঁর কথা বলছেন মার্কস; ভিস্‌বাদেনের পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানিতে এম্‌স্‌ও ছিল তাঁর একটা বাসস্থান। পৃঃ ১৭০

(৭৭) **পাণ্ডুরেরা** (pandurs) — অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে অস্থায়ী পদাতিক ইউনিটের বিশেষ ধরনের সৈনিকেরা। পৃঃ ১৭১

(৭৮) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে লুই ফিলিপ ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্ল্যারমন্ট-এ বাস করছিলেন। পৃঃ ১৭১

(৭৯) **'Motu proprio'** ('তাঁর খাস অনুমোদনে') — পোপের শাসনাধীন অঞ্চলের সাধারণত অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়াবলি সম্পর্কে কার্ডিনালদের প্রাথমিক অনুমোদন ছাড়াই গৃহীত পোপের বিশেষ ধরনের পরিপত্রের প্রারম্ভিক জবান। এই বিশেষ ক্ষেত্রে পোপ ৯ম পাইয়েস-এর ১৮৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৭২

(৮০) **কসাক** — রাশিয়ায় অশ্বারোহী বাহিনীর বিশেষ একটা ইউনিট। ১ম নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে জেনারেল প্লাতভ-এর পরিচালিত কসাকদের ইউনিট অংশগ্রহণ করে। পৃঃ ১৮১

(৮১) মার্কসের দেওয়া অঙ্ক মিল খায় না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ছাপার ভুলের দরুন ৫৭,৮১,৭৮,০০০-এর বদলে রয়েছে ৫৩,৮০,০০,০০০। তবে এই ছাপার ভুলের ফলে মার্কসের সাধারণ সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ন হয় নি, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই মাথাপিছু নীট আয় ২৫ ফ্র্যাঙ্কের কম। পৃঃ ১৮৫

(৮২) লেজিটিমিস্ট ডেপুটি দা বোন্-এর মৃত্যুর পরে দ্য গার্ জেলায় অতিরিক্ত নির্বাচনে 'পবত'-এর সমর্থকদের প্রার্থী ফাবোন ৩৬ হাজারের মধ্যে ২০ হাজার ভোটের সংখ্যাধিক্যে ডেপুটি নির্বাচিত হন। পৃঃ ১৮৬

(৮৩) ১৮৫০ সালে সরকার ফ্রান্সের রাজ্যক্ষেত্রকে বড় বড় পাঁচটা সামরিক এলাকায় বিভক্ত করেছিল, তার ফলে প্যারিস এবং সন্নিহিত জেলাগুলি চরম প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন চারটে এলাকা দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলের অবাধ ক্ষমতা এবং তুর্কী পাশাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের মধ্যে তুলনা করে প্রজাতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকাগুলি ঐসব এলাকার নাম দিয়েছিল 'পাশালিক।' পৃঃ ১৮৭

(৮৪) ১৮৪৯ সালে ৩১ অক্টোবর বিধান-সভার কাছে রাষ্ট্রপতি লুই বোনাপার্টের পাঠান চিঠির কথা বলা হচ্ছে; এই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, বারো-র মন্ত্রিসভার খারিজ করে তিনি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পৃঃ ১৮৮

(৮৫) প্যারিস পুলিসের নবনিযুক্ত প্রিফেক্ট কার্লিয়ে তাঁর ১৮৪৯ সালের ১০ নভেম্বর পাঠান বার্তায় 'ধর্ম, শ্রম, পরিবার, সম্পত্তি এবং রাজভক্তি' নিরাপদ রাখার জন্য একটা 'সমাজতন্ত্রবিরোধী সামাজিক লীগ' স্থাপন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। পৃঃ ১৮৮

(৮৬) **'Le Napoléon'** ('নেপোলিয়ন')। — ১৮৫০ সালে ৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ মে পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ১৮৮

(৮৭) **অবাধ বাণিজ্য পার্টি** (free-trade party) — বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং আর্থনীতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ না-করার পক্ষপাতীরা। ইংলন্ডে উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে অবাধ বাণিজ্য পার্টি ছিল বিশেষ রাজনীতিক দল হিসেবে। পৃঃ ১৯০

(৮৮) মুক্তি বৃক্ষগুলি প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় লাগান হয়েছিল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়ের পরে। মুক্তি বৃক্ষগুলি — সাধারণত ওক আর পপ্লার — লাগানোর ব্যাপারটা আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর থেকে ফ্রান্সে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; ঐ সময়ে কনভেন্শনের একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ১৯৩

(৮৯) **জুলাই স্তম্ভ** — ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লবের সময়ে যাঁরা নিহত হন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৮৪০ সালে প্যারিসে বাস্তিল চকে নির্মিত স্তম্ভ; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় থেকে এই স্তম্ভে ইমর্টেল ফুলের মালা দেওয়া হত। পৃঃ ১৯৩

(৯০) ব্লাঙ্কির সমর্থক এবং প্যারিসের বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি দ্য ফ্লত ১৮৫০ সালে ১০ মার্চের নির্বাচনে ১,২৬, ৬৪৩ ভোট পেয়েছিলেন। পৃঃ ১৯৫

(৯১) **বার্থলমিউ রাত্রি** — প্যারিসে ১৫৭২ সালের ২৪ অগস্ট রাত্রে (সেণ্ট বার্থলমিউ দিবসের আগে) ক্যাথলিকদের হাতে প্রটেস্ট্যাণ্ট হুগেনটদের গণহত্যা। পৃঃ ১৯৬

(৯২) **কবলেনৎস** — পশ্চিম জার্মানির একটা শহর; আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে শহরটি ছিল প্রতিবিপ্লবী দেশান্তরীদের আড্ডা। পৃঃ ১৯৮

(৯৩) ১৭৯৭ সালে ব্রিটিশ সরকার একটা বিশেষ আইন পাস ক'রে ব্যাঙ্ক অভ্ ইংলন্ডের কাজকর্ম গণ্ডিবদ্ধ করেছিল; এই আইনে ব্যাঙ্কনোটকে বিহিত অর্থ করা হয়েছিল এবং তার বাবত সোনা দেওয়া মুলতবি করা হয়েছিল। সোনা দেওয়া আবার চালু হয়েছিল ১৮১৯ সালে। পৃঃ ২০১

(১৪) **বুর্গ্রেভ-রা** (Burgraves) — নতুন নির্বাচনী আইনের মুসাবিদা করার জন্য বিধান-সভার কমিটির ১৭ জন নেতৃস্থানীয় অর্লিয়ান্সী আর লেজিটিমিস্টের ক্ষমতার জন্য অসমর্থনীয় দাবি এবং প্রতিক্রিয়াশীল দুরাকাঙ্ক্ষার দরুন তাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটা নেওয়া হয় ভিক্তর হুগোর ঐ একই নামের ঐতিহাসিক নাটক থেকে। এই নাটকের ঘটনাস্থল হল মধ্যযুগীয় জার্মানি, সেখানে এক-একটা 'বার্গ' (সুরক্ষিত শহর কিংবা দুর্গ)-এর শাসকের উপাধি ছিল বার্গ-গ্রাফ, তাকে নিযুক্ত করতেন সম্রাট। পৃঃ ২০৪

(১৫) **'L' Assemblée nationale'** ('জাতীয় পরিষদ') — রাজতান্ত্রিক লেজিটিমিস্ট মতধারার ফরাসী দৈনিক; ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে পত্রিকাটি দুটি রাজবংশের অনুগামী লেজিটিমিস্ট আর অর্লিয়ান্সী পার্টির মিশে এক হয়ে যাবার সমর্থক ছিল। পৃঃ ২০৭

(১৬) **'Le Constitutionnel'** ('নিয়মতান্ত্রিক পত্রিকা') — ১৮১৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে অর্লিয়ান্সীদের নরমপন্থী অংশের মুখপত্র; ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে এতে প্রকাশিত হত তিয়ের-এর চারপাশে জড়ো-হওয়া প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের অভিমত; ১৮৫১ সালের কুদেতার পরে বোনাপার্টপন্থী পত্রিকা। পৃঃ ২০৭

(১৭) **'লামুরেৎ-এর চুম্বন'** -- আঠার শতকের শেষের দিককার ফরাসী বিপ্লবের সময়ের একটা বিখ্যাত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। ১৭৯২ সালের ৭ জুলাই বিধান-সভার সদস্য লামুরেৎ বলেন, ভ্রাতোচিত চুম্বনে সমস্ত পার্টিগত বিরোধ শেষ করে দেওয়া যাক। সেই প্রস্তাব অনুসারে বিরুদ্ধ পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা সাগ্রহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল, কিন্তু যা অনুমান করা যেত, এই কপট 'ভ্রাতোচিত চুম্বনের' কথা পরদিন কারও আর মনে ছিল না। পৃঃ ২০৯

(১৮) 'Le Pouvoir' ('সরকার') — ১৮৪৯ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত বোনাপার্টসমর্থক সংবাদপত্র; এই নামে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫০ সালের জুন থেকে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। পৃঃ ২০৯

(১৯) বিধান-সভার দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তীকালে ২৫ জন নির্বাচিত সদস্য এবং 'সভা'র ব্যুরোকে নিয়ে স্থায়ী কমিশন স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদে। প্রয়োজন হলে ঐ কমিশন বিধান-সভার অধিবেশন বসাতে পারত। ১৮৫০ সালে এই কমিশনটা ছিল বস্তুত ৩৯ জন

সদস্য নিয়ে: ব্যুরোর সদস্য ১১ জন, ৩ জন কোয়েস্টার এবং নির্বাচিত সদস্য ২৫ জন। পৃঃ ২১০

(১০০) ঘটনাক্রমে কাউণ্ট শাঁবর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে লেজিটিমিস্টরা যে-নতুন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করত সেটার কথা বলা হচ্ছে। ঐ মন্ত্রিসভা গড়া হত দ্য লেভিস, সাঁ-প্রিস্ত, বেরিয়ে, পাস্তোরে এবং দ্য' এস্কারকে নিয়ে। পৃঃ ২১১

(১০১) বলা হচ্ছে যেটার নাম ছিল 'ভিসবাদেন ইস্তাহার' সেটার কথা, — 'ইস্তাহার'খানা ছিল কাউণ্ট শাঁবর-এর নির্দেশক্রমে ১৮৫০ সালের ৩০ অগস্ট ভিসবাদেন-এ বিধান-সভায় লেজিটিমিস্ট উপদলের সচিব দা' বার্তালেমির লেখা পরিপত্র। লেজিটিমিস্টরা ঘটনাক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের কর্মনীতি যা হত সেই সম্বন্ধে বিবৃতি ছিল এই পরিপত্রখানায়। কাউণ্ট শাঁবর বলেছিলেন, তিনি 'যেকোন রকমে জনগণের শরণ নেবার নিন্দা করছেন বিধিবৎ এবং নিশ্চিতভাবে, কেননা তেমন শরণ নেওয়া হলে তাতে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের মহান জাতীয় নীতি প্রত্যাখ্যান করা বোঝায়'। ডেপুটি লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে কিছু কিছু রাজতন্ত্রীর প্রতিবাদ প্রসঙ্গে কর্মনীতি সংক্রান্ত ঐ বিবৃতিটা পত্র-পত্রিকাগুলিতে বিতর্ক ঘটিয়েছিল। পৃঃ ২১১

(১০২) **১০ ডিসেম্বর সমিতি** — (সমিতির সমর্থক লুই বোনাপার্ট ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তদনুসারে এই নাম) — ১৮৪৯ সালে গঠিত গুপ্ত বোনাপার্টপন্থী সমিতি, তাতে ভর্তি হয় প্রধানত স্বশ্রেণীচ্যুত লোকেরা, সৈনিকেরা, রাজনীতিক হঠকারীরা ইত্যাদি।

পৃঃ ২১৩

নামের সূচি

ন

প

ফ

ল

স

হ

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

অর্ফিয়ুস — গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে কবি ও গায়ক, যার গান সমস্ত বন্য পশুকে পোষ মানায় এবং এমনকি পাথরকেও মোহিত করে। —১৫৭

অর্লান্ডো (অথবা রোল্যান্ড) ক্রোধোন্মত্ত — আরিয়োস্তো'র কবিতার পৌরাণিক নায়ক। —১৪১

আন্টিয়স — গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক, সে ততক্ষণ পর্যন্ত অজেয় যতক্ষণ সে ধরিত্রীমাতাকে ছুঁয়ে আছে, যিনি সর্বদাই তাকে নতুন শক্তি জোগাচ্ছেন। —১৬৩

গর্ডিয়ুস — ফ্রিজিয়ার রাজা; পুরাকথায় বলা হয় যে তিনি নিজের রথের জোয়ালটি অতি জটিল জট দিয়ে বেঁধেছিলেন (এ থেকেই গর্ডিয়ান জট নাম। আলংকারিক অর্থে — বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা জট পাকানো অবস্থা); ওরাক্‌লের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যে এই জট খুলতে পারবে সে এশিয়ার শাসক হবে; মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার এই জট খোলার বদলে তা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলেন। —২১৪

জেনাস — প্রাচীন রোমের দেবতা, যার দুটি বিপরীতমুখী মুখ আছে, এমনভাবে একে চিত্রিত করা হত; আলংকারিক অর্থে — দু'মুখো মানুষ। —১৫৮

জোসেফ — প্রাচীন ইহুদী উপকথা অনুসারে, প্যাট্রিয়ার্ক জেকবের পুত্র, ভাইয়েরা তাকে মিশরে বিক্রি করে দেয় এবং সেখানে সে খ্যাতি লাভ করে। —১৭১

দ্যামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে, সিরাকিউসের স্বৈরাচারী ডায়োনিসিয়াসের (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) অনুচর। দ্যামোক্লিস ডায়োনিসিয়াসের কাছে এক ভোজে আমন্ত্রিত হয়। ভোজ চলার সময় ডায়োনিসিয়াস তার প্রতি ঈর্ষান্বিত দ্যামোক্লিসকে মানব সম্বলের অশক্ততা সম্পর্কে বিশ্বাস করানোর জন্যে তাকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথার উপর ঘোড়ার চুলে বাঁধা একটি ধারালো তরোয়াল ঝুলিয়ে দেন। 'দ্যামোক্লিসের তরোয়াল' প্রবাদবাক্যটি দ্বারা নিরন্তর, নিকট আর ভয়াবহ বিপদ বোঝায়। —১৮৭

নেমেসিস — প্রাচীন গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিশোধের দেবী। —১৫৮

পোশ্টিফ্রিয়াস (পটিফার) — প্রাচীন ইহুদী উপকথা অনুসারে মিশরের সম্ভ্রান্ত, যার কাছে প্যাট্রিয়ার্ক জেকবের ছেলে জোসেফকে বিক্রি করা হয়। —১৭১

বার্থলমিউ — বাইবেলের কথা অনুসারে খৃষ্টের ১২ জন শিষ্যের অন্যতম একজন। —১২৯

মিডাস — ফ্রিজিয়ার রাজা; প্রাচীন উপকথা অনুসারে অ্যাপলো তাঁকে গাধার কানে পুরস্কৃত করেন। —১৩৭

মুসা — বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর, তিনি প্রাচীন ইহুদীদের মিশরের ফারাওঁ অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন ('মিশর থেকে প্রত্যাগমন')। —১৭৯

রবের মাকের — বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা ফ্রেদেরিক লেমেত্র রচিত এবং অনরে দোমিয়ের ব্যঙ্গে অমর হয়ে থাকা চতুর মতলববাজ লোকের চরিত্র। —৯৪

স্যামসন — বাইবেলে বর্ণিত নায়ক, যার অতি অসাধারণ শারীরিক শক্তি ছিল। —১৬৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

১.৫.৮৪

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

৬

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো · ১৯৭৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том III

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}092}{016(01)\text{-}79}$ 739-79   0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব (১)

১

বিপ্লবের শুরুতে জার্মানি

ইউরোপের মূলভূমিতে বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ। ১৮৪৮-এর ঝঞ্ঝার আগে 'কর্তৃপক্ষ যারা ছিল' তারা আবার 'বিদ্যমান কর্তৃপক্ষ,' আর কমবেশি জনপ্রিয় একদিনের শাসকেরা, সাময়িক গভর্নররা, ত্রিজন-শাসকদের একতমরা, একনায়কেরা, তাদের প্রতিনিধি, সিভিল কমিশনার, সামরিক কমিশনার, জেলা-শাসক, বিচারপতি, জেনারেল, অফিসার আর সৈনিকদের নিয়ে লেজুড়টা সমেত ছিটকে পড়েছে গিয়ে নানা বৈদেশিক উপকূলে, 'চালান হয়েছে সাগরপারে' ইংলণ্ডে কিংবা আমেরিকায়। সেখানে তারা গড়বে 'in partibus infidelium' (২) নতুন নতুন সরকার, বিভিন্ন ইউরোপীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, জাতীয় কমিটি, আর নিজেদের অভ্যাগম প্রচার করবে যেসব উদ্‌ঘোষণায় সেগুলো হবে যেকোন কম কাল্পনিক শাসকদের উদ্‌ঘোষণারই মতো গুরুগম্ভীর।

সৈন্যব্যূহের একেবারে সমস্ত ঘাঁটিতে ইউরোপের মূলভূমির বৈপ্লবিক পক্ষ -- বরং বলা ভাল, পক্ষগুলি -- যেমনটা ভোগ করেছে তার চেয়ে বিলক্ষণ পরাজয় কল্পনাতীত। কিন্তু তাতে কী হবে? সামাজিক আর রাজনীতিক প্রাধান্যের জন্যে বৃটিশ বুর্জোয়াদের আটচল্লিশ বছর ধরে, ফরাসী বুর্জোয়াদের চল্লিশ বছর ধরে দৃষ্টান্তহীন সংগ্রাম চালাতে হয় নি কি? পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র যখন মনে করেছিল সেটা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি অটল হয়ে দাঁড়াল ঠিক সেই মুহূর্তেই যেমনটা, অন্য কোন সময়ে তার চেয়ে নিকটবর্তী হয়েছিল কি বুর্জোয়াদের বিজয়? বিপ্লবকে অল্পকিছু আলোড়কের বিদ্বেষপ্রসূত বলা হত যে-কুসংস্কারে সেটার সময় চলে গেছে অনেক আগেই।

প্রত্যেকেই আজকাল জানে, যেখানেই কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন ঘটে সেখানে পশ্চাদভূমিতে থাকেই কোন সামাজিক অভাব, যেটা জীর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির বাধার দরুন মিটতে পারে না। যাতে আশু সাফল্য নিশ্চিত হয় তত প্রবলভাবে, তত সর্বজনীন হয়ে অভাবটা কোন একসময়ে তখনও মালুম না হতে পারে, কিন্তু বলপূর্বক দমনের প্রত্যেকটা চেষ্টার ফলে সেটা শুধু ক্রমাগত প্রবলতর হয়েই প্রকাশ পায়, শেষে ফেটে পড়ে বেড়ি ভেঙে। তাহলে, আমরা যখন পরাস্তই হয়েছি, সেক্ষেত্রে শুরু থেকে আবার শুরু করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। তাছাড়া, সৌভাগ্যবশত, আন্দোলনের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনার মধ্যে বিশ্রামের জন্যে সম্ভবত খুবই সংক্ষিপ্ত যে বিরতিটা জুটে গেল তাতে আমাদের খুবই জরুরী একটা কাজের জন্য সময় পাওয়া গেল: বিলম্বে বৈপ্লবিক সংঘটন এবং পরাজয় উভয়ই অবশ্যম্ভাবী হবার কারণগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ; কিছু কিছু নেতার আপতিক প্রচেষ্টা, প্রতিভা, দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি কিংবা বেইমানির মধ্যে নয়, কারণগুলো খুঁজতে হবে আলোড়িত জাতিগুলির প্রত্যেকটার সাধারণ সামাজিক অবস্থা এবং জীবনের পরিবেশের ক্ষেত্রে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসের সহসা সংগঠিত আন্দোলন দুটি কোন পৃথক পৃথক ব্যক্তির কৃতি নয়, তা হল কমবেশি স্পষ্ট উপলব্ধ কিন্তু প্রত্যেকটি দেশে বহু শ্রেণীর খুবই নিশ্চিতভাবে অনুভূত জাতিগত অভাব আর প্রয়োজনসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত দুর্নিবার অভিব্যক্তি, এখন এ সত্য সর্বত্রই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবৈপ্লবিক সাফল্যগুলোর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সবদিক থেকে সঙ্গেসঙ্গেই উত্তর পাওয়া যায়: শ্রী অমুক কিংবা তমুক মহাশয় জনগণের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা করেন'। পরিস্থিতি অনুসারে উত্তরটা হতে পারে যথার্থ কিংবা তা নয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সেটায় কোনকিছুরই ব্যাখ্যা মেলে না — 'জনগণ' তাদের প্রতি এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা হতে দিল, এমনটা ঘটল কেন, তাও তাতে দেখান হয় না। তমুক মহাশয়কে বিশ্বাস করা চলবে না, এই একমাত্র তথ্য সম্বন্ধে অবগতি যে রাজনৈতিক পার্টির মোট পুঁজিপাটা সেটার সাফল্যের সম্ভাবনা তো সামান্যই।

তাছাড়া, বৈপ্লবিক আলোড়ন এবং সেটার দমনের কারণগুলোর অনুসন্ধান এবং প্রকটন একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্নও বটে।

মারাস্ত, না লেদ্রু-রলাঁ, না লুই ব্লাঁ, না অস্থায়ী সরকারের অন্য কোন সদস্য, না তাঁরা সবাই মিলে বিপ্লবটাকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন বিপর্যয়ের মধ্যে, যেখানে সেটা ডুবল, এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী উক্তি — এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কোন্দল, অভিযোগ আর পালটা অভিযোগ — এগুলোতে আমেরিকান কিংবা ইংরেজদের কোন্ আগ্রহটা থাকতে পারে, ব্যাপারটা বুঝতে এগুলো তাদের কোন্ সাহায্যটা করতে পারে, যখন তারা এই সমস্ত বিভিন্ন আন্দোলন লক্ষ্য করেছে এত দূর থেকে যাতে কার্যকলাপের কোন খুঁটিনাটি পৃথক করে ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়? কোন প্রকৃতিস্থ লোক কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, ভালর জন্যেই হোক, আর মন্দর জন্যেই হোক, মোটের উপর মামুলি ক্ষমতাসম্পন্ন এগার জন* তিন মাসের মধ্যে তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষের জাতিটার সর্বনাশ করতে সমর্থ হল — যদি না ঐ তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষ তাদের সামনে পথটাকে দেখতে পেরে থাকে ঐ এগার জনের মতোই সামান্যই। কিন্তু এমনটা কী করে ঘটল যাতে কোন্ পথে চলতে হবে সেটা অংশত আবছা আলোয় হাতড়ে হলেও তাদের নিজেদেরই স্থির করতে ডাক পড়ল একসঙ্গে এই তিন কোটি ষাট লক্ষের উদ্দেশে, আর তারপর কী করে তারা পথ হারাল এবং তাদের পুরন নেতাদের কিছু সময়ের জন্যে নেতৃত্বে ফিরে আসতে দেওয়া হল, এটাই আসল প্রশ্নটা।

কাজেই, যেসব কারণ ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লবকে অনিবার্য করেছিল, এবং ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সালে সেটার ঠিক তেমনই অবশ্যম্ভাবী সাময়িক অবদমন ঘটিয়েছিল, সেগুলোকে আমরা 'Tribune'-এর (৩) পাঠকদের সামনে খুলে ধরতে চেষ্টা করলে সেদেশে তখনকার ঘটনাধারার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় না যেন। আপাতদৃষ্টিতে আপতিক, অসংলগ্ন এবং বেখাপ ঘটনাবলির তালগোল পাকান পিন্ডটার কোন্ অংশটা হবে পৃথিবীর ইতিহাসের একাংশ সেটা পরবর্তী ঘটনাবলি এবং আগামী পুরুষ-পর্যায়গুলির রায় দিয়ে নির্ধারিত হবে। তেমন কাজটা করার সময় এখনও আসে নি। যা সম্ভবপর সেটার চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে, আর সেই আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনার, প্রধান প্রধান উত্থান-পতনের

---

* ফরাসী অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা। — সম্পাঃ

ব্যাখ্যা দেবার জন্যে, এবং পরবর্তী সম্ভবত অনতিদূরবর্তী উৎক্ষেপ জার্মান জনগণকে কোন্ অভিমুখে চালিত করবে তার সূত্রক পাবার জন্যে অনস্বীকার্য তথ্যাদির ভিত্তিতে যুক্তিসম্মত কারণগুলো বের করতে পারলে সেটাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে।

প্রথমত, বিপ্লবের শুরুতে জার্মানির অবস্থাটা কী ছিল?

জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর গড়ন হল প্রত্যেকটা রাজনীতিক সংগঠনের বনিয়াদ — সেটা জার্মানিতে ছিল অন্য যেকোন দেশের চেয়ে জটিল। বড় বড় শহরে, বিশেষত রাজধানীতে জড়ো হওয়া শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ বুর্জোয়ারা ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করেছিল, কিংবা, অল্প কয়েকটা আকারে পর্যবসিত করেছিল, যেমনটা ইংলণ্ডে, কিন্তু জার্মানিতে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল তাদের প্রাচীন বিশেষাধিকারগুলোর একটা বড় অংশ বজায় রেখেছিল। সামন্ততান্ত্রিক রায়তিস্বত্বের বহুল প্রচলন ছিল প্রায় সর্বত্র। ভূমির ভূম্যধিকারী প্রভুরা তাদের প্রজাদের উপর এক্তিয়ার পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। রাজনীতিক বিশেষাধিকার থেকে, রাজন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েও তারা কৃষকদের উপর নিজেদের খাসমহলের মধ্যযুগীয় আধিপত্যের প্রায় সবটাই এবং কর থেকে অব্যাহতিও বজায় রেখেছিল। কোন কোন এলাকার চেয়ে অন্য কোন কোন এলাকায় সামন্ততন্ত্র বেশি জেঁকে ছিল, কিন্তু রাইন নদীর পশ্চিম পারে ছাড়া কোথাও সেটা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি। তখন খুবই সংখ্যাবহুল এবং অংশত খুবই সমৃদ্ধ এই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল সরকারীভাবে দেশের পহেলা 'বর্গ' বলে গণ্য ছিল। ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তারা, ফৌজের প্রায় সমস্ত অফিসার ছিল এদের মধ্য থেকে।

জার্মানির বুর্জোয়ারা মোটেই ফ্রান্স কিংবা ইংলণ্ডের বুর্জোয়াদের মতো তত সমৃদ্ধ এবং একত্রে জড় ছিল না। স্টীম চালু হবার ফলে এবং ইংরেজদের ম্যানুফ্যাকচারের দ্রুত বেড়ে চলা প্রাধান্যের দরুন জার্মানির প্রাচীন ম্যানুফ্যাকচার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়নীয় ইউরোপীয় মূলভূমি ব্যবস্থার (৪) আমলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চালু করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার দিয়ে পুরনগুলো নষ্ট হবার ক্ষতিপূরণও হয় নি, নিজ অভাব সরকারগুলির গোচরে জোর করে আনার মতো শক্তিশালী ম্যানুফ্যাকচারিং

তরফ সৃষ্টি করতেও তা যথেষ্ট ছিল না, — অভিজাতকুলের ছাড়া অন্যের সম্পদ আর ক্ষমতার যেকোন প্রসারের বিরুদ্ধে প্রখর সতর্কতা ছিল এইসব সরকারের। ফ্রান্স যেখানে বিপ্লব আর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর জুড়ে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য রেশম ম্যানুফ্যাকচার চালিয়েছিল, ঐ একই সময়ে জার্মানির ক্ষৌমবস্ত্রের শিল্প প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। তাছাড়া, ম্যানুফ্যাকচারের এলাকা ছিল বিরল; সেগুলো ছিল দূর অন্তর্দেশে, আমদানি-রপ্তানির জন্যে ব্যবহার করত প্রধানত বৈদেশিক, ওলন্দাজ কিংবা বেলজিয়ান বন্দর, উত্তর সাগর এবং বলটিক রাষ্ট্রগুলির বড় বড় সমুদ্র-বন্দর শহরের সঙ্গে সেগুলির সমস্বার্থ ছিল সামান্য কিংবা মোটেই না; সর্বোপরি, সেগুলি প্যারিস আর লিয়োঁ, লন্ডন আর ম্যাঞ্চেস্টারের মতো বড় বড় ম্যানুফ্যাকচার আর বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে নি। জার্মান ম্যানুফ্যাকচারের এই অনগ্রসরতার কারণ ছিল বহুবিধ, তবে সেটার বাবত দুটো কারণ দেখানোই যথেষ্ট হবে: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রধান পথ হয়ে উঠেছিল আটলাণ্টিক মহাসাগর, সেটা থেকে বেশ দূরে দেশটির প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান, আর জার্মানি অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত ছিল, ষোল শতক থেকে এখনকার দিন অবধি সেইসব যুদ্ধ চলেছিল দেশটির মাটিতে। যে রাজনীতিক প্রাধান্য ইংরেজ বুর্জোয়াদের আয়ত্তে রয়েছে সেই ১৬৮৮ সাল থেকে, যা ফরাসীরা জিতে নিয়েছিল ১৭৮৯ সালে, সেটা জার্মান বুর্জোয়ারা লাভ করতে পারে নি এই সংখ্যাল্পতারই দরুন, বিশেষত কোনই কেন্দ্রীকরণের অভাবের দরুন। অথচ জার্মানিতে বুর্জোয়াদের সম্পদ এবং তার সঙ্গে রাজনীতিক গুরুত্ব সমানে বাড়ছিল সেই ১৮১৫ সাল থেকেই। অনিচ্ছাভরে হলেও সরকারগুলি এই বুর্জোয়াদের অন্তত অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ বৈষয়িক স্বার্থগুলোর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি এমনটাও যথার্থই বলা চলে যে, বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংবিধানগুলিতে বুর্জোয়াকে যে রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিটি কণাই আবার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ এবং ১৮৩২ থেকে ১৮৪০ সালের প্রতিক্রিয়াশীলতার দুটো কালপর্যায়ে, তেমন প্রতিটি কণা বাবত ক্ষতিপূরণ করা হয়েছিল তাদের কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক সুবিধা দিয়ে। বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটা রাজনীতিক পরাজয়ের পিছু পিছু এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যিক আইন

প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের এক-একটা জয়। কোন খুদে ডিউক রাজ্যের ব্যবস্থাপরিষদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে ভোট দিলে ঐ মন্ত্রীরা শুধু উপহাস করত, সেই অনাস্থা প্রকাশের অনিশ্চিত অধিকারের চেয়ে ১৮১৮ সালের প্রুশীয় সংরক্ষণ শুল্ক (৫) এবং 'জল্‌ফেরাইন' (Zollverein) (৬) চালু হওয়াটা জার্মান ব্যবসায়ী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে ঢের বেশি মূল্যবান ছিল নিশ্চয়ই। এইভাবে, সম্পদ বাড়তে-বাড়তে এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে-ঘটতে বুর্জোয়ারা শিগ্‌গিরই একটা পর্বে পৌঁছে দেখল, তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর পথে বাধা হল দেশের রাষ্ট্রিক গঠন — দেশ এলোমেলোভাবে বিভক্ত ছত্রিশটি রাজন্যের মধ্যে, তাদের পরস্পরের বিরোধী নানা প্রবণতা আর খামখেয়াল; বাধা হল কৃষির উপর এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের উপর সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল; বাধা হল বুর্জোয়াদের যাবতীয় কাজকারবারের উপর অজ্ঞ এবং উদ্ধত আমলাদের উঁকি-মারা পরিদর্শন। তার সঙ্গে সঙ্গে 'জল্‌ফেরাইন' প্রসারিত এবং পাকাপোক্ত হল, স্টীম যোগাযোগ চালু হল সর্বত্র, অন্তর্বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে চলল, তার ফলে বিভিন্ন রাজ্য আর প্রদেশের ব্যবসায়ী-ম্যানুফ্যাকচারার শ্রেণীগুলি পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে গেল, তাদের স্বার্থের সমতা ঘটল, কেন্দ্রীকৃত হল তাদের শক্তি। সেটার স্বাভাবিক পরিণতিতে তাদের গোটা জনরাশি চলে গেল উদারপন্থী প্রতিপক্ষ শিবিরে, আর রাজনীতিক ক্ষমতার জন্যে জার্মান বুর্জোয়াদের প্রথম ঐকান্তিক সংগ্রামে জিত হল। এই পরিবর্তনটার সূচনাকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল, যখন থেকে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা জার্মানির বুর্জোয়াদের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ১৮৪০-৪৭ সালের এই উদারপন্থী প্রতিপক্ষ আন্দোলনের কথায় আমরা ফিরে আসব পরে।

জাতির জনসমষ্টির বিপুল অংশটা ছিল অভিজাতও নয়, বুর্জোয়াও নয়, সেটা ছিল শহরে শহরে ছোট ব্যবসায়ী আর দোকানদার শ্রেণী এবং মেহনতী জন, আর গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে।

জার্মানিতে শ্রেণী হিসেবে বড় বড় পুঁজিপতি এবং ম্যানুফ্যাকচারারদের ব্যাহত বিকাশের পরিণতিতে সে দেশে ছোট ব্যবসায়ী আর দোকানদারদের শ্রেণীটা অত্যন্ত সংখ্যাবহু। অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলিতে বাসিন্দাদের প্রায়

অধিকাংশই এই শ্রেণীর মানুষ, আর প্রভাবের জন্যে আরও ধনী প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ছোট শহরগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য পুরোপুরি। প্রত্যেকটা আধুনিক রাষ্ট্র সংগঠনে এবং প্রত্যেকটা আধুনিক বিপ্লবে অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণী আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ জার্মানিতে, সেখানে সাম্প্রতিক সংগ্রামগুলির সময়ে সাধারণভাবে চূড়ান্ত ভূমিকায় এসেছে এই শ্রেণী। অপেক্ষাকৃত বড় বড় পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের শ্রেণী, যথাযথভাবে বললে বুর্জোয়া শ্রেণী, এবং প্রলেতারিয়ানদের বা শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থান থেকে আসে ঐ শ্রেণীর প্রকৃতিটা। প্রথমটার অবস্থানে উঠতে আকাঙ্ক্ষী এই শ্রেণীর পৃথক পৃথক মানুষ সামান্য ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলেই ছিটকে গিয়ে পড়ে দ্বিতীয়টার কাতারে। রাজতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজসভা আর অভিজাতদের প্রথা এটার অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়ে — এই ফরমাশদাতাদের লোকসান হলে এই শ্রেণীর একটা মস্ত অংশের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিতে সামরিক গ্যারিসন, জেলা-বোর্ড, অনুগামীদের সমেত আদালত প্রায়ই এই শ্রেণীর সমৃদ্ধির ভিত্তি; সেগুলোকে সরিয়ে নিলে পড়ে যায় ছোট দোকানদার, দরজি, মুচি আর কাঠের মিস্ত্রিরা। এমনিভাবে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ শ্রেণীর কাতারে ঢুকবার আশা, আর প্রলেতারিয়ানের, কিংবা নিঃস্ব ফকিরেরই দশায় পড়ে যাবার আশঙ্কার মধ্যে; সাধারণের বিষয়াবলি পরিচালনায় অংশীদারি জিতে নিয়ে নিজেদের স্বার্থের উন্নতিবিধানের আশা, আর তাদের সেরা খদ্দেরদের ভাগিয়ে দেবার ক্ষমতা সরকারের আছে বলে, সেই যে-সরকার তাদের অস্তিত্বেরই নিয়ন্তা, অসময়োচিত বিরোধিতা দিয়ে সেটাকে কুপিত করার আতঙ্কের মধ্যে সদা-দোদুল্যমান এই শ্রেণী, যেটার সংগতি-সংস্থান সামান্য, আর সেই মালিকানার নিরাপত্তাহীনতা সেটার পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে, এই শ্রেণীটার মতামত অত্যন্ত ইতস্তত দোলায়মান। শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক সরকারের আমলে অবনমিত এবং হীনানুগত এই শ্রেণীটা বুর্জোয়াদের ক্ষমতা উঠতি হতে থাকলে ঘোরে উদারপন্থার দিকে; যেইমাত্র বুর্জোয়ারা নিজ আধিপত্য হাসিল করে অমনি এটার প্রচণ্ড গণতান্ত্রিক আস্ফালন শুরু হয়ে যায়, কিন্তু নিজের নিচের শ্রেণীটা, প্রলেতারিয়ানরা তাদের স্বতন্ত্র আন্দোলনের

চেষ্টা শুরু করতে-না-করতেই এটা ভয়ের শোচনীয় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যায়। জার্মানিতে এইসব পর্বের একটা থেকে অন্যটায় এই শ্রেণীর পর্যায়ক্রমে পার হয়ে যাওয়াটা আমরা দেখব ক্রমে ক্রমে।

সামাজিক আর রাজনীতিক বিকাশের দিক থেকে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণী ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর পিছনে ততটাই দূরে পড়ে আছে যতটা পিছনে জার্মান বুর্জোয়ারা রয়েছে ঐ দুই দেশের বুর্জোয়াদের থেকে। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য। সংখ্যাবহুল, শক্তিশালী, জড়ো-হওয়া এবং কুশল প্রলেতারিয়ান শ্রেণীর জীবনযাত্রার অবস্থার ক্রমবিকাশ চলে সংখ্যাবহুল, ধনী, জড়ো-হওয়া এবং শক্তিশালী বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নের সমান তালে। বুর্জোয়াদের সমস্ত পৃথক পৃথক মহল, বিশেষত শ্রেণীটার সবচেয়ে উন্নতিশীল মহল বড় ম্যানুফ্যাকচারাররা রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করে নিজেদের চাহিদাগুলো অনুসারে রাষ্ট্রটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন করে গড়ে তোলে, খাস শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনই কখনও স্বাধীন হয় না, সেটার প্রকৃতি কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রলেতারিয়ান হয়ে ওঠে না। মালিক আর কর্মীদের অনিবার্য সংঘাতটা আসন্ন হয়ে ওঠে তখনই, সেটাকে আর মুলতবি রাখা যায় না; যা কখনও পূরণ হবার নয় এমনসব ভুয়ো আশা আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে আর নিরস্ত করা যায় না; উনিশ শতকের বিরাট সমস্যা — প্রলেতারিয়েত লোপ করার সমস্যা — অবশেষে স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে প্রকাশ পায়। আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং সম্রাটদের অতি চমৎকার-সব নমুনা পাওয়া যায় গ্রেট বৃটেনে, কিন্তু জার্মানিতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান অংশটার নিয়োগকর্তা তারা ছিল না, এই নিয়োগকর্তারা ছিল ছোট ছোট কারিগর-ব্যবসায়ীরা, এদের গোটা ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগের অবশেষমাত্র। মস্ত মস্ত তুলো সম্রাট আর খুদে মুচি কিংবা ওস্তাদ দরজির মধ্যে যেমন বিপুল ব্যবধান, তেমনি দূরত্ব আছে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাবিলনগুলির তীক্ষ্ণ চতুর কারখানা-কর্মীদের থেকে কোন গ্রামাঞ্চলের খুদে শহরের লাজুক জার্নিম্যান দরজি কিংবা আসবাবপত্রের ছুতোরমিস্ত্রির, এরা যে পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে সেগুলো শ'-পাঁচেক বছর আগেকার তাদের ধরনের মানুষের চেয়ে বড় একটা পৃথক নয়। জীবনযাত্রার আধুনিক পরিবেশ, শিল্পোৎপাদনের আধুনিক প্রণালীর এই

সর্বৈব অভাবের সঙ্গে অবশ্য ছিল আধুনিক ভাব-ধারণারও মোটামুটি সমানই সমগ্র অভাব, কাজেই বিপ্লবের শুরুতে মেহনতী শ্রেণীগুলির একটা বড় অংশ গিল্ড এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত বৃত্তিগত কর্পোরেশনগুলি অবিলম্বে পুনঃস্থাপনের জন্যে হাঁক ছাড়ল, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। তবু, ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকাগুলিতে উৎপাদনের আধুনিক প্রণালীর প্রাধান্য ছিল, বহুসংখ্যক ভ্রমণশীল মেহনতীজনের থেকে জুটেছিল মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা আর মানসিক বিকাশ, ফলে গড়ে উঠেছিল একটা তাকতদার কেন্দ্রী অংশ, নিজেদের শ্রেণীর মুক্তি সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট এবং বিদ্যমান আর ইতিহাসনির্দিষ্ট চাহিদাগুলোর অপেক্ষাকৃত অনুযায়ী; কিন্তু তারা ছিল ঊনজনমাত্র। বুর্জোয়াদের সক্রিয় আন্দোলনের সূচনা-কাল ১৮৪০ সাল ধরলে, শ্রমিক শ্রেণীর বেলায় সেটা আবির্ভাবের সূত্রপাত করে ১৮৪৪ সালে (৭) সাইলেসিয়ায় আর সহেমিয়ায়* কারখানা মজুরদের অভ্যুত্থান; যেসব পর্ব পার হয়ে চলেছিল এই আন্দোলন সেটা পর্যালোচনা করার উপলক্ষ আমাদের হবে একটু পরেই।

শেষে, ছিল ছোট খামারীদের, কৃষকদের বিরাট শ্রেণীটা; খেতমজুর লেজুড়টা সমেত এই শ্রেণীটার মানুষ ছিল সমগ্র জাতির অধিকাংশ। কিন্তু বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল এই শ্রেণীটা। ছিল প্রথমত, কিছুটা সম্পন্ন খামারীরা, জার্মানিতে তাদের বলা হয় Gross-আর Mittelbauern** তারা কমবেশি বড় বড় খামারের মালিক, তারা প্রত্যেকে কয়েক জন করে খেতমজুর খাটাত। করমুক্ত বড় বড় সামন্ত ভূস্বামীরা, আর ছোট কৃষক এবং খেতমজুরেরা — এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল ঐ শ্রেণীটার স্থান; এই শ্রেণীটা শহরের সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীজোটকে অতি স্বাভাবিক রাজনীতিক পন্থা হিসেবে ধরেছিল স্পষ্টপ্রতীয়মান কারণেই। আর ছিল, দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট লাখেরাজদার কৃষক, তারা সংখ্যাবহু ছিল রাইন অঞ্চলে, সেখানে সামন্ততন্ত্র ঘায়েল হয়েছিল ফরাসী মহাবিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে। অন্যান্য প্রদেশেও এখানে-ওখানে ঐরকমের স্বাধীন

* চেক্। — সম্পাঃ

** বড় আর মাঝারি কৃষক। — সম্পাঃ

ছোট ছোট কৃষক ছিল — যেসব জায়গায় তারা তাদের জমির উপর আগেকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা বাবত টাকা মিটিয়ে দিতে পেরেছিল। এই শ্রেণীটা কিন্তু লাখেরাজদারদের ছিল শুধু নামেই, সাধারণত তাদের সম্পত্তি এমন পরিমাণে এবং এমন গুরুভার শর্তে বন্ধক থাকত যাতে কৃষক নয়, যে টাকা ধার দিত সেই মহাজনই হত জমির আসল মালিক। তৃতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক প্রজারা, জমা থেকে তাদের সহজে উচ্ছেদ করা যেত না, কিন্তু তাদের চিরস্থায়ী খাজনা দিতে হত কিংবা খাস জমিদারির মালিকের জন্যে কিছু পরিমাণ খাটতে হত তেমনি বরাবর। শেষে, খেতমজুর। বহু বড় খামারে তাদের অবস্থা ছিল হুবহু ইংলন্ডের একই শ্রেণীর অবস্থার মতো, সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা গরিবি হালে কম খেয়ে মনিবের দাস-দশায় জীবনযাত্রা চালিয়ে সেই অবস্থায়ই মরত। কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির এই শেষের তিনটে শ্রেণী — ছোট লাখেরাজদার, সামন্ততান্ত্রিক প্রজা আর খেতমজুরেরা — বিপ্লবের আগে কখনও রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না, কিন্তু স্পষ্টতই এই ঘটনাটা নিশ্চয়ই তাদের জন্যে খুলে দিল জীবনের নতুন ধারা, যেটা উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ঠাসা। বিপ্লব তাদের প্রত্যেকের সামনে বিভিন্ন সুযোগ তুলে ধরল; মনে করা যায়, আন্দোলন একবারে ঠিকমতো লেগে গেলে তাতে তারা শামিল হবে প্রত্যেকেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্টপ্রতীয়মান এবং সমস্ত আধুনিক দেশের ইতিহাস থেকেও দেখা গেছে যে, বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার দরুন এবং তাদের কোন মোটারকমের অংশে মতৈক্য ঘটান দুষ্কর হবার ফলে কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টি কখনও সার্থক স্বাধীন আন্দোলনের চেষ্টা করতে পারে না; অপেক্ষাকৃত একত্রে জড়ো-হওয়া, অপেক্ষাকৃত শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত, অপেক্ষাকৃত সহজে যারা নড়েচড়ে, সেই শহরের মানুষের প্রবর্তক প্রেরণা তাদের আবশ্যক হয়।

সাম্প্রতিক আন্দোলন শুরু হবার সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব শ্রেণীর সাকল্যটা ছিল জার্মান জাতি সেগুলি সম্বন্ধে একটু আগে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণই ঐ আন্দোলনে বিদ্যমান অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য এবং প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব-অসংগতির অনেকটার ব্যাখ্যার জন্যে যথেষ্ট। এতই বিবিধ, এতই বিরুদ্ধ, এতই পরস্পরের বিপরীত বিভিন্ন স্বার্থ যখন প্রচণ্ড বিরোধে অবতীর্ণ হয়; এইসব দ্বন্দ্বরত স্বার্থ যখন প্রত্যেকটা এলাকায়, প্রত্যেকটা

প্রদেশে তালগোল পাকিয়ে যায় বিভিন্ন অনুপাতে; সর্বোপরি যখন দেশে থাকে না কোন মস্ত কেন্দ্র, থাকে না কোন লণ্ডন, কোন প্যারিস, যেটার সিদ্ধান্ত সেটার গুরুত্বের প্রভাব দিয়ে প্রত্যেকটা এলাকায় একই বিবাদ বারংবার লড়বার আবশ্যকতা দূর করতে পারে — যে লড়াইয়ে বিপুল পরিমাণ রক্ত, কর্মশক্তি আর পুঁজি ঢালা হল সেটা অসংখ্য বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, সবকিছু সত্ত্বেও লড়াইয়ে কোন নিষ্পত্তির ফল ফলে না, তাছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে?

তিন ডজন কমবেশি গুরুত্বসম্পন্ন রাজ্যে জার্মানির রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থাটাও সমানই বোধগম্য হয় এই ব্যাপারটা থেকে: জাতির অঙ্গ-উপাদানগুলি তালগোল পাকান এবং বহুতর, ঐসব উপাদান আবার প্রত্যেকটা এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে সমস্বার্থ থাকে না সেখানে কোন লক্ষ্যের ঐক্য থাকতে পারে না, কর্মের ঐক্য তো নয়ই। জার্মান কনফেডারেশনকে (৮) চির-অটুট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল বটে, তবু এই কনফেডারেশন এবং সেটার ডায়েট (৯) কখনও জার্মান ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ হয় নি। জার্মানিতে কেন্দ্রীকরণ সর্বকালের মধ্যে যে সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠেছিল সেটা হল 'জল্‌ফেরাইন'-এর স্থাপনা; এটা দিয়ে উত্তর সাগরের পাড়ের রাজ্যগুলিকেও জোর করে ঢোকান হয়েছিল তাদের নিজস্ব কাস্টম্‌স ইউনিয়নে (১০); তখন অস্ট্রিয়া থেকে গিয়েছিল নিজস্ব পৃথক নিবারক শুল্ক মুড়ি দিয়ে। ছত্রিশটার জায়গায় কার্যত মাত্র তিনটে স্বাধীন শক্তিতে বিভক্ত হল, এটাই ছিল জার্মানির সন্তোষের কারণ। রুশী জারের* ১৮১৪ সালে স্থাপিত সর্বোচ্চ আধিপত্য অবশ্য তাতে করে একটুও পরিবর্তিত হয় না।

আমাদের সিদ্ধান্তসূত্র থেকে এইসব প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বের করার পরে আমরা আমাদের পরের কিস্তিতে দেখব জার্মান জাতির উল্লিখিত শ্রেণীগুলি একের পর এক সচল হয়ে উঠেছিল কিভাবে, আর এই বিচলন কোন্ প্রকৃতি ধারণ করেছিল ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব শুরু হবার সময়ে।

লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

---

* প্রথম আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

প্রাশিয়া রাষ্ট্র

জার্মানিতে মধ্য শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনীতিক আন্দোলন শুরুর সময় ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল। তার আগে বিভিন্ন লক্ষণ থেকে দেখা গিয়েছিল, দেশটির ধনবান এবং শিল্প-মালিক শ্রেণীটি এত পরিমাণে পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল যাতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-আমলাতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের চাপে তারা আর অনীহ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারত না। জার্মানির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজন্যরা একে-একে কমবেশি উদারপন্থী ধরনের নিয়মতন্ত্র মঞ্জুর করল — অংশত, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের নিজ নিজ রাজ্যে অভিজাতকুলের প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে, আর অংশত, ভিয়েনা কংগ্রেস (১১) তাদের শাসনাধীনে সম্মিলিত করল যেসব বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সেগুলোকে সমগ্র সত্তা হিসেবে পাকাপোক্ত করার জন্যে। নিজেদের কোন বিপদ ছাড়াই তারা এটা করতে পারল, কেননা তারা জানত, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার নিছক ক্রীড়াপুত্তলিকা কনফেডারেশনের ডায়েট তাদের সার্বভৌমত্বের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে তারা সেটার নির্দেশগুলির প্রতিরোধ করার কাজে জনমত এবং ব্যবস্থাপরিষদগুলির সমর্থন পাবে; আর উল্টে ব্যবস্থাপরিষদগুলি বড় বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলে সমস্ত বিরোধিতা চূর্ণ করার জন্যে তারা কনফেডারেশনের ডায়েটের ক্ষমতা লাগাতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ, বাডেন আর হানোভারের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি রাজনীতিক ক্ষমতার জন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের উদ্ভব ঘটাতে পারত না, কাজেই বিভিন্ন খুদে রাজ্যের বিধানপরিষদগুলিতে উত্থাপিত ঝগড়া-বিবাদ থেকে খুবই সাধারণভাবে দূরে থেকে গেল জার্মান বুর্জোয়াদের বিরাট অংশটা, তাতে তারা বেশ ভালভাবেই জানত যে, জার্মানির দুটো বৃহৎ শক্তির কর্মনীতিতে আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী পরিবর্তন ছাড়া কোন গৌণ প্রচেষ্টা এবং জয়ে কোন ফায়দা হবে না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, এইসব খুদে পরিষদে গজিয়ে উঠল উদারপন্থী ব্যবহারজীবী,

প্রতিপক্ষবাদীদের একটা পেশাদার গোষ্ঠী: রোটেকরা, ভেল্কাররা, রোয়েমাররা, জর্ডানরা, স্ট্যুভেরা, আইসেনমানরা, সেই মহা 'জনপ্রিয় লোকেরা' (Volksmänner), যাঁরা বিশ বছরের কমবেশী কোলাহলময় কিন্তু সর্বদাই অকৃতকার্য প্রতিপক্ষীয়তার পরে ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক জোয়ারে ক্ষমতার শিখরে উন্নীত হয়ে সেখানে নিজেদের চূড়ান্ত অক্ষমতা আর তুচ্ছতা দেখিয়ে আবার ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন অচিরে। জার্মানির মাটিতে রাজনীতি আর প্রতিপক্ষীয়তার ব্যাপারীদের প্রথম প্রথম নমুনা এ'রা, বক্তৃতা আর লেখাগুলিতে এ'রা নিয়মতান্ত্রিকতার ভাষাটাকে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছিলেন জার্মানদের কানে; আর নিজেদের জীবনযাত্রা দিয়েই এ'রা একটা সময় কাছিয়ে আসার পূর্বলক্ষণ দেখিয়েছিলেন, যখন আসল অর্থ সম্বন্ধে বিশেষকিছু না জানা এইসব বাচাল অ্যাটর্নি আর প্রফেসরদের ব্যবহৃত রাজনীতিক কথাগুলিকে লুফে নিয়ে সেগুলিকে সঠিক অর্থে ব্যবহার করবে বুর্জোয়ারা।

১৮৩০ সালের ঘটনাবলি (১২) সারা ইউরোপকে ফেলে দিয়েছিল যে রাজনীতিক উত্তেজনার মধ্যে সেটার প্রভাবে সক্রিয় হয়েছিল জার্মান সাহিত্যও। তখনকার প্রায় সমস্ত লেখকই প্রচার করত একটা স্থূল নিয়মতান্ত্রিকতা, কিংবা আরও স্থূল প্রজাতন্ত্রবাদ। রচনাদিতে নিপুণতার ঘাটতি মেটাবার জন্যে রাজনীতিক ইঙ্গিতে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল বিশেষত নিকৃষ্ট ধরনের লেখক-সাহিত্যিকরা, কেননা রাজনীতিক ইঙ্গিত মনোযোগ আকর্ষণ করবে সেটা নিশ্চিত ছিল। কবিতায়, উপন্যাসে, পর্যালোচনায়, নাটকে, প্রত্যেকটা সাহিত্যিক রচনায় গিজগিজ করত যাকে বলা হত 'প্রবণতা', অর্থাৎ সরকারবিরোধী মেজাজের কমবেশি ভীতু প্রকাশ। জার্মানিতে ১৮৩০ সালের পরে বিরাজমান ভাব-ভাবনার বিভ্রান্তিটা ষোল-কলা পূর্ণ হল যখন রাজনীতিক বিরোধিতার এইসব উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ে বদহজম করা জার্মান দর্শনের স্মৃতি এবং ফরাসী সমাজতন্ত্রের, বিশেষত সাঁ-সিমোঁবাদের টুকরোটাকরা। ভাব-ভাবনার এই জগাখিচুড়ি নিয়ে যাদের কারবার, লেখকদের সেই ঘোঁটটা গাল-ভরা নাম ধারণ করল 'নবীন জার্মানি' বা 'আধুনিক সম্প্রদায়' (১৩)। বয়োদোষের জন্যে তারা পরে অনুশোচনা করে, কিন্তু তাদের রচনাশৈলীর উন্নতি হয় নি।

শেষে, জার্মান দর্শন — অতি জটিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জার্মান মানস

বিকাশের সবচেয়ে নিশ্চিত এই উষ্ণমাপকটি বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল যখন হেগেল তাঁর 'আইনের দর্শন'-এ বলেছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ধরনের শাসন। অর্থাৎ কিনা, রাজনীতিক ক্ষমতায় দেশের বুর্জোয়াদের আসন্ন আগমনের কথা তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মতসম্প্রদায় সেখানেই থেকে যায় না। তাঁর অনুগামীদের অপেক্ষাকৃত আগুয়ান অংশটা একদিকে কঠোর সমালোচনার কঠিন পরীক্ষায় ফেলল প্রত্যেকটা ধর্মমতকে, খৃষ্ট ধর্মের প্রাচীন কাঠামটার ভিত্তিমূলে ধরে নাড়া দিল, তার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরল বিভিন্ন রাজনীতিক মূলনীতি, যেগুলি তদবধি জার্মানির মানুষ যেমনটা বিবৃত হতে শুনেছে তার চেয়ে দুঃসাহসিক, আর প্রথম ফরাসী বিপ্লবের বীর-নায়কদের গৌরবমণ্ডিত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল। এইসব ভাব-ভাবনা জড়ান থাকত দুর্বোধ্য দার্শনিক ভাষায়, সেটা লেখক আর পাঠক উভয়ের মন যেমন ঝাপসা করে আনত, তেমনি সমানই ধাঁধিয়ে দিত সেন্সরের চোখ, এইভাবেই 'তরুণ হেগেলবাদী' লেখকেরা সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা পেয়েছিল তেমনটা সাহিত্যের অন্য সমস্ত শাখায় ছিল অজ্ঞাত।

জার্মানিতে জনমতের মস্ত পরিবর্তন ঘটছিল, সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল এইভাবে। যেসব শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষায় কিংবা জীবনে প্রতিষ্ঠা এমন ছিল যাতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অধীনেও কিছুটা রাজনীতিক জ্ঞান পাওয়া এবং স্বাধীন রাজনীতিক অভিমত গোছের কিছু গড়ে তোলা সম্ভব সেগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটু একটু করে সম্মিলিত হয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষব্যূহ। জার্মানিতে রাজনীতিক বিকাশের মন্থরতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে প্রত্যেকের অবশ্যই বিবেচনায় রাখা দরকার এই কথাটা: যে দেশে সংবাদ-তথ্যাদির সমস্ত উৎস সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, যেখানে গরিবদের অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং রবিবারের বিদ্যালয় থেকে সংবাদপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত আগে সরকারী অনুমোদন ছাড়া বলা, শেখান, ছাপান কিংবা প্রকাশিত হত না কিছুই, সেখানে যেকোন বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া কত দুষ্কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভিয়েনার দিকে চেয়ে দেখুন। মেহনত আর শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যে ভিয়েনার মানুষ বোধহয় জার্মানিতে কারও চেয়ে খাটো নয়, এবং উৎসাহ-

উদ্দীপনা, সাহস আর বৈপ্লবিক কর্মশক্তিতে তারা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত, অথচ নিজেদের আসল স্বার্থের ব্যাপারে তারা ছিল অন্য সবার চেয়ে অজ্ঞ, বিপ্লবের সময়ে তারা ভুল করেছিল আর সবার চেয়ে বেশি। অতি মামুলি রাজনীতিক বিষয়গুলো সম্বন্ধেও মেটারনিখ সরকার তাদের প্রায় ষোল-আনা অজ্ঞ রাখতে পেরেছিল, এটাই বহুলাংশে তার কারণ।

আর কোন ব্যাখ্যা ছাড়াও বোঝা যায় কেন এমন ব্যবস্থার অধীনে রাজনীতিক তথ্যাদিতে প্রায় সম্পূর্ণ একচেটে ছিল সমাজের এমনসব শ্রেণীর যেগুলি সেই তথ্য গোপনে আমদানি করার খরচ যোগাতে পারত, আরও বিশেষত বিদ্যমান অবস্থার সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পড়ছিল যাদের স্বার্থের উপর, অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যিক শ্রেণীর। কাজেই, কমবেশি প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্র চালু থাকার বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে তারাই; প্রতিপক্ষের কাতারে তাদের শামিল হওয়া থেকেই ধরতে হবে জার্মানিতে আসল বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হবার সময়।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপক্ষীয় ঘোষণাপত্রের সময় ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল থেকে, প্রাশিয়ার প্রয়াত রাজার* মৃত্যুর সময় থেকে; ১৮১৫ সালের 'পবিত্র মৈত্রী'র (১৪) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে কেবল তিনিই বেঁচে ছিলেন। জানা ছিল যে, নতুন রাজা তাঁর পিতার আমলাতন্ত্র আর সামরিকতার প্রাধান্যের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। ১৬শ লুইয়ের অভ্যাগম থেকে ফরাসী বুর্জোয়ারা যা প্রত্যাশা করেছিল, কিছু পরিমাণে তাই প্রুশীয় ৪র্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের কাছে আশা করেছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী। পুরন ব্যবস্থাটা ফেটে পড়েছিল, সেটা ছিল জীর্ণ, সেটাকে পরিত্যাগ করা চাই, এবিষয়ে সর্বদিক থেকে সবাই একমত ছিল, পুরন রাজার আমলে যেটাকে নীরবে বরদাস্ত করা হয়েছিল সেটা তখন অসহ্য বলে ঘোষণা করা হল উচ্চৈঃস্বরে।

কিন্তু যেখানে ১৬শ লুই, 'Louis-le-Desire' (ঈপ্সিত লুই) ছিলেন সাদাসিধে, নিরহঙ্কার বোকারাম, নিজের অকার্যকরতা সম্বন্ধে অর্ধ-সচেতন, তাঁর কোন নির্দিষ্ট মতামত ছিল না, তিনি শাসন চালাতেন

---

* ৩য় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

প্রধানত শিক্ষাকালে গঠিত অভ্যাস অনুসারে, 'ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম-le Desire' ছিলেন একেবারেই ভিন্ন কিছু। চরিত্রের ক্ষীণতার দিক থেকে তিনি তাঁর ফরাসী আদিরূপটিকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিরহঙ্কারও ছিলেন না, মতামতহীনও ছিলেন না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি শখের গোছের ধরনে অবগত হয়েছিলেন, কাজেই ভাবতেন তিনি যা বিদ্বান্ তাতে প্রত্যেকটা বিষয়ে নিজ মীমাংসাকে তিনি চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী, আর বার্লিনে কোন ভ্রমণরত ক্যানভ্যাসার ভান-করা বুদ্ধির দীর্ঘ ক্লান্তিকর কথায় কিংবা অলঙ্কারপূর্ণ বাকপটুতায় তাঁকে নিশ্চয়ই হার মানাতে পারত না। সর্বোপরি, তাঁর নিজের মতামত ছিল। প্রুশীয় রাজতন্ত্রের আমলাতান্ত্রিক উপাদানটাকে তিনি ঘৃণা করতেন, অবজ্ঞা করতেন, কিন্তু তার একমাত্র কারণ তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক উপাদানটার প্রতি। তিনি নিজে ছিলেন 'Berliner politisches Wochenblatt' (১৫) (বার্লিন রাজনীতিক সাপ্তাহিক)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাতে প্রধান লেখক; তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তথাকথিত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়-এর (১৬) (এই সম্প্রদায়ের উপজীব্য ছিল বোনাল্ড, দ্য' মাইস্ত্র এবং ফরাসী লেজিটিমিস্টদের (১৭) প্রথম পুরুষের অন্যান্য লেখকদের ভাব-ধারণা), সেইভাবে অভিজাতকুলের প্রাধান্যশালী সামাজিক অবস্থান যতখানি সম্ভব পুরোপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ৪র্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম যে 'চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত ধারণা'টি বাস্তবায়িত করবার কাজ হাতে নিয়েছিলেন এবং বাস্তবায়িত করতে এখন আবার চেষ্টা করছেন সেটা এইরকমের: রাজ্যের পহেলা অভিজাত রাজা, তিনি প্রথম পর্যায়ে সামন্ত, প্রিন্স, ডিউক আর কাউন্টদের জমকাল রাজদরবার দিয়ে পরিবেষ্টিত; দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁকে ঘিরে সংখ্যাবহু ধনী অধস্তন অভিজাতকুল; রাজভক্ত বার্গার আর কৃষকদের উপর শাসন চলবে তাঁর মর্জিমাফিক, এইভাবে নিজে হবেন বিভিন্ন সামাজিক বর্গ বা পঙক্তির একটা সমগ্র ক্রমবিভাগতন্ত্রের প্রধান, ঐসব পদ বা পঙক্তির প্রত্যেকটার থাকবে নির্দিষ্ট বিশেষাধিকার, প্রত্যেকটাকে অন্যগুলি থেকে পৃথক করে রাখবে জন্ম কিংবা স্থিরীকৃত, অপরিবর্তনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রায় অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধ; তার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত

পঙক্তি বা 'রাজ্যের বর্গসমূহ' ক্ষমতা আর প্রভাবের দিক থেকে এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করবে যাতে কার্যকরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে রাজার।

প্রুশীয় বুর্জোয়ারা তত্ত্বগত প্রশ্নাবলিতে খুব বিদিত ছিল না — তাদের রাজার প্রবণতাটার আসল মর্ম বুঝতে তাদের কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই তারা বুঝতে পেরেছিল রাজা এমনসব ব্যাপারে বদ্ধপরিকর যেগুলো তারা যা চায় সেটার একেবারে বিপরীত। পিতার মৃত্যুর ফলে নিজ 'বাকপটুতা' শৃঙ্খলমুক্ত হতে-না-হতেই নতুন রাজা অগুন্তি বক্তৃতায় তাঁর অভিপ্রায় ঘোষণা করতে লেগে গিয়েছিলেন; তাঁর প্রত্যেকটা বক্তৃতা, প্রত্যেকটা কাজের ফলে তাঁর প্রতি বুর্জোয়াদের সহানুভূতি সরে যাচ্ছিল আরও দূরে। কিছু কিছু কঠোর এবং চমকপ্রদ বাস্তবতা তাঁর কাব্যিক স্বপ্নগুলোয় ব্যাঘাত না ঘটালে ওসব তিনি গ্রাহ্য করতেন না। হায়, কল্পনাবিলাসিতা হিসাবে তেমন দড় নয়, আর ডন্ কুইক্সোটের পর থেকে বরাবর সামন্ততন্ত্র সামনে চলতে জানে না! নগদ টাকা সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য বরাবরই ধর্মযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততির সবচেয়ে দরাজ উত্তরাধিকার, সেটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল ৪র্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌মের। গদি লাভ করার সময়ে তিনি পেয়েছিলেন হিসাব ক'রে ব্যবস্থিত হলেও ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা এবং পরিমিতভাবে পূর্ণ রাজকোষ। রাজসভার পরব, রাজকীয় শোভাযাত্রা, অনুগ্রহবিতরণ, অভাবী বদস্বভাবী আর লোভী অভিজাতদের জন্যে অর্থসাহায্য, ইত্যাদি বাবত রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থের শেষ কপর্দকও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল দু'বছরে। তখন রাজদরবার কিংবা সরকার কোনটার জরুরী প্রয়োজনের জন্যে নিয়মিত কর আর যথেষ্ট নয়। এইভাবে হিজ্ ম্যাজেস্টি অচিরেই দেখলেন, তাঁর একদিকে রয়েছে দগদগে ঘাটতি, আর অন্যদিকে ১৮২০ সালের একটা আইন, তাতে 'ভবিষ্য জন-প্রতিনিধিত্বের' অনুমোদন ছাড়া নতুন ঋণগ্রহণ কিংবা বিদ্যমান কর বাড়ান বেআইনী। এই প্রতিনিধিত্ব ছিল না; সেটা সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি নতুন রাজার ছিল বাপের চেয়েও কম; সে-প্রবৃত্তি যদি তাঁর হত তাহলে তিনি বুঝতেন তাঁর গদি পাবার পর থেকে জনমতের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

বাস্তবিকপক্ষে, বুর্জোয়ারা অংশত আশা করেছিল নতুন রাজা

সঙ্গেসঙ্গেই নিয়মতন্ত্র চালু করবেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, ইত্যাদি ঘোষণা করবেন — সংক্ষেপে, রাজনীতিক প্রাধান্যলাভের জন্যে তারা যা চেয়েছিল সেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবেন রাজা নিজেই — তারা নিজেদের ভুল বুঝে দুর্দান্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাজার বিরুদ্ধে। রাইন প্রদেশে এবং কমবেশি সাধারণভাবে সারা প্রাশিয়ায় তারা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যাতে পত্র-পত্রিকাজগতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাদের নিজেদের উপযুক্ত লোক কম ছিল বলে তারা চরমপন্থী দার্শনিক দলের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিল, যে-বিষয়ে আমরা আগে বলেছি। এই মৈত্রীর ফল হয়েছিল কলোন্-এর 'Rheinische Zeitung' (১৮), যে-পত্রিকাটিকে পনর মাস চলার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বলা যেতে পারে জার্মানিতে সংবাদপত্র প্রেসের অস্তিত্ব তখন থেকে। এটা ছিল ১৮৪২ সালে।

বেচারা রাজার লেনদেনের দুষ্করতা হল তাঁর মধ্যযুগীয় ঝোঁকগুলোর উপর প্রখরতম বিদ্রূপ-বাণ, তিনি অচিরেই বুঝলেন, 'জন-প্রতিনিধিত্বে'র জন্যে সাধারণের সোরগোলের ব্যাপারে সামান্যকিছু সুবিধে না দিয়ে রাজত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় -- সেই যে 'জন-প্রতিনিধিত্ব' হল ১৮১৩ আর ১৮১৫ সালের দীর্ঘ-বিস্মৃত প্রতিশ্রুতির অবশেষ, যেটা অঙ্গীভূত ছিল ১৮২০ সালের আইনে। এই অসুবিধাজনক আইনটা পালনের সবচেয়ে কম আপত্তিকর ধরনটা তিনি বের করলেন -- বিভিন্ন প্রাদেশিক ডায়েটের স্থায়ী কমিশনগুলিকে তিনি একত্রে বসালেন। প্রাদেশিক ডায়েটগুলো স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। রাজ্যের আটটা প্রদেশের প্রত্যেকটার ডায়েট গঠিত ছিল নিম্নলিখিতদের নিয়ে: ১। ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল, জার্মান সাম্রাজ্যের প্রাক্তন রাজ-পরিবারগুলো, সেইসব পরিবারের কর্তারা ডায়েটের সদস্য ছিল জন্মাধিকারবলে; ২। নাইটদের প্রতিনিধিরা বা নিম্নতন অভিজাতকুল; ৩। শহরগুলির প্রতিনিধিরা; এবং ৪। কৃষককুল বা ছোট খামারী শ্রেণীর ডেপুটিরা। গোটা জিনিসটা এমনভাবে সাজান ছিল যাতে প্রত্যেকটা প্রদেশের ডায়েটে অভিজাতকুলের দুটো অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। আটটা প্রাদেশিক ডায়েটের প্রত্যেকটা নির্বাচিত করত একটা কমিশন, এখন বহু-আকাঙ্ক্ষিত ঋণ ভোটে পাস করাবার উদ্দেশ্যে ঐ আটটা কমিশনকে বার্লিনে ডাকা হল প্রতিনিধি পরিষদ হিসেবে গঠিত হবার জন্যে। বলা হয়েছিল রাজকোষ পূর্ণ,

ঋণটা আবশ্যক ছিল চলতি চাহিদার জন্যে নয় — একটা রেলপথ নির্মাণের জন্যে। কিন্তু সম্মিলিত কমিশনসমূহ (১৯) সোজা 'না' জবাব দিয়েছিল রাজাকে, তারা বলেছিল জন-প্রতিনিধিবৃন্দ হিসেবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা তাদের ছিল না; হিজ্ ম্যাজেস্টিকে তারা বলেছিল, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনগণের সহায়তা চাইবার সময়ে তিনি যে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা এই রাজা পালন করুন।

সম্মিলিত কমিশনসমূহের অধিবেশনে প্রমাণিত হয়েছিল যে, বিরোধিতার মনোভাব বুর্জোয়াদেরই মধ্যে আর গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। কৃষকদের একাংশ তাদের সঙ্গে শামিল হয়েছিল; আর বহু অভিজাত ছিল নিজেদের তালুকে বড় বড় খামারী আর তারা ছিল শস্য, পশম, স্পিরিট আর ক্ষৌমের কারবারি, তাদের একই রকমের গ্যারাণ্টি প্রয়োজন ছিল স্বৈরতন্ত্র আর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধানের পক্ষে সমানই মতপ্রকাশ করেছিল। লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হল রাজার পরিকল্পনা; তিনি টাকা পেলেন না, কিন্তু বাড়িয়ে তুললেন প্রতিপক্ষের ক্ষমতা। বিভিন্ন ডায়েটের পরবর্তী অধিবেশনগুলি হয়েছিল রাজার পক্ষে আরও দুর্ভাগ্যজনক। সেগুলি সবই চেয়েছিল বিভিন্ন সংস্কার, ১৮১৩ আর ১৮১৫ সালের প্রতিশ্রুতি পালন, সংবিধান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; কোন কোন ডায়েটে ঐ মর্মে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ভাষা ছিল একটু অশিষ্টই, তাতে রুষ্ট রাজার বদমেজাজী জবাবগুলো আরও বাড়িয়ে তুলেছিল অনিষ্টটাকে।

সরকারের আর্থিক অসুবিধা বেড়ে চলেছিল ইতোমধ্যে। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্যে বরাদ্দ-করা টাকা কাটা হয়েছিল: 'Seehandlung' (২০) নামে একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের হিসাবে এবং ঝুঁকিতে ফাটকাবাজি আর বাণিজ্য চালাত; সেটা দীর্ঘকাল যাবত ছিল রাষ্ট্রের টাকার দালাল, সেটার সঙ্গে বিভিন্ন জুয়াচুরির লেনদেন করা হয়েছিল — এইভাবে ঠাট বজায় রাখা গিয়েছিল কিছুকাল। রাষ্ট্রের কাগুজে মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়ে কিছুটা সংগতিসংস্থান জোটান হয়েছিল; তাই ব্যাপারটাকে মোটের উপর বেশ ভালভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ফন্দিফিকির ফুরিয়ে গিয়েছিল অচিরেই। আর-একটা পরিকল্পনা নিয়ে চেষ্টা করে দেখা হয়েছিল:

পরিমাণে। ১৮৪০ সাল থেকে বরাবর অনুরূপ ভাব-ধারণার প্রতি ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেবার ফলে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম রীতিমাফিক হয়ে উঠেছিল জার্মানিতেও, আর সেই ১৮৪৩ সালেই বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা গিজগিজ করত সমস্ত সংবাদপত্রে। জার্মানিতে শিগ্‌গিরই গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্রীদের একটা সম্প্রদায়, যেটা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল ভাব-ধারণার অভিনবত্বের চেয়ে দুর্বোধ্যতার জন্যেই বেশি। জার্মান দর্শনের জটিল ভাষায় ফরাসী ফুরিয়েপন্থী, সাঁ-সিমোঁপন্থী এবং অন্যান্য মতবাদের তরজমা করাই ছিল সেটার প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা (২২)। এই গোষ্ঠীটা থেকে একেবারেই পৃথক জার্মান কমিউনিস্ট সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল প্রায় একই সময়ে।

১৮৪৪ সালে ঘটেছিল সাইলেসিয়ার তাঁতিদের হাঙ্গামা, তারপরে প্রাগ-এ ক্যালিকো-ছাপা কর্মীদের অভ্যুত্থান। সরকারের বিরুদ্ধে নয়, মালিকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের এইসব হাঙ্গামা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল, এগুলি গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট প্রচারে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল। তেমনি ১৮৪৭-এর দুর্ভিক্ষের বছর খাদ্যের জন্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও। সংক্ষেপে, যেভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ সেটার পতাকাতলে সমবেত করেছিল সম্পত্তি-বিত্তবান শ্রেণীগুলির প্রধান অংশটাকে (বড় বড় সামন্ত ভূস্বামীদের ছাড়া), সেইভাবেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় শহরের শ্রমিক শ্রেণী মুক্তির জন্যে নির্ভর করছিল সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট মতবাদের উপর, যদিও তদানীন্তন সংবাদপত্র আইনের অবস্থায় সে সম্বন্ধে তাদের জানান সম্ভব ছিল যৎসামান্যমাত্র। শ্রমিকরা কী চাইত সে সম্বন্ধে তাদের খুব নির্দিষ্ট কোন ধারণা আশা করা যেত না — তারা শুধু জানত যা চাইত তার সবকিছু নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের কর্মসূচিতে ছিল না, আর নিয়মতান্ত্রিক ভাব-ধারণার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না তাদের চাহিদাগুলো।

জার্মানিতে তখন কোন পৃথক প্রজাতান্ত্রিক পার্টি ছিল না। লোকে তখন হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী, নইলে কমবেশি স্পষ্ট ধরনের সমাজতন্ত্রী কিংবা কমিউনিস্ট।

এমনসব উপাদান থাকায়, সামান্যতম সংঘর্ষও নিশ্চয়ই বিপ্লব ঘটাত।

যখন ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল এবং ঊর্ধ্বতন কর্মচারী আর সামরিক অফিসারেরা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন; যখন নিম্নতন অভিজাতকুল, ব্যাপারী বুর্জোয়ারা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, সমস্ত মাত্রার বিদ্যালয় শিক্ষকেরা, এমনকি আমলাতন্ত্র আর সামরিক অফিসারদের নিম্নতর পদের লোকেরাও, এরা সবাই সম্মিলিত ছিল সরকারের বিরুদ্ধে; যখন এদের পিছনে ছিল বিক্ষুব্ধ কৃষক-সাধারণ এবং বড় বড় শহরের বিক্ষুব্ধ প্রলেতারিয়ানরা, যারা তখনকার মতো উদারপন্থী প্রতিপক্ষকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হাতে সবকিছু তুলে নেবার অজানা কথা বিড়বিড় করে বলছিল তখনই; যখন সরকারটাকে বলপূর্বক ঠেলে ফেলে দিতে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রস্তুত, আর বুর্জোয়াদের বলপূর্বক ঠেলে ফেলে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল প্রলেতারিয়ানরা — তখন সরকার একগুঁয়ে হয়ে যে পথে চলছিল তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। ১৮৪৮ সালের গোড়ায় জার্মানি ছিল একটা বিপ্লবের প্রাক্কালে, ফেব্রুয়ারি মাসের ফরাসী বিপ্লব ত্বরিত না করলেও এই বিপ্লব আসতই।

জার্মানির উপর প্যারিস-বিপ্লবের ক্রিয়াফল কী হয়েছিল সেটা আমরা দেখব পরের কিস্তিতে।

লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৩

অন্যান্য জার্মান রাজ্য

১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালে যেটা ছিল জার্মান আন্দোলনে সবাইকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র সেই রাজ্যটা, অর্থাৎ প্রাশিয়া বিষয়েই আমাদের আলোচনা গণ্ডিবদ্ধ ছিল গত কিস্তিতে। তবে জার্মানির একই কালপর্যায়ের অন্যান্য রাজ্যের উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাবার সময় হয়েছে।

খুদে রাজ্যগুলো তো ১৮৩০ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময় থেকেই কনফেডারেশনের ডায়েটের অর্থাৎ অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার একনায়কত্বাধীন হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণভাবেই। কয়েকটা সংবিধান প্রবর্তিত

হয়েছিল, সেগুলি ছিল যেমন বৃহত্তর রাজ্যগুলির আদেশ-নির্দেশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে, তেমনি সেগুলির রচয়িতা রাজন্যদের জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করার জন্যে এবং একেবারে কোন নির্দেশক নীতি ছাড়াই ভিয়েনা কংগ্রেসের গঠিত পাঁচমিশালী প্রদেশগুলির ঐক্য নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে — এইসব সংবিধান অসার হলেও ১৮৩০ আর ১৮৩১ সালের উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে খুদে রাজন্যদের নিজেদেরই কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেগুলোকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। সেগুলি থেকে যাকিছু অবশিষ্ট থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা ছায়াও নয়; এইসব খুদে রাজ্যের অক্ষম পরিষদগুলিতে হীন চাটুবাদ মেশান যে অবনমিত বিরোধিতা প্রদর্শন তাতে অনুমত ছিল সেটার কোনক্রমে ফলপ্রদ হবার সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যেত শুধু কোন ভেল্কার, রোট্রেক কিংবা ডালমান-এর বাচাল আত্মসন্তুষ্টিতে।

অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার এইসব অধীনরাজ্যে পার্লামেণ্টারি শাসন গড়ে উঠবে এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বুর্জোয়াদের অপেক্ষাকৃত কর্মোদ্যোগী অংশগুলি আগে যত আশা করেছিল সেসবই তাদের ছাড়তে হল ১৮৪০ সালের ঠিক পরেই। প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সেটার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রেণীগুলি যেইমাত্র প্রাশিয়ায় পার্লামেণ্টারি শাসনের জন্যে সংগ্রামের গুরুসংকল্প প্রদর্শন করল, অমনি অস্ট্রিয়া ছাড়া সারা জার্মানিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের নেতৃত্ব করতে দেওয়া হল। এখন আর কেউ আপত্তি তুলবে না যে, মধ্য জার্মানির যেসব নিয়মতন্ত্রী পরে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, যাদের পৃথক সভাগুলির জায়গার নাম অনুসারে যাদের বলা হয়েছিল গোথা পার্টি (২৩), তাদের কোষ কেন্দ্রটা ১৮৪৮ সালের অনেক আগেই যে পরিকল্পনা মনস্থ করেছিল সেটাকে সামান্য অদলবদল করে তারা ১৮৪৯ সালে উপস্থিত করেছিল সারা জার্মানির প্রতিনিধিদের কাছে। তাদের অভিপ্রায় ছিল — জার্মান কনফেডারেশন থেকে অস্ট্রিয়াকে একেবারেই বাদ দেবে, প্রাশিয়ার রক্ষণাধীনে স্থাপন করবে নতুন কনফেডারেশন, সেটার থাকবে নতুন সংবিধান আর ফেডারেল পার্লামেণ্ট, এবং অপেক্ষাকৃত নগণ্য রাজ্যগুলিকে কিছুটা বড় বড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবে। এই সবকিছু কার্যে পরিণত করার কথা ছিল

যেইমাত্র প্রাশিয়া দাঁড়াবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কাতারে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রবর্তন করবে, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র কর্মনীতি গ্রহণ করবে, আর এইভাবে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলির নিয়মতন্ত্রীদের নিজ নিজ সরকারের সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পের উদ্ভাবক ছিলেন হাইডেলবের্গের (বাডেন) প্রফেসর গের্ভিনাস। এইভাবে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তির হবার কথা ছিল সাধারণভাবে জার্মানির বুর্জোয়াদের মুক্তির সংকেত, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীজোট গড়ার সংকেত; কেননা এখনই দেখা যাবে, একেবারেই অসভ্য দেশ বলে বিবেচিত হত অস্ট্রিয়া, সেদেশ সম্বন্ধে জানা ছিল যৎসামান্যই, আর সেই সামান্যটা দেশটির মানুষের পক্ষে সম্মানজনক ছিল না; কাজেই জার্মানির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য ছিল না অস্ট্রিয়া।

ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী প্রাশিয়ায় তাদের সমকক্ষদের পিছন পিছন এগিয়েছিল কমবেশি দ্রুত। পেটি বুর্জোয়ারা তাদের নিজ নিজ সরকারগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় 'স্বেচ্ছাচারের দাসদের' সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার সময়ে তারা যেসব রাজনীতিক ভুয়া বিশেষাধিকারের বড়াই করত সেগুলোকে ছেঁটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাদের বিরোধিতায় তখনও সুনির্দিষ্ট এমনকিছু ছিল না যাতে উচ্চতর বুর্জোয়াদের নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে স্পষ্ট-পৃথক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে তাদের উপর ছাপ পড়তে পারে। কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষ সমপরিমাণে বেড়ে চলছিল, কিন্তু একথা সুবিদিত যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার যেখানে চালু আছে সেইসব দেশে ছাড়া জনসমষ্টির এই অংশটা নির্ঝঞ্ঝাট এবং শান্তিপূর্ণ সময়ে নিজ স্বার্থ কিছুতেই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে না এবং স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে নিজ অবস্থানে দাঁড়ায় না। শহরগুলির বিভিন্ন বৃত্তি আর ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের 'বিষে' সংক্রমিত হতে শুরু করেছিল, কিন্তু প্রাশিয়ার বাইরে আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল স্বল্পসংখ্যক, আর ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকা ছিল আরও কম, তাই কার্যকরণ আর প্রচারের কেন্দ্রের অভাবের দরুন ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে এই শ্রেণীর আন্দোলন ছিল অত্যন্ত মন্থর।

প্রাশিয়ায়ও, ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতেও রাজনীতিক বিরুদ্ধতা প্রকাশ করায় দুষ্করতার ফলে জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্র এবং মুক্ত সম্প্রদায়গুলো (২৪) এই দুটো সদৃশ ধর্মীয় প্রতিপক্ষ গোছের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল।

ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে রাষ্ট্রীয় চার্চের আশিসধন্য দেশগুলিতে, যেখানে রাজনীতিক আলোচনা শৃঙ্খলিত সেখানে ঐহিক ক্ষমতার প্রতি অদিব্য এবং বিপজ্জনক বিরোধিতা লুকিন থাকে আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত পাপমুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত আপাত-স্বার্থশূন্য সংগ্রামে। নিজেদের কোন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা যেগুলি হতে দেয় না এমন বহু সরকারই শহিদ সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং জনগণের ধর্মোন্মাদনা খুঁচিয়ে তুলতে দ্বিধা করবে। এইভাবে ১৮৪৫ সালের জার্মানিতে প্রত্যেকটি রাজ্যে রোমান-ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম কিংবা দুইই দেশের আইনের অপরিহার্য অংশ বলে গণ্য ছিল। তাছাড়া, প্রত্যেকটি রাজ্যে ঐ দুটোর একটার কিংবা উভয়েরই যাজকমণ্ডলী ছিল সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই প্রটেস্ট্যান্ট কিংবা ক্যাথলিক ধর্মমতের উপর আক্রমণ, যাজকের কাজের উপর আক্রমণ ছিল সরকারেরই উপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্রের বেলায় — সেটার অস্তিত্বই ছিল জার্মানির, বিশেষত অস্ট্রিয়া আর ব্যাভেরিয়ার ক্যাথলিক সরকারগুলির উপর আক্রমণ। ঐসব সরকার সেটাকে ধরেছিল ঐভাবেই। কিছুটা বৃটিশ এবং মার্কিন ইউনিটারিয়ানদের (২৫) অনুরূপ মুক্ত সম্প্রদায়গুলোর সদস্যরা, প্রটেস্ট্যান্ট ডিসেন্টাররা প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র শিক্ষা আর যাজকীয় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইকহর্ন-এর যাজকতান্ত্রিক এবং কঠোর গোঁড়ামির প্রতি বিরুদ্ধতা ঘোষণা করত প্রকাশ্যে। প্রথম সম্প্রদায়টা ক্যাথলিক দেশগুলিতে, দ্বিতীয়টা প্রটেস্ট্যান্ট দেশগুলিতে — কিছুকালের জন্যে দ্রুত প্রসার ঘটেছিল এই সম্প্রদায়-দুটির ও উৎপত্তির ভিন্নতা ছাড়া কোন পার্থক্য ছিল না এদের মধ্যে। নীতির বেলায় — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে উভয়ে সম্পূর্ণভাবে একমত ছিল: সমস্ত স্থির-নির্দিষ্ট আপ্তবাক্য বাজে জিনিস। কোন সীমানির্দেশ না-থাকাটাই ছিল তাদের সারমর্ম। যেখানে সমস্ত জার্মান একত্রে মিলিত হতে পারে সেই মন্দির নির্মাণ করছিল বলে তারা জাহির করত। এইভাবে তারা ছিল তখনকার আর-একটা রাজনীতিক ধারণার ধর্মীয় রূপের প্রতিভূ — সে

ধারণাটা হল জার্মান ঐক্য, অথচ তারা কখনও নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারে নি।

স্পষ্টতই সমস্ত জার্মানের উপযোগিতা, অভ্যাস এবং রুচি অনুসারে প্রস্তুত করা একটা সাধারণী ধর্ম উদ্ভাবন ক'রে অন্তত ধর্মীয় ভিত্তিতে উল্লিখিত সম্প্রদায়-দুটি জার্মান ঐক্যের যে-ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিল সেটা বাস্তবিকই ছিল বহুবিস্তৃত, বিশেষত ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে। নেপোলিয়ন জার্মান সাম্রাজ্যটাকে ভেঙে দেবার পর থেকে (২৬) জার্মান সংস্থার সমস্ত disjecta membra*-র সম্মিলনীর জন্যে হাঁকটা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষের সবচেয়ে ব্যাপক অভিব্যক্তি, সেটা সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে, যেখানে রাজসভা, প্রশাসনযন্ত্র আর ফৌজের ব্যয়বাহুল্য, সংক্ষেপে করের গুরুভার বেড়ে চলছিল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতা আর অক্ষমতার সমানুপাতে। কিন্তু কার্যে পরিণত হলে কী দাঁড়াবে এই জার্মান ঐক্য সে প্রশ্নে বিভিন্ন পক্ষের মতৈক্য ছিল না। বুর্জোয়ারা কোন গুরুতর বৈপ্লবিক ওলটপালট চায় নি, যেটাকে তারা 'সাধনসাধ্য' বিবেচনা করত বলে আমরা দেখেছি, অর্থাৎ প্রাশিয়ার নিয়মতান্ত্রিক শাসনের আধিপত্যে অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে সারা জার্মানির সম্মিলনী, তাতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। বিপজ্জনক ঝড়-ঝঞ্ঝা ডেকে না এনে তখন তার চেয়ে বেশি কিছু করা যেত না, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। পেটি বুর্জোয়ারা এবং এমনসব ব্যাপারে যতখানি মাথা ঘামাত তাতে কৃষককুল যে জার্মান ঐক্যের জন্যে এত উচ্চৈঃস্বরে সোরগোল করত তার কোন নির্দিষ্ট আকার তারা কখনও স্থির করে নি; অল্পকিছু কল্পনাবিলাসী মানুষ বিশেষ করে সামন্ততন্ত্রী প্রতিক্রিয়াপন্থী জার্মান সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের আশা রাখত; অল্পকিছু অজ্ঞ মানুষ, soi-disant** র‍্যাডিকালরা সুইস প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির ভক্ত ছিল, পরে যাতে তাদের মোহমুক্তি ঘটেছিল অতি হাস্যকরভাবে সেই কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তখনও তাদের হয় নি, তারা মতপ্রকাশ করেছিল ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। এক অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্যে তখন

* Disjecta membra: ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সদস্যরা। — সম্পাঃ

** Soi-disant: তথাকথিত। — সম্পাঃ

মতপ্রকাশের সাহস করেছিল কেবল সবচেয়ে চরমপন্থী পক্ষটা (২৭)। এইভাবে, আপনাতেই জার্মান ঐক্য সংক্রান্ত প্রশনটা ছিল অনৈক্য, বিরোধ এবং সম্ভাব্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি গৃহযুদ্ধের বিপদে ঠাসা।

তাহলে, সারসংক্ষেপ করলে, ১৮৪৭ সালের শেষে প্রাশিয়ার অবস্থা এবং জার্মানির ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল এই। বুর্জোয়ারা নিজ ক্ষমতা উপলব্ধি করত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যিক লেনদেন, শিল্পোৎপাদনশীলতা এবং শ্রেণী হিসেবে সাধারণী ক্রিয়াকলাপকে যে বেড়ি দিয়ে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র সেটাকে আর বেশি কাল বরদাস্ত না করতে তারা কৃতসংকল্প হয়েছিল; ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের একাংশ শুধু বাজার-চল পণ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল এতখানি যাতে তাদের স্বার্থ এবং কর্মব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের মতোই, তাই তারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; নানা কর এবং কাজকারবারের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের জন্য বিক্ষুব্ধ ছিল, অসন্তোষ প্রকাশ করছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাপারী শ্রেণী, কিন্তু সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার মাঝে যাতে তাদের অবস্থান নিরাপদ হয় এমন সংস্কারের কোন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাদের ছিল না; এখানে সামন্ততান্ত্রিক জবরদস্তি আদায়, সেখানে সুদখোর, মহাজন আর উকিলদের দ্বারা উৎপীড়িত কৃষকেরা; ব্যাপক অসন্তোষে সংক্রমিত শহরের মেহনতী জনগণ সমানই ঘৃণা করত সরকারকে এবং শিল্পক্ষেত্রের বড় বড় পুঁজিপতিদের, তারা সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট ভাব-ধারণায় সংক্রমিত হচ্ছিল। সংক্ষেপে, মোটামুটি বুর্জোয়াদের পরিচালিত বিভিন্ন স্বার্থাধীন একগাদা পাঁচমিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, আর সেই বুর্জোয়াদের প্রথম সারিতে এগোচ্ছিল প্রাশিয়ার এবং বিশেষত রাইন প্রদেশের বুর্জোয়ারা। অন্যদিকে ছিল বহু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সরকারগুলি, তারা পরস্পরকে এবং বিশেষত প্রাশিয়ার সরকারকে অবিশ্বাস করত, যদিও আশ্রয়ের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হত সেটার উপর। প্রাশিয়ায় জনমতের পরিত্যক্ত, এমনকি অভিজাতকুলেরও একাংশের পরিত্যক্ত এই সরকার নির্ভর করছিল ফৌজ আর আমলাতন্ত্রের উপর যা প্রতিদিনই আরও বেশি পরিমাণে প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াদের ভাব-ধারণায় সংক্রামিত হচ্ছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছিল — এই সরকার ঐ সবকিছুর উপর

ছিল কথাটার ষোল-আনা আক্ষরিক অর্থেই কপর্দকশূন্য, যে-সরকার বুর্জোয়াদের প্রতিপক্ষতার মর্জির কাছে নতিস্বীকার না করে বেড়ে-চলা ঘাটতি পূরণের জন্যে এক কপর্দকও যোগাড় করতে পারত না। ক্ষমতার জন্যে বিদ্যমান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময়ে কোন দেশের বুর্জোয়াদের এমন চমৎকার অবস্থান ছিল কি আর কখনও?

লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৪

অস্ট্রিয়া

এখন আমাদের বিচার-বিবেচনা করতে হবে অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে, এই যে দেশটি ১৮৪৮ সালের মার্চ মাস অবধি বৈদেশিক জাতিগুলির দৃষ্টির আড়ালে ছিল, প্রায় যেমনটা চীন ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে কিছুকাল আগেকার যুদ্ধ পর্যন্ত(২৮)।

স্বভাবতই, এখানে আমরা বিচার-বিবেচনা করতে পারি শুধু জার্মান অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে। পোলীয়, হাঙ্গেরীয় কিংবা ইতালীয় অস্ট্রীয়রা আমাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ছে না, তবে ১৮৪৮ সাল থেকে যে পরিমাণে তারা জার্মান অস্ট্রীয়দের নিয়তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে তাদের ব্যাপার বিবেচনায় রাখতে হবে অতঃপর।

প্রিন্স মেটারনিখের সরকার নির্ভর করত দুটো নীতির উপর: প্রথমত, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন জাতিগুলির প্রত্যেকটাকে অনুরূপ অবস্থার অন্যান্য সমস্ত জাতিকে দিয়ে সংযত রাখা; দ্বিতীয়ত, সমর্থনের জন্যে সামন্ত জমিদার এবং বড় বড় ফটকা কারবারি শ্রেণী-দুটোর উপর নির্ভর করা, যা বরাবরই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রগুলির বুনিয়াদী নীতি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের ক্ষমতা আর প্রভাব দিয়ে এই শ্রেণী-দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে সরকারের কাজকর্ম চালাতে পারে একেবারে অবাধে। ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতদের গোটা আয়টা হত হরেক রকমের সামন্ততান্ত্রিক রাজস্ব থেকে,

যে পদদলিত ভূমিদাস শ্রেণীর কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের জীবনযাত্রা চলত সেটার বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ সরকারটাকে তারা সমর্থন না করে পারত না। তাদের মধ্যে একটু কম ধনী অংশটা যখনই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত, যেমন হয়েছিল ১৮৪৬ সালে গ্যালিসিয়ায়, অমনি মেটারনিখ তাদের উপর লেলিয়ে দিতেন সেই ভূমিদাসদেরই, যারা নিজেদের অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ উৎপীড়কদের উপর অন্তত ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে লাভবান হত (২৯)। অন্যদিকে, দেশের সরকারী তহবিলে এক্সচেঞ্জের বড় পুঁজিপতিদের বিপুল হিসসাটা দিয়ে তারা বাঁধা ছিল মেটারনিখ সরকারের কাছে। অস্ট্রিয়া পূর্ণ ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৫ সালে, তারপরে ১৮২০ সাল থেকে ইতালিতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন ক'রে এবং বজায় রেখে অস্ট্রিয়া ১৮১০ সালে দেউলিয়া হয়ে যাবার সময়কার দায়-দেনা অংশত মিটিয়ে ফেলেছিল, আর শান্তি চুক্তির পরে ইউরোপের মস্ত টাকার বাজারে আর্থ সুনাম পুনঃস্থাপন করেছিল অচিরেই, আর এই আর্থ সুনাম বাড়ার সমানুপাতে সেটার সুযোগ নিচ্ছিল। এইভাবে ইউরোপের সমস্ত বড় বড় টাকার কারবারি তাদের পুঁজির একটা মোটা অংশ লগ্নি করেছিল অস্ট্রীয় তহবিলে। তারা সবাই দেশটির আর্থ সুনাম প্রতিপোষণ করতে আগ্রহান্বিত ছিল, আর প্রতিপোষিত হতে হলে অস্ট্রিয়ার সরকারী তহবিলে সবসময়ে নতুন নতুন ঋণের প্রয়োজন ছিল, তাই আগেই যা দিয়েছিল সেগুলোর সিকিউরিটির ক্রেডিট বজায় রাখার জন্যে তারা মাঝে মাঝে নতুন পুঁজি ধার দিতে বাধ্য হত। ১৮১৫ সালের পরে শান্তি ছিল দীর্ঘস্থায়ী; অস্ট্রিয়ার মতো হাজার বছরের প্রাচীন সাম্রাজ্য উলটে পড়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই ছিল, তার ফলে মেটারনিখ সরকারের ক্রেডিট বেড়ে গিয়েছিল আশ্চর্য পরিমাণে, তাতে এমনকি ভিয়েনার ব্যাঙ্কার আর ফটকা কারবারিদের থেকেও অনপেক্ষ হয়ে গিয়েছিল এই সরকার, কেননা মেটারনিখ যেহেতু ফ্রাঙ্কফুর্টে আর আমস্টার্ডামে প্রচুর টাকা পেতে পারতেন, তাই অস্ট্রীয় পুঁজিপতিদের নিজের পদানত পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই খুশি ছিলেন। তাছাড়া, অন্যান্য সমস্ত দিক থেকেও তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্তে। ব্যাঙ্কার, ফটকা কারবারি আর সরকারী কন্ট্রাক্টররা ফন্দি ক'রে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কাছ থেকে সবসময়ে যে মোটা মোটা মুনাফা তুলত

সেটা পুষিয়ে যেত তাদের জান-মালের উপর সরকারের হস্তগত প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দিয়ে। কাজেই এই মহল থেকে বিরোধিতার লেশমাত্রও আসতে পারে বলে মনে হত না। এইভাবে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আর প্রভাবশালী শ্রেণী-দুটোর সমর্থন সম্বন্ধে মেটারনিখ নিশ্চিত ছিলেন, তাছাড়া তাঁর ছিল ফৌজ আর আমলাতন্ত্র, যার গঠন স্বৈরতন্ত্রের প্রয়োজনাদি অনুসারে আর উৎকৃষ্ট হতে পারত না। অস্ট্রীয় কৃত্যকে বেসামরিক আর সামরিক অফিসারদের নিয়ে রয়েছে তাদের একটা নিজস্ব জাত; তাদের বাপেরা 'কাইজারে'র খিদমত করেছিল, তাদের ছেলেরাও তাই করবে। দুই-মাথাওয়ালা ঈগলের পাখার তলে সমবেত বহুবিধ জাতিসত্তাগুলির কোনটার মানুষ তারা নয়। সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পোল্যান্ড থেকে ইতালিতে, জার্মান প্রদেশগুলি থেকে ট্রান্সিলভানিয়াতে তারা স্থানান্তরিত হয় এবং বরাবর তাই হয়ে আসছে; হাঙ্গেরীয়, পোল্, জার্মান, রুমানীয়, ইতালীয়, ক্রোট্, যেকোন ব্যক্তির 'সাম্রাজ্যিক এবং রাজকীয়' কর্তৃত্বের ছাপ নেই, যার আছে কোন পৃথক জাতিগত চরিত্র, তাকে তারা সমানিহ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের কোন জাতিসত্তা নেই, কিংবা আসল অস্ট্রীয় জাতিটা কেবল তাদেরই নিয়ে। কোন বুদ্ধিমান এবং উদ্যমশীল সর্দারের হাতে এমন বেসামরিক এবং সামরিক তন্ত্রটা কতখানি সহজে-ব্যবহার্য এবং শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান।

জনসমষ্টির অন্যান্য শ্রেণীর বেলায় -- ancien régime*-এর রাষ্ট্রনায়কোচিত মেজাজের মেটারনিখের বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না তাদের সমর্থন। তাদের প্রসঙ্গে তাঁর কর্মনীতি ছিল শুধু একটাই: তাদের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় করে নাও কর হিসেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাখো নিরুপদ্রব করে। অস্ট্রিয়ায় ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারিং বুর্জোয়াদের বৃদ্ধি মন্থরই ছিল। দানিউব নদীতে বাণিজ্য ছিল অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন; দেশটির বন্দর ছিল মাত্র একটা — ত্রিয়েস্ত, এই বন্দরের বাণিজ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ম্যানুফ্যাকচাররা বিস্তর সংরক্ষণ পেত, সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে রহিত করার শামিল। কিন্তু এই

* — ancien régime — পুরন ব্যবস্থা। — সম্পাঃ

সুযোগ দেওয়া হয়েছিল প্রধানত তাদের করদান ক্ষমতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে, আর সেটাকে উলটো দিক থেকে সমভার করা হত ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্যের উপর অভ্যন্তরীণ বাধা-নিষেধ দিয়ে, গিল্ড এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক কর্পোরেশনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে. এগুলিকে সযত্নে প্রতিপোষণ করা হত যতক্ষণ তারা সরকারের উদ্দেশ্য আর অভিমত ব্যাহত না করত। খুদে ব্যাপারীদের আটকে রাখা হত এইসব মধ্যযুগীয় গিল্ডের সংকীর্ণ চৌহদ্দির ভিতরে, গিল্ডগুলো বিভিন্ন বৃত্তিকে সুবিধালাভের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখত, এবং মেহনতী শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষদের সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণতই রহিত ক'রে ঐসব অনৈচ্ছিক সমিতির সদস্যদের জন্যে পুরুষানুক্রমিক সুস্থিতি গোছের কিছু যুগিয়ে দিত। শেষে, কৃষক আর মজুরকে দেখা হত নিছক করযোগ্য বস্তু হিসেবে, তাদের ব্যাপারে যেটুকুমাত্র যত্ন নেওয়া হত সেটা ছিল জীবনযাত্রার যে অবস্থায় তখন তারা ছিল এবং যে অবস্থায় তাদের আগে ছিল তাদের বাপেরা, যথাসম্ভব সেই একই অবস্থায় তাদের বজায় রাখার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা পুরন প্রতিষ্ঠিত পুরুষানুক্রমিক কর্তৃত্ব প্রতিপোষণ করা হত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিপোষণেরই ধরনে। খুদে প্রজা-খামারীর উপর জমিদারের, কারখানার মিস্ত্রির উপর ম্যানুফ্যাকচারারের, জার্নিম্যান আর শিক্ষানবিসের উপর খুদে কর্তার, ছেলের উপর বাপের কর্তৃত্ব সর্বত্র কঠোরভাবে বজায় রাখত সরকার, যেকোন রকমের অমান্যতার ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনেরই মতো শাস্তি দেওয়া হত — অস্ট্রীয় ন্যায়বিচারের সর্বজনীন হাতিয়ার লাঠি দিয়ে।

শেষে, কৃত্রিম সুস্থিতি সৃষ্টির এই সমস্ত চেষ্টাকে একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থা হিসেবে গুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতির জন্যে অনুমত মানসিক খোরাক বেছে নেওয়া হত অতি যথাযথ সতর্কতা সহকারে, আর সেটা বিতরণ করা হত যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণে। শিক্ষা সর্বত্রই ছিল ক্যাথলিক যাজকবর্গের হাতে, তাদের সর্দাররা বড় বড় সামন্ত জমিদারদের মতো একই ধরনে বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখায় গভীরভাবে আগ্রহান্বিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা হত যাতে সেগুলি পয়দা করতে পারত শুধু বিশেষ ধরনের মানুষ, তারা জ্ঞানের এটা-ওটা বিশেষ

শাখায় মস্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারত কিংবা নাও-বা পারত, কিন্তু যেকোন ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে ব্যাপক সংস্কারমুক্ত উদার শিক্ষা প্রত্যাশিত সেটা তার থেকে বাদ ছিল। হাঙ্গেরিতে ছাড়া কোথাও কোন সংবাদপত্র প্রকাশনা ছিল না, আর রাজত্বের অন্যান্য সমস্ত জায়গায় হাঙ্গেরীয় কাগজগুলি নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ সাহিত্যের বেলায় -- এটার পরিধি এই শতাব্দীর মধ্যে বাড়ে নি; ২য় জোসেফের মৃত্যুর পরে পরিধিটাকে আবার সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছিল। সীমান্তের যেখানেই অস্ট্রীয় রাজ্য কোন সভ্য দেশের সন্নিহিত তার সর্বত্র কাস্টম-হাউস কর্মকর্তাদের কর্ডনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে সাহিত্য-সংক্রান্ত সেন্সরদের কর্ডন স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে কোন বৈদেশিক পুস্তক কিংবা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু সমকালের হানিকর মানসের সামান্যতম সংক্রমণ থেকেও মুক্ত বিশুদ্ধ কিনা তা দু'বার কিংবা তিন বার সম্যক্ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করার আগে অস্ট্রিয়ায় ঢুকতে না পারে।

১৮১৫ সালের পরে প্রায় তিরিশ বছর ধরে এই ব্যবস্থাটা অনুসারে কাজে আশ্চর্য সাফল্য ঘটেছিল। অস্ট্রিয়া প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল ইউরোপের কাছে, আর ইউরোপও প্রায় সমানই স্বল্পপরিচিত ছিল অস্ট্রিয়ায়। মনে হত, জনসমষ্টির প্রত্যেকটা শ্রেণীর এবং সমগ্র জনসমষ্টির সামাজিক অবস্থায় যেন সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটে নি। শ্রেণীগুলির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ যা-ই থাকুক -- এই বিদ্বেষের অস্তিত্ব মেটারনিখের পক্ষে ছিল শাসন চালাবার জন্যে আবশ্যক একটা প্রধান অবস্থা, আর উচ্চতর শ্রেণীগুলিকে নিজের সমস্ত জবরদস্তির আদায়ের হাতিয়ার করে তিনি এই বিদ্বেষটাকে এমনকি বাড়িয়েই তুলতেন এবং এইভাবে দোষভাগী করতেন তাদেরই; আর রাজ্যের অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি জনসাধারণের যতই ঘৃণা থাকুক, কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ছিল মোটের উপর সামান্যই কিংবা একটুও না। সম্রাট ছিলেন ভক্তিভাজন, -- এই ব্যবস্থাটার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে বৃদ্ধ প্রথম ফ্রান্‌জ যে কথাটা বলেছিলেন সেটা যেন সত্যই প্রতিপন্ন হচ্ছিল, তিনি বলেছিলেন; 'তবু এটা টিকে থাকবে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আর মেটারনিখ।'

কিন্তু চলছিল একটা মন্থর প্রচ্ছন্ন আন্দোলন, সেটা মেটারনিখের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। ম্যানুফ্যাকচার ক্ষেত্রের এবং ব্যাপারী

বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বেড়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারে যন্ত্রপাতি আর স্টীমের শক্তি চালু হবার ফলে অন্যান্য সমস্ত জায়গার মতো অস্ট্রিয়ায়ও সমাজের গোটা গোটা শ্রেণীর পুরন সম্পর্ক এবং জীবনের পরিবেশ উলটেপালটে গিয়েছিল; এর ফলে ভূমিদাসেরা হয়ে উঠেছিল স্বাধীন মানুষ, আর ছোট খামারীরা হয়েছিল ম্যানুফ্যাকচারের মিস্ত্রি; পুরন সামন্ততান্ত্রিক বৃত্তিগত কর্পোরেশনগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছিল, তার অনেকগুলোর জীবনোপায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার ক্ষেত্রের নতুন জনসমষ্টির সর্বত্র সংঘাত ঘটছিল পুরন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে। কাজকারবার উপলক্ষে বুর্জোয়া মানুষকে ক্রমেই বেশি ঘন ঘন বিদেশে যেতে হচ্ছিল, তারা সাম্রাজ্যিক কাস্টমস সীমান্তপারের সভ্য দেশগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবাস্তব তথ্যাদি চালু করেছিল; রেলপথ চালু হবার ফলে অবশেষে শিল্পক্ষেত্রের এবং মনোজাগতিক উভয় আন্দোলন ত্বরিত হয়েছিল। অস্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেও ছিল একটা বিপজ্জনক অংশ, সেটা হল হাঙ্গেরীয় সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান এবং সেটার পার্লামেণ্টারি কার্যধারা, আর সরকার আর তার মিত্র ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে অভিজাতকুলের গরিব হয়ে পড়া প্রতিপক্ষ জনরাশির সংগ্রাম। ডায়েটের অবস্থানস্থল প্রেস্‌বুর্গ* ছিল ভিয়েনার একেবারে দ্বারদেশে। এইসব উপাদান মিলে শহরের বুর্জোয়াদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল একটি মনোভাব, যেটা ঠিক বিরোধিতার মনোভাব নয়, কেননা বিরোধিতা তখনও ছিল অসম্ভব, কিন্তু অসন্তোষের মনোভাব আর বিভিন্ন সংস্কারের জন্যে ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা, সেসব সংস্কারের প্রকৃতি ছিল ততটা নয় সাংবিধানিক, যতটা কিনা প্রশাসনিক। প্রাশিয়ার মতো এখানেও একই ধরনে আমলাতন্ত্রের একাংশ শামিল হয়েছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে। এই পুরুষানুক্রমিক আমলাকুলের মধ্যে ২য় জোসেফের রেওয়াজ বিস্মৃত হয় নি। সরকারের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কর্মকর্তারা নিজেরাই কখনও কখনও বিভিন্ন সম্ভাব্য কাল্পনিক সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাত, তারা মেটারনিখের 'পিতৃবৎ' স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে সেই সম্রাটের উন্নতিশীল এবং মানস স্বৈরতন্ত্র বেশি পছন্দ করত। কিছুটা গরিব অভিজাতদের একাংশও তেমনি

---

* স্লাভ নাম: ব্রাতিস্লাভা। — সম্পাঃ

বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, আর জনসমষ্টির নিম্নতর শ্রেণীগুলির সবসময়েই বিস্তর অভিযোগ ছিল সরকারের বিরুদ্ধে না হলেও তাদের উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে, এই শ্রেণীগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বুর্জোয়াদের সংস্কারমূলক আকাঙ্ক্ষা সমর্থন না করে পারে নি।

এই পরিবর্তনের পক্ষে উপযোগী একটা বিশেষ সাহিত্য-শাখা জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় এই সময়েই, ধরা যাক ১৮৪৩ কিংবা ১৮৪৪ সালে। অল্পকিছু অস্ট্রীয় লেখক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক, আনাড়ী কবি, যাদের সবারই মেধা ছিল খুবই মামুলি ধরনের, কিন্তু যাদের ছিল ইহুদিসুলভ বিশেষ রকমের অধ্যবসায়, তারা লাইপজিগে এবং অস্ট্রিয়ার বাইরে অন্যান্য জার্মান শহরে কায়েমী হয়ে বসে মেটারনিখের নাগালের বাইরে থেকে অস্ট্রিয়ার ব্যাপার নিয়ে কয়েকখানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। তারা এবং তাদের প্রকাশকেরা 'ফলাও কারবার' চালিয়েছিল সেটা নিয়ে। ইউরোপীয় চীনের কর্মনীতির গোপনকথাটা অবগত হবার জন্যে উদগ্রীব ছিল সারা জার্মানি; বোহেমিয়ার* সীমান্ত দিয়ে পাইকারী গোপন চালান হয়ে পাওয়া এইসব বইপত্র সম্বন্ধে আরও বেশি কৌতূহলী ছিল অস্ট্রিয়ানরা নিজেরাই। এইসব বইপত্রে ফাঁস করা গোপনকথাগুলোর অবশ্য কোন বিরাট গুরুত্ব ছিল না; সেগুলোর শুভাকাঙ্ক্ষী রচয়িতারা যেসব সংস্কারের পরিকল্পনা তুলে ধরত সেগুলোতে যে নিরীহতার ছাপ থাকত সেটা রাজনীতিগত কুমারীত্বেরই শামিল। অস্ট্রিয়ায় কোন সংবিধান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হাসিল করার অসাধ্য বলে বিবেচিত হত। বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার, প্রাদেশিক ডায়েটগুলির অধিকতর অধিকার, বৈদেশিক বই আর সংবাদপত্র আসতে দেওয়া, সেন্সরশিপের কঠোরতাহ্রাস — এইসব ছাড়িয়ে বড় একটা এগোত না ঐসব সুশীল অস্ট্রিয়ানের রাজভক্ত এবং নম্র আকাঙ্ক্ষা।

যা-ই হোক, বাদবাকি জার্মানির সঙ্গে এবং জার্মানির ভিতর দিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সাহিত্যগত সংসর্গ রোধ করা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, সেটা সরকারবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে খুবই সহায়ক

* চেক্। — সম্পাঃ

হয়েছিল, আর অন্তত সামান্য পরিমাণে রাজনীতিক তথ্যাদি এনে দিয়েছিল অস্ট্রিয়ার জনসমষ্টির একাংশের নাগালের মধ্যে। এইভাবে, তখন সারা জার্মানিতে প্রবল ছিল যে রাজনীতিক এবং রাজনীতিক-ধর্মীয় আলোড়ন, সেটা ১৮৪৭ সালের শেষাশেষি আঁকড়ে ধরেছিল অস্ট্রিয়াকেও, যদিও কম মাত্রায়। অস্ট্রিয়ায় এই আলোড়নের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ হলেও সেখানে যাদের উপর সেটা খাটান যেত এমন বৈপ্লবিক উপাদান ছিল যথেষ্টই। ছিল কৃষক, ভূমিদাস কিংবা সামন্ততান্ত্রিক প্রজা, — মনিবদের কিংবা সরকারী জবরদস্তির আদায় তাদের গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল; ছিল কারখানার মিস্ত্রিরা — ম্যানুফ্যাকচারারদের মর্জিমাফিক যেকোন শর্তে কাজ করতে তাদের বাধ্য করত পুলিসের লাঠি; আরও ছিল জার্নিম্যানরা, — গিল্ডগুলোর আইনকানুন তাদের নিজেদের বৃত্তিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছিল; তারপর সওদাগরেরা — কাজকারবারের প্রতিপদে তারা অদ্ভুত-অসম্ভব নিয়মকানুনে হোঁচট খেত; ছিল ম্যানুফ্যাকচারাররা — তাদের সবসময়ে খটাখটি লাগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার জন্যে সতর্ক-যত্নশীল বৃত্তিগত গিল্ডগুলো কিংবা লোভী এবং হস্তক্ষেপকারী আমলাদের সঙ্গে; আর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, বিদ্বান মানুষেরা, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কর্মকর্তারা, যারা বৃথাই লড়ত অজ্ঞ এবং দাম্ভিক যাজকবর্গের বিরুদ্ধে, কিংবা গণ্ডমূর্খ হুকুমদার উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে। সংক্ষেপে, একটাও শ্রেণী সন্তুষ্ট ছিল না, কেননা কখনও-কখনও সরকার যেসব ছোটখাটো সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হত সেগুলো নিজের ক্ষতি করে নয়, কেননা সেটা রাজকোষের সামর্থ্যে কুলোত না, তা দিত ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল আর যাজকমণ্ডলীর ক্ষতি করে। তাই মস্ত মস্ত ব্যাঙ্কার আর অর্থপতিদের বেলায় — ইতালির সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাবলি, হাঙ্গেরীয় ডায়েটের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা, আর সাম্রাজ্যের সর্বত্র অভিব্যক্ত অসন্তোষের অনভ্যস্ত মেজাজ এবং সংস্কারের জন্যে হাঁক-ডাকের প্রকৃতিটা এমন ছিল না যাতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা এবং শোধক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের আস্থা মজবুত হতে পারে।

এইভাবে অস্ট্রিয়াও এগিয়ে চলছিল একটা বিরাট পরিবর্তনের দিকে — ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, এমন সময়ে ফ্রান্সে একটা ঘটনা ফেটে পড়ল,

যাতে আসন্ন ঝঞ্ঝাটা এসে পড়ল তৎক্ষণাৎ, বুড়ো ফ্রান্‌জ যে বলেছিলেন তাঁর আর মেটারনিখের জীবৎকালে ইমারতটা টিকে থাকবে, সেটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৫

ভিয়েনার অভ্যুত্থান

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি লুই ফিলিপ প্যারিস থেকে বিতাড়িত হন, ঘোষিত হয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র। তারপরে ১৩ মার্চ ভিয়েনার মানুষ প্রিন্স মেটারনিখের ক্ষমতা চূর্ণ করে, তিনি কলঙ্কিত হয়ে দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ১৮ মার্চ অস্ত্র-হাতে দাঁড়িয়ে যায় বার্লিনের মানুষ, আঠার ঘণ্টার দুর্দমনীয় লড়াইয়ের পরে রাজা তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলে তারা পরিতোষ লাভ করে। জার্মানির বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের রাজধানীগুলিতে কমবেশি প্রচণ্ড ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে যুগপৎ, সবগুলি সমানই সাফল্যমণ্ডিত হয়। জার্মান জনগণ প্রথম বিপ্লব নিষ্পন্ন না করলেও তারা অন্তত মোটামুটি প্রবৃত্ত হল বৈপ্লবিক কর্মজীবনে। .

এইসব অভ্যুত্থানের ঘটনাবলি নিয়ে বিশদ আলোচনা আমরা এখানে করতে পারছি না; আমাদের যা ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা হল সেগুলোর প্রকৃতি এবং সেগুলো সম্বন্ধে জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর মতাবস্থান।

বলা যেতে পারে ভিয়েনার বিপ্লব করেছিল প্রায় সর্বসম্মত জনসমষ্টি। ব্যাঙ্কার আর ফটকা কারবারিরা বাদে বুর্জোয়া, খুদে ব্যাপারী শ্রেণী, মেহনতীজন, প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সবার অতি ঘৃণ্য সরকারের বিরুদ্ধে, সে সরকার সর্বজনের বিরাগভাজন ছিল এতই যাতে সেটার সমর্থক সংখ্যাল্প অভিজাত আর অর্থপতিরা প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীকে মেটারনিখ এতখানি রাজনীতিক অজ্ঞতার মাঝে রেখেছিলেন যাতে প্যারিস থেকে অরাজকতা, সমাজতন্ত্র আর

সন্ত্রাসের রাজ সম্বন্ধে এবং পংজিপতি শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে সংবাদাদি তাদের কাছে একেবারেই অবোধ্য হয়ে পড়ল। এই রাজনীতিক হাবাগবারা হয় এইসব খবরের কোন অর্থ করতে পারল না, নইলে মনে করল, ওগুলো হল তাদের ভয় খাইয়ে আজ্ঞানুবর্তী করার জন্যে মেটারনিখের শয়তানী উদ্ভাবন। তাছাড়া, মেহনতীজনকে শ্রেণী হিসেবে সক্রিয় হতে, কিংবা নিজেদের স্পষ্ট-পৃথক শ্রেণী-স্বার্থের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে তারা দেখে নি কখনও। সর্বজনঘৃণ্য সরকারটাকে উলটে দেবার জন্যে তখন অমন সাগ্রহে সম্মিলিত শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দেবার সম্ভাবনা সংক্রান্ত কোন ধারণা তাদের ছিল না অতীত অভিজ্ঞতা থেকে। তারা দেখেছিল সংবিধান, জুরির বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মেহনতী জনগণ ছিল তাদের সঙ্গে একমত। এইভাবে, অন্তত ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে বুর্জোয়ারা আন্দোলনের সঙ্গে ছিল সর্বান্তঃকরণে, আর অন্যদিকে, আন্দোলনটা গোড়া থেকে তাদের করে দিয়েছিল (অন্তত তত্ত্বগতভাবে) রাজ্যের প্রাধান্যশালী শ্রেণী।

বিভিন্ন শ্রেণীর এই সম্মিলনী সবসময়েই যেকোন বিপ্লবের একটা কোন মাত্রায় আবশ্যিক শর্ত, কিন্তু এই সম্মিলনী দীর্ঘকাল টিকতে পারে না, এটা সমস্ত বিপ্লবেরই নিয়তি। সবার একই শত্রুর বিরুদ্ধে যেইমাত্র জয়লাভ হয় অমনি বিজেতারা বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে। শ্রেণীবিরোধের এই দ্রুত এবং আবেগোচ্ছল বিকাশই পুরন এবং জটিল সামাজিক গঠনে বিপ্লবকে সামাজিক আর রাজনীতিক প্রগতির এমন প্রবল ক্রিয়াকর্তা করে তোলে; ঐসব প্রচন্ড আলোড়নের সময়ে একটার পরে একটা নতুন তরফের গড়ে ওঠা এবং দ্রুত বিকাশ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এই অবিরাম প্রক্রিয়াটাই কোন জাতি সাধারণ পরিস্থিতিতে এক শতাব্দীতে যা করত তার চেয়ে বেশি পথ পার করিয়ে দেয় পাঁচ বছরে।

ভিয়েনার বিপ্লব বুর্জোয়াদের প্রাধান্যশালী শ্রেণী করে দিল তত্ত্বগতভাবে; অর্থাৎ কিনা, সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সুযোগসুবিধাগুলো এমন ছিল যা কার্যে পরিণত করলে এবং কিছুকাল টিকিয়ে রাখা হলে বুর্জোয়াদের আধিপত্য হাসিল হত, সেটা অবশম্ভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঐ শ্রেণীর

আধিপত্য কায়েম হবার ধারেকাছেও পৌঁছল না। জাতীয় রক্ষিবাহিনী গড়া হল, তার ফলে অস্ত্র পেল বুর্জোয়ারা আর খুদে ব্যাপারীরা, তাতে ঐ শ্রেণীটা লাভ করল শক্তি আর গুরুত্ব দুইই, তা ঠিক; স্থাপিত হল বৈপ্লবিক, দায়িত্বশূন্য সরকার গোছের 'নিরাপত্তা কমিটি', তাতে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য, তারা এসে গেল ক্ষমতার শীর্ষে, তা ঠিক। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মেহনতীরাও অংশত অস্ত্রসজ্জিত হল; লড়াই যতখানি হয়েছিল তাতে লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা সামলেছিল তারা আর ছাত্ররা; অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চেয়ে ঢের ভালভাবে সুশৃংখল প্রায় ৪০০০ ছাত্র হল বৈপ্লবিক বাহিনীর কেন্দ্রী উপাদান, আসল শক্তি, তখন তারা 'নিরাপত্তা কমিটির' হাতে নিছক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে রাজী ছিল না একদম। তারা 'নিরাপত্তা কমিটিকে' মানত, এমনকি তারা ছিল সেটার সবচেয়ে সোৎসাহ সমর্থক, তবু তারা ছিল স্বতন্ত্র গোছের এবং কিছুটা দুর্দান্ত সংস্থা, নিজেরা আলোচনাদি করত 'সভা-গৃহে', তারা থাকত বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের মাঝামাঝি অবস্থানে, অবিরাম আলোড়ন চালিয়ে সবকিছুকে আগেকার দৈনন্দিন নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় থিতিয়ে যেতে দিত না, আর প্রায়ই নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত 'নিরাপত্তা কমিটির' উপর। পক্ষান্তরে, মেহনতীজন প্রায় সবাই ছিল কাজছাড়া, রাষ্ট্রের খরচে তাদের পূর্তকার্যে কাজ দেওয়া আবশ্যক ছিল, সেজন্যে টাকা নিতে হত অবশ্য করদাতার পকেট থেকে কিংবা ভিয়েনার পৌর তহবিল থেকে। এই সবকিছু ভিয়েনার ব্যবসায়ীদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর না হয়ে পারে নি। বৃহৎ দেশের ধনী আর অভিজাত সভাসদদের ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই ছিল নগরীর ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্য, সেগুলো স্বভাবতই বিপ্লবের ফলে এবং অভিজাত আর সভাসদদের পলায়নের দরুন একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; অচল হয়ে পড়েছিল বাণিজ্য। যাকে বলে 'আস্থা পুনঃস্থাপন' সেটার একটা উপায় ছিল না নিশ্চয়ই ছাত্র আর মেহনতী জনগণের চাঙ্গা করে রাখা আলোড়ন আর উত্তেজনা। এইভাবে, অল্প দিনের মধ্যে একদিকে বুর্জোয়া এবং অন্যদিকে দুর্দান্ত ছাত্র আর মেহনতীজনের মধ্যে সম্পর্কে ঔদাসীন্যের ভাব দেখা দিয়েছিল; এই ঔদাসীন্য দীর্ঘকালের মধ্যে পরিপক্ক হয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হয় নি, তার

কারণ পুরন হালচাল ফিরিয়ে আনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে মন্ত্রিসভা এবং বিশেষত রাজসভাসদেরা অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক তরফগুলির সন্দেহ আর দুর্দান্ত ক্রিয়াকলাপ ন্যায্য বলে সমর্থন করছিল এবং এমনকি বুর্জোয়াদের চোখের সামনেই পুরন মেটারনিখী স্বৈরাচারের ভূতটাকে সর্বক্ষণ তুলে ধরছিল। এইভাবে কোন কোন নবার্জিত স্বাধীনতার উপর আক্রমণ কিংবা সেগুলিকে নষ্ট করার জন্যে সরকারের চেষ্টার দরুন ১৫ মে এবং আবার ২৬ মে ভিয়েনায় সমস্ত শ্রেণীর নতুন নতুন অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তার প্রত্যেক বারই জাতীয় রক্ষিবাহিনী বা সশস্ত্র বুর্জোয়া, ছাত্র এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে মৈত্রীজোট আবার কিছুকালের জন্যে

হয়েছিল।

জনসমষ্টির অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অভিজাত আর অর্থপতিরা অ
হয়েছিল, আর কৃষকেরা সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের একেবারে শেষ নিদর্শ
অবধি অপসারিত করতে ব্যাপৃত ছিল। ইতালির যুদ্ধের দরুন
এবং ভিয়েনা আর হাঙ্গেরি দরবারকে যেভাবে ব্যাপৃত রেখেছিল তার
কৃষকেরা চলতে পেরেছিল একেবারেই অবাধে এবং মুক্তির কর্মে
লাভ করেছিল জার্মানিতে অন্য যেকোন জায়গার চেয়ে বেশি অ
খুব অল্পকাল পরেই অস্ট্রিয়ার ডায়েটকে শুধু আগেই কৃষকদের কা
অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলিকে অনুমোদন করতে হয়েছিল; প্রিন্স শ্‌ভার্সেন
সরকার আর যা-ই পুনরুদ্ধার করতে পারুক না কেন, কৃষকের সামন্ত
গোলামি পুনঃস্থাপন করার সাধ্য হবে না কখনও। অস্ট্রিয়া যে
মুহূর্তে আবার অপেক্ষাকৃত শান্ত, এমনকি শক্তিশালী, তার প্রধান
হল এই যে, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ কৃষকেরা বিপ্লবে
লাভবান হয়েছে আর পুনঃস্থাপিত সরকার আর যাকিছুর উপর
চালাক না কেন, কৃষককুলের জিতে নেওয়া এইসব প্রতীয়মান,
সুযোগসুবিধার উপর এখন অবধি হাত পড়ে নি।

লণ্ডন, অক্টোবর, ১৮৫১

৬

বার্লিনের অভ্যুত্থান

বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল বার্লিন। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে যা বলা হয়েছে তার থেকে ধারণা করা যেতে পারে, ভিয়েনায় এতে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর যে সর্বসম্মত সমর্থন ছিল তার কাছাকাছিও ছিল না বার্লিনের কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন। প্রাশিয়ায় বুর্জোয়ারা ইতোমধ্যেই সরকারের সঙ্গে যথার্থ সংগ্রামে জড়িত ছিল। 'সম্মিলিত ডায়েট'-এর অধিবেশনের ফল হয়েছিল তাদের মধ্যে একটা কাটান-ছিঁড়েন। আসন্ন হয়ে উঠেছিল একটা বুর্জোয়া বিপ্লব, সেটা প্রথম বিস্ফোরণে ভিয়েনার মতোই সর্ববাদীসম্মত হতে পারত যদি না ঘটত ফেব্রুয়ারি মাসের প্যারিস বিপ্লব। সেই ঘটনা সবকিছুকে ত্বরান্বিত করেছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাশিয়ার বুর্জোয়ারা যে পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হচ্ছিল সেটা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ঐ বিপ্লবের পতাকা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফ্রান্সে একেবারে ঠিক সেই ধরনের সরকার উৎখাত করেছিল যেমনটা প্রুশীয় বুর্জোয়ারা স্থাপন করতে যাচ্ছিল তাদের নিজেদের দেশে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘোষণা করেছিল সেটা ছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব; সেই বিপ্লব ঘোষণা করেছিল বুর্জোয়া সরকারের পতন এবং মেহনতীজনের মুক্তি। ওদিকে নিজেদের দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আলোড়ন ইতোমধ্যে ঢেরই হয়ে গিয়েছিল প্রুশীয় বুর্জোয়াদের বেলায়। সাইলেসিয়ার দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রথম বিভীষিকা কেটে যাবার পরে তারা এই আলোড়নটাকে নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা অবধি করেছিল। কিন্তু সেটাতে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের হিতকর আতঙ্ক বজায় ছিল সবসময়েই; তাই প্যারিস সরকারের নেতাদের তারা যখন দেখল, যাঁরা তাদের বিবেচনায় ছিলেন মালিকানা, শৃঙ্খলা, ধর্ম, পরিবার এবং আধুনিক বুর্জোয়াদের অন্যান্য কুলদেবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু, তৎক্ষণাৎ তাদের নিজেদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ল। তারা বুঝল সন্ধিক্ষণটাকে চটপট কাজে লাগান দরকার এবং মেহনতী জনগণের আনুকূল্য

ছাড়া তারা পরাস্ত হবে, অথচ তাদের সাহসে কুলোল না। কাজেই প্রথম-প্রথম আংশিক এবং প্রাদেশিক বিস্ফোরণগুলিতে তারা সরকারের পক্ষাবলম্বন করল, বার্লিনে জনগণকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল, পাঁচ দিন ধরে জনগণ রাজ প্রাসাদের সামনে ভিড় করে খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করছিল এবং সরকারের পরিবর্তন দাবি করছিল। আর মেটারনিখের পতনের সংবাদের পরে রাজা* অবশেষে সামান্যকিছু অনুগ্রহ দান করলে বুর্জোয়াদের বিবেচনায় বিপ্লব সমাধা হল, রাজা তাঁর প্রজাদের সমস্ত সাধ মিটিয়েছেন বলে বুর্জোয়ারা হিজ ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ জানাতে গেল। কিন্তু তারপরে এল জনতার উপর সৈন্যদের হামলা, ব্যারিকেড নির্মাণ, সংগ্রাম আর রাজবংশের পরাজয়। তখন সবকিছু বদলে গেল; যাদের পিছনে ফেলে রাখার ঝোঁক ছিল বুর্জোয়াদের সেই মেহনতী শ্রেণীকে সামনে এনে ফেলা হয়েছিল। শ্রমিকরা লড়ে জিতল এবং সহসা সচেতন হয়ে উঠল নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে। ভোটাধিকারের উপর, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর, জুরির সদস্য হবার অধিকারের উপর, সভা-সমাবেশের অধিকারের উপর বাধা-নিষেধগুলো বুর্জোয়াদের পক্ষে খুবই প্রীতিকর হত, কেননা সেগুলো শুধু তাদের নিচের শ্রেণীগুলিতেই প্রযোজ্য ছিল — সেগুলো তখন আর সম্ভব ছিল না। প্যারিসের 'অরাজকতা'র দৃশ্যগুলোর পুনরাবৃত্তির বিপদ আসন্ন হয়ে উঠল। এই বিপদের মুখে আগেকার সমস্ত পার্থক্য ঘুচে গেল। বিজয়ী মেহনতীজন তখনও নিজের স্বার্থে কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট দাবি প্রকাশ না করলেও তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গেল বহু বছরের মিত্র আর শত্রুরা, বুর্জোয়া এবং উলটে-ফেলা ব্যবস্থাটার সমর্থকদের মধ্যে মৈত্রীজোট গঠিত হল বার্লিনের ব্যারিকেডগুলোতেই। আবশ্যক সুযোগ-সুবিধা দিতে হল, কিন্তু যা অপরিহার্য তার চেয়ে বেশি কিছু নয়; 'সম্মিলিত ডায়েটে' প্রতিপক্ষ নেতাদের নিয়ে সরকার গড়া হবে বলে স্থির হল, সেটা ক্রাউন রক্ষা করতে খিদমতের প্রতিদানে পাবে পুরন শাসনব্যবস্থার সমস্ত ঠেকনো — সামন্ত অভিজাতকুল, আমলাতন্ত্র আর ফৌজের সমর্থন। এইসব শর্তেই মন্ত্রিসভা গড়ার কাজ হাতে নিলেন কাম্পহাউজেন এবং হান্‌জেমান মহাশয়েরা।

---

* চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্‌ম। — সম্পাঃ

জেগে-ওঠা জনগণ সম্বন্ধে নতুন মন্ত্রীদের আতঙ্কের মাত্রাটা ছিল এমনই যাতে তাদের চোখে প্রত্যেকটা উপায়ই ছিল বাঞ্ছিত, শুধু যদি সেটা কর্তৃত্বের টলে যাওয়া ভিত্তিটাকে একটু মজবুত করে। তারা, সেই হতভাগা ঠকে-যাওয়া জীবগুলি ভেবেছিল সাবেক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হবার সমস্ত বিপদই কেটে গিয়েছিল, তাই 'শৃঙ্খলা' পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করেছিল গোটা পুরন রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে। একজনও পুরন আমলা কিংবা সামরিক অফিসার বরখাস্ত হল না; প্রশাসনের সাবেকী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটায় সামান্যতম পরিবর্তনও করা হল না। বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রথম প্রাবল্যের মাঝে যেসব কর্মকর্তাকে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে তাদের আগেকার ঔদ্ধত্যের জন্যে জনগণ তাড়িয়ে দিয়েছিল, এমনকি তাদেরও পদে পুনর্বহাল করল ঐসব গুণী নিয়মতন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা। প্রাশিয়ায় বদলাল না কিছুই — মন্ত্রীদের চেহারাগুলো ছাড়া। এমনকি বিভিন্ন মন্ত্রিবিভাগে কর্মচারীদেরও ছোঁয়া হল না; যাদের নিয়ে হয়েছিল নব-উন্নীত শাসকদের দোহারদল, যারা ক্ষমতা আর পদ-পদবির ভাগ আশা করেছিল, সেই সমস্ত নিয়মতন্ত্রী চাকরিসন্ধানীদের বলা হল, আমলাতন্ত্রের লোকজন তখনও বিপদমুক্ত নয়, সেখানে যাতে রদ-বদল চলতে পারে সেইভাবে সুস্থিতি পুনঃস্থাপিত হওয়া অবধি তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

১৮ মার্চের অভ্যুত্থানের পরে চূড়ান্ত মাত্রায় অবমানিত হতাশাগ্রস্ত রাজা অচিরেই টের পেলেন এইসব 'উদারপন্থী' মন্ত্রীরা তাঁর পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তিনিও তাদের পক্ষে ঠিক তেমনই প্রয়োজনীয়। বিপ্লব সিংহাসনখানাকে অব্যাহতি দিয়েছিল; 'অরাজকতা'র পথে বিদ্যমান শেষ প্রতিবন্ধক ছিল সিংহাসনখানা, তাই উদারপন্থী বুর্জোয়ারা এবং তখন মন্ত্রিসভায় তাদের নেতারা ক্রাউনের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখতে সর্বতোভাবে আগ্রহান্বিত ছিল। সেটা আবিষ্কার করতে রাজার এবং তাঁকে ঘিরে-থাকা প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রণাদাতাদের দেরি হয় নি; যেসব ছোটখাটো সংস্কার মাঝে মাঝে সাধন করতে মনস্থ করা হয়েছিল, এমনকি সেগুলোর ব্যাপারেও মন্ত্রিসভার এগোতে গেলে বাধা দেবার জন্যে তারা ঐ পরিস্থিতি দিয়ে লাভবান হয়েছিল।

সাম্প্রতিক বলপূর্বক পরিবর্তনগুলোতে একটা বিধানিক চেহারা গোছের

কিছু দেওয়াটা ছিল মন্ত্রিসভার প্রথম উৎকণ্ঠার বিষয়। জনগণের যাবতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও জনগণের বিধিবদ্ধ এবং নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে 'সম্মিলিত ডায়েটের' অধিবেশন ডাকা হল পরিষদের নতুন নির্বাচনী আইন পাস করাবার জন্যে, ক্রাউনের সঙ্গে একমত হয়ে ঐ পরিষদের নতুন সংবিধান রচনা করবার কথা ছিল। নির্বাচন হবার কথা ছিল পরোক্ষ, ভোটদাতা-সাধারণ নির্বাচিত করত কিছুসংখ্যক নির্বাচক, আর তারা তখন নির্বাচিত করত প্রতিনিধিদের। সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দুই-ভাগের নির্বাচনব্যবস্থা পাস হয়েছিল। তারপরে 'সম্মিলিত ডায়েটকে' বলা হয়েছিল আড়াই কোটি ডলার ঋণের জন্যে, তার বিরোধিতা করেছিল জনতার তরফ, কিন্তু সেটাতেও সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

মন্ত্রিসভার এইসব কাজকর্ম খুবই দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল জনতার তরফের, এখন যেটা নাম নিয়েছে গণতান্ত্রিক তরফ। খুদে ব্যাপারী আর দোকানদার শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এই তরফের পতাকাতলে বিপ্লবের শুরুতে মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সম্মিলিত হয়েছিল, এই তরফ দাবি করেছিল যেমনটা ছিল ফ্রান্সে তেমনি সরাসর এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, এক-কক্ষের বিধানসভা, এবং নতুন শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে ১৮ মার্চের বিপ্লবের পূর্ণ এবং প্রকাশ্য স্বীকৃতি। তরফের অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী অংশটা এইভাবে 'গণতন্ত্রায়িত' রাজতন্ত্র পেলে সন্তুষ্ট হত; আখেরে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাবি করেছিল অপেক্ষাকৃত আগুয়ান অংশটা। ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান জাতীয় পরিষদকে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মানতে সম্মত ছিল উভয় অংশ; আর নিয়মতন্ত্রী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এই সংস্থাটার সার্বভৌমত্বকে মহা বিভীষিকা বলে ভাব দেখিয়েছিল, তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল সেটাকে তারা পুরোদস্তুর বৈপ্লবিক বলে মনে করত।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র আন্দোলন বিপ্লবের ফলে কিছুকালের জন্যে ভেঙে গিয়েছিল। আন্দোলনের সাক্ষাৎ চাহিদাগুলি এবং পরিস্থিতি এমন ছিল যাতে প্রলেতারিয়ান তরফের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট দাবিই সামনে তুলে ধরা চলত না। বাস্তবিকই, যতক্ষণ না মেহনতী জনগণের স্বতন্ত্র কর্মকাণ্ডের জমিন প্রস্তুত হচ্ছিল, যতক্ষণ না চালু হচ্ছিল সরাসর এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, একটু বড় এবং একটু ছোট ৩৬টা রাজ্য যতক্ষণ জার্মানিকে কেটে অগুন্তি

টুকরোয় ভাগ করে রাখছিল, ততক্ষণ প্রলেতারিয়ান তরফ আর কী করতে পারত তাদের পক্ষে সর্বগুরুত্বপূর্ণ প্যারিসের আন্দোলন লক্ষ্য করা ছাড়া, আর যেসব অধিকারের সাহায্যে পরে তাদের নিজেদের স্বার্থে লড়াই সম্ভব হত সেগুলি হাসিল করার জন্যে খুদে দোকানদারদের সঙ্গে মিলে সংগ্রাম করা ছাড়া?

তখন মাত্র তিনটে বিষয়ে রাজনীতিক কর্মকান্ড দিয়ে প্রলেতারিয়ান তরফ নিজেকে মূলত পৃথক করে নিয়েছিল খুদে ব্যাপারী শ্রেণী বা যথাভিহিত গণতান্ত্রিক তরফ থেকে: প্রথমত, ফরাসী আন্দোলন সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ধরনে ধারণা করার ব্যাপারে, সে-প্রসঙ্গে প্যারিসের চরমপন্থী তরফটাকে গণতন্ত্রীরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করত, আর প্রলেতারিয়ান বিপ্লবপন্থীরা সেটাকে সমর্থন করত; দ্বিতীয়ত, এক অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ঘোষণা করায়, যেখানে গণতন্ত্রীদের মধ্যে অতি প্রচন্ড চরমপন্থীরাও শুধু ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সাহস করত; আর তৃতীয়ত, প্রত্যেকটা ব্যাপারে কর্মকান্ডের সেই বৈপ্লবিক সাহস এবং তৎপরতা দেখানোতে, যে ব্যাপারে পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এবং প্রধানত তাদের নিয়ে গড়া যেকোন তরফের ঊনতা থাকে সবসময়ে।

মেহনতী জনসাধারণ বিপ্লবের শুরুতে ছিল গণতন্ত্রীদের লেজুড়, সেই জনগণকে গণতন্ত্রীদের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনতে প্রলেতারিয়ান বা যথার্থ বৈপ্লবিক তরফ কৃতকার্য হয়েছিল খুবই ক্রমে ক্রমে মাত্র। তবে গণতন্ত্রী নেতাদের দ্বিধা, দুর্বলতা এবং ভীরুতা বাদবাকিটা করেছিল যথাসময়ে, এখন বলা যেতে পারে, গত বছরের প্রচন্ড আলোড়নগুলোর একটা প্রধান ফল হল এই যে, যেখানেই শ্রমিক শ্রেণী আদৌ অনল্প জনরাশি হিসেবে একত্রিত আছে সেখানে তারা সেই গণতান্ত্রিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যেটা ১৮৪৮ আর ১৮৪৯ সালে তাদের নিয়ে গিয়েছিল অশেষ ভুল-ভ্রান্তি আর দুর্ভাগ্যের মধ্যে। কিন্তু আমাদের আগেভাগে আলোচনা না করাই ভাল; গণতন্ত্রী ভদ্রলোকদের কাজের মাঝে দেখতে পাবার প্রচুর সুযোগই আমাদের দেবে এই দু'বছরের ঘটনাবলি।

অস্ট্রিয়ারই মতো প্রাশিয়ার কৃষককুল অবিলম্বে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে বিপ্লব থেকে লাভবান হয়েছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত

কম সক্রিয়তা দিয়ে, এখানে তাদের উপর সামন্ততন্ত্রের পেষণ মোটের উপর ঠিক তত কঠোর ছিল না। কিন্তু আগে বিবৃত কারণে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা অবিলম্বেই চলে গিয়েছিল কৃষকদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে পুরন, সবচেয়ে অপরিহার্য মিত্রদের বিরুদ্ধে। যেটাকে বলা হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার উপর আক্রমণ তাতে বুর্জোয়াদের মতো সমানই আতঙ্কিত গণতন্ত্রীরাও কৃষকদের সমর্থন করে নি; এইভাবে, তিন মাসের মুক্তির পরে, বিশেষত সাইলেসিয়ায় কত রক্তাক্ত সংগ্রাম আর সামরিক নিধনের পরে গতকাল অবধি সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়াদের হাত দিয়ে সামন্ততন্ত্র পুনঃস্থাপিত হল। এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য তথ্য তোলা যায় না তাদের বিরুদ্ধে। শ্রেষ্ঠ মিত্রদের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে নি ইতিহাসে আর কোন তরফ; বুর্জোয়া তরফের কপালে আরও যত শাস্তি আর অবমাননা থাকুক, তার প্রতিটি কণাই সেটার প্রাপ্য হয়েছে এই একটা কাজ দিয়েই।

লন্ডন, অক্টোবর, ১৮৫১

৭

ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ

আমাদের পাঠকদের হয়ত স্মরণে আছে, এর আগের ছ'টা প্রবন্ধে ভিয়েনায় ১৩ মার্চ এবং, বার্লিনে ১৮ মার্চের জনগণের দুটো মস্ত বিজয় অবধি জার্মানির বৈপ্লবিক আন্দোলন নিয়ে আমরা আলোচনা চালিয়েছিলাম। অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া উভয় দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে এবং সমস্ত ভবিষ্য কর্মনীতির পরিচালনাকর নিয়ম হিসেবে উদারপন্থী বা বুর্জোয়াদের নীতি ঘোষিত হতে আমরা দেখেছি; কর্মকাণ্ডের এই দুটো মস্ত কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে, দু'জন ধনী ব্যবসায়ী সর্বশ্রী কাম্পহাউজেন এবং হান্‌জেমান মারফত উদারপন্থী বুর্জোয়ারা সরাসরি ক্ষমতা দখল করল প্রাশিয়ায়; আর অস্ট্রিয়ায় বুর্জোয়াদের রাজনীতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল অনেক কম, সেখানে উদারপন্থী আমলাতন্ত্র

ক্ষমতায় এসে খোলাখুলি ঘোষণা করল তারা ক্ষমতা হাতে নিল বুর্জোয়াদের মোক্তারনামায়। সমাজের যেসব পার্টি আর শ্রেণী আগে পুরন সরকারের প্রতিপক্ষতায় সম্মিলিত ছিল সেগুলো বিজয়ের পরে, এমনকি সংগ্রামের সময়েই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তাও আমরা দেখেছি; দেখেছি বিজয়ের ফলে একমাত্র যারা লাভবান হল সেই উদারপন্থী বুর্জোয়ারা কিভাবে অবিলম্বে আগের দিনের মিত্রদের থেকে মুখ ফেরাল, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর প্রকৃতির প্রত্যেকটি শ্রেণী বা তরফের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করল এবং মৈত্রীজোট বাঁধল বিজিত সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক পক্ষের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, বৈপ্লবিক নাট্যের শুরু থেকেই স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল যে, অপেক্ষাকৃত বেশি র‍্যাডিকাল বিভিন্ন তরফের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে ছাড়া উদারপন্থী বুর্জোয়ারা বিজিত কিন্তু যা বিনষ্ট নয় সেই সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক তরফের বিরুদ্ধে কোট বজায় রাখতে পারে না, তেমনি অধিকতর র‍্যাডিকাল এই জনগণের খরস্রোতের বিরুদ্ধে সামন্ত অভিজাতকুল আর আমলাতন্ত্রের সহায়তাও তাদের সমানই প্রয়োজন। এইভাবে বেশ স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখা এবং দেশের প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদিকে নিজেদের চাহিদা আর ভাব-ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট শক্তি অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের ছিল না। উদারপন্থী বুর্জোয়া মন্ত্রিসভা ছিল শুধু একটা সাময়িক বিরতিস্থল, যেখান থেকে পরিস্থিতির সম্ভাব্য ফের অনুসারে দেশটিকে হয় এগিয়ে যেতে হত ঐকিক প্রজাতন্ত্রবাদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পর্বে, নইলে ফিরে যেতে হত পুরন যাজকীয়-সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক রাজে। যা-ই হোক, আসল, চূড়ান্ত সংগ্রাম তখনও আসে নি; মার্চের ঘটনাবলি দিয়ে লড়াই সবে শুরু হয়েছিল।

অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া জার্মানির দুটি শাসনরত রাজ্য, তাই ভিয়েনায় কিংবা বার্লিনে প্রত্যেকটা চূড়ান্ত বিজয় নিষ্পত্তিকর হত সারা জার্মানির ক্ষেত্রে। এইভাবে, এই দুটি শহরে ১৮৪৮ সালের ঘটনাবলি যে পরিমাণে অগ্রসর হয়েছিল তাতে জার্মান বিষয়াবলির গতি নির্ধারিত হয়ে গেল। কাজেই গৌণ রাজ্যগুলিতে সংঘটিত আন্দোলনের ব্যাপারে ফিরে আসাটা নিষ্প্রয়োজনই হত, বাস্তবিকপক্ষে আমরা কেবল অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার

ব্যাপার নিয়ে বিচার-বিবেচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারতাম -- যদি এইসব গৌণ রাজ্যের অস্তিত্বের ফলে এমন একটা সংস্থা দেখা না দিত যেটার অস্তিত্বই ছিল জার্মানির অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং অনতিপূর্ববর্তী বিপ্লবের অসম্পূর্ণতার লক্ষণীয় প্রমাণ, এই সংস্থাটা এতই অস্বাভাবিক, সেটার অবস্থানেরই ফলে এতই হাস্যকর, অথচ নিজস্ব গুরুত্বে এতই ভরপুর, যাতে ইতিহাস খুব সম্ভব কখনও সেটার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারবে না। এই সংস্থাটা হল মাইন্-পাড়ের ফ্রাঙ্কফুর্টের তথাকথিত **জার্মান জাতীয় পরিষদ**।

ভিয়েনায় আর বার্লিনে জনগণের বিজয়ের পরে সারা জার্মানির একটা প্রতিনিধি পরিষদ হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। কাজেই নির্বাচিত হয়েছিল এই সংস্থা, সেটার অধিবেশন হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের পাশে। জনগণ আশা করেছিল, জার্মান জাতীয় পরিষদ বিতর্কনীয় সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করবে এবং সমগ্র জার্মান কনফেডারেশনের সর্বোচ্চ বিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ চালাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে, ফেডারেটিভ ডায়েট সেটার অধিবেশন ডেকেছিল, কিন্তু সেটার ক্রিয়াকলাপ স্থির করে দেয় নি কোনভাবে। সেটার ডিক্রিগুলোর আইন হিসেবে বলবত্তা থাকবে, না সেগুলো হবে ফেডারেটিভ ডায়েটের কিংবা পৃথক পৃথক সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ, তা কেউ জানত না। পরিষদের সামান্যতম কর্মোদ্যোগ থাকলে এই জটিলতার মাঝে সেটা জার্মানিতে সবচেয়ে লোক-বিরাগভাজন কর্পোরেট সংস্থা ফেডারেটিভ ডায়েটটাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করে তার জায়গায় নিজ সদস্যদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে কায়েম করত ফেডারেল সরকার। জার্মান জনগণের সার্বভৌম সংকল্পের একমাত্র আইনগত প্রতিভূ বলে নিজেকে ঘোষণা করা দরকার ছিল সেটার এবং এইভাবে নিজের একেবারে প্রত্যেকটা ডিক্রিতে আইনগত বলবত্তা আরোপ করতে হত। সেটা সর্বোপরি নিজের আয়ত্তে নিত একটা সংগঠিত এবং সশস্ত্র শক্তি যা দেশের মধ্যে সরকারগুলোর পক্ষ থেকে আসা যেকোন বিরোধিতা দমন করার জন্যে যথেষ্ট হত। বিপ্লবের সেই গোড়ার দিককার সময়ে এই সবকিছু ছিল সহজ, খুবই সহজ। কিন্তু পরিষদটার বেশির ভাগ সদস্য ছিল উদারপন্থী অ্যাটর্নি আর পুঁথিবাগীশ অধ্যাপক, পরিষদটা ভান করত সেটা যেন জার্মান মনীষা আর বিজ্ঞানের একেবারে সারমর্মেরই প্রতিরূপ, কিন্তু আসলে সেটা ছিল

শুধু এমন একটা মঞ্চ যেখানে বুড়ো আর অবসন্ন রাজনীতিকেরা সারা জার্মানির চোখের সামনে প্রদর্শন করত তাদের অনৈচ্ছিক হাস্যকর প্রকৃতি এবং যেমন কর্মের তেমনি চিন্তনের অক্ষমতা — এমন পরিষদের কাছ থেকে উল্লিখিত কাজকর্ম প্রত্যাশা করাটা হত বড়ই বেশিকিছু। বুড়িদের এই পরিষদ সেটার অস্তিত্বের প্রথম দিনটা থেকেই সমস্ত জার্মান সরকারের যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সাফল্যটার চেয়ে বেশি ভয় করত সামান্যতম জন-আন্দোলনকে। সেটা আলোচনাদি চালাত ফেডারেটিভ ডায়েটের চোখের সামনে, তার উপর নিজ ডিক্রিগুলোর প্রতি ফেডারেটিভ ডায়েটের অনুমোদনের কাঙাল ছিল প্রায়, কেননা সেটার প্রথম সিদ্ধান্তগুলি জারি হওয়া দরকার ছিল ঐ জঘন্য সংস্থাটাকে দিয়ে। নিজ সার্বভৌমত্ব মজবুত করার পরিবর্তে সেটা অমন বিপজ্জনক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে চলত। জনগণের সশস্ত্র শক্তি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখার বদলে সেটা সরকারগুলোর যাবতীয় অত্যাচার সম্বন্ধে চোখ বুজে থেকে পরবর্তী ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করত। সেটার একেবারে চোখের সামনেই মেইনৎসকে অবরোধের অবস্থায় রেখে সেখানকার মানুষকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল — জাতীয় পরিষদ নড়েও নি। পরে সেটা অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ইয়োহানকে জার্মানির রীজেন্ট নির্বাচিত করেছিল এবং সেটার সমস্ত সিদ্ধান্ত আইন হিসেবে বলবৎ হবে বলে ঘোষণা করেছিল। তবে কিনা, আর্চডিউক ইয়োহানকে এই নতুন সম্মানিত পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল শুধু সবকটা সরকারের সম্মতি পাবার পরে, আর পরিষদ নয়, তাঁকে নিযুক্ত করেছিল ফেডারেটিভ ডায়েট। পরিষদের ডিক্রিগুলোর আইনগত বলবত্তা — এই বিষয়টাকে বিভিন্ন বৃহত্তর সরকারগুলো কখনও মানে নি, পরিষদ নিজেও কখনও তা বলবৎ করে নি, কাজেই সেটা থেকে গিয়েছিল অনিশ্চিত অবস্থায়। এইভাবে দেখা দিয়েছিল একটা অদ্ভুত দৃশ্য: একটা পরিষদ নিজেকে একটা মহান এবং সার্বভৌম জাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করে অথচ নিজ দাবি মান্য করাবার জন্যে সেটার কখনও সংকল্পও নেই, শক্তিও না। এই জাতীয় পরিষদের বিতর্কের কোন ব্যবহারিক ফলাফল ছিল না, এমনকি ছিল না কোন তত্ত্বগত মূল্যও, কেননা এইসব বিতর্কে বিভিন্ন সেকেলে বাতিল দর্শন আর আইন সম্প্রদায়ের বহুব্যবহৃত অতি মামুলি বিষয়বস্তুর অবিকল পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই থাকত

না। সেই পরিষদে উচ্চারিত, বরং বলা ভাল স্পষ্টোক্ত প্রত্যেকটা বাক্য অনেক আগেই হাজার বার ছাপা হয়েছে হাজারগুণ ভালভাবে।

এইভাবে, জার্মানির নতুন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাহির করা সংস্থাটা সবকিছু যেমনটা পেয়েছিল সেইভাবেই রেখে দিল। তাই দীর্ঘকালের চাহিদা জার্মানির সম্মিলন হাসিল করা তো দূরের কথা, দেশের শাসকদের মধ্য থেকে অতি নগণ্য সম্রাটকেও এই পরিষদ বেদখল করল না; জার্মানির পৃথক পৃথক প্রদেশের মধ্যে মিলনের সম্পর্কটাকে সেটা ঘনিষ্ঠতর করল না; প্রাশিয়া থেকে হানোভারকে এবং অস্ট্রিয়া থেকে প্রাশিয়াকে আলাদা করে দেয় যে কাস্টম্‌সের বেড়া সেটাকে ভাঙার জন্যে পরিষদ এক-পাও এগোল না; প্রাশিয়ার সর্বত্র নদী-নৌবাহের ক্ষেত্রে জঘন্য প্রতিবন্ধক মাসুল তুলে দেবার সামান্যতম চেষ্টাও করল না। তবে এই পরিষদ কাজ করল যত কম, ততই বেশি করল তর্জন-গর্জন। পরিষদ গড়ল একটা জার্মান নৌবহর— কেবল কাগজপত্রে; পোল্যান্ড আর শ্লেজ্‌ভিগ দখল করল; সেটা জার্মান অস্ট্রিয়াকে ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দিল, অথচ জার্মানিতে অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে অস্ট্রীয়দের পিছু তাড়া করে যেতে ইতালীয়দের বাধা দিল; প্রায়ই হুর্‌রে ধ্বনি তুলল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে, আর অভ্যর্থনা করল হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রদূতদের, তারা অবশ্য জার্মানি সম্বন্ধে তালগোল পাকান ধারণা যতটা নিয়ে এসেছিল দেশে ফিরেছিল তার চেয়ে ঢের বেশিটা নিয়ে।

বিপ্লবের শুরুতে এই পরিষদটা ছিল সমস্ত জার্মান সরকারের জুজুবুড়ি। এই পরিষদের আইনগত যোগ্যতা কী সেটাকে অনির্দিষ্টতার মাঝে ছেড়ে রাখা আবশ্যক ছিল বলেই সরকারগুলো ভেবেছিল পরিষদের কর্মকান্ড হবে খুবই একনায়কত্বমূলক এবং বৈপ্লবিক। তাই এইসব সরকার এই ভয়ঙ্কর সংস্থাটার প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে খুবই বিস্তৃত একদফা ষড়যন্ত্র সাজিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু দেখা গেল তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে সৌভাগ্যই ছিল বেশি, কেননা সরকারগুলো নিজেদের কাজ নিজেরা যেমনটা করতে পারত তার চেয়ে ভালভাবেই সেটা করল ঐ পরিষদ। বিধান পরিষদগুলির অধিবেশন আহ্বান করাই ছিল এইসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রধান উপাদানটা, তার ফলে শুধু ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিই তাদের বিধানমন্ডলগুলির

অধিবেশন ডাকল শুধু তাই নয়, প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়াও তাদের সংবিধান-সভা দুটোর অধিবেশন ডাকল। ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রতিনিধি-সভার মতো এই দুটোতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল উদারপন্থী বুর্জোয়াদের কিংবা তাদের মিত্র উদারপন্থী ব্যবহারজীবী এবং আমলাতন্ত্রীদের, আর প্রত্যেকটাতে বিষয়াবলির গতিমুখের পরিবর্তন ঘটল প্রায় একই রকমের। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, জার্মান জাতীয় পরিষদ ছিল একটা কাল্পনিক দেশের পার্লামেন্ট, কেননা যা-ই হোক, যা ছিল পরিষদের নিজেরই অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক প্রথম উপাদান, অর্থাৎ সম্মিলিত জার্মানি গঠন করা, তা সেটা পরিহার করল; সেটা তার নিজের সৃষ্টি একটা কাল্পনিক সরকারের কাল্পনিক ব্যবস্থাবলি নিয়ে আলোচনা করল, যেসব ব্যবস্থা কখনও কার্যে পরিণত হবার মতো ছিল না, আর পাস করল বিভিন্ন কাল্পনিক প্রস্তাব যেগুলো কারও ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় সংবিধান-সভা দুটো অন্তত ছিল সত্যিকারের পার্লামেন্ট, যা ভাঙত এবং গড়ত সত্যিকারের মন্ত্রীদের, আর যাদের সঙ্গে তাদের লড়তে হত সেই রাজন্যদের উপর অন্তত কিছুকালের জন্যে জোর করে চাপিয়ে দিত নিজেদের সিদ্ধান্তগুলিকে। সে-দুটোও ছিল ভীতু, বৈপ্লবিক সংকল্পের প্রসারিত অভিমতের ঊনতা ছিল তাদের; সে-দুটোও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত করেছিল সামন্ততান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের হাতে। তবে কিনা, সে-দুটো অন্তত আশু আগ্রহজনক বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীর মাটিতে বাস করতে বাধ্য ছিল, যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের দমবাজেরা 'স্বপ্নের কল্পনারাজ্যে', 'im Luftreich des Traums'* বিচরণ করতে পারলে যেমনটা তেমন সুখী হত না আর কখনও। এইভাবে বার্লিন আর ভিয়েনার সংবিধান-সভার আলোচনা হল জার্মানির বৈপ্লবিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্গ, কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের সমষ্টিগত ভাঁড়ামির পণ্ডিতীপনায় আগ্রহান্বিত হয় শুধু সাহিত্যঘটিত এবং প্রাচীন দুর্লভ বস্তুর সংগ্রাহকেরা।

দেশের জঘন্য অঞ্চলগত বিভাগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ধ্বংস করে দেয়

---

* হাইনে, 'জার্মানি। এক শীতকালীন কাহিনী', ৭ম পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

জাতির সমষ্টিগত শক্তিকে, সেটার অবসান ঘটাবার প্রয়োজন গভীরভাবে বোধ ক'রে জার্মানির মানুষ কিছুকালের জন্যে আশা করেছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ হল অন্তত নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু সেই পণ্ডিতমানী চক্রের বালসুলভ আচরণ জাতীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল অচিরেই। মালমোয়ে-র যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে তাদের লজ্জাকর আচরণ (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮) (৩১) লক্ষ্য করে জনসাধারণের ক্রোধ আর ঘৃণা ফেটে পড়েছিল এই সংস্থাটার বিরুদ্ধে, সেটা জাতিকে মুক্ত উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র দেবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু যার জুড়ি মেলে না এমন ভীরুতার বশবর্তী হয়ে সেটা তার বদলে বর্তমান প্রতিবৈপ্লবিক ব্যবস্থা যে-ভিত্তির উপর নির্মিত সেটাকে আগেকার মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিল।

লন্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫২

৮

পোলরা, চেকরা এবং জার্মানরা

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে যা বলা হয়েছে তা থেকে ইতোমধ্যে স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবের পরে একটা নতুন বিপ্লব না ঘটলে জার্মানিতে সবকিছু এই ঘটনার আগে যা ছিল সেখানেই ফিরে যেত, সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুটার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করছি সেটা এমনই জটিল ধরনের যাতে যাকে বলা যেতে পারে জার্মান বিপ্লবের বৈদেশিক সম্পর্ক সেটাকে বিবেচনায় না রেখে পরবর্তী ঘটনাবলি স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই বৈদেশিক সম্পর্কের ধরনটা ছিল স্বরাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির ধরনেরই মতো জটিল।

একথা সুবিদিত যে, একেবারে এলবা, সালে আর বোহেমীয় বনভূমি*

---

* চেক বনভূমি। — সম্পাঃ

অবধি জার্মানির গোটা পূর্বার্ধটাকে গত হাজার বছরে স্লাভ বংশোদ্ভূত আক্রমণকারীদের হাত থেকে জয় করে নেওয়া হয়। এইসব রাজ্যক্ষেত্রের বেশির ভাগটাকে জার্মানায়িত করা হয়েছে এবং এর ফলে গত কয়েক শতাব্দী ধরে সমস্ত স্লাভ জাতিসত্তা আর ভাষা সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয়েছে। একেবারেই বিচ্ছিন্ন অল্পকিছু অবশেষ, মোট এক লাখের কম মানুষ (পোমেরানিয়ায় কাসুবিয়ানরা, লুসাশিয়ায় ভেন্দ বা সোর্বিয়ানরা) বাদে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীরা বস্তুত জার্মান। কিন্তু প্রাচীন পোল্যান্ডের সমগ্র সীমান্ত বরাবর এবং চেক্-ভাষাভাষী অঞ্চল বোহেমিয়ায় আর মরাভিয়ায় অবস্থাটা অন্য রকম। এখানে প্রত্যেকটা এলাকায় দুটো জাতিসত্তা মিশে আছে, শহরগুলি সাধারণভাবে কমবেশি জার্মান, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে স্লাভপ্রাধান্য, যদিও সেখানেও সেটা ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে এবং জার্মান প্রভাবের সমানে অগ্রগতির মুখে পিছু হঠছে।

এমন অবস্থার কারণটা এই। শার্লেমেনের আমল থেকে বরাবর জার্মানিরা সবচেয়ে ক্ষান্তিহীন এবং অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা চালিত করেছে পূর্ব ইউরোপকে জয়, উপনিবেশিত কিংবা অন্তত সভ্য করার জন্যে। এল্‌বা আর ওদের নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সামন্ত অভিজাতকুলের দেশজয়গুলো এবং প্রাশিয়ায় আর লিভোনিয়ায় নাইটদের সামরিক সম্প্রদায়ের সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশগুলো ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারিং বুর্জোয়াদের দ্বারা জার্মানীকরণের ঢের বেশি বিস্তৃত এবং কার্যকর প্রণালীর জমিনই প্রস্তুত করেছিল শুধু, বাদবাকি পশ্চিম ইউরোপের মতো জার্মানিতেও এই বুর্জোয়ারা সামাজিক এবং রাজনীতিক গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল পনর শতক থেকে। স্লাভরা এবং বিশেষত পশ্চিম-স্লাভরা (পোল্‌রা আর চেক্‌রা) নিতান্তই কৃষিজীবী জাতি, বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার কখনও তারা বড় একটা পছন্দ করত না। তার পরিণতি হল এই যে, এইসব অঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারজাত সমস্ত জিনিসের উৎপাদন পড়েছিল জার্মান পরদেশীদের হাতে, আর কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে ঐসব পণ্যের বিনিময়ের ব্যাপারটা হয়ে পড়েছিল শুধু ইহুদিদের একচেটে, কোন জাতিসত্তার অন্তর্গত হলে এরা এইসব অঞ্চলে নিশ্চয়ই স্লাভদের চেয়ে বেশি পরিমাণে জার্মানই। সমগ্র পূর্ব ইউরোপেই অবস্থাটা এই রকমের, যদিও কিছু কম

মাত্রায়। পিটার্সবুর্গে, পেশ্‌ট্‌-এ, ইয়াস্‌সিতে, এমনকি কনস্টান্টিনোপ্‌লেও অদ্যাবধি কারিগর, ছোট দোকানদার, খুদে ম্যানুফ্যাকচারার হল জার্মান, আর মহাজন, শুঁড়ি, হকার — এইসব জনবিরল অঞ্চলে সে খুবই ভারি লোক — খুবই সাধারণ ইহুদি, যার মাতৃভাষা হল ভীষণ বিকৃত জার্মান। শহর, বাণিজ্য এবং ম্যানুফ্যাকচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্তী স্লাভ এলাকাগুলিতে জার্মান উপাদানটার গুরুত্ব নিয়মিতভাবে বাড়ছিল, সেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল যখন দেখা যায় মানস সংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেকটা উপাদান আমদানি করতে হয় জার্মানি থেকে। জার্মান ব্যাপারী আর কারিগরের পরে স্লাভ মাটিতে এসে কায়েমী হয়ে বসেছিল জার্মান পাদরি, জার্মান বিদ্যালয়-শিক্ষক, জার্মান পণ্ডিত। শেষে, সামাজিক বিকাশধারায় বিজাতীয়করণের ধীর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতির পরে গেল শুধু নয়, তার থেকে বহুগুণ আগে চলে গেল বিজেতা বাহিনীগুলোর লৌহ পদক্ষেপ, কিংবা কূটনীতির সাবধানী, সুপরিকল্পিত হস্তমুষ্টি। এইভাবে, ঐসব সন্নিহিত এলাকায় জার্মান ঔপনিবেশিকদের কাছে বিভিন্ন সরকারী জমিদারি বিক্রি করে এবং তা তাদের অনুদান হিসেবে দিয়ে, ম্যানুফ্যাক্টরি স্থাপন করার জন্যে জার্মান পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, ইত্যাদি উপায়ে, এবং প্রায়ই ঐ অঞ্চলের পোল্‌ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে নিদারুণ স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা অবলম্বন করে পোল্যান্ডের প্রথম বিভাগের পর থেকে পশ্চিম প্রাশিয়া আর পজ্‌নানের মস্ত মস্ত অংশকে জার্মানায়িত করা হয়েছে।

সুতরাং, গত সত্তর বছরে জার্মান আর পোলীয় জাতিসত্তার মধ্যকার সীমারেখা একেবারেই বদলে গেছে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সঙ্গেসঙ্গেই জাগিয়ে তুলেছিল সমস্ত উৎপীড়িত জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের দাবি এবং তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই মীমাংসা করার অধিকারের দাবি, তাই ১৭৭২ সালের আগে (৩২) প্রাচীন পোলীয় প্রজাতন্ত্রের সীমান্তের ভিতরে দেশ পুনঃস্থাপনের জন্যে পোলরা তৎক্ষণাৎ দাবি তুলল. এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। জার্মান এবং পোলীয় জাতিসত্তার মধ্যকার সীমানির্দেশক হিসেবে ধরলে এই সীমান্ত এমনকি তখনও অচলিত হয়ে পড়েছিল. তা ঠিক: সেটা আরও বেশি প্রতিবছর জার্মানীকরণের অগ্রগতির ফলে। তবে কিনা, পোলান্ড পুনঃস্থাপনের জন্যে জার্মানরা এতই উৎসাহ জাহির করেছিল যাতে

তাদের নিশ্চয়ই অনুমান করা দরকার যে, তাদের সহানুভূতির আন্তরিকতার প্রথম প্রমাণ হিসেবে লুঠের **তাদের** হিস্‌সাটাকে ছেড়ে দিতে বলা হবে। অন্য দিকে, প্রধানত জার্মানদের অধ্যুষিত গোটা গোটা এলাকা, বড় বড় পুরোপুরি জার্মান শহর কি ছেড়ে দিতে হবে এমন একটা জাতির হাতে যেটা কৃষিক্ষেত্রের ভূমিদাসপ্রথার ভিত্তিতে স্থাপিত সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা ছাড়িয়ে এগোবার সামর্থ্যের কোন প্রমাণই তখন অবধি কখন দেয় নি? প্রশ্নটা জটিলই ছিল বটে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধেই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য মীমাংসা; তখন আমূল পরিবর্তিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে সীমানির্দেশের প্রশ্নটাকে করা হত একই শত্রুর বিরুদ্ধে নিরাপদ সীমান্ত কায়েম করা সংক্রান্ত প্রধান প্রশ্নটার সঙ্গে তুলনায় গৌণ। পুবে সম্প্রসারিত বিরাট অঞ্চল পেয়ে পোলরা তাদের দাবিতে পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং পরিমিত হত; আর যা-ই হোক, রিগা আর মিতাভা* তাদের কাছে দান্‌জিগ আর এলবিং**-এর মতো সমানই গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচিত হত। এইভাবে জার্মানিতে আগুয়ান তরফটি ইউরোপের মূলভূখণ্ডের আন্দোলন চালু রাখার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আবশ্যক বিবেচনা ক'রে, এবং পোল্যান্ডের এমনকি একাংশেরও জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে এমন যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী মনে ক'রে পোলদের সমর্থন করল। তখন আধিপত্যশালী উদারপন্থী বুর্জোয়া তরফ স্পষ্ট বুঝতে পারল রাশিয়ার সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধে তাদের পতন ঘটবে — ঐ যুদ্ধের ফলে পরিচালনে এসে যাবে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় এবং কর্মতৎপর লোকজন, কাজেই জার্মান জাতিসত্তার সম্প্রসারের জন্যে উৎসাহ-আগ্রহের ভান করে তারা পোলীয় বৈপ্লবিক আলোড়নের প্রধান কেন্দ্র প্রুশীয় পোল্যান্ডকে ভাবী জার্মান সাম্রাজ্যের অপরিহার্য অংশ বলে ঘোষণা করল। উত্তেজনার প্রথম দিনগুলিতে পোলদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙা হল লজ্জাকরভাবে; সরকারের মঞ্জুরি অনুসারে প্রস্তুত-করা পোলীয় সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ এবং ধ্বংস করা হল প্রুশীয় গোলন্দাজবাহিনী দিয়ে; ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসেই, বার্লিন বিপ্লবের পরে মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যেই পোলীয় আন্দোলন

* লাতভীয় নাম: ইয়েলগাভা। — সম্পাঃ

** পোলীয় নাম: গদানস্ক এবং এলব্লং। — সম্পাঃ

বিধ্বস্ত করা হল, পুনরুজ্জীবিত হল পোল্ আর জার্মানদের মধ্যে জাতিগত বৈরিতা। রুশী স্বৈরশাসকের এই বিপুল এবং অপরিমেয় খিদমত করেছিলেন উদারপন্থী ব্যাপারী-মন্ত্রিদ্বয় কাম্পহাউজেন আর হান্‌জেমান। আরও বলা দরকার, পোল্যান্ড অভিযান ছিল প্রুশীয় ফৌজকে পুনঃসংগঠিত করার এবং আত্মপ্রত্যয় দেবার প্রথম উপায়, আর সেই ফৌজই পরে উদারপন্থী পার্টিকে বিতাড়িত করেছিল এবং সর্বশ্রী কাম্পহাউজেন আর হান্‌জেমানের অনেক কষ্ট করে সযত্নে গড়ে-তোলা আন্দোলনটাকে বিধ্বস্ত করেছিল। 'যা দিয়ে তারা অপরাধ করেছিল, তাই দিয়ে তাদের শাস্তি হল।' লেদ্রু-রলাঁ থেকে শাঙ্গার্নিয়েরে, আর কাম্পহাউজেন থেকে হাইনাউ পর্যন্ত —১৮৪৮ আর ১৮৪৯ সালের সমস্ত হঠাৎ নবাবের পরিণতি ঘটেছিল এমনই।

জাতিসত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল বোহেমিয়ায়ও। কুড়ি লক্ষ জার্মান এবং চেক্-ভাষাভাষী তিরিশ লক্ষ স্লাভদের অধ্যুষিত এই অঞ্চলটার মস্ত মস্ত ঐতিহাসিক অনুস্মৃতি ছিল, সেগুলির প্রায় সবই চেক্‌দের আগেকার আধিপত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে কিনা, ১৫ শতকে হুস্‌সাইটদের যুদ্ধের (৩৩) পর থেকে ভেঙে পড়েছিল স্লাভ বংশের এই শাখাটার প্রতাপ; চেক্-ভাষাভাষী প্রদেশগুলি ভাগ-ভাগ হয়ে গিয়েছিল, একটা ভাগ ছিল বোহেমিয়া রাজ্য, আর-একটা ছিল রাজন্য-শাসিত মরাভিয়া, আর তৃতীয়টা ছিল স্লোভাকদের কার্পেথিয়ান পার্বত্য অঞ্চল, সেটা হাঙ্গেরির অংশ। মরাভীয়দের আর স্লোভাকদের জাতিগত অনুভূতি আর প্রাণশক্তির সমস্ত নিদর্শন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অনেককাল আগেই, যদিও তাদের ভাষা বজায় ছিল বহুলাংশে। বোহেমিয়া চার দিকের তিন দিক থেকে ঘেরা ছিল সম্পূর্ণভাবে জার্মান অঞ্চল দিয়ে। বোহেমিয়ার নিজের অঞ্চলে জার্মানদের বিস্তর উন্নতি হয়েছিল; এমনকি রাজধানী প্রাগেও জাতিসত্তা-দুটি সংখ্যায় মোটামুটি সমকক্ষই ছিল; আর সর্বত্রই পুঁজি, বাণিজ্য, শিল্প এবং মানস সংস্কৃতি ছিল জার্মানদের হাতে। চেক্ জাতিসত্তার প্রধান সমর্থক প্রফেসর পালাস্‌কি নিজে একজন খেপে-যাওয়া জার্মান বিদ্বান্ ছাড়া কিছু নন, এখনও তিনি নির্ভুল এবং বৈদেশিক স্বরাঘাত ছাড়া চেক্ ভাষা বলতে পারেন না। চেক্ জাতিসত্তা লুপ্তপ্রায় -- গত চার-শ' বছর ধরে ইতিহাসে জানা প্রত্যেকটা তথ্য অনুসারে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু যেমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে, সেটা আগেকার

প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল ১৮৪৮ সালে, তবে, যাবতীয় বৈপ্লবিক বিচার-বিবেচনা থেকে অনপেক্ষভাবে, সেই চেষ্টার ব্যর্থতা থেকে এটা প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, অতঃপর বোহেমিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে কেবল জার্মানির একটা অংশ হিসেবেই, যদিও সেটার বাসিন্দাদের একাংশ আরও কয়েক শতাব্দী ধরে কথা বলে চলতে পারে একটা অ-জার্মান ভাষায় (৩৪)।

লণ্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

৯

সর্ব-স্লাভ সমন্বয়নীতি। শ্লেজ্‌ভিগ-হোল্‌স্টাইনের যুদ্ধ

বোহেমিয়া এবং ক্রোয়েশা (স্লাভ জাতির আর-একটি ছত্রভঙ্গ অঙ্গ, যেটার প্রতি হাঙ্গেরীয়দের আচরণ হল বোহেমিয়ার প্রতি জার্মানদের আচরণের মতো) ছিল ইউরোপের মূলভূমিতে যা 'সর্ব-স্লাভ সমন্বয়নীতি' বলে পরিচিত সেটার উৎপত্তিস্থল। স্বাধীনভাবে জাতি হিসেবে বিদ্যমান থাকার মতো যথেষ্ট শক্তি বোহেমিয়ারও ছিল না, ক্রোয়েশারও না। তাদের নিজ নিজ জাতিসত্তা ক্রমে ক্ষয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণের ক্রিয়াফলে, তাতে কোন জাতিসত্তাকে গিলে ফেলে অপেক্ষাকৃত তেজীয়ান কোন জাতি, সেটা অবশ্যম্ভাবী, তারা স্বাতন্ত্র্য গোছের কিছু পুনঃস্থাপনের আশা করতে পারত শুধু অন্যান্য স্লাভ জাতির সঙ্গে মৈত্রীজোট বেঁধে। ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ পোল্, সাড়ে চার কোটি রুশী, ৮০ লক্ষ সার্বীয় আর বুলগেরীয় — এই গোটা ৮ কোটি স্লাভদের নিয়ে পরাক্রমশালী কনফেডারেশন গড়ে পবিত্র স্লাভভূমি থেকে অনধিকার-প্রবেশকারী তুর্কীদের, হাঙ্গেরীয়দের এবং, সর্বোপরি, ঘৃণ্য কিন্তু প্রয়োজনীয় 'Niemetz' — জার্মানদের খেদিয়ে দেওয়া কিংবা ঝাড়ে-মূলে বিনষ্ট করা যায় তো! এইভাবে, ইতিহাস বিজ্ঞানে অল্প কয়েক জন পল্লবগ্রাহী স্লাভের অধ্যয়নকক্ষে ফাঁদা হয়েছিল এই হাস্যকর ইতিহাসবিরোধী আন্দোলন; সভ্য পশ্চিমকে বর্বর পূবের অধীন করা,

শহরকে গ্রামাঞ্চলের বশবর্তী, বাণিজ্য, ম্যান্ফ্যাকচার আর মানস সংস্কৃতিকে স্লাভ ভূমিদাসদের আদিম ধরনের কৃষির বশীভূত করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, তার চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু এই হাস্যকর তত্ত্বের পিছনে ছিল **রুশ সাম্রাজ্যের** ভয়ঙ্কর বাস্তবতা, এই সাম্রাজ্য প্রত্যেকটা নড়াচড়া দিয়ে জাহির করে যে, সারা ইউরোপকে খাস ভূমিসম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার ন্যায্য দাবিদার হল স্লাভ জাতি, বিশেষত এই জাতির একমাত্র কর্মতৎপর অংশ রুশীরা; এই সাম্রাজ্যের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ আর মস্কো এই দুটো রাজধানী থাকতেও, প্রত্যেকটি রুশী কৃষক যেটাকে মনে করে তার ধর্ম আর জাতির আদত রাজধানী সেই **'জারের নগরী'** (কনস্টান্টিনোপ্ল্, রুশ ভাষায় বলে ৎসারিগ্রাদ, অর্থাৎ জারের নগরী) প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্রাটের বাসস্থান না হওয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য এখনও সেটার ভারকেন্দ্র পায় নি; গত ১৫০ বছরে এই সাম্রাজ্য যত যুদ্ধ বাধিয়েছে তার কোনটায় রাজ্যক্ষেত্র হারায় নি, প্রত্যেকটায় রাজ্যক্ষেত্র জিতে নিয়েছে। রুশী কর্মনীতি যেসব ষড়যন্ত্র দিয়ে সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের অভিনব তত্ত্বটাকে সমর্থন করেছিল সেটা মধ্য ইউরোপে সুবিদিত; রুশী কর্মনীতির অভীষ্টের পক্ষে এই তত্ত্বটার চেয়ে উপযোগী আর কিছুই উদ্ভাবিত হতে পারত না। এইভাবে, সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের সমর্থক বোহেমীয়রা আর ক্রোয়েশীয়রা, কেউ ইচ্ছাপূর্বক, কেউ অজানতে কাজ করেছিল রাশিয়ার সরাসর স্বার্থে; বৈপ্লবিক কর্মব্রতের প্রতি তারা বেইমানি করেছিল শুধু জাতিসত্তার আদলটুকুর জন্যে, সেটা হলে তাদের বরাতে জুটত বড়জোর রুশ প্রভাবাধীন পোলীয় জাতিসত্তার মতো অবস্থা। তবে পোল্দের সম্মানার্থে এটা বলতেই হবে যে, এইসব সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের ফাঁদে তারা কখনও গুরুতরভাবে জড়িয়ে পড়ে নি; অল্পকিছু অভিজাত হয়ে উঠেছিল ঘোর সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থী, তারা জানত তাদের নিজেদের কৃষক ভূমিদাসদের বিদ্রোহের চেয়ে রাশিয়ার অধীনতা থেকে তারা হারাত কম।

বোহেমীয়রা আর ক্রোয়েশীয়রা তখন সার্ব স্লাভীয় মৈত্রীজোটের প্রস্তুতির জন্যে একটা সাধারণ স্লাভ কংগ্রেস ডেকেছিল প্রাগে (৩৫)। অস্ট্রীয় সৈন্যদলের হস্তক্ষেপ না হলেও এই কংগ্রেস ব্যর্থ প্রতিপন্ন হত। স্লাভ ভাষা আছে কয়েকটা, সেগুলির মধ্যে পার্থক্য ইংরেজী, জার্মান আর সুইডেনীয় ভাষার মধ্যকার পার্থক্যেরই মতো, কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হলে বক্তাদের

কথা সবার বোধগম্য করার মতো কোন একটা ভাষা ছিল না। ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে দেখা হয়েছিল, সেটা ছিল অধিকাংশের কাছে সমানই অবোধগম্য, বেচারা স্লাভ-উৎসাহীদের একমাত্র অভিন্ন অনুভব ছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে সবার একই ঘৃণা, তারা শেষে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল ঘৃণ্য জার্মান ভাষায়, একমাত্র যেটা তারা সবাই বুঝত! কিন্তু ঠিক তখনই প্রাগে সমবেত হচ্ছিল আর-একটা স্লাভ কংগ্রেস, সেটা ছিল গ্যালিসীয় ল্যান্সার, ক্রোয়েশীয় আর স্লোভাক গ্রিনেডিয়ার এবং বোহেমীয় গোলন্দাজ আর কুইর‍্যাসিয়ারদের, আর এই আসল, সশস্ত্র স্লাভ কংগ্রেস ভিন্দিশগ্রেৎস-এর সেনাপতিত্বে চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে কাল্পনিক স্লাভ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের শহর থেকে খেদিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

অস্ট্রিয়ার সংবিধান-ডায়েটে বোহেমীয়, মরাভীয়, দলমেশীয় এবং অংশত পোলীয় ডেপুটিরা (অভিজাত) ঐ পরিষদে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রণালীবদ্ধ লড়াই চালিয়েছিল। এই পরিষদে জার্মানরা এবং পোল্‌দের একাংশ (গরিব হয়ে পড়া অভিজাতেরা) ছিল বৈপ্লবিক অগ্রগতির প্রধান সমর্থক। স্লাভ ডেপুটিদের প্রধান অংশটা তাদের বিরোধিতা করেছিল, এইভাবে নিজেদের সমগ্র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাটাকে স্পষ্ট প্রদর্শন করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তারা এতখানি নেমে গিয়েছিল যাতে যে অস্ট্রীয় সরকার প্রাগে তাদের সভা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল সেটারই সঙ্গে মিলে চালিয়েছিল গুপ্ত যোগসাজশ আর চক্রান্ত। এই কলঙ্কজনক আচরণের জন্যে তারা প্রতিফলও পেয়েছিল। ১৮৪৮ সালে অক্টোবর অভ্যুত্থানের সময়ে তারা সরকারকে সমর্থন করেছিল, এই ঘটনা থেকে শেষে সংবিধান-ডায়েটে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল; সেই প্রায় পুরোপুরি স্লাভ ডায়েটটাকে ভেঙে দিয়েছিল অস্ট্রীয় সৈনিকেরা, প্রাগ কংগ্রেসেরই মতো, আর সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থীরা ফের নড়াচড়া করলে তাদের জেলে পোরা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর তারা পেয়েছে শুধু এই যে, অস্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণের ফলে এখন সর্বত্রই খর্ব হচ্ছে স্লাভ জাতিসত্তা, এই পরিণামের জন্যে তারা দায়ী করতে পারে শুধু নিজেদের উন্মত্ততা আর অন্ধতাকেই।

হাঙ্গেরি এবং জার্মানির সীমান্ত সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলে আর-একটা ঝগড়া নিশ্চয়ই হত সেখানে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত,

সেখানে কোন ছুতো ছিল না, উভয় জাতির স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকায় তারা সংগ্রাম চালিয়েছিল একই শত্রুদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ অস্ট্রীয় সরকার এবং সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থী উন্মত্ততার বিরুদ্ধে। এই সমঝতায় মুহূর্তের জন্যেও কোন গোলযোগ ঘটে নি। কিন্তু ইতালীয় বিপ্লব জার্মানির অন্তত একাংশকে পারস্পরিক ধ্বংসকর যুদ্ধে জড়িয়ে নিয়েছিল; জন-মনের বিকাশ পিছিয়ে রাখতে মেটারনিখীয় ব্যবস্থাটা কতখানি কৃতকার্য হয়েছিল তার একটা প্রমাণ হিসেবে এখানে বলা দরকার, যারা ১৮৪৮ সালের প্রথম ছ'মাসে ভিয়েনায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল সেই লোকেরাই উৎসাহে ভরপুর হয়ে ইতালীয় দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে ফৌজে যোগ দিয়েছিল। তবে ভাব-ধারণার এই শোচনীয় তালগোল পাকান অবস্থা দীর্ঘকাল চলে নি।

শেষে, শ্লেজ্‌ভিগ আর হোল্‌স্টাইন নিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ। জাতিসত্তা, ভাষা এবং প্রবণতার দিক থেকে অঞ্চল-দুটি তর্কাতীতভাবেই জার্মান, তাছাড়া, সামরিক, নৌবাহিনী এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যিক কারণে জার্মানির পক্ষে প্রয়োজনীয়। গত তিন বছর ধরে অঞ্চল-দুটির বাসিন্দারা ডেনমার্কের প্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছে। অধিকন্তু, সন্ধিচুক্তি সংক্রান্ত অধিকার তাদেরই। মার্চের বিপ্লবের ফলে ডেন্‌দের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘাত ঘটে, আর জার্মানি তাদের সমর্থন করে। পোল্যান্ডে, ইতালিতে, বোহেমিয়ায় এবং পরে হাঙ্গেরিতে সামরিক অভিযান যৎপরোনাস্তি সতেজে চালান হলেও, এক্ষেত্রে, এই একমাত্র জনযুদ্ধে, অন্তত অংশত এই একমাত্র বৈপ্লবিক যুদ্ধে কিন্তু নিষ্পত্তিহীন অভিযান আর পাল্টা-অভিযানের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, আর প্রয়োগ করা হয়েছিল বৈদেশিক কূটনীতিক হস্তক্ষেপ, যার ফলে বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধবিগ্রহের পরে সমাপ্তিটা হয় অতি শোচনীয়। এই যুদ্ধের মধ্যে জার্মান সরকারগুলি প্রত্যেকটা উপলক্ষে শ্লেজ্‌ভিগ-হোল্‌স্টাইন বৈপ্লবিক ফৌজের প্রতি বেইমানি করে এবং যখন ফৌজটা ছত্রভঙ্গ কিংবা ভাগ-ভাগ হয়ে পড়ে তখন ইচ্ছে করে সেটাকে ডেন্‌দের হাতে কচু-কাটা হতে দেয়। একই আচরণ করা হয় জার্মান স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর প্রতি।

কিন্তু জার্মান নামটা যখন এইভাবে চতুর্দিক থেকে শুধু ঘৃণাই কুড়োয়, জার্মান নিয়মতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী সরকারগুলো আনন্দে গদ্‌গদ

হয়ে উঠেছিল। পোলীয় আর বোহেমীয় আন্দোলন-দুটিকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পেরেছিল। সর্বত্র তারা জিইয়ে তুলেছিল পুরন জাতিগত শত্রুতা, সেটা অতঃপর জার্মানদের, পোলদের ইতালীয়দের সমস্ত সাধারণী সমঝতা এবং কর্মকাণ্ড রোধ করেছিল। মানুষকে তারা গৃহযুদ্ধ এবং সৈন্যদের দমন-পীড়নের দৃশ্যে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। প্রুশীয় ফৌজ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল পোল্যাণ্ডে, অস্ট্রীয় ফৌজ — প্রাগে; শ্লেজভিগে আর লম্বার্ডিতে বৈপ্লবিক হলেও অদূরদর্শী নওজোয়ানের অঢেল প্রচুর দেশপ্রেমের (হাইনের ভাষায় 'die patriotische Überkraft'*) পরিণাম হয়েছিল শত্রুর ছটরা-গুলিতে বিনাশ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার আদত হাতিয়ার উভয় নিয়মিত ফৌজ বিদেশীদের উপর জয়লাভের সাহায্যে সাধারণের সুনজর পুনঃপ্রাপ্তির অবস্থায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা আবার বলি: অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তরফের বিরুদ্ধে অভিযানের উপকরণ হিসেবে উদারপন্থীদের দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা এই ফৌজ-দুটো যেইমাত্র কিছু পরিমাণ আত্মবিশ্বাস আর শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেছিল, অমনি তারা ঘুরে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুরন ব্যবস্থার লোকজনকে ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত করেছিল। রাডেটস্কি যখন আদিজে নদীর পিছনে তাঁর শিবিরে ভিয়েনার 'দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের' প্রথম হুকুম পেয়েছিলেন, তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন: 'এই মন্ত্রীরা কারা? তারা তো অস্ট্রিয়ার সরকার নয়! এখন আমার শিবিরে ছাড়া কোথাও নেই অস্ট্রিয়া; আমি আর আমার ফৌজ — আমরাই অস্ট্রিয়া; ইতালীয়দের যখন আমরা গুঁড়িয়ে দেব, তখন আমরা সাম্রাজ্য পুনর্জয় করব সম্রাটের জন্যে!' বৃদ্ধ রাডেটস্কি ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু ভিয়েনার অক্ষম, 'দায়িত্বশীল' মন্ত্রীরা কর্ণপাত করে নি তাঁর কথায়।

লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

* হাইনে, 'প্যারিসে রাত্রের পাহারাওয়ালার আগমন' ('আধুনিক কবিতাগুচ্ছ' থেকে)। — সম্পাঃ

প্যারিসের বিদ্রোহ।
ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ

১৮৪৮ সালে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকেই ইউরোপ মহাদেশে বৈপ্লবিক খরস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; প্রথম বিজয়ে লাভবান হয়েছিল সমাজের যেসব শ্রেণী সেগুলি অবিলম্বে বিজিতদের সঙ্গে মৈত্রীজোট গড়ে এটা ঘটিয়েছিল। ফ্রান্সে পেটি বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশটা রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। জার্মানিতে আর ইতালিতে বিজয়ী বুর্জোয়ারা জনগণ আর পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ত অভিজাতবর্গ, সরকারী আমলাতন্ত্র এবং ফৌজের সমর্থন প্রার্থনা করেছিল। সম্মিলিত রক্ষণপন্থী এবং প্রতিবৈপ্লবিক তরফগুলি প্রাবল্য আবার পুনরুদ্ধার করেছিল অচিরেই। ইংলণ্ডে একটা অকালিক এবং খারাপভাবে আয়োজিত জন-বিক্ষোভপ্রদর্শন (১০ এপ্রিল) আন্দোলনের পার্টির পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল (৩৬)। ফ্রান্সে দুটি অনুরূপ আন্দোলন (১৬ এপ্রিল (৩৭) এবং ১৫ মে (৩৮)) সমানেই পরাস্ত হয়েছিল। ইতালিতে রাজা-বোমা* নিজ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিলেন ১৫ মে এক-ঘায়ে (৩৯)। জার্মানিতে পৃথক পৃথক নতুন বুর্জোয়া সরকারগুলি এবং তাদের নিজ নিজ সংবিধান-সভা সংহত হয়ে উঠেছিল; ঘটনাবহুল ১৫ মে ভিয়েনায় জনগণের যে জয় হয়েছিল সেটা ছিল শুধু গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা, সেটাকে জন-কর্মতৎপরতার শেষ সফল ঝলকানি বলে ধরা যেতে পারে। মনে হচ্ছিল হাঙ্গেরিতে আন্দোলন বয়ে গেল সম্পূর্ণ বৈধতার নিরুপদ্রব খাতে; আর পোলীয় আন্দোলনকে প্রুশীয় বেয়নেট অংকুরে বিনষ্ট করল, যা আমরা দেখেছি আমাদের আগের একটা কিস্তিতে। তবে ঘটনাবলি শেষপর্যন্ত কোন্ দিকে মোড় ঘুরবে সেটা তখনও কিছুতেই নির্ধারিত হয়ে যায় নি, আর বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক

---

* দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড। — সম্পাঃ

তরফগুলির খোয়া যাওয়া প্রতি ইঞ্চি জমিন চূড়ান্ত কর্মকাণ্ডের জন্যে তাদের কাতারগুলিকে ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে সংহতই করেছে শুধু।

সেই চূড়ান্ত কর্মকাণ্ড ঘনিয়ে আসছিল। সেটা গড়া যেত কেবল ফ্রান্সেই; কেননা, বৈপ্লবিক সংগ্রামে ইংলণ্ড যতক্ষণ কোন অংশগ্রহণ করছিল না, আর জার্মানি থাকছিল বিভক্ত হয়ে, ততক্ষণ জাতীয় স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং কেন্দ্রীকরণের কারণে ফ্রান্সই ছিল চারদিককার দেশগুলিতে মহা আলোড়নের প্রেরণা সঞ্চারিত করার একমাত্র দেশ। এইভাবে, ১৮৪৮ সালে ২৩ জুন (৪০) প্যারিসে যখন শুরু হল রক্তাক্ত সংগ্রাম, যখন পর-পর প্রত্যেকটি তার কিংবা ডাকের সংবাদ ইউরোপের চোখের সামনে এটা স্পষ্ট খুলে ধরল যে, সেটা ছিল একদিকে মেহনতী জনসাধারণ এবং অন্য দিকে প্যারিসের জনসমষ্টির অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর (ফৌজের সমর্থিত) মধ্যে সংগ্রাম, যখন লড়াই চলল কয়েক দিন ধরে, আধুনিক গৃহযুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে যেটার উত্তেজনা-অস্থিরতার কোন জুড়ি নেই, অথচ কোন পক্ষেরই প্রাধান্য প্রতীয়মান হল না — তখন প্রত্যেকের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এটাই সেই চূড়ান্ত মস্ত লড়াই যেটা অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হলে সমগ্র ইউরোপকে ছেয়ে ফেলবে নতুন নতুন বিপ্লবের মহাপ্লাবনে, আর সেটা দমিত হলে প্রতিবৈপ্লবিক শাসন পুনঃস্থাপিত হবে অন্তত সাময়িকভাবে।

প্যারিসের প্রলেতারিয়ানরা পরাস্ত হল, নিহত হল ব্যাপকভাবে, বিধ্বস্ত হল, সেটা এতখানি কার্যকর হয়েছিল যাতে অদ্যাবধি তারা সেই আঘাত থেকে সামলে উঠতে পারে নি। অবিলম্বে ইউরোপের সর্বত্র নতুন এবং পুরন রক্ষণপন্থী আর প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেটা এতই ধৃষ্ট যাতে দেখা গিয়েছিল ঘটনাটার গুরুত্ব তারা বুঝেছিল কত ভালভাবে। পত্র-পত্রিকার উপর হামলা চলেছিল সর্বত্র, সভা-সমিতির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হয়েছিল, প্রত্যেকটা ছোট মফস্বল শহরে প্রত্যেকটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে জনগণকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, ঘোষণা করা হয়েছিল অবরোধের অবস্থা, কাভেনিয়াকের শেখান নতুন ধরনের সামরিক গতিবিধি এবং কৌশল অনুসারে সৈন্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, ফেব্রুয়ারি মাসের পরে সেই প্রথম বার প্রতিপন্ন হল যে, কোন প্রকাণ্ড শহরে জন-অভ্যুত্থানের অজেয়তার ধারণাটা একটা বিভ্রান্তি; সৈন্যবাহিনীগুলোর সম্মান

পুনঃস্থাপিত হল; গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার লড়াইগুলিতে সৈনিকেরা তদবধি সবসময়ে হেরে যেত — তারা এমনকি এই ধরনের লড়াইয়েও নিজেদের দক্ষতা সম্বন্ধে আস্থা ফিরে পেল।

জার্মানিতে সাবেক সামন্ততান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক তরফ এমনকি তাদের সাময়িক মিত্র বুর্জোয়াদের কাছ থেকেও অব্যাহতি পাবার এবং মার্চের ঘটনাবলির আগেকার অবস্থায় জার্মানিকে পুনঃস্থাপিত করার প্রথম-প্রথম নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে, সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে প্যারিসের শ্রমিকদের ঐ পরাজয়ের সময় থেকে। আবার রাষ্ট্রে নিষ্পত্তিকর ক্ষমতা হল ফৌজ, আর ফৌজের মালিক ছিল না বুর্জোয়ারা, মালিক ছিল তারা নিজেরাই। ১৮৪৮ সালের আগে প্রাশিয়ায় নিম্নতন শ্রেণীর অফিসারদের একাংশের বেশকিছুটা ঝোঁক দেখা যেত নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে — এমনকি সেই প্রাশিয়ায়ও বিপ্লবের ফলে ফৌজে চালু হওয়া বিশৃঙ্খলার দরুন ঐ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নওজোয়ানেরা আবার অনুগত হয়ে ওঠে। কোন সাধারণ সৈনিক যেইমাত্র অফিসারদের সম্পর্কে অল্পস্বল্প স্বাধীন আচরণ করে অমনি শৃঙ্খলা আর অকুণ্ঠ আজ্ঞাপালনের আবশ্যকতা অফিসারদের কাছে স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে। পরাস্ত অভিজাত আর আমলারা তখন নিজেদের সামনে পথ দেখতে শুরু করে; ফৌজ তখন অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে সম্মিলিত, ছোটখাটো অভ্যুত্থানে এবং বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহে জয়ের ফলে তারা উচ্ছ্বসিত, ফরাসী সৈনিকদের সবে অর্জিত মস্ত সাফল্য সংরক্ষণে তারা যত্নশীল — এই ফৌজকে জনগণের সঙ্গে অবিরাম ছোটখাটো সংঘাতে শুধু জড়িয়ে রাখলেই নিষ্পত্তিকর মুহূর্তটা এসে পড়লে এই ফৌজ একটা প্রচণ্ড আঘাতে বিপ্লবপন্থীদের চূর্ণবিচূর্ণ করবে এবং ঠেলে সরিয়ে দেবে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারিয়ানদের। এমন নিষ্পত্তিকর আঘাত হানার উপযুক্ত মুহূর্ত এসেছিল শিগগিরই বটে।

গ্রীষ্মকালে জার্মানিতে বিভিন্ন তরফ যেসব কখনও অদ্ভুত কিন্তু প্রধানত ক্লান্তিকর পার্লামেণ্টারি কাজকর্ম এবং স্থানীয় সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিল সেগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যেগুলোর একটা থেকেও কোন ব্যবহারিক ফল ফলে নি এমন বহু পার্লামেণ্টারি জয় সত্ত্বেও বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থকেরা খুবই সাধারণভাবে

বোধ করেছিল যে, প্রান্তবর্তী তরফগুলির মাঝামাঝি জায়গায় তাদের অবস্থান প্রতিদিনই টিকিয়ে রাখায় অসাধ্য হয়ে উঠেছিল আরও বেশি পরিমাণে, কাজেই কখনও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মৈত্রীর জন্যে চেষ্টা করতে, আর পরদিন অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক তরফগুলির অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে তারা বাধ্য। এই অবিরাম দোদুল্যমানতা তাদের প্রকৃতিটাকে জনমতের কাছে চূড়ান্ত মাত্রায় স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছিল, আর তখন ঘটনাবলি যেভাবে মোড় ঘুরছিল তাতে তারা যে পরিমাণে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়েছিল সেটা থেকে তখনকার মতো লাভবান হয়েছিল প্রধানত আমলাতন্ত্রী আর সামন্ততন্ত্রীরা।

শরৎকালের শুরুতে বিভিন্ন তরফের আপেক্ষিক মতাবস্থান এতই তাক্তবিরক্ত আর দোষদর্শী হয়ে উঠেছিল যাতে নিষ্পত্তিকর লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। গণতান্ত্রিক আর বৈপ্লবিক জনগণ এবং ফৌজের মধ্যে প্রথম লড়াই হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। গৌণ লড়াই মাত্র হলেও, এতে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ফৌজ অর্জন করেছিল আদৌ লক্ষণীয় প্রথম শ্রেষ্ঠত্ব, সেটার ফলিত ক্রিয়া হয়েছিল মস্ত। ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদের স্থাপিত শখের সরকারটাকে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সঙ্গে এমন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করতে দিয়েছিল, সেটা খুবই স্পষ্টপ্রতীয়মান কারণেই, যাতে শ্লেজ্‌ভিগের জার্মানদের সমর্পণ করা হয়েছিল ডেনমার্কের প্রতিহিংসার কাছে শুধু তাই নয়, ডেনিশ যুদ্ধের ভিত্তিতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া কমবেশি বৈপ্লবিক নীতিগুলিকেও তাতে ত্যাজ্য করা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে এই যুদ্ধবিরতি দুই-তিন ভোটের জনসংখ্যাধিক্যে বাতিল হয়েছিল। এই ভোটের পরে এসেছিল ভুয়ো মন্ত্রিত্ব সংকট, কিন্তু তিন দিন পরে পরিষদ ঐ ভোট পুনর্বিবেচনা করেছিল, ঐ ভোট নাকচ করতে এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জনসাধারণের ঘৃণা আর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এই লজ্জাকর কার্যধারার ফলে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া হয়ে গিয়েছিল, তবে ফ্রাঙ্কফুর্টে যথেষ্ট সৈন্য আনান হয়েছিল আগেই, অভ্যুত্থান দমন হয়েছিল ছ'ঘণ্টা লড়াইয়ের পরে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছিল জার্মানির অন্যান্য জায়গায় (বাডেন-এ, কলোন্‌-এ), কিন্তু সেগুলির একই পরাজয় ঘটেছিল।

এই প্রারম্ভিক লড়াইয়ের ফলে প্রতিবিপ্লবের তরফের একটা মস্ত সুবিধে

হয়েছিল: অন্তত বাহ্যত পুরোপুরি সাধারণের গণনির্বাচন থেকে উদ্ভূত একমাত্র সরকার ফ্রাঙ্কফুর্টের সাম্রাজ্যিক সরকার এবং জাতীয় পরিষদও সাধারণের দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়ে গেল। সাধারণের সংকল্পের অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে সৈনিকদের বেয়নেটের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল এই সরকার এবং এই পরিষদ। তারা দুর্নামভাগী হল; যে সামান্য শ্রদ্ধা তারা তদবধি হয়ত দাবি করতে পারত, তাও গেল; নিজেদের উৎপত্তি অস্বীকার করার ফলে, জনবিরোধী সরকারগুলি এবং তাদের সৈন্যদের উপর নির্ভরের ফলে সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি, তাঁর মন্ত্রীরা এবং ডেপুটিরা অতঃপর একেবারেই নাস্তি হয়ে গেল। অক্ষম কল্পনাবিলাসী লোকগুলির সংস্থাটার পাঠান প্রত্যেকটা নির্দেশ, প্রত্যেকটা অনুরোধ, প্রত্যেকটা ডেপুটেশনকে প্রথমে অস্ট্রিয়া, তারপরে প্রাশিয়া এবং পরে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিও কতখানি অবজ্ঞাভরে দেখত সেটা আমরা দেখতে পাব শিগ্‌গিরই।

জুন মাসের ফরাসী লড়াইয়ের যে মহা প্রতিধ্বনি হয়েছিল, সেই কথায় আমরা এখন আসছি — যে ঘটনা জার্মানির পক্ষে নিষ্পত্তিকর হয়েছিল ফ্রান্সে প্যারিসের প্রলেতারিয়ানদের সংগ্রামেরই মতো। আমরা বলছি ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসের বিপ্লব এবং তারপরে ভিয়েনার উপর প্রচণ্ড আক্রমণের কথা। তবে এই লড়াইয়ের গুরুত্ব এমনই, আর যেসব বিভিন্ন পরিস্থিতি সেটার অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ কারণ সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে 'Tribune'-এর স্তম্ভগুলির এতটা অংশ লাগবে, যাতে সেটা নিয়ে একটা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

লণ্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

১১

ভিয়েনার অভ্যুত্থান

আমরা এখন সেই নিষ্পত্তিকর ঘটনাটার বিষয় ধরছি যেটা ছিল জুন মাসের প্যারিসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনীয় জার্মানির ঘটনাবলি যা একটামাত্র

আঘাতে প্রতিবৈপ্লবিক তরফের অনুকূলে পাল্লা ভারি করে দিয়েছিল: ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনার অভ্যুত্থান।

১৩ মার্চের বিজয়ের পরে ভিয়েনায় বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান কী ছিল সেটা আমরা দেখেছি। আমরা আরও দেখেছি জার্মান অস্ট্রিয়ার আন্দোলন কিভাবে অস্ট্রিয়ার অ-জার্মান প্রদেশগুলির ঘটনাবলির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল এবং ঘটনাবলি দিয়ে ব্যাহত হয়েছিল। তাহলে, জার্মান অস্ট্রিয়ার এই শেষ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ঘটার কারণগুলো নিয়ে সংক্ষেপে সমীক্ষা করাটাই শুধু আমাদের বাকি আছে।

মেটারনিখীয় সরকারের প্রধান বেসরকারী অবলম্বন ছিল উপরতলার অভিজাতেরা আর ফটকা-ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা; এমনকি মার্চের ঘটনাবলির পরেও সরকারের ব্যাপারে তারা প্রাধান্যশীল প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল দরবার, ফৌজ আর আমলাতন্ত্রের সাহায্যেই শুধু নয়, সেটা আরও বেশি পরিমাণে 'অরাজকতা'র বিভীষিকার সাহায্যে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বুর্জোয়াদের মধ্যে। জনমত যাচাই করার জন্যে তারা শিগ্গিরই সাহস করে অল্প কয়েকটা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল — যেমন, 'সংবাদপত্র আইন' (৪১), একটা নিরাকার ধরনের 'অভিজাত সংবিধান' (৪২), সাবেকী 'সামাজিক বর্গ' বিভেদের ভিত্তিতে একটা 'নির্বাচনী আইন' (৪৩)। আধা-উদারপন্থী, ভীরু, অযোগ্য আমলাদের নিয়ে গড়া তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা ১৪ মে তারিখে ঝুঁকি নিয়ে এমনকি জনগণের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর সরাসরি হামলা করেছিল — জাতীয় রক্ষিবাহিনী এবং অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের (৪৪) প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া কেন্দ্রীয় কমিটিটিকে তারা ভেঙে দিয়েছিল, এই সংস্থাটা গঠিত হয়েছিল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে আহ্বান করার বিশেষ-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। কিন্তু কর্মটা ১৫ মে তারিখের অভ্যুত্থানটাকে খুঁচিয়েই তুলেছিল শুধু, সেটার জোরে সরকার কমিটিটিকে স্বীকার করতে, সংবিধান আর নির্বাচনী আইন রদ করতে, এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার অনুসারে নির্বাচিত সংবিধান-ডায়েটকে নতুন বুনিয়াদী বিধান রচনা করার ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরদিন একটা সাম্রাজ্যিক উদ্ঘোষণায় এই সবকিছু অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিরা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী তরফেরও, তারা

জনগণের অর্জিত সাফল্যের উপর নতুন হামলা চালাতে প্রবৃত্ত করাল তাদের 'উদারপন্থী' সহযোগীদের। আন্দোলনের তরফের দৃঢ়ঘাঁটি, অবিরাম আলোড়নের কেন্দ্র 'অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন' ঠিক এই জন্যেই ভিয়েনার অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী বার্গারদের পক্ষে আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল। ২৬ মে একটা সরকারী ডিক্রি দিয়ে সেটাকে ভেঙে দেওয়া হল। এই আঘাতটা হয়ত কৃতকার্য হতে পারত যদি এটাকে বলবৎ করা হত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটা অংশকে দিয়েই শুধু, কিন্তু সরকার তাদেরও বিশ্বাস করত না বলে সামনে নিয়ে এল সৈন্যদের, আর অমনি জাতীয় রক্ষিবাহিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের সঙ্গে মিলিত হল এবং এইভাবে ব্যর্থ করে দিল সরকারী পরিকল্পনাটাকে।

কিন্তু সম্রাট* এবং তাঁর দরবার ইতোমধ্যে ভিয়েনা ছেড়ে গিয়েছিলেন ১৬ মে তারিখে এবং পালিয়ে গিয়েছিলেন ইনস্‌ব্রুকে। এখানে তাদের ঘিরে ছিল অন্ধভক্ত তিরলীয়রা, তাদের অঞ্চলে সার্ডো-লম্বার্ডীয় ফৌজের আক্রমণের আশংকা থেকে তাদের রাজানুগত্য আবার চাগিয়ে উঠেছিল; সেখানে ছিল রাডেটস্কির সৈন্যদের নৈকট্যের অবলম্বন, ইনস্‌ব্রুক ছিল তার কামানের গোলার পাল্লার ভিতরে; এখানে প্রতিবিপ্লবের তরফ এমন একটা আশ্রয় পেল যেখান থেকে অনিয়ন্ত্রিত, অলক্ষিত এবং নিরাপদ থেকে সেটা নিজের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে সমবেত করতে পারে, এবং সেটার চক্রান্তজাল আবার ছড়িয়ে দিতে পারে সারা দেশে। যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হল রাডেটস্কির সঙ্গে, ইয়েলাচিচের সঙ্গে আর ভিন্দিশ্‌গ্রেৎসের সঙ্গে, তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসনিক চক্রের মধ্যকার নির্ভরযোগ্য লোকজনের সঙ্গে; আবার নানা চক্রান্ত ফাঁদা হল স্লাভ সর্দারদের সঙ্গে; এইভাবে প্রতিবৈপ্লবিক গুপ্ত চক্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্যে গড়ে তোলা হল একটা সত্যিকারের শক্তি, আর ওদিকে বৈপ্লবিক জনগণের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ এবং আসন্ন সংবিধান-সভার বিতর্কের মধ্যে ক্ষয়ে যেতে দেওয়া হল ভিয়েনার অক্ষম মন্ত্রীদের স্বল্পকালীন এবং ক্ষীণ জনপ্রিয়তা। এইভাবে, রাজধানীর আন্দোলনটাকে

---

* প্রথম ফার্ডিন্যান্ড। — সম্পাঃ

কিছুকালের জন্যে নিজের মতো থাকতে দেওয়া হল; ফ্রান্সের মতো কেন্দ্রীকৃত এবং সমরূপ দেশে এমন কর্মনীতির ফলে আন্দোলনের তরফ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠত, কিন্তু এখানে, অস্ট্রিয়ায় পাঁচমিশালি রাজনীতিক পিণ্ডটার বেলায় এই কর্মনীতি হল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শক্তি পুনঃসংগঠিত করার সবচেয়ে নিরাপদ একটা উপায়।

ভিয়েনায় বুর্জোয়ারা স্থির করল, পর-পর তিনটে পরাজয়ের পরে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান-ডায়েটের মুখে দরবারের তরফ আর কোন প্রতিপক্ষ নয়, এটা মনে করে তারা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ক্লান্তি আর অনীহার মাঝে গা ছেড়ে দিল এবং চিরকেলে রব তুলল শৃঙ্খলা আর শান্তির জন্যে; প্রচণ্ড আন্দোলন-আলোড়ন এবং তজ্জনিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলায় পড়ে এই শ্রেণীটাকে এই মনোভাবে ধরে। অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে ম্যানুফ্যাকচারজাত জিনিসের উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিলাসসামগ্রীতে গণ্ডিবদ্ধ, সেগুলোর জন্যে চাহিদা বিপ্লবের পর থেকে এবং দরবারের পলায়নের ফলে অনিবার্যভাবেই ছিল সামান্য। নিয়মিত শাসনপ্রণালী এবং দরবার ফিরে এলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্ত ঘটার আশা করা যেত — ঐ প্রত্যাবর্তনের জন্যে হাঁক-ডাক বুর্জোয়াদের মধ্যে সর্বাত্মক হয়ে উঠল। জুলাই মাসে সংবিধান-ডায়েটের উদ্বোধন উপলক্ষে উল্লাস করা হল বৈপ্লবিক যুগের অবসান হিসেবে। তেমনই অভিনন্দিত হল দরবারের প্রত্যাবর্তন, -- ইতালিতে রাডেটস্কির জয়গুলোর পরে এবং ডোব্‌ল্‌হফের প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার অধিষ্ঠানের পরে দরবার জন-খরস্রোতের সম্মুখীন হতে সাহস করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেছিল নিজেকে, তার সঙ্গে সঙ্গে, ডায়েটে স্লাভ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে ষড়যন্ত্রগুলো নিষ্পন্ন করার জন্যে ভিয়েনায় দরবারের উপস্থিতি আবশ্যক মনে করল। সংবিধান-ডায়েট যখন আলোচনা করছিল সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব-বন্ধন এবং অভিজাতদের জন্যে বেগার খাটুনি থেকে কৃষকদের মুক্ত করার আইন নিয়ে, তখন পরম কুশলী একটা আঘাতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছিল দরবার। ১৯ আগস্ট সম্রাটকে দিয়ে জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে পরিদর্শন করার প্রস্তাব পেশ করা হল। রাজপরিবার, অমাত্যেরা, জেনেরালেরা পাল্লা দিয়ে স্তাবকতা করল সশস্ত্র বার্গারদের, এরা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি

হিসেবে স্বীকৃত দেখে ইতোমধ্যে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তার ঠিক পরেই মন্ত্রিসভায় একমাত্র লোকগ্রাহ্য মন্ত্রী ম. শ্‌ভার্টসেরের সই করা একটা ডিক্রি প্রকাশিত হল, কর্মহীন মেহনতীদের তদবধি দেওয়া সরকারী সাহায্য তাতে বাতিল করা হল। ফতে হল ফন্দিটা। শ্রমিকরা বিক্ষোভপ্রদর্শন করল; বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহিনী দাঁড়াল তাদের মন্ত্রীটির ডিক্রির পক্ষে; তারা 'নৈরাজ্যবাদীদের' উপর আক্রমণ করল; নিরস্ত্র, প্রতিরোধে বিরত শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বহুসংখ্যক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করল ২৩ আগস্ট তারিখে। এইভাবে ভেঙে গেল বৈপ্লবিক বাহিনীর শক্তি আর ঐক্য। বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ভিয়েনায়ও ফেটে পড়ল রক্তাক্ত বিস্ফোরণে, আর প্রতিবৈপ্লবিক চক্রিদল বুঝল তাদের প্রধান আঘাত হানার দিন ঘনিয়ে এল।

তারা কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাজ চালাতে মনস্থ করেছে সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সুযোগ অচিরেই জুটিয়ে দিল হাঙ্গেরির ব্যাপার: ৫ অক্টোবর সরকারী 'Wiener Zeitung' (৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্রাজ্যিক ডিক্রিতে হাঙ্গেরির ডায়েট ভেঙে দেবার ঘোষণা করে ক্রোয়েশিয়ার বান্ ইয়েলাচিচ্‌কে করা হল দেশটির বেসামরিক এবং সামরিক গভর্নর, ইয়েলাচিচ্ — দক্ষিণ-স্লাভ প্রতিক্রিয়াশীলতার নেতা, তিনি হাঙ্গেরির বিধিসংগত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত ছিলেন। ডিক্রিটাতে হাঙ্গেরির কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর ছিল না। তার সঙ্গে সঙ্গে, ভিয়েনার সৈন্যদলকে যুদ্ধসজ্জায় এগিয়ে গিয়ে ইয়েলাচিচের কর্তৃত্ব বলবৎ করার জন্যে নির্দিষ্ট ফৌজের অংশ হতে নির্দেশ দেওয়া হল। তবে কিনা, এতে করে শয়তানিটা প্রকাশ হয়ে পড়ল বড্ড বেশি স্পষ্টভাবে: ভিয়েনায় প্রত্যেকেই উপলব্ধি করল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হল নিয়মতন্ত্রসম্মত শাসন সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর ছাড়াই একটা ডিক্রিকে আইনগত বলবত্তা দিতে সম্রাট চেষ্টা করায় সেই ডিক্রিতেই ঐ নীতি পদদলিত হয়। ৬ অক্টোবর জনগণ, অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন, ভিয়েনার জাতীয় রক্ষিবাহিনী সবাই একত্রে বিদ্রোহী হয়ে সৈন্যদলের যাত্রায় বাধা দিল। কিছু কিছু গ্রিনেডিয়ার চলে গেল জনগণের পক্ষে; অল্পকালের লড়াই হল জন-বাহিনী এবং সৈন্যদলের মধ্যে; জনগণের হাতে নিহত হল যুদ্ধ মন্ত্রী লাতুর, সন্ধ্যা

নাগত জনগণ হল বিজেতা। ইতোমধ্যে, স্টুলভেইসেনবুর্গে* পের্সেলের হাতে পরাস্ত হয়ে বান্ ইয়েলাচিচ্ আশ্রয় নিয়েছিলেন ভিয়েনার কাছে জার্মান-অস্ট্রীয় রাজ্যক্ষেত্রে। তাঁকে সমর্থন করতে যুদ্ধযাত্রা করার কথা ছিল ভিয়েনার সৈন্যদলের, সেটা তাঁর সুস্পষ্ট বিরোধী এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল; আর সম্রাট এবং দরবার আবার পালিয়ে গেলেন আধা-স্লাভ অঞ্চলের ওলমুট্স** শহরে।

কিন্তু ওলমুট্সে গিয়ে দরবার দেখল পরিস্থিতিটা ইন্সব্রুকের অবস্থা থেকে খুবই পৃথক। তখন দরবার অবিলম্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার মতো অবস্থায় ছিল। সেটাকে ঘিরে ছিল সংবিধান-সভার স্লাভ ডেপুটিরা, তারা দলে দলে ভিড় করে গিয়েছিল ওলমুট্সে, আর ঘিরে ছিল রাজ্যের সমস্ত জায়গা থেকে আগত স্লাভীয় উৎসাহীরা। তাদের বিবেচনায় অভিযানটা হত স্লাভতন্ত্র পুনঃসংস্থাপনের এবং যা স্লাভভূমি বলে গণ্য ছিল সেখানে দুটো অনধিকার-প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে, জার্মান আর মাগিয়ারের বিরুদ্ধে উন্মূলনের যুদ্ধ। ভিয়েনার চারপাশে সমবেত সৈন্যদলগুলির তখনকার সেনাপতি প্রাগ-বিজয়ী ভিন্দিশ্‌গ্রেৎস সঙ্গেসঙ্গেই হয়ে উঠলেন স্লাভ জাতিসত্তার বীর-নায়ক। সমস্ত দিক থেকে এসে তাঁর সৈন্যদল দ্রুত কেন্দ্রীভূত হল। ইয়েলাচিচের সৈন্যদল এবং ভিয়েনার প্রাক্তন গ্যারিসনের সঙ্গে শামিল হবার জন্যে ভিয়েনা অভিমুখী রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট মার্চ করে চলল বোহেমিয়া, মরাভিয়া, স্টিরিয়া, উচ্চ অস্ট্রিয়া এবং ইতালি থেকে। এইভাবে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক হয়েছিল ষাট হাজারের বেশি সৈনিক, তারা সাম্রাজ্যিক নগরীটিকে সমস্ত দিক থেকে ঘেরাও করতে শুরু করেছিল অচিরেই, শেষে নিষ্পত্তিকর আক্রমণ চালাতে সাহস করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে তারা এগিয়েছিল ৩০ অক্টোবর।

ভিয়েনায় ইতোমধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং অসহায় ভাব। জয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা আবার 'অরাজক' মেহনতী শ্রেণীগুলির প্রতি তাদের পুরন অবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মেহনতীজনের

* হাঙ্গেরীয় নাম: সেকেশ্‌ফেখের্‌ভার। — সম্পাঃ

** চেক্ নাম: ওলমউৎস। — সম্পাঃ

প্রতি সশস্ত্র বুর্জোয়ারা ছ' সপ্তাহ আগে যে আচরণ করেছিল সেকথা এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের অস্থির, দোদুল্যমান কর্মনীতির কথা মনে রেখে মেহনতীজনেরা বুর্জোয়াদের হাতে নগরীর প্রতিরক্ষা ন্যস্ত করতে রাজী না হয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সংগঠন দাবি করল নিজেদেরই জন্যে। সাম্রাজ্যিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার [illegible] অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন শ্রেণী-দুটির মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রকৃতিটা বুঝতে, এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করতে অপারক হল সম্পূর্ণভাবে। তখন বিভ্রান্তি জন-মনে, বিভ্রান্তি শাসক পরিষদগুলিতে। ডায়েটের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ জার্মান ডেপুটিরা এবং অল্প কয়েক জন বিপ্লবী পোলীয় ডেপুটি ছাড়া ওলমুট্সের বন্ধুদের তরফে গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ অল্পকিছু স্লাভরা অধিবেশন চালাতে থাকল অবিরাম। কিন্তু সক্রিয় কার্যকলাপের বদলে তারা সমস্ত সময় নষ্ট করতে থাকল নিয়মতান্ত্রিক প্রথা-রীতির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে না গিয়ে সাম্রাজ্যিক ফৌজকে বাধা দেবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিতর্কে। ভিয়েনার প্রায় সমস্ত জন-সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া 'নিরাপত্তা কমিটি' প্রতিরোধ করতে কৃতসংকল্প হলেও তাতে প্রাধান্য ছিল বার্গার আর খুদে ব্যাপারী সংখ্যাগরিষ্ঠের, তারা কমিটিকে কোন দৃঢ়সংকল্প, তেজীয়ান কর্মধারা নিয়ে এগিয়ে চলতে দিল না। অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের কমিটি বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করল, কিন্তু তারা পরিচালকের ভূমিকা নিতে সক্ষম ছিল না কোনক্রমেই। মেহনতীরা ছিল অবিশ্বাসভাজন, নিরস্ত্র, অসংগঠিত, তারা পুরন আমলের মানসিক বন্দিত্ব থেকে বড় একটা বেরিয়ে আসে নি, তাদের সবে জেগে উঠছিল নিজেদের সামাজিক অবস্থান এবং উপযুক্ত রাজনীতিক কর্মধারা সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, সেটা সহজজ্ঞানমাত্র — তারা নিজেদের কথা শোনাতে পারত শুধু উচ্চরব মিছিল দিয়ে, তারা তখনকার দুষ্করতা প্রসঙ্গে উপযুক্ত এবং প্রস্তুত হবে তা আশা করা যেত না। কিন্তু অস্ত্র পাওয়ামাত্র শেষ পর্যন্ত লড়তে তারা প্রস্তুত ছিল — জার্মানিতে বিপ্লবের সময়ে তারা যেমনটা ছিল বরাবর।

এই ছিল ভিয়েনার হালচাল। বাইরে — ইতালিতে রাডেট্স্কির জয়গুলির জন্যে উচ্ছ্বসিত পুনঃসংগঠিত অস্ট্রীয় ফৌজ; ষাট কিংবা সত্তর হাজার অস্ত্রে সুসজ্জিত, সুসংগঠিত সৈনিক, তারা সুপরিচালিত না হলেও

তাদের অন্তত ছিল সেনাপতিরা। ভিতরে — বিভ্রান্তি, শ্রেণীবিরোধ, বিশৃঙ্খলা: জাতীয় রক্ষিবাহিনী, যেটার একাংশ আদৌ না লড়তে কৃতসংকল্প, একাংশ অস্থিরসংকল্প, শুধু সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশটা ক্রিয়াকলাপের জন্যে প্রস্তুত; প্রলেতারিয়ান জনরাশি, তারা সংখ্যায় বিশাল, কিন্তু নেতৃবিহীন, যাদের কোন রাজনীতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, প্রায় বিনা কারণেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত কিংবা ক্রোধে-উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠতে পারত, ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকটা মিথ্যা গুজবের শিকার, লড়তে খুবই আগ্রহী, কিন্তু অন্তত শুরুতে অস্ত্রহীন, আর অবশেষে যখন তারা লড়াইয়ে পরিচালিত হয় তখন অসম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত এবং সামান্যই সংগঠিত; যখন মাথার উপর ছাদ প্রায় জ্বলছে সেই অবস্থায় তাত্ত্বিক মারপেঁচ নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত অসহায় ডায়েট; প্রেরণা কিংবা কর্মশক্তি বর্জিত একটা নেতৃত্বকর কমিটি। সবকিছু বদলে গিয়েছিল মার্চ আর মে মাসের দিনগুলি থেকে, যখন প্রতিবৈপ্লবিক শিবির ছিল বিভ্রান্তিময়, আর একমাত্র সংগঠিত শক্তি ছিল যেটাকে সৃষ্টি করেছিল বিপ্লব। এমন সংগ্রামের পরিণাম সম্বন্ধে সংশয় বড় একটা থাকতে পারত না, আর যাকিছু সংশয় হয়ত-বা ছিল সেটার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিল ৩০ আর ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বরের ঘটনাগুলি।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১২

ভিয়েনায় ঝটিকা আক্রমণ। ভিয়েনার প্রতি বেইমানি

ভিন্দিশগ্রেৎসের একত্র-করা ফৌজ শেষে যখন ভিয়েনায় আক্রমণ শুরু করেছিল তখন প্রতিরক্ষার জন্যে যে শক্তি হাজির করা গিয়েছিল সেটা ছিল ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর শুধু একটা অংশকে আনা হয়েছিল পরিখায়। তাড়াহুড়ো করে শেষে একটা প্রলেতারিয়ান রক্ষিবাহিনী গড়া হয়েছিল বটে, কিন্তু জনসমষ্টির সবচেয়ে

সংখ্যাবহুল, সবচেয়ে নির্ভয় এবং সবচেয়ে তেজীয়ান এই অংশটাকে এইভাবে কাজে আনার চেষ্টাটার বিলম্বের দরুন সেটা অসদ্ব্যবহার করায় এবং শৃঙ্খলার প্রথম-প্রথম মূল উপাদানগুলিতে এতই কম অভ্যস্ত ছিল যাতে সেটা প্রতিরোধ করতে পারত না। তিন থেকে চার হাজার জনের অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন ভালভাবে তালিম দেওয়া ছিল, কিছু পরিমাণ শৃঙ্খলা ছিল তাদের, তারা ছিল সাহসী এবং উৎসাহী — সেটাই হল, সামরিক দিক থেকে বলতে গেলে, নিজ কাজটা করতে কৃতকার্য হতে পারার মতো একমাত্র শক্তি। ওদিকে, ইয়েলাচিচের দস্যুদঙ্গলগুলো তাদের অভ্যাসাদির প্রকৃতির অনুসারেই একবাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে, একগলি থেকে অন্য গলিতে লড়াইয়ে খুবই কাজের, তাদের হিসেবে না ধরলেও ভিন্দিশগ্রেৎসের ঢের বেশি সংখ্যাবহুল নিয়মিত সৈনিকদের বিরুদ্ধে অল্পকিছু নির্ভরযোগ্য জাতীয় রক্ষিদল এবং সশস্ত্র প্রলেতারিয়ানদের তালগোল পাকান পিণ্ডটা সমেত ঐ অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন আর কী? ভিন্দিশগ্রেৎস যেগুলোর অমন যথেচ্ছ অপব্যবহার করত সেই বহুসংখ্যক এবং নিখুঁতভাবে সজ্জিত কামানশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার জন্যে বিদ্রোহীদের হাতে অল্পকিছু পুরন, জীর্ণ, খারাপভাবে স্থাপিত এবং অযত্নে রক্ষিত কামানই-বা কী?

বিপদ যতই কাছিয়ে আসতে থাকল, ততই বেড়ে চলল ভিয়েনায় বিশৃঙ্খলা। রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে ছিল পেৰ্সেলের হাঙ্গেরীয় ফৌজ, সাহায্যের জন্য সেটাকে ডাকতে শেষ মুহূর্ত অবধি যথেষ্ট কর্মতৎপর হয়ে উঠতে পারল না ডায়েট। 'নিরাপত্তা কমিটি' পাস করল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রস্তাব, সশস্ত্র জনগণেরই মতো তারা নিজেরাই গুজব আর পাল্টা-গুজবের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ভাসছিল আর নামছিল। সবাই একমত ছিল শুধু একটা ব্যাপারে — সেটা হল মালিকানা মানা করা; আর সেটা করা হয়েছিল অমন সময়ের পক্ষে প্রায় হাস্যকর মাত্রায়। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার ব্যাপারে করা হয়েছিল যৎসামান্যই। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে কেউ পারলে ভিয়েনাকে উদ্ধার করতে পারতেন একটিমাত্র মানুষ — বেম, জন্মসূত্রে স্লাভ তিনি তখন ভিয়েনার একজন প্রায় অজ্ঞাত বিদেশী, সর্বজনীন অবিশ্বাসের মাঝে অসহায় হয়ে তিনি সেকাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অধ্যবসায়ী হলে তাঁকে হয়ত রাষ্ট্রদ্রোহী

হিসেবে লিঙ্ক্ করা হতে পারত। বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মেসেনহাউসের যতটা ছিলেন এমনকি সাবল্টার্ন অফিসারও নয়, বরং ঔপন্যাসিক, তিনি ছিলেন করণীয় কাজটার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। অথচ আট মাসের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরেও জনগণের তরফ তাঁর চেয়ে বেশি সামর্থ্যসম্পন্ন কোন সামরিক কর্মী পয়দা করতে কিংবা সংগ্রহ করতে পারে নি। লড়াই শুরু হয়েছিল এই পরিস্থিতিতে। ভিয়েনার মানুষের প্রতিরক্ষার উপকরণ ছিল যৎপরোনাস্তি সামান্য এবং সৈন্যশ্রেণীগুলিতে সামরিক দক্ষতা আর সংগঠন ছিল না একেবারেই, এটা বিবেচনায় রাখলে বলতে হয়, অতি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধই তারা করেছিল। বেম্ যখন সেনাপতি ছিলেন তখন অনেক জায়গায় 'ফাঁড়িটাকে শেষ সৈনিক বেঁচে থাকা অবধি রক্ষা করো' নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হত। কিন্তু জয় হল শক্তির। দীর্ঘ এবং প্রশস্ত সড়কে, শহরতলির প্রধান প্রধান বীথিকাগুলিতে ব্যারিকেডের পরে ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল সাম্রাজ্যিক কামানশ্রেণী; লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় ক্রোট্রা দখল করল পুরন শহরের ঢালুর সামনেকার গৃহশ্রেণী। হাঙ্গেরীয় ফৌজের একটা ক্ষীণ এবং বিশৃঙ্খল আক্রমণ সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময়ে, যখন পুরন শহরের কোন কোন সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করেছিল, দ্বিধা করছিল এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল কেউ কেউ, নতুন করে প্রতিরোধব্যবস্থা প্রস্তুত করছিল অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের অবশিষ্টাংশ, তখন একজায়গায় প্রবেশ করেছিল সাম্রাজ্যিক বাহিনী আর সেই সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলার মাঝে বিজিত হয়েছিল পুরন শহর।

এই বিজয়ের অব্যবহিত পরিণতি — সামরিক আইনের পাশবিকতা আর নিধনকান্ড, ভিয়েনার উপর লেলিয়ে-দেওয়া স্লাভ দস্যুদঙ্গলের অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতা আর জঘন্যতা — এসব খুবই সুবিদিত, তাই এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। পরবর্তী পরিণতি নিয়ে, ভিয়েনায় বিপ্লবের পরাজয় জার্মানির বিষয়াবলিতে যে সম্পূর্ণ নতুন মোড় ঘুরিয়ে দিল সেটা নিয়ে আমাদের পরে মন্তব্য করার কারণ ঘটবে। ঝটিকা আক্রমণে ভিয়েনা দখল প্রসঙ্গে দুটো বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা বাকি আছে। ঐ শহরের ছিল দুটি মিত্র: হাঙ্গেরীয়রা এবং জার্মান জনগণ। কোথায় ছিল তারা এই কঠোর পরীক্ষার সময়ে?

আমরা দেখেছি, সদ্য-মুক্ত মানুষের যাবতীয় উদারতাসম্পন্ন ভিয়েনাবাসীরা যে কর্মব্রতসাধনে এগিয়েছিল সেটা আখেরে তাদের নিজেদের হলেও প্রথমত এবং সর্বোপরি ছিল হাঙ্গেরীয়দের কর্মব্রত। অস্ট্রীয় সৈন্যদলগুলো হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে অভিযান করে সেটা বরদাস্ত করার চেয়ে তারা বরং প্রথম এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড আক্রমণটাকে করল নিজেদের অভিমুখী। তারা এই মহৎ কাজটা করল তাদের মিত্রদের সমর্থনে, আর ইয়েলাচিচের বিরুদ্ধে কৃতকার্য হাঙ্গেরীয়রা তাঁকে তাড়িয়ে দিল ভিয়েনার দিকে, এবং এই জয় দিয়ে ভিয়েনা শহর আক্রমণ করবে যে সৈন্যবাহিনী সেটার শক্তি বাড়িয়ে দিল। এই পরিস্থিতিতে, ভিয়েনায় ডায়েটকে নয়, 'নিরাপত্তা কমিটি' কিংবা ভিয়েনার অন্য কোন সরকারী সংস্থাকে নয়, **ভিয়েনার বিপ্লবকে** বিলম্ব না করে এবং প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত শক্তি দিয়ে সমর্থন করাই ছিল হাঙ্গেরির স্পষ্ট কর্তব্য। ভিয়েনা লড়ে দিয়েছিল হাঙ্গেরির প্রথম লড়াই সেকথা হাঙ্গেরি যদি-বা ভুলেও গিয়ে থাকত, তবু নিজ নিরাপত্তার গরজেই হাঙ্গেরির ভোলা চলত না যে, ভিয়েনা ছিল হাঙ্গেরীয় স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাঘাঁটি, আর ভিয়েনার পতনের পরে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সম্মুখীন হতে পারে না আর কিছুই। তবে কিনা, ভিয়েনা অবরোধ এবং সেখানে ঝটিকা আক্রমণের সময়ে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে হাঙ্গেরীয়রা যা বলতে পারে এবং বলেছে তা আমরা জানি: তাদের নিজেদের সংগ্রামী শক্তির অপ্রতুল অবস্থা, ভিয়েনায় ডায়েট কিংবা অন্য কোন সরকারী সংস্থা তাদের ডেকে নিতে অসম্মত হল, নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে অবস্থান আবশ্যক ছিল, জার্মান কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া এড়াবার প্রয়োজন। হাঙ্গেরীয় ফৌজের অপ্রতুল অবস্থা প্রসঙ্গে কথা হল এই যে, ভিয়েনার বিপ্লব এবং ইয়েলাচিচের উপস্থিতির পরবর্তী প্রথম দিনগুলিতে স্থায়ী সৈন্যদল হিসেবে কিছুই আবশ্যক ছিল না, কেননা অস্ট্রীয় স্থায়ী সৈন্যদল মোটেই কেন্দ্রীভূত ছিল না; স্টুলভেইসেনবুর্গে লড়েছিল যে লাণ্ডস্টুর্ম শুধু তাই দিয়েই ইয়েলাচিচের বিরুদ্ধে প্রথম জয়টার পর সেটাকে সতেজে কঠোরতা বজায় রেখে চালিয়ে গেলেই ভিয়েনার মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটাবার জন্যে এবং সেদিন থেকে ছ'মাস অবধি অস্ট্রীয় ফৌজের যেকোন সমাবেশ মুলতুবি করার জন্যে সেটাই যথেষ্ট হত। যুদ্ধে, বিশেষত বৈপ্লবিক

যুদ্ধবিগ্রহে কোন স্পষ্ট-নিশ্চিত সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত কার্যকলাপের দ্রুততা হল প্রথম নিয়ম; আর কোন দ্বিধা না করে আমরা বলতে পারি, **নিছক সামরিক কারণেই,** ভিয়েনার মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটার আগে পের্সেলের থামা উচিত ছিল না। এতে কিছু ঝুঁকি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু কিছু ঝুঁকি না নিয়ে কেউ কখনও কোন লড়াই জিতেছে কি? ১ কোটি ২ লক্ষ হাঙ্গেরীয়দের বিরুদ্ধে দেশজয় অভিযান করত যে সৈন্যবাহিনী সেটাকে নিজেদের অভিমুখী করাবার সময়ে কোন ঝুঁকি নেয় নি কি ভিয়েনার চার লক্ষ মানুষ? অস্ট্রীয়রা একত্র হওয়া অবধি হাঙ্গেরীয়দের অপেক্ষা করা, এবং শ্ভেখাটের কাছে যে পরাজয় অবধারিত ছিল তাতে নিষ্ফল ক্ষীণ শক্তিপ্রদর্শন ছিল সামরিক ভুল; নিশ্চয়ই ইয়েলাচিচের ভেঙে-দেওয়া দস্যুদলের বিরুদ্ধে স্থিরসংকল্প ভিয়েনা অভিযানের চেয়ে বেশি ঝুঁকি ছিল ঐ ভুলে।

কিন্তু, বলা হয়, কোন সরকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া হাঙ্গেরীয়দের অমন অগ্রগতিতে জার্মান রাজ্যক্ষেত্র লঙ্ঘন করা হত, ফ্রাংকফুর্টে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হত, সর্বোপরি সেটা হত হাঙ্গেরীয়দের কর্মব্রতের যা শক্তি সেই আইনগত আর নিয়মতান্ত্রিক কর্মনীতি বর্জন। কিন্তু, ভিয়েনায় সরকারী সংস্থাগুলি তো ছিল নাস্তি বস্তু! হাঙ্গেরির সপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটা কি ডায়েট, সেটা কি কোন গণতান্ত্রিক কমিটি? না, হাঙ্গেরির স্বাধীনতার জন্যে প্রথম লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধরেছিল যে ভিয়েনার মানুষ, কেবল তারাই? ভিয়েনায় অমুক কিংবা অমুক সরকারী সংস্থার পক্ষাবলম্বন করা জরুরী ছিল তা নয় — বৈপ্লবিক ঘটনাধারার অগ্রগতিতে অচিরেই উলটে পড়তে পারত এবং পড়ত ঐ সমস্ত সরকারী সংস্থা, একমাত্র যা বিবেচ্য বিষয় ছিল সেটা হল বৈপ্লবিক আন্দোলনের উন্নতি, খাস জন-কর্মকাণ্ডেরই অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি, একমাত্র সেটাই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারত হাঙ্গেরিকে। উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ভিয়েনা এবং সাধারণভাবে জার্মান অস্ট্রিয়ার মৈত্রী বজায় থাকলে, এই বৈপ্লবিক আন্দোলন পরে কোন্ রূপ ধারণ করতে পারত সেটা ছিল ভিয়েনার মানুষের ব্যাপার, হাঙ্গেরীয়দের নয়। কিন্তু কথাটা হল, একটাকিছু বিধিবদ্ধ গোছের প্রাধিকারের জন্যে হাঙ্গেরীয় সরকারের জিদটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিনা কার্যপ্রণালীর কিছুটা অনিশ্চিত বৈধতার জন্যে একটা ভানের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ, যে ভানটা

হাঙ্গেরিকে উদ্ধার না করলেও অন্তত, একটা পরবর্তী কালে, ইংরেজ বুর্জোয়া দর্শকদের কাছে খুব ভালই লেগেছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মানির কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে সম্ভাব্য বিরোধের ছুতোটা তো একেবারেই অসার। ভিয়েনায় প্রতিবিপ্লবের বিজয় দেখে ফ্রাঙ্কফুর্টের কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপ্রস্তাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল; সেখানে বিপ্লব সেটার শত্রুদের পরাস্ত করার জন্যে আবশ্যক সহায়তা পেলে তারা বিচলিত হত সমানই। আর শেষে, বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক জমিন হাঙ্গেরি ছেড়ে যেতে পারে নি, এই মস্ত যুক্তিটা বৃটিশ ফ্রীট্রেডারদের (৪৬) কাছে খুবই পর্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটা কখনও যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। ধরা যাক ভিয়েনার মানুষ যদি ১৩ মার্চ এবং ৬ অক্টোবর 'বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক' উপায় আঁকড়ে ধরে থাকত তাহলে কোথায় থাকত 'বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক' আন্দোলন এবং সমস্ত গৌরবময় লড়াই যা হাঙ্গেরির প্রতি সেই প্রথম সভ্য দুনিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল? ঠিক যে বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক জমিনে হাঙ্গেরীয়রা ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালে দাঁড়িয়েছিল বলে দৃঢ়োক্তি করা হয় সেটাকে তাদের জন্যে জিতে দিয়েছিল ভিয়েনার মানুষের ১৩ মার্চের চূড়ান্ত অবৈধ এবং অনিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহ। হাঙ্গেরির বৈপ্লবিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এমনটা বলা উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যে, নিছক বৈধ উপায় ব্যবহার করার মতো দ্বিধা-সংকোচ যে নিদারুণ অবজ্ঞা করে এমন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শুধু সেই উপায় প্রয়োগ করতে চাইবার ভানটা একেবারেই বাজে; আর এর সঙ্গে আমরা আরও বলতে পারি, গ্যোর্গে এই বৈধতার চিরকেলে ভানটাকে আঁকড়ে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে না ধরলে, জেনারেলের প্রতি গ্যোর্গের ফৌজের অনুরক্তি এবং ভিলাগোশের কলঙ্কজনক বিপর্যয় অসম্ভব হত (৪৭)। আর, নিজেদের সম্মান রক্ষা করার জন্যে হাঙ্গেরীয়রা যখন অবশেষে ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লেইথা পার হয়ে গিয়েছিল সেটা কি অবিলম্ব এবং স্থিরসংকল্প আক্রমণের মতো একেবারে সমানই অবৈধ ছিল না?

হাঙ্গেরির প্রতি আমরা কোন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করি নে, তা সবাই জানে। সংগ্রামের সময়ে আমরা হাঙ্গেরিকে সমর্থন করেছিলাম;

আমাদের বলার অধিকার আছে, আমাদের পত্রিকা 'Neue Rheinische Zeitung'(৪৮) হাঙ্গেরির কর্মবৃত্তকে জার্মানিতে জনসাধারণ্যে বিদিত করার জন্যে অন্য সবার চেয়ে বেশি করেছে; পত্রিকাটি ম্যাগিয়ার আর স্লাভদের মধ্যে সংগ্রামের প্রকৃতিটার ব্যাখ্যা দিয়েছে, হাঙ্গেরীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে এক-প্রস্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি এইভাবে প্রশংসাভাজন হয়েছে যে, হাঙ্গেরীয়দেরই এবং 'প্রত্যক্ষদর্শীদের' রচনাগুলি সমেত বিষয়টা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকটা পরবর্তী বইয়ে সেগুলি হয়েছে কুম্ভিলকবৃত্তির বস্তু। আমরা এখনও মনে করি, ইউরোপের মূলভূমিতে যেকোন ভবিষ্য আলোড়নে হাঙ্গেরি হল জার্মানির প্রয়োজনীয় এবং অকৃত্রিম মিত্র। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অবাধে সবকিছু বলবার অধিকার প্রসঙ্গে আমরা আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রতি খুবই কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছি; তাছাড়া, আমাদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা চাই ঐতিহাসিক পক্ষপাতশূন্যতা অনুসারে, আমরা বলতে চাই, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভিয়েনার মানুষের উদার নির্ভীকতা ছিল হাঙ্গেরীয় সরকারের সাবধানী বিমৃশ্যকারিতার চেয়ে ঢের বেশি মহৎই শুধু নয়, অধিকতর দূরদর্শীও বটে। আর জার্মান হিসেবে আমরা আরও বলতে চাই, হাঙ্গেরীয় অভিযানের যাবতীয় জমকাল জয় আর চমৎকার লড়াইয়ের সঙ্গে আমরা বিনিময় করতে রাজী হব না আমাদের স্বদেশবাসীদের, ভিয়েনার মানুষের সেই স্বতঃস্ফূর্ত একক অভ্যুত্থান আর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যা হাঙ্গেরিকে ফৌজ সংগঠিত করার সময় দিয়েছিল, যে ফৌজ করেছিল ঐসব মস্ত মস্ত কাজ।

ভিয়েনার দ্বিতীয় মিত্র ছিল জার্মান জনগণ। কিন্তু তারা সর্বত্র ভিয়েনাবাসীদের মতো একই সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট, বাডেন, কলোনকে একটু আগেই পরাস্ত করে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। বার্লিনে আর ব্রেসলাউয়ে* জনগণ খড়্গহস্ত ছিল ফৌজের বিরুদ্ধে; যেকোন দিন তাদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যেতে পারত। এমনটাই ছিল সংগ্রামের প্রত্যেকটা স্থানীয় কেন্দ্রে। সর্বত্রই ছিল নানা অমীমাংসিত প্রশ্ন, যেগুলোর সমাধান হতে পারত কেবল অস্ত্রবলেই। জার্মানির সাবেক খণ্ড-খণ্ড অবস্থা এবং

---

* পোল নাম: ভ্রোৎস্লাভ। — সম্পাঃ

বিকেন্দ্রীকরণ চলতে থাকার সর্বনাশা পরিণতি তীব্রভাবে অনুভূত হল সেই প্রথম তখন। প্রত্যেকটা রাজ্যে, প্রত্যেকটা প্রদেশে, প্রত্যেকটা শহরে বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল মূলত একই, কিন্তু সেগুলোকে সর্বত্র তুলে ধরা হল বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, সর্বত্র সেগুলোর পরিপক্বতার মাত্রা হল বিভিন্ন। এইভাবে ভিয়েনার ঘটনাবলির চূড়ান্ত গুরুত্ব প্রত্যেকটা এলাকায় উপলব্ধ হলেও ভিয়েনার মানুষকে বিপদে সাহায্য করা কিংবা তাদের অনুকূলে গতিপরিবর্তনের আশায় কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ আঘাত হানার সম্ভাবনা ছিল না। এইভাবে, তাদের সাহায্য করার জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্টের পার্লামেণ্ট আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছাড়া কেউই আর রইল না। তাদের কাছে সবদিক থেকে আবেদন গেল, কিন্তু তারা করল কী?

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট এবং পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের সঙ্গে সেটার অত্যাচারী সংগ্রামে পয়দা করা জারজ সন্তান তথাকথিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ভিয়েনার আন্দোলন থেকে উপকৃত হল: তারা জাহির করল তাদের ভাহা নাস্তিত্ব। আমরা আগেই দেখেছি, এই ধূর্ত পরিষদটা সতীত্ব খুইয়েছিল অনেক আগেই, আর তরুণ-বয়সী হয়েও সেটা ইতোমধ্যে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছিল এবং বকবকানি আর ভুয়ো-কূটনীতিক নীচবৃত্তির যাবতীয় ছলাকলায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। গোড়ায় সেটাকে ছেয়ে ছিল ক্ষমতার এবং জার্মানির পুনরুজ্জীবন আর একত্বের স্বপ্ন এবং বিভ্রম, তার থেকে অবশিষ্ট রইল শুধু এক-প্রস্থ চটকদার টিউটনিক ফাঁকাবুলি, যা আওড়ান হত যেকোন উপলক্ষে, আর রইল নিজ গুরুত্ব এবং জনসাধারণের সহজবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সদস্যের দৃঢ়প্রত্যয়। বর্জন করা হল গোড়াকার অতি-সরল ভাব; জার্মান জনগণের প্রতিনিধিরা হয়ে উঠলেন বিষয়বুদ্ধিতে পোক্ত মানুষ, অর্থাৎ কিনা, তাঁরা বুঝে ফেললেন তাঁরা করবেন যত কম আর বকবক করবেন যত বেশি, ততই নিরাপদ হবে জার্মানির ভাগ্যক্ষেত্রে সালিস হিসেবে তাঁদের অবস্থান। নিজেদের কার্যবাহকে তাঁরা অনাবশ্যক বিবেচনা করলেন তা নয়; ঠিক তার উলটো। কিন্তু তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সমস্ত সত্যিকারের প্রশ্ন তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষেত্র বলে সেগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য না করাই ভাল। তাঁরা অবশেষে যে নিয়তির কবলিত হয়েছিলেন সেটারই উপযুক্ত গুরুত্ব আর অধ্যবসায় সহকারে তাঁরা 'লোয়ার এম্পায়ারের' একদল বিজাণ্টিন ডাক্তারের মতো

আলোচনা করলেন সভ্য জগতের সর্বত্র অনেক আগেই মীমাংসিত বিভিন্ন তত্ত্বগত নীতিসূত্রাদি নিয়ে, কিংবা যৎসামান্য ব্যবহারিক প্রশ্নাবলি নিয়ে, যে আলোচনা কখনও কোন ব্যবহারিক ফলে পৌঁছয় নি। সদস্যদের পারস্পরিক শিক্ষণের ল্যাংকাস্টারীয় বিদ্যালয় (৪৯) গোছের এই পরিষদ তাই সদস্যদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা এই প্রত্যয়ের বশবর্তী হলেন যে, জার্মান জনগণের যতখানি প্রত্যাশা করার অধিকার ছিল তার চেয়ে বেশিই করছিল ঐ পরিষদ; আর তাঁদের কোন ফলে পৌঁছতে বলার ঔদ্ধত্য যার হত এমন প্রত্যেকে তাঁদের বিবেচনায় ছিল দেশদ্রোহী।

ভিয়েনার অভ্যুত্থান ফেটে পড়লে সেটা সম্বন্ধে তোলা হল একগাদা প্রশ্ন, বিতর্ক, প্রস্তাব আর সংশোধনী; সেগুলো অবশ্য ছিল নিষ্ফল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ আবশ্যক হল। সেখান থেকে ভিয়েনায় পাঠান হল দুজন কমিসার — ভূতপূর্ব উদারপন্থী মিঃ ভেল্কার এবং মিঃ মোস্লে। জার্মান একত্বের এই দুই দুঃসাহসী কর্মব্রতীর বীরকীর্তি এবং আশ্চর্য অভিযানগুলির সঙ্গে তুলনায় ডন্ কুইক্সোট আর সাঙ্কো পাঞ্জার সফর একটা ওডিসির বিষয়বস্তু হতে পারে। তাঁদের ভিয়েনায় যাবার সাহস হয় নি, ভিন্দিশগ্রেৎস তাঁদের প্রতি তর্জন-গর্জন করেন, তাহা মূর্খ সম্রাটটি* সবিস্ময় কৌতূহল প্রকাশ করেন, আর মন্ত্রী স্টাডিয়ন ধোঁকা দেন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে। ফ্রাঙ্কফুর্টের কার্যবিবরণী থেকে বোধ হয় একমাত্র যে অংশটা জার্মান সাহিত্যে স্থান পাবে সেটা তাঁদের পাঠান বার্তা আর রিপোর্টগুলি; সেগুলো মিলিয়ে হয়েছে একটা রেডিমেড নিখুঁত বিদ্রূপাত্মক রমন্যাস, আর ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ এবং সেটার সরকারের কলঙ্কের একটা চিরস্থায়ী স্মৃতিনিদর্শন।

ভিয়েনায় জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব তুলে ধরার জন্যে পরিষদের বাম পক্ষও (৫০) সেখানে পাঠিয়েছিল দুজন কমিসার — মিঃ ফ্রোবেল এবং মিঃ রবার্ট ব্লুম। বিপ্লব কাছিয়ে এলে ব্লুম ঠিকই বিবেচনা করেছিলেন যে, সেখানে লড়া হবে জার্মান বিপ্লবের প্রধান লড়াইটা, তিনি ঐ ব্যাপারে জীবন পণ করতে মনস্থ করেছিলেন দ্বিধা না করে। তার বিপরীতে ফ্রোবেলের মত ছিল এই যে, ফ্রাঙ্কফুর্টে নিজ পদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের জন্যে নিজেকে

* প্রথম ফার্ডিন্যান্ড। — সম্পাঃ

নিরাপদ রাখা তাঁর কর্তব্য। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে সবচেয়ে বাকপটুদের একজন বলে গণ্য ছিলেন ব্লুম; তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। কোন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারি পরিষদে তাঁর বাকপটুতা পরীক্ষায় টিকত না; ভিন্নমতের জার্মান ধর্মপ্রচারকের মতো অগভীর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যাসক্ত, আর দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা এবং ব্যবহারিক বাস্তবিকতার সঙ্গে পরিচয় দুইয়েরই অভাব থাকত তাঁর যুক্তিগুলিতে। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 'পরিমিত গণতন্ত্রের' পক্ষে, সেটা একটা অনির্দিষ্ট ধরনের বস্তু, সেই মত পোষণ করা হত বরং সেটার নীতিতে নির্দিষ্টতার অভাবেরই কারণে। তবে এই সবকিছু সত্ত্বেও রবার্ট ব্লুম ছিলেন স্বভাবগুণেই পুরোদস্তুর যদিও কিছুটা মার্জিত প্লিবিয়ান; নিষ্পত্তিকর মুহূর্তগুলিতে তাঁর অনির্দিষ্ট তাই অনিশ্চিত রাজনীতিক মত আর জ্ঞানকে ছাপিয়ে যেত তাঁর প্লিবিয়ান সহজজ্ঞান এবং প্লিবিয়ান কর্মতৎপরতা। এমনসব মুহূর্তে নিজ ক্ষমতার সাধারণ মান অনেকটা ছাড়িয়ে উঠতেন তিনি।

এইভাবে, ভিয়েনায় এক নজরেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হতে হবে সেখানে, ফ্রাঙ্কফুর্টের ভবিষ্য মার্জিত বিতর্কগুলির মাঝে নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন, একেবারেই ছাড়লেন পিছু হঠার ধারণা, বৈপ্লবিক বাহিনীতে একটা পরিচালন পদ নিলেন, আর তাঁর আচরণে দেখা গেল অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি এবং সংকল্প। বেশ কিছুকাল ধরে শহর দখল পিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ডানিউব নদীতে টাবোর সেতু পুড়িয়ে দিয়ে শহরের একটা পার্শ্বভাগকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই। শহর দখল হবার পরে তিনি গ্রেপ্তার হন, তাঁর বিচার হয় সামরিক আদালতে, তাঁকে গুলি করে মারা হয়, তা সবাই জানে। বীরের মৃত্যু হয় তাঁর। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ বিভীষিকাগ্রস্ত হলেও সেই রক্তাক্ত অবমাননাটাকে নিল যেন প্রসন্নভাবেই। একটা প্রস্তাব পাস হল, তাতে নরম ভাব এবং ভাষার কূটনীতিক শোভনতার ফলে সেটা অস্ট্রিয়ার ঘৃণার কলঙ্কচিহ্ন হবার চেয়ে বেশি হল খুন করা শহিদের কবরে অবমাননার ছাপ। তবে এই ঘৃণ্য পরিষদ সেটার একজন সদস্যের, বিশেষত বাম পক্ষের নেতার হত্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করবে তা প্রত্যাশিত ছিল না।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১৩

প্রুশীয় সংবিধান-সভা। জাতীয় পরিষদ

১ নভেম্বর ভিয়েনার পতন ঘটে, আর ঐ মাসেরই ৯ তারিখে বার্লিনে সংবিধান-সভা ভেঙে দেওয়া হয়, তার থেকে দেখা যায় ঘটনাটা সারা জার্মানিতে প্রতিবৈপ্লবিক তরফের উৎসাহ আর শক্তি সঙ্গেসঙ্গেই কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রাশিয়ায় ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালের ঘটনাবলির কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সংবিধান-সভা, কিংবা বরং 'একটা সংবিধান সম্বন্ধে ক্রাউনের সঙ্গে ঐকমত্যে পেঁছবার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরিষদ' এবং বুর্জোয়া পক্ষ থেকে সেটার অধিকাংশ প্রতিনিধি জনসমষ্টির অপেক্ষাকৃত কর্মতৎপর অংশের ভয়ে রাজদরবারের যাবতীয় চক্রান্তে প্রশ্রয় দেওয়ার দরুন জনসাধারণের সমস্ত শ্রদ্ধা খুইয়ে বসেছিল অনেক কাল আগেই। সামন্ততন্ত্রের জঘন্য বিশেষাধিকারগুলোকে তারা অনুমোদন করেছিল, বরং পুনঃস্থাপন করেছিল, এবং এইভাবে বিকিয়ে দিয়েছিল কৃষককুলের স্বাধীনতা আর স্বার্থ। তারা সংবিধান রচনাও করতে পারে নি, সাধারণ আইন সংশোধনও করতে পারে নি কোনভাবে। নানা সূক্ষ্ম তত্ত্বগত সংজ্ঞা, বিভিন্ন নিছক অনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়েই তারা ব্যাপৃত ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে। প্রকৃতপক্ষে, লোকে যাতে আগ্রহান্বিত হতে পারে এমন একটা সংস্থার চেয়ে বেশি পরিমাণে এই পরিষদটা ছিল সেটার সদস্যদের পার্লামেণ্টারি savoir vivre* শিক্ষালয়। তাছাড়া, এতে কোন স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষিত হত না, সেটা প্রায় সবসময়েই নির্ধারিত করত দোলায়মান **'মধ্যপন্থীরা'**, দক্ষিণ থেকে বামে এবং তদ্বিপরীতে তাদের দোলনের ফলে প্রথমে কাম্পহাউজেনের এবং পরে আউয়ের্সভাল্ড আর হানজেমানের মন্ত্রিসভা উলটে পড়েছিল। কিন্তু যেমন অন্য সব জায়গায়

* সাংসারিক প্রজ্ঞা। — সম্পাঃ

তেমনি এখানেও উদারপন্থীরা এইভাবে সুযোগ হাত ফসকে যেতে দিয়েছে, আর তখন রাজদরবার নিজের শক্তি পুনঃসংগঠিত করেছে; ঐ শক্তিতে ছিল অভিজাতকুল এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির সবচেয়ে অমার্জিত অংশ, তেমনি ফৌজ আর আমলাতন্ত্র। হানজেমানের পতনের পরে সব কট্টর প্রতিক্রিয়াপন্থী আমলা আর সামরিক অফিসারদের নিয়ে একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, সেটা কিন্তু পার্লামেণ্টের দাবির কাছে আপাতদৃষ্টিতে নতিস্বীকার করেছিল। 'লোকেরা নয়, ব্যবস্থাবলি' এই উপযুক্ত নীতি অনুসারে চলতে গিয়ে পরিষদটি প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত হয়ে এই মন্ত্রিসভাকে বাহবা দিয়েছিল, তবে ঐ মন্ত্রিসভাটাই প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত এবং সংগঠিত করার যে কাজ চালাচ্ছিল প্রায় প্রকাশ্যেই সে সম্বন্ধে তাদের হুঁশ ছিল না। শেষে ভিয়েনার পতন থেকে সংকেত এলে রাজা* তাঁর মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে তাদের জায়গায় বসান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাউন্টেউফেলের নেতৃত্বে 'কাজের লোকদের'। স্বপ্নাবিষ্ট পরিষদ অমনি বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট পাস করায়; সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবে একটা ডিক্রির জোরে পরিষদকে স্থানান্তরিত করা হয় বার্লিন থেকে ব্রান্ডেনবুর্গে, — কোন সংঘর্ষ ঘটলে পরিষদ বার্লিনে জনগণের সমর্থনের ভরসা করতে পারত, আর ব্রান্ডেনবুর্গ হল সম্পূর্ণভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী একটা ছোট্ট মফস্বল শহর। কিন্তু পরিষদ ঘোষণা করল, নিজ সম্মতি ব্যতিরেকে তার অধিবেশন মুলতবি, সেটাকে স্থানান্তরিত করা, কিংবা ভেঙে দেওয়া যায় না। ইতোমধ্যে, চল্লিশ হাজার সৈন্য পরিচালনা করে জেনারেল দ্রাঙ্গেল প্রবেশ করলেন বার্লিনে। পৌর শাসক এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অফিসারদের এক সভায় কোন প্রতিরোধ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পরিষদ এবং সেটার পক্ষীয় উদারপন্থী বুর্জোয়ারা প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করতে এবং প্রতিরক্ষার প্রায় প্রত্যেকটা উপায় তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে দিয়েছিল সংযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল তরফকে — তারপরে তারা তখন শুরু করল 'নিষ্ক্রিয় এবং বৈধ প্রতিরোধ'-এর সেই চমকদার প্রহসন, যেটাকে তারা করতে চেয়েছিল হ্যাম্পডেনের এবং

---

* চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেলম। — সম্পঃ

স্বাধীনতার যুদ্ধে (৫১) আমেরিকানদের প্রথম প্রচেষ্টাগুলির দৃষ্টান্তের গৌরবময় অনুকরণ। বার্লিনে অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হল, সঙ্গেসঙ্গেই শান্ত রইল বার্লিন; জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে সরকার ভেঙে দিল, তারা অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল পরম তৎপরতা সহকারে। একপক্ষ কাল ধরে এক সভাস্থল থেকে আর-একটাতে পরিষদকে তাড়া করে ফিরে সৈন্যদল সর্বত্র সভাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করল, আর নাগরিকদের শান্ত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল পরিষদ। শেষে, পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল বলে সরকারের ঘোষণা হলে পরিষদ কর ধার্য করা বেআইনী ঘোষণা করে একটা প্রস্তাব পাস করল, তারপরে কর-বন্ধ সংগঠিত করার জন্যে পরিষদের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়লেন দেশের সর্বত্র। কিন্তু তাঁরা দেখতে পেলেন উপায় বাছনে নিদারুণ ভুল হয়েছিল তাঁদের। অল্প কয়েকটা উত্তেজনাময় সপ্তাহ কাটল, তারপরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চলল সরকারের কঠোর ব্যবস্থাবলি, তখন যে বিলুপ্ত পরিষদ আত্মরক্ষা করার সাহস পর্যন্ত করে নি সেটাকে খুশি করার জন্যে কর বন্ধ করার চিন্তা ছেড়ে দিল প্রত্যেকেই।

১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করার সময় আর ছিল না কিনা, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতা লক্ষ্য করে ফৌজের একটা অংশ পরিষদের পক্ষে চলে যেত এবং এইভাবে পরিষদের সপক্ষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যেত কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ত কখনও না-ও হতে পারে। তবে যেমন যুদ্ধে তেমনি বিপ্লবে শক্তিমত্তা প্রদর্শন আবশ্যক, তেমনি যে আক্রমণ করে সে-ই সুবিধে পায়; আর যেমন যুদ্ধে তেমনি বিপ্লবে অনুকূলে-প্রতিকূলে অসমতা যা-ই থাক, নিষ্পত্তিকর মুহূর্তে সবকিছু পণ করাটা সর্বোচ্চ মাত্রায় আবশ্যক। এইসব স্বতঃসিদ্ধের যাথার্থ্য যাতে প্রতিপন্ন হয় নি এমন একটাও কৃতকার্য বিপ্লব নেই ইতিহাসে। প্রুশীয় বিপ্লবের বেলায় নিষ্পত্তিকর মুহূর্তটা এসেছিল ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে; সরকারীভাবে সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বে অবস্থিত প্রুশীয় সংবিধান-সভা শক্তিমত্তা প্রদর্শন তো করেই নি — শত্রুর প্রত্যেকটা অগ্রগতির মুখে সেটা হটে গেছে; আক্রমণ করা তো আরও দূরের কথা — সেটা আত্মরক্ষা করতেও মনস্থ করে নি। নিষ্পত্তিকর মুহূর্ত যখন এসেছিল, চল্লিশ হাজার সৈন্য পরিচালনা করে ভ্রাঙ্গেল যখন বার্লিনের ফটকে-ফটকে ঘা মারছিলেন

তিনি এবং তাঁর সমস্ত অফিসার সর্বত মনে করেছিলেন তিনি দেখবেন প্রত্যেকটা রাস্তা ব্যারিকেডে গিজগিজ করছে, গুলি ছোড়ার গর্তে পরিণত হয়েছে প্রত্যেকটা জানলা, কিন্তু তার বদলে তিনি দেখেছিলেন ফটকগুলো খোলা, আর রাস্তায়-রাস্তায় বাধা শুধু বার্লিনের শান্তিপূর্ণ বার্গাররা, তারা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় স্তম্ভিত সৈনিকদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে ভ্রাঙ্গেলের সঙ্গে যে তামাসাটা করেছিল তাই নিয়ে মজা করছিল। পরিষদ এবং জনগণ প্রতিরোধ করলে তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হতে পারত তা ঠিক; বার্লিনের উপর গোলা বর্ষিত হতে পারত, বহু শত মানুষ নিহত হতে পারত, অথচ রাজতান্ত্রিক তরফের আখেরী বিজয় রোধ হত না, তা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্যে সেটা কোন কারণ হতে পারে না। ভালভাবে লড়ে পরাজয় হলে সে ঘটনার বৈপ্লবিক গুরুত্ব সহজে অর্জিত জয়েরই মতো। ১৮৪৮ সালে জুন মাসে প্যারিসের এবং অক্টোবর মাসে ভিয়েনার পরাজয় এই নগরী দুটির মানুষের মনে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে ফেব্রুয়ারি আর মার্চের বিজয়ের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের বেশিই করেছিল। পরিষদ এবং বার্লিনের জনসাধারণের নিয়তি হয়ত উল্লিখিত শহর দুটির মতোই হত, কিন্তু তাদের পতনটা গৌরবময়, আর তাদের পিছনে যারা টিকে থাকত তাদের মনে রেখে যেত প্রতিশোধের কামনা, যেটা হল বৈপ্লবিক কালপর্যায়ে তেজীয়ান এবং প্রচন্ড আবেগপূর্ণ কর্মকান্ডের সবচেয়ে মস্ত একটা প্রবর্তনা। প্রত্যেকটা সংগ্রামে চ্যালেঞ্জ যে গ্রহণ করে তার পরাস্ত হবার ঝুঁকি থাকে, এটা তো স্বাভাবিক, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার এবং অস্ত্রধারণ না করেই বশ্যতা মেনে নেবার কারণ হতে পারে কি সেটা?

বিপ্লবে যে কোন নিষ্পত্তিকর অবস্থান নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু শত্রুকে আক্রমণে শক্তিপরীক্ষা করতে বাধ্য করার বদলে সমর্পণ করে সেই অবস্থান সে সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হবারই যোগ্য।

যেটাতে প্রাশিয়ার রাজা সংবিধান-সভা ভেঙে দিয়েছিলেন সেই একই ডিক্রিতে একটা নতুন সংবিধানও ঘোষিত হয়েছিল, সেটা ছিল ঐ পরিষদেরই একটা কমিশনের রচিত খসড়ার ভিত্তিতে। তবে তাতে কোন কোন বিষয়ে ক্রাউনের ক্ষমতা আরও বাড়ান হয়েছিল, আর অন্য কোন কোন বিষয়ে অনিশ্চিত করে তোলা হয়েছিল পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে। ঐ সংবিধান

দুটো কক্ষ স্থাপন করেছিল; সংবিধান নিয়ে আলোচনা এবং অনুমোদন করার জন্যে কক্ষ-দুটোর অধিবেশন বসার কথা ছিল শিগ্গিরই।

প্রুশীয় নিয়মতন্ত্রীদের 'বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ' সংগ্রামের সময়ে জার্মান জাতীয় পরিষদ কোথায় ছিল, সে প্রশ্ন তোলার বড় একটা প্রয়োজন নেই। সেটা ফ্রাঙ্কফুর্টের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রুশীয় সরকারের কার্যবাহের বিরুদ্ধে নিস্তেজ প্রস্তাব পাস করার এবং 'পাশব শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়, বৈধ এবং সর্বসম্মত প্রতিরোধের সমারোহময় দৃশ্যে'র তারিফ করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। মন্ত্রিসভা এবং পরিষদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে বার্লিনে কমিসারদের পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু তাদেরও হয়েছিল আগে ওলমুটস-এ পাঠান কমিসারদেরই মতো দশা — ভদ্রভাবে তাদের বিদেয় করা হয়েছিল। জাতীয় পরিষদের বাম অংশ, অর্থাৎ তথাকথিত র‍্যাডিকাল তরফও তাদের কমিসারদের পাঠিয়েছিল, তবে বার্লিন পরিষদের যৎপরোনাস্তি অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে যথাযোগ্যভাবে নিশ্চিত হয়ে এবং নিজেদের সমানই অসহায় অবস্থা কবুল করে তারা ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে উন্নতি ঘটে বলে রিপোর্ট দিয়েছিল, আর জানিয়েছিল যে, বার্লিনের মানুষের আচরণ যথার্থই প্রশংসনীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম কমিসার মিঃ বাসেরমান তাঁর বিবরণে বলেছিলেন যে, প্রুশীয় মন্ত্রীদের কিছুকাল আগেকার কঠোর ব্যবস্থাবলি ভিত্তিহীন নয়, কেননা ইদানীং বার্লিনের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল কতিপয় হিংস্রদর্শন লোকজনকে, কোন অরাজকতার আন্দোলনের আগে যেমনটা দেখা দেয় সবসময়েই (আর যাদের তখন থেকে বলা হচ্ছে 'বাসেরমানীয় লোক'), তখন বাম অংশের এই গুণধর ডেপুটিরা, বৈপ্লবিক পক্ষের কর্মতৎপর সমর্থকরা যথার্থই উঠে দাঁড়িয়ে হলফ করে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ব্যাপারটা তেমন ছিল না! এইভাবে দু'মাসের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের ষোল-আনা অক্ষমতা। এই সংস্থাটা ছিল সেটার করণীয় কাজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত, শুধু তাই নয়, নিজ করণীয় কাজটা আসলে কী সে সম্বন্ধে লেশমাত্র ধারণাও ছিল না এই সংস্থাটার তাতে এর চেয়ে বেশি দগদগে প্রমাণ আর হতে পারত না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের অস্তিত্বের প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ না করেই ভিয়েনা আর

বার্লিনে উভয়ত্র বিপ্লবের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেল, উভয় রাজধানীতে সবচেয়ে জরুরী এবং চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নাবলির মীমাংসা হয়ে গেল; কেবল এই অবস্থাটাই এটা প্রতিপাদন করার জন্যে যথেষ্ট যে, সংস্থাটা ছিল একটা বিতর্ক-সভামাত্র, বোকা-বনা একপ্রস্থ লোক নিয়ে সেটা গঠিত। সরকার তাদের দিয়ে পার্লামেণ্টারি পুতুলনাচ করাতে পেরেছিল, সে নাচ দেখান হয়েছিল খুদে খুদে রাজ্য আর খুদে খুদে শহরের দোকানদার আর খুদে ব্যাপারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে, যতক্ষণ এইসব তরফের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করাবার জন্যে সেটা উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। সেটা উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল কতকাল, তা আমরা দেখব অচিরেই। তবে এটা লক্ষণীয় যে, এই পরিষদের সমস্ত 'বিশিষ্ট' ব্যক্তির মধ্যে একজনও ঘুণাক্ষরে টের পান নি কোন্ ভূমিকায় তাঁদের অভিনয় করান হয়েছিল, আর এমনকি অদ্যাবধি ফ্রাঙ্কফুর্ট ক্লাবের প্রাক্তন সদস্যদের ইতিহাস উপলব্ধির ইন্দ্রিয় নিয়ত একরূপ, যা তাদেরই বেলায় বিশিষ্ট।

লণ্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১৪

শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন। ডায়েট এবং কক্ষ

১৮৪৯ সালের প্রথম মাসগুলিকে অস্ট্রীয় এবং প্রুশীয় সরকার লাগিয়েছিল আগের অক্টোবর আর নভেম্বর মাসে পাওয়া সুবিধাগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্যে। ভিয়েনা দখলের পর থেকে অস্ট্রিয়ার ডায়েট মরাভিয়ার ক্রেমসির* নামে একটা ছোট মফস্বল শহরে ছিল নামেমাত্র। তাদের নির্বাচকদের সমেত স্লাভ ডেপুটিরা ছিল অস্ট্রীয় সরকারকে সেটার অসহায় দশা থেকে টেনে তুলতে প্রধান সহায় — তারা ইউরোপীয় বিপ্লবের

* চেক্ নাম: ক্রোমের্জিজ। — সম্পাঃ

বিরুদ্ধে বেইমানির বিলক্ষণ প্রতিফল পেল এখানে। সরকার শক্তি পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে ডায়েট এবং সেটার স্লাভ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকল, আর সাম্রাজ্যিক অস্ত্রশক্তির প্রথম সাফল্যগুলি থেকে হাঙ্গেরীয় যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির পূর্বলক্ষণ দেখা গেলে সরকার ৪ মার্চ ডায়েট ভেঙে দিয়ে সামরিক শক্তি দিয়ে ডেপুটিদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। অবশেষে তখন স্লাভরা বুঝল তাদের বোকা বানান হয়েছে, আর তখন তারা হাঁক ছাড়ল: 'চলো ফ্রাঙ্কফুর্টে! বিরোধিতা এখানে চালান যায় না — সেটা চালাতে হবে সেখান থেকে!' কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর চুপচাপ থাকা কিংবা অক্ষম ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে যোগ দেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না, কেবল এটাই তাদের যৎপরোনাস্তি অসহায় অবস্থাটাকে দেখিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল।

জার্মানির স্লাভদের স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এইভাবে শেষ হল তখনকার মতো এবং খুব সম্ভব চিরকালের জন্যে। বহু জাতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এইসব অবশেষ, এগুলির জাতিসত্তা আর রাজনীতিক প্রাণশক্তি লোপ পেয়েছিল দীর্ঘকাল আগে, তার ফলে এগুলি প্রায় হাজার বছর ধরে অধিকতর ক্ষমতাশালী বিজেতা জাতির পায়ে-পায়ে চলতে বাধ্য হয়েছিল, ঠিক যেমন ইংলণ্ডে ওয়েল্স্ জাতি, স্পেনে বাস্ক্রা, ফ্রান্সে দক্ষিণ-ব্রেতন্রা, এবং উত্তর আমেরিকার যেসব অংশ ইদানীং ইঙ্গ-মার্কিন নকুলের অধিকৃত সেগুলিতে স্পেনীয় আর ফরাসী ক্রিওল্রা, সেই মৃতকল্প জাতিসত্তাগুলি — বোহেমীয়, ক্যারিন্থীয়, ডালমাটীয়, ইত্যাদিরা —৮০০ খ্রীষ্টাব্দের তাদের রাজনীতিক স্থিতাবস্থা (status quo) পুনরুদ্ধারের জন্যে ১৮৪৮ সালের সর্বব্যাপী তালগোল পাকান অবস্থা থেকে লাভবান হতে চেষ্টা করেছিল। হাজার বছরের ইতিহাস দেখে তাদের বোঝা উচিত ছিল এমন প্রতীপগতি অসম্ভব; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এল্বা আর সালে-এর পূবে সমস্ত অঞ্চলকে যে সগোত্র স্লাভরা দখল করেছিল সেটা থেকে ইতিহাসক্রমিক ধারাটাই শুধু প্রমাণিত হয়েছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হয়েছিল জার্মান জাতির প্রাচীন পূর্বী প্রতিবেশীদের বশীভূত, গ্রাস এবং আত্মভূত করতে জার্মান জাতির শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, জার্মানদের এই আত্মভূত করার প্রবণতাটা

বরাবর এবং তখনও ছিল সবচেয়ে পরাক্রমশালী একটা উপায় যেটার সাহায্যে ইউরোপ মহাদেশের পূর্বভাগে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, সেটা ক্ষান্ত হতে পারে একমাত্র যখন জার্মানী-করণের প্রক্রিয়াটা পৌঁছয় স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন যাপনে সক্ষম কোন বৃহৎ, নিবিড়, অখণ্ডিত জাতির সীমান্তে, যেমন হাঙ্গেরীয়রা এবং কিছু পরিমাণে পোলরা; আর কাজেই তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, তাদের অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবেশীদের দ্বারা মিলিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটাকে নিষ্পন্ন হতে দেওয়াই ছিল এইসব মৃতকল্প জাতির স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী স্বপ্নবিলাসীরা বোহেমীয় এবং দক্ষিণ-স্লাভদের একাংশকে আলোড়িত করতে কৃতকার্য হয়েছিল — তাদের পক্ষে অমন ভবিষ্য চিত্র অবশ্য প্রীতিকর নয়। কিন্তু, এখানে রয়েছে অল্প কয়েকটা ক্ষয়গ্রস্ত জনসমষ্টি, তারা যে অঞ্চলের অধিবাসী তার প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জার্মানরা, আর অঞ্চলটাকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে জার্মানরা, তেমনি প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে জার্মান ছাড়া কোন ভাষা তাদের ছিল না, তাদের নেই জাতিগত অস্তিত্বের একেবারে প্রথম দুটো শর্ত — সংখ্যা আর আঞ্চলিক অখণ্ডতা — এই জনসমষ্টিগুলিকে খুশি করার জন্যে ইতিহাস হাজার বছর পিছিয়ে যাবে, এমনটা আশা করতে পারে কি সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থীরা? জার্মান আর হাঙ্গেরীয় স্লাভ অঞ্চলগুলির সর্বত্র সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী অভ্যুত্থান ছিল এই সমস্ত অগুন্তি খুদে জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের ছদ্মবেশ. এই অভ্যুত্থান সর্বত্র ইউরোপীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির বিরোধী হয়, এইভাবে স্লাভরা মুক্তির জন্যে লড়াইয়ের ভান করলেও, সবসময়েই (পোলদের গণতান্ত্রিক অংশ বাদে) তাদের দেখা গেছে স্বৈরতন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে। এমনটাই জার্মানিতে, এমনটাই হাঙ্গেরিতে, এমনকি তুরস্কে এখানে-সেখানেও এমনটাই। জনগণের কর্মব্রতের বিরুদ্ধে বেইমান, অস্ট্রীয় সরকারের গুপ্ত চক্রের সমর্থক এবং প্রধান ঠেকনো হিসেবে তারা সমস্ত বৈপ্লবিক জাতির বিবেচনায় স্বভাবদুর্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। জাতিসত্তা সম্বন্ধে সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী নেতাদের বাধান ঝগড়াঝাঁটিতে স্লাভ জনসাধারণের ব্যাপক অংশ কোথাও অংশগ্রহণ করে নি, তারা বড় বেশি অজ্ঞ

এই কারণেই, তবু এটা কখনও বিস্মৃত হবে না যে, আধা-জার্মান শহর প্রাগে স্লাভীয় উন্মাদনাগ্রস্ত ভিড় 'জার্মান মুক্তির চেয়ে রুশী চাবুকই ভাল' জিগিরে সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালে প্রথম উবে-যাওয়া প্রচেষ্টার পরে এবং অস্ট্রীয় সরকারের দেওয়া শিক্ষার পরে পরবর্তী কোন সুযোগে আর-একটা চেষ্টা সম্ভবত হবে না। তবে তারা যদি অনুরূপ ছুতোয় আবার প্রতিবৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধতে চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে জার্মানির কর্তব্য স্পষ্টই। বিপ্লবের অবস্থায় এবং বহির্যুদ্ধে জড়িত কোন দেশ একেবারে নিজ মর্মদেশে একটা ভাঁদে (৫২) বরদাস্ত করতে পারে না।

ডায়েট ভেঙে দেবার একই সঙ্গে সম্রাটের* ঘোষিত সংবিধানের কথায় ফিরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা সেটার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না কখনও, আর এখন সেটা খতম হয়ে গেছে একেবারেই। ১৮৪৯ সালের ৪ মার্চ থেকেই অস্ট্রিয়ায় স্বৈরতন্ত্র বস্তুত সম্পূর্ণভাবে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

প্রাশিয়ায় রাজার ঘোষিত নতুন সনদ আলোচনা এবং অনুমোদন করার জন্যে ফেব্রুয়ারি মাসে কক্ষ দুটির অধিবেশন বসেছিল। অধিবেশন চলেছিল প্রায় ছ' সপ্তাহ ধরে, সরকারের উদ্দেশে তাদের আচরণ ছিল বেশ নম্র এবং বশংবদ, তবু রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীরা যতটা চাইছিলেন ততদূর যেতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই উপযুক্ত সুযোগ আসামাত্র কক্ষ দুটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া উভয়েই তখনকার মতো পার্লামেণ্টারি নিয়ন্ত্রণের বেড়ি থেকে অব্যাহতি পেল। তখন সমস্ত ক্ষমতা সরকার দুটোর হাতে কেন্দ্রীভূত, তখন তারা সে ক্ষমতা খাটাতে পারে যেখানেই আবশ্যক: হাঙ্গেরি আর ইতালির উপর অস্ট্রিয়া, জার্মানির উপর প্রাশিয়া। কেননা, প্রাশিয়াও ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে 'শৃঙ্খলা' পুনঃস্থাপনের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

জার্মানির মস্ত কর্মকান্ডকেন্দ্র দুটোয় — ভিয়েনায় আর বার্লিনে — তখন প্রতিবিপ্লবের সর্বপ্রাধান্য, তখন বাকি ছিল শুধু ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি, যেখানে সংগ্রামের তখনও নিষ্পত্তি হয় নি, যদিও সেখানেও পাল্লা ক্রমাগত

---

* প্রথম ফ্রানৎস-জোসেফ। — সম্পাঃ

বেশি ভারি হচ্ছিল বৈপ্লবিক পক্ষের বিরুদ্ধে। যা আমরা বলেছি, এইসব ক্ষুদ্রতর রাজ্যের একই কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল ফ্রাংকফুর্টের জাতীয় পরিষদ। এই তথাকথিত জাতীয় পরিষদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি দীর্ঘকাল যাবত স্পষ্টপ্রতীয়মান ছিল, সেটা এতখানি যাতে ফ্রাংকফুর্টেরই মানুষ অস্ত্রধারণ করেছিল সেটার বিরুদ্ধে, তবু সেটার উদ্ভবের ধরনটা ছিল কমবেশি বৈপ্লবিক। জানুয়ারি মাসে সেটা ছিল একটা অস্বাভাবিক বৈপ্লবিক অবস্থানে; সেটার এক্তিয়ার কখনও নির্দিষ্ট করা হয় নি, এবং সেটা শেষে স্থির করেছিল যে, সেটার সিদ্ধান্তের আছে আইনগত বলবত্তা, যদিও বৃহত্তর রাজ্যগুলি কখনও তা মানে নি। এই পরিস্থিতিতে, আর যখন নিয়মতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক তরফ দেখল স্বৈরতন্ত্রীরা আবার বল পেতে থাকবার ফলে তাদের অবস্থা ঘুরে যাচ্ছে, তখন প্রায় সমগ্র জার্মানির উদারপন্থী রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা এই পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে করল শেষ ভরসাস্থল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই — ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক তরফের কেন্দ্রী অংশ পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা তাদের বেড়ে-চলা দুর্দশার অবস্থায় এই একই সংস্থার সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশকে ঘিরে জড় হয়েছিল, এই যে অংশটা বাস্তবিকই ছিল গণতন্ত্রের শেষ দৃঢ় পার্লামেণ্টারি ব্যূহ। অন্য দিকে, বৃহত্তর সরকারগুলোর, বিশেষত প্রুশীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনায় জার্মানিতে পুনঃস্থাপিত রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এমন একটা অনিয়মিত নির্বাচিত সংস্থার অস্তিত্ব ক্রমেই বেশি বেখাপ ঠেকছিল, সেটাকে তারা যে তৎক্ষণাৎ জোর করে ভেঙে দেয় নি তার কারণ শুধু এই যে তখনও সময় আসে নি, তাছাড়া, প্রাশিয়া সেটাকে আগে নিজ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে ব্যবহার করবে বলে আশা করেছিল।

সেই বেচারা পরিষদটা নিজেই ইতোমধ্যে পড়েছিল ক্রমেই বেশি পরিমাণ তালগোল পাকান অবস্থার মধ্যে। ভিয়েনা আর বার্লিন উভয়ে সেটার ডেপুটেশনগুলি এবং কমিসারদের প্রতি আচরণ করা হয়েছিল যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞাভরে; পার্লামেণ্টারি অনাক্রম্যতা থাকা সত্ত্বেও সেটার একজন সদস্যকে* ভিয়েনায় সাধারণ বিদ্রোহী হিসেবে বধ করা হয়। সেটার ডিক্রিগুলোর প্রতি

* রবার্ট ব্লুম। — সম্পাঃ

কোথাও মনোযোগ দেওয়া হত না; আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা হলে সেটা শুধু প্রতিবাদ-লিপিকা দিয়ে, যাতে সরকারগুলোর পক্ষে অবশ্যপালনীয় হিসেবে পরিষদের আইন আর প্রস্তাব পাস করার কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হত। জার্মানির প্রায় প্রত্যেকটা মন্ত্রিসভার সঙ্গে কূটনীতিক কলহে জড়িত ছিল পরিষদের প্রতিনিধি — কেন্দ্রীয় নির্বাহী ক্ষমতা; পরিষদ কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কোনটাই শত চেষ্টা করেও অস্ট্রিয়াকে কিংবা প্রাশিয়াকে তাদের আখেরী অভিমত, পরিকল্পনা এবং দাবি বিবৃত করাতে পারে নি। পরিষদ অবশেষে অন্তত এটুকু স্পষ্ট বুঝতে শুরু করল যে, সেটা সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাত থেকে ফসকে যেতে দিয়েছে, সেটা অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার সম্পূর্ণ আয়ত্তে, জার্মানির জন্যে কোন ফেডারেল সংবিধান আদৌ রচনা করতে মনস্থ করলে সেটা করা চাই অবিলম্বে এবং স্থিরসংকল্প নিয়ে। দোদুল্যমান সদস্যদের অনেকেও স্পষ্ট বুঝলেন সরকারগুলো তাঁদের বোকা বানিয়েছে মর্মান্তিক ধরনে। কিন্তু নিজেদের অক্ষম অবস্থায় তখন কী করবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল? চটপট এবং স্থিরনিশ্চয় হয়ে জনগণের শিবিরে চলে যাওয়াটাই ছিল একমাত্র উপায় যা তাদের রক্ষা করতে পারত, কিন্তু এমনকি সে পদক্ষেপটার কৃতকার্যতাও ছিল অনিশ্চিতই শুধু নয়। তাছাড়া, অস্থিরমনা, অদূরদর্শী, আত্মগর্বী এই লোকগুলো যখন পরস্পরবিরোধী গুজব এবং কূটনীতিক লিপিকাসমূহের অবিরাম কোলাহলে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তখন এরা একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন খুঁজেছিল এই অন্তহীনভাবে পুনরাবৃত্ত আশ্বাসের মাঝে যে, তারাই দেশের সবচেয়ে সেরা, মহত্তম, বিজ্ঞতম মানুষ, জার্মানিকে রক্ষা করতে পারে কেবল তারাই। এই অসহায় লোকগুলোর ভিড়ের মাঝে, আমরা বলি, একটামাত্র বছরের পার্লামেণ্টারি জীবন যাদের আকাট মূর্খে পরিণত করেছিল সেই তুচ্ছ লোকগুলোর মধ্যে তেজীয়ান আর সংগতিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে তো দূরের কথা, তৎপর এবং স্থিরনিশ্চিত সংকল্পের মানুষই-বা কোথায়?

অবশেষে মুখোশ ছুড়ে ফেলে দিল অস্ট্রীয় সরকার। ৪ মার্চের সংবিধানে অস্ট্রিয়াকে অবিভাজ্য রাজতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হল, তাতে একই রাজস্ব ব্যবস্থা, একই বহিঃশুল্ক ব্যবস্থা, সামরিক প্রতিষ্ঠানাদি একই — এইভাবে নিশ্চিহ্ন করা হল জার্মান এবং অ-জার্মান প্রদেশগুলির মধ্যকার

প্রত্যেকটা বাধা আর পার্থক্য। ইতোমধ্যে ফেডারেল সংবিধান পাস হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে, সেই পরিকল্পিত সংবিধান সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি এবং প্রবন্ধসমূহ সত্ত্বেও এল অস্ট্রীয় সরকারের ঐ ঘোষণা। এটা হল পরিষদের কাছে অস্ট্রিয়ার চ্যালেঞ্জ, সেটা গ্রহণ করা ছাড়া বেচারা পরিষদের গত্যন্তর ছিল না। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ বিস্তর তর্জন-গর্জন করল, তবে নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং পরিষদের ডাহা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন অস্ট্রিয়া সেটাকে কেটে যেতে দিতে বেশ সমর্থই ছিল। অস্ট্রিয়ার পক্ষ থেকে এই অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পরিষদ নিজেকে যা বলে অভিহিত করে সেই জার্মান জনগণের প্রতিনিধি হস্তপদবদ্ধ হয়ে প্রুশীয় সরকারের পায়ে আছড়ে পড়াটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচনা করল। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু অবৈধ এবং জনবিরোধী বলে পরিষদ যাদের উপর ধিক্কার দিয়েছিল, যাদের বরখাস্ত করাবার জন্যে সেটা বৃথাই পীড়াপীড়ি করেছিল, সেই মন্ত্রীদেরই সামনে সেটা নতজানু হল। এই কলঙ্কজনক কাজকারবারের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৎপরবর্তী ট্র্যাজি-কমিকাল ঘটনাবলি হবে আমাদের পরের কিস্তির বিষয়বস্তু।

লন্ডন, এপ্রিল, ১৮৫২

১৫

প্রাশিয়ার জয়

এবার আমরা আসছি জার্মান বিপ্লবের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে: বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলির, বিশেষত প্রাশিয়ার সরকারের সঙ্গে জাতীয় পরিষদের বিরোধ; দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানির অভ্যুত্থান, আর শেষে প্রাশিয়া কর্তৃক অভ্যুত্থান দমন করা।

কর্মরত ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদকে আমরা আগেই দেখেছি। আমরা দেখেছি সেটা অস্ট্রিয়ার লাথি খেয়েছে, প্রাশিয়া সেটাকে অপমান করেছে, সেটাকে অমান্য করেছে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি, সেটাকে বোকা বানিয়েছে সেটার নিজস্ব অক্ষম কেন্দ্রীয় 'সরকার', যেটাকে আবার বোকা বানিয়েছে দেশের

একেবারে প্রত্যেকটা রাজন্য। কিন্তু শেষে এই দুর্বল, দোলায়মান, নিস্তেজ বিধানিক সংস্থাটার মহা বিপদই ঘনিয়ে আসতে থাকল। বাধ্য হয়ে সেটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, 'জার্মান একত্বের মহিমান্বিত ধারণাটাকে বাস্তবে পরিণত করার সম্ভাবনা বিপন্ন', সেটার অর্থ ছিল একেবারে ঠিক ঠিক এই যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ এবং সেটা যাকিছু করেছিল আর করতে যাচ্ছিল, সবই খুব সম্ভব ভেস্তে যাচ্ছিল। তাই সেটা চমৎকার বস্তু 'সাম্রাজ্যিক সংবিধান' পয়দা করতে লেগে গিয়েছিল স্থিরসংকল্প হয়ে।

কিন্তু একটা মুশকিল ছিল: নির্বাহী কর্তৃপক্ষটা হবে কী? নির্বাহী পরিষদ? না; নিজেদের পাণ্ডিত্য অনুসারে তারা ভেবেছিল সেটা হত জার্মানিকে প্রজাতন্ত্র করে ফেলা। 'রাষ্ট্রপতি'? সেটাও তো দাঁড়ায় ঐ একই। কাজেই তাদের জাগিয়ে তোলা চাই সাবেকী সাম্রাজ্যিক মর্যাদা। কিন্তু — যেহেতু সম্রাট তো হওয়া চাই একজন রাজন্য — তিনি হবেন কে? রেইস্-গ্রেইট্স-শ্লেইট্স-লোবেনস্টেইন-এবের্সডর্ফ* থেকে ব্যাভেরিয়ার রাজা** অবধি dii minorum gentium***-এর কেউ নিশ্চয়ই নয়; অস্ট্রিয়া কিংবা প্রাশিয়া কেউই সেটা মানত না। হতে পারত শুধু অস্ট্রিয়া কিংবা প্রাশিয়া। কিন্তু এই দুইয়ের কোন্‌টা? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য দিক থেকে পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এই মহিমময় পরিষদ এই মস্ত উভয়সংকট সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে অদ্যাবধি আলোচনা চালাতে থাকত, যদি অস্ট্রীয় সরকার জটিলতার মীমাংসা করে দিয়ে তাদের মুশকিল আসান না করত।

অস্ট্রিয়া বেশ ভালভাবেই জানত, সমস্ত প্রদেশগুলিকে বশীভূত করে একটা শক্তিশালী এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে সে যে মুহূর্তে আবার ইউরোপের সামনে দেখা দেবে অমনি রাজনীতিক মহাকর্ষ নিয়মটাই বাদবাকি জার্মানিকে তার কক্ষে আকর্ষণ করে নেবে — ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের প্রদত্ত সাম্রাজ্যিক ক্রাউন যেকোন কর্তৃত্ব দিতে পারত সেটার সাহায্য ছাড়াই। অস্ট্রিয়া ছিল ঢের বেশি শক্তিশালী, অস্ট্রিয়ার গতিবিধি ছিল ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ, যেহেতু

---

* ৭২তম হেনরি। — সম্পাঃ

** ২য় ম্যাক্সিমিলিয়েন। — সম্পাঃ

*** আক্ষরিক অর্থে: অবর দেবতারা; আলংকারিক অর্থে: দ্বিতীয় শ্রেণীদারের লোক। — সম্পাঃ

সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল জার্মান সাম্রাজ্যের ক্ষমতাহীন ক্রাউন, যে ক্রাউন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্মনীতিটাকে ভারাক্রান্ত করত, অথচ জার্মানির ভিতরে কিংবা বাইরে তার শক্তি বাড়াত না একরত্তিও। আর ধরা যাক অবস্থা এমন দাঁড়াল যাতে ইতালিতে আর হাঙ্গেরিতে অবস্থান বজায় রাখতে পারল না অস্ট্রিয়া — তাহলে তো অস্ট্রিয়া ভেঙে পড়ে, ধ্বংস হয়ে যায় জার্মানিতেও, এবং নিজ শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকার অবস্থায় যে ক্রাউন হাত থেকে ফসকে গেল সেটাকে আবার হস্তগত করার দাবি করতে পারে না। তাই অস্ট্রিয়া তৎক্ষণাৎ যেকোন সাম্রাজ্যিক ক্ষমতাপুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে সাদাসিধে দাবি করল ফেডারেটিভ ডায়েটের পুনঃস্থাপনা, যেটা ছিল জার্মানির একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার যেটা ১৮১৫ সালের সন্ধিচুক্তিতে বিদিত এবং স্বীকৃত। ১৮৪৯ সালে ৪ মার্চ জারি করল সেই সংবিধান যেটার একমাত্র অর্থ হল অস্ট্রিয়াকে একটা অবিভাজ্য, কেন্দ্রীকৃত এবং স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা, ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ যে জার্মানি পুনঃসংগঠিত করত সেটা থেকেও যে রাজতন্ত্র পৃথক।

এই প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণার ফলে বাস্তবিকপক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টের পণ্ডিতমানীদের সামনে উপায় রইল শুধু অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বাদ দেওয়া এবং বাদবাকি জার্মানিকে নিয়ে একটা 'পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য' (৫৩), 'খুদে জার্মানি' গোছের কিছু সৃষ্টি করা, যেটার কিছুটা জীর্ণ সাম্রাজ্যিক সাজ বসবে প্রাশিয়ার হিজ ম্যাজেস্টির কাঁধে। স্মরণে থাকতে পারে, এটা হল ছয় কিংবা আট বছর আগে দক্ষিণ আর মধ্য জার্মানির একদল উদারপন্থী নীতিবাগীশদের পোষিত একটা পুরন পরিকল্পনার পুনর্নবীকরণ, তাদের পুরন খেয়ালটা দেশের মোক্ষের জন্যে 'নতুন উপস্থাপনা' হিসেবে আবার সামনে এসে গেল যে হীনতাজনক পরিস্থিতির কল্যাণে সেটাকে তারা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করল।

তদনুসারে পরিষদ ১৮৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং তার সঙ্গে একত্রে অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা আর সাম্রাজ্যিক নির্বাচনী আইন নিয়ে বিতর্ক শেষ করে. তাতে তারা অবশ্য কখনও রক্ষণপন্থী বা বরং প্রতিক্রিয়াশীল তরফকে এবং কখনও পরিষদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশগুলিকে বহুতর বিষয়ে অতি পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সুবিধে দিতে

বাধ্য হয়। পরিষদের নেতৃত্ব আগে ছিল দক্ষিণপন্থীদের এবং দক্ষিণ মধ্যপন্থীদের (রক্ষণপন্থী আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের) হাতে, আর তখন প্রকৃতপক্ষে স্পষ্ট দেখা গেল, ধীরে হলেও ক্রমে নেতৃত্ব চলে যাচ্ছিল সংস্থাটির বাম বা গণতান্ত্রিক দিকে। এই পরিষদ অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বাদ দিয়েছিল, কিন্তু অস্ট্রীয় ডেপুটিরা সেখানে থাকতে এবং ভোট দিতে পারত— তাদের কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থান পরিষদের ভারসাম্য বিগড়ে দেবার সহায়ক ছিল। এইভাবে, ফেব্রুয়ারি মাসের সেই শেষের দিকেই বাম মধ্যপন্থী আর বামেরা অস্ট্রীয় ভোটের সাহায্যে খুবই সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, আর অন্যান্য দিন অস্ট্রীয়দের রক্ষণপন্থী অংশ হঠাৎ এবং তামাসা করার জন্যেই দক্ষিনেদের সঙ্গে মিলে ভোট দিয়ে আবার পাল্লা ভারি করে দিয়েছিল অপর পক্ষে। এইসব হঠাৎ হঠাৎ লাফালাফি দিয়ে তারা পরিষদকে অবজ্ঞেয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল একেবারেই অনাবশ্যক: ফ্রাঙ্কফুর্টের চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা এবং কিছু দেবার ব্যাপারে অকার্যকরতা সম্বন্ধে জনসাধারণ নিশ্চিত ছিল অনেক আগে থেকেই। ইতোমধ্যে, এইসব লাফালাফি আর পালটা-লাফালাফির অবস্থায় কেমনতর সংবিধান রচিত হয়েছিল সেটা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে।

পরিষদের বাম অংশটা মনে করত তারা ছিল বৈপ্লবিক জার্মানির সেরা অংশ এবং গর্বের বস্তু; অস্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের প্ররোচনায় এবং সেটার স্বার্থে সক্রিয় একপ্রস্থ অস্ট্রীয় রাজনীতিকের শুভেচ্ছা, বরং বলা ভাল বিদ্বেষের সাহায্যে অল্প কয়েকটা তুচ্ছ সাফল্য লাভ করে একেবারেই প্রমত্ত ছিল এই বাম অংশটা। তাদের নিজেদের নীতিগুলো তেমন সুনির্দিষ্ট ছিল না, সেগুলোর একটুও কাছাকাছি কিছু হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় লঘুকৃত অবস্থায় যখনই ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের অনুমোদন গোছের কিছু লাভ করত অমনি এই গণতন্ত্রীরা উচ্চকণ্ঠে জাহির করত তারা দেশকে এবং জনগণকে রক্ষা করেছে। এইসব অকিঞ্চিৎকর, দুর্বলচিত্ত মানুষ তাদের সাধারণভাবে খুবই অখ্যাত জীবনে সাফল্য গোছের কিছুর ব্যাপারে এতই অনভ্যস্ত ছিল যে, তারা বাস্তবিকই বিশ্বাস করত দুই-তিন ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাদের তুচ্ছ সংশোধনী প্রস্তাবগুলো পাস হলে ইউরোপের চেহারা বদলে যেত। বিধানিক কর্মজীবনের শুরু থেকেই তারা পরিষদের অন্য যেকোন উপদলের চেয়ে বেশি মাত্রায়

চিকিৎসার অসাধ্য সেই **'পার্লামেণ্টারি বামনত্ব'** রোগে আচ্ছন্ন; এই ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভাগাদের মগজে এই গুরুগম্ভীর প্রত্যয় জন্মায় যে, যে বিশেষ প্রতিনিধি সংস্থাটা সেটার সদস্যদের মধ্যে তাদের পেয়ে ধন্য হয়েছে সেখানেই ভোটাধিক্যে নিয়মিত এবং নির্ধারিত হয় সমগ্র পৃথিবী, সেটার ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ। তারা বিশ্বাস করে যে, যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা — সেটা যা-ই হোক — কোন একমুহূর্তে তাদের সম্মানিত আইনসভার মনোযোগ জুড়ে থাকে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সঙ্গে তুলনায় তাদের আইনসভার চার-দেয়ালের বাইরে যাকিছু ঘটে — যুদ্ধ, বিপ্লব, রেলপথ নির্মাণ, গোটা গোটা নতুন মহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করা, কালিফোর্নিয়ায় সোনা আবিষ্কার, মধ্য আমেরিকায় খাল কাটা, রুশী সৈন্যবাহিনী এবং মানবজাতির নিয়তির উপর অন্তত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন অন্য সবকিছু অকিঞ্চিৎকর। এইভাবেই পরিষদের গণতান্ত্রিক তরফ 'সাম্রাজ্যিক সংবিধানে'র মধ্যে তাদের দু'-চারটে সাধের দাওয়াই কোনমতে ঢুকিয়ে দিতে পেরে প্রথমে সেটাকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতায় পড়ে, যদিও প্রত্যেকটা সারবান বিষয়ে সেটা তাদের নিজস্ব প্রায়শ ঘোষিত নীতিগুলোর সরাসরি বিরোধী। আর শেষে, যখন সেই খচ্চর বস্তুটার প্রধান রচয়িতারা সেটাকে পরিত্যাগ ক'রে গণতান্ত্রিক তরফের দায়াদ করে তখন তারা সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে এবং **তখন** যারা নিজ নিজ **প্রজাতান্ত্রিক** নীতি ঘোষণা করেছিল এমনকি তাদেরও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আঁকড়ে থাকে এই **রাজতান্ত্রিক** সংবিধান।

তবে এটা বলতেই হবে যে, এতে অসংগতিগুলো ছিল শুধু আপাতপ্রতীয়মান। সাম্রাজ্যিক সংবিধানের অনির্দিষ্ট, স্ববিরোধী, অপরিণত প্রকৃতিটা হল এই গণতন্ত্রী ভদ্রলোকদের অপরিণত, তালগোল পাকান, পরস্পরবিরোধী রাজনীতিক ভাব-ধারণারই প্রতিমূর্তি। তাদের নিজেদের বিভিন্ন উক্তি এবং রচনা — যতখানি তারা লিখতে পারে — যদি সেটার যথেষ্ট প্রমাণ না হয় তাহলে সেই প্রমাণ দিচ্ছে তাদের কাজকর্ম, কেননা যারা বিচক্ষণ তাদের পক্ষে কারও সম্বন্ধে ধারণা স্থির করতে হলে তার বক্তব্য দিয়ে নয়, তার কাজকর্ম দিয়েই সেটা করা স্বাভাবিক; তিনি যেমনটা ভান করেন তা দিয়ে নয়, তিনি যা করেন এবং তিনি আসলে যা তাই দিয়ে; আর জার্মান গণতন্ত্রের এই বীর-নায়কদের কৃতিগুলি আপনাতেই যথেষ্ট সোচ্চার,

তা আমরা জানব একটু পরেই। তবে যাবতীয় পরিশিষ্ট আর আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি সমেত সাম্রাজ্যিক সংবিধান পাস হয় চূড়ান্তভাবে, আর ২৮ মার্চ প্রাশিয়ার রাজা নির্বাচিত হন অস্ট্রিয়া বাদে জার্মানির সম্রাট, পক্ষে ২৯০ ভোট, বিরুদ্ধে ২৪৮ ভোট (যারা ভোটদানে বিরত ছিল) এবং শ'-দুই ভোট (যারা ছিল অনুপস্থিত)। ইতিহাসের পরিহাস ষোল-কলা পূর্ণ হল; ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চ (৫৪) বিপ্লবের তিন দিন পরে স্তম্ভিত বার্লিনের (রাজা তখন যে অবস্থায় সেটা অন্যত্র হলে মার্কিনী মেন্ রাজ্যের সুরাবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ত) রাস্তায় রাস্তায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের সাম্রাজ্যিক প্রহসন — ঠিক একবছর পরে সেই নাক্কারজনক প্রহসনটাকে মঞ্জুরি দিল সারা জার্মানির প্রতিনিধি পরিষদ ভেকধারী সংস্থাটা। এই হল জার্মান বিপ্লবের পরিণাম!

লণ্ডন, জুলাই, ১৮৫২

১৬

জাতীয় পরিষদ এবং বিভিন্ন সরকার

প্রাশিয়ার রাজাকে (অস্ট্রিয়া বাদে) জার্মানির সম্রাট নির্বাচিত করার পরে ফ্রাংকফুর্টের জাতীয় পরিষদ সম্রাটকে রাজমুকুট প্রদানের জন্যে একটা ডেপুটেশন বার্লিনে পাঠিয়ে তার অধিবেশন মুলতবি রাখল। ৩ এপ্রিল ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম অভ্যর্থনা করলেন ডেপুটিদের। তাদের তিনি বললেন, জন-প্রতিনিধিদের ভোট তাঁকে যা দিয়েছে, জার্মানির অন্যান্য সমস্ত রাজন্যের উপর তাঁর সেই অগ্রাধিকার গ্রহণ করেও, তাঁর আধিপত্য এবং তাঁকে ঐ অধিকার প্রদানের সাম্রাজ্যিক সংবিধান বাদবাকি রাজন্যরা মানছে বলে নিশ্চিত হবার আগে তিনি সম্রাটের মুকুট গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, জার্মানির সরকারগুলির বিবেচনা করা দরকার এই সংবিধান সেগুলির পক্ষে অনুসমর্থনীয় কিনা। শেষে তিনি বলেন, যা-ই হোক, তিনি সম্রাট হন, কি না-ই হন, বহিঃশত্রু কিংবা গৃহশত্রুর বিরুদ্ধে অসি নিষ্কাশিত

করতে তিনি প্রস্তুত থাকবেন সর্বদাই। কিভাবে তিনি জাতীয় পরিষদের পক্ষে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ধরনেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন সেটা আমরা দেখব অচিরেই।

প্রগাঢ় কূটনীতিক অনুসন্ধানাদি করে ফ্রাঙ্কফুর্টের পন্ডিতমানীরা শেষে স্থির করল এই উত্তরটা ক্রাউন প্রত্যাখ্যানেরই শামিল। তখন (১২ এপ্রিল) তারা সিদ্ধান্ত নিল: সাম্রাজ্যিক সংবিধান দেশের বিধান, সেটাকে বজায় রাখতেই হবে; এবং সামনে আদৌ কোন পথই দেখতে না পেয়ে এই সংবিধান বলবৎ করার উপায় সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে তিরিশ-জনের একটা কমিশন নির্বাচিত করল।

এই সিদ্ধান্তটা হল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ এবং জার্মান সরকারগুলোর মধ্যে সংঘাতের সংকেত, সেই সংঘাত তখন বেধে গেল।

বুর্জোয়ারা, বিশেষত পেটি বুর্জোয়ারা সহসা নতুন ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধানের সপক্ষে জোরাল মত প্রকাশ করল। 'বিপ্লবের অবসান ঘটাবার' মুহূর্তটার জন্যে তারা আর বিলম্ব করতে পারল না। অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় তখনকার মতো বিপ্লবের অবসান ঘটান হয়েছিল সশস্ত্র শক্তির হস্তক্ষেপ দিয়ে; এই কাররবাইটা সমাধা করতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি অপেক্ষাকৃত কম জবরদস্তির উপায় বেশি পছন্দ করত, কিন্তু তারা সুযোগ পায় নি। ব্যাপারটা তো ঘটেই গেছে, সেটার যথোচিত সদ্ব্যবহার তাদের করা চাই, এই সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ নিয়ে সেটাকে তারা অতি বীরোচিত উপায়ে কার্যে পরিণত করল। ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে সবকিছু চলছিল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে, সেখানে বুর্জোয়ারা পড়েছিল গিয়ে জমকাল কিন্তু নিষ্ফল কেননা ক্ষমতাহীন পার্লামেন্টারি আলোড়নের মাঝে, যেটা ছিল তাদের নিজেদের সবচেয়ে মুনাসিব। জার্মানির রাজ্যগুলিকে পৃথক পৃথক করে ধরে দেখলে প্রতীয়মান হত সেগুলি এমন একটা নতুন এবং চূড়ান্ত আকার পেয়েছিল যাতে করে নাকি সেগুলি তখন থেকে শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরতে পারে। অমীমাংসিত প্রশ্ন রইল শুধু একটা — জার্মান কনফেডারেশনের নতুন রাজনীতিক সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন। এই একটামাত্র প্রশ্ন তখনও বিপদে ঠাসা বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল — সেটার অবিলম্ব মীমাংসা আবশ্যক বিবেচিত হল। তাই বুর্জোয়ারা ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের উপর চাপ দিতে থাকল

সংবিধানটাকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করতে সেটাকে প্রবৃত্ত করাবার জন্যে; তাই অবিলম্বে থিতান অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে উচ্চ এবং নিম্ন বুর্জোয়ারা এটা যা-ই হোক এই সংবিধানটাকে গ্রহণ এবং সমর্থন করতে কৃতসংকল্প হল। এইভাবে, একেবারে শুরু থেকেই সাম্রাজিক সংবিধানের সপক্ষে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি থেকে, আর অনেক আগে থেকেই বিপ্লব সম্বন্ধে ত্যক্তবিরক্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে পয়দা হয়েছিল এই আলোড়ন।

কিন্তু আরও একটা বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট ছিল এতে। ভবিষ্য জার্মান সংবিধানের প্রথম এবং বুনিয়াদী মূলনীতিগুলি ভোটে গৃহীত-অনুমোদিত হয়েছিল বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতে — ১৮৪৮ সালে বসন্তে এবং গ্রীষ্মে — তখনও জন-আলোড়ন ছিল বহুবিস্তৃত। তখন পাস করা প্রস্তাবগুলি তখন পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল হলেও অস্ট্রীয় আর প্রুশীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারী কার্যকরণগুলোর পরে সেগুলি খুবই উদারনীতিক, এমনকি গণতান্ত্রিক প্রতীয়মান হয়। তুলনার মানদণ্ড বদলে গিয়েছিল। ফ্রাংকফুর্ট পরিষদ যদি একদা ভোটে পাস করান অনুবিধিগুলি কেটে বাদ দিয়ে অস্ট্রীয় আর প্রুশীয় সরকারের তলোয়ার-হাতে হুকুম-করা অনুবিধির ছাঁচে সাম্রাজ্যিক সংবিধানটাকে ঢেলে ফেলত সেটা হত পরিষদের নৈতিক আত্মহত্যারই শামিল। তাছাড়া, আমরা যা দেখেছি, ঐ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পক্ষবদল করেছিল; উদারপন্থী এবং গণতান্ত্রিক তরফের প্রভাব বাড়ছিল। এইভাবে সম্পূর্ণত আপাতপ্রতীয়মান গণতান্ত্রিক উদ্ভব দিয়ে সাম্রাজিক সংবিধান বিশিষ্ট ছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে, নানা অসংগতি দিয়ে ভরা থাকলেও, সেটা ছিল সারা জার্মানির সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু এটা ছিল নিছক এক-তা কাগজ, এটার অনুবিধিগুলিকে সমর্থন করার কোন ক্ষমতা ছিল না — এই ছিল সেটার বড় দোষ।

এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক তরফ, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ সাম্রাজ্যিক সংবিধানটাকে জড়িয়ে ধরেছিল, এটা ছিল স্বাভাবিক। দাবিদাওয়ার দিক থেকে এই শ্রেণীটি সবসময়ে রাজতান্ত্রিক-নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল; এই শ্রেণী অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠতার ভাব প্রদর্শন করত, প্রায়ই সশস্ত্র প্রতিরোধের হুমকি দিত, মুক্তির

জন্যে সংগ্রামে রক্ত এবং অস্তিত্ব বলিদান করার দেদার প্রতিশ্রুতি দিত; কিন্তু ইতোমধ্যে এটা প্রচুর প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিল যে, বিপদের দিনে এটার পাত্তা পাওয়া যায় না, আর কোন চূড়ান্ত পরাজয়ের পরদিন যেমনটা তার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এটা বোধ করত না আর কখনও, ঐ পরাজয়ে সবকিছু খোয়া যাবার পরে এটা অন্তত এই জেনে সান্ত্বনা পেত যে, কোন-না-কোন ভাবে ব্যাপারটার ফয়সালা **হয়ে গেল**। কাজেই, যেখানে বড় বড় ব্যাঙ্কার, ম্যানুফ্যাকচারার এবং ব্যাপারীদের আনুগত্য ছিল অপেক্ষাকৃত চাপা ধরনের, ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধানের সপক্ষে প্রধানত সাদাসিধে প্রদর্শনের মতো, তাদের ঠিক নিচের শ্রেণীটি, আমাদের তেজী গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা এগিয়ে আসত জাঁকের তোড়ে, এবং যথারীতি ঘোষণা করত তারা বরং ঢেলে দেবে শেষ রক্তবিন্দু অবধি, তবু ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না সাম্রাজ্যিক সংবিধানটিকে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারের বুর্জোয়া এবং কমবেশি গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এই দুই তরফের সমর্থনে সাম্রাজ্যিক সংবিধান অবিলম্বে প্রবর্তন করার আলোড়নের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে; কতকগুলি রাজ্যের পার্লামেণ্টে সেটার সবচেয়ে প্রবল অভিব্যক্তি হয়। প্রাশিয়া, হানোভার, সাক্সনি, বাডেন এবং ভুর্টেমবের্গের চেম্বারগুলি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে। সরকারগুলি এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের মধ্যে সংগ্রাম আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে।

তবে সরকারগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল দ্রুত। প্রুশীয় চেম্বারগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল, সেটা হল অবৈধ কাজ, কেননা প্রুশীয় সংবিধান সংশোধন এবং অনুমোদন করার কাজটা ছিল তাদের; সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে উসকানো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল বার্লিনে; তার পরদিন ২৮ এপ্রিল প্রুশীয় মন্ত্রিসভার প্রচারিত সার্কুলারে সাম্রাজ্যিক সংবিধানকে অত্যন্ত অরাজকতাজনক এবং বৈপ্লবিক দলিল বলে অভিহিত করে বলা হল, সেটাকে নতুন ছাঁচে ঢালা এবং শোধন করাই সরকারগুলির কাজ। এইভাবে, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিজ্ঞজনেরা বরাবর যে সার্বভৌম বিধানিক ক্ষমতার বড়াই করেছেন কিন্তু কখনও প্রতিষ্ঠা করেন নি সেটা স্পষ্টাস্পষ্টি অগ্রাহ্য করল প্রাশিয়া। আগেই আইন হিসেবে সাধারণ্যে ঘোষিত সংবিধান সম্বন্ধে বিচার-মীমাংসা করতে বসল রাজন্য কংগ্রেস (৫৫) — পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের নতুন আকার। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া সৈন্যসমাবেশ করল ক্রয়েজনাখে, সেখান থেকে

ফ্রাঙ্কফুর্ট তিন দিন মার্চের পথ, আর ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে বলল, যেইমাত্র তাদের চেম্বার ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে অমনি যেন সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয় প্রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসারে। এই দৃষ্টান্ত ত্বরায় অনুসরণ করেছিল হ্যানোভার আর স্যাক্সনি।

অস্ত্রবলে সংগ্রামের নিষ্পত্তি এড়ান যাবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সরকারগুলোর বিরুদ্ধতা, জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন প্রতিদিনই প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। গণতন্ত্রী নাগরিকেরা সর্বত্র সৈন্যদলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকল — তাতে বিপুল সাফল্য হল দক্ষিণ জার্মানিতে। সর্বত্র অনুষ্ঠিত হল বড় বড় গণসভা, সেগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবে প্রয়োজন হলে অস্ত্রবলে সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত হল। কলোনে রাইনীয় প্রাশিয়ার সমস্ত পৌর পরিষদের ডেপুটিদের একটা সভা হল ঐ একই উদ্দেশ্যে। পেলাট্‌নেটে, বের্গে, নুরেম্‌বার্গে, ওডেনভাল্ডে কৃষকেরা বহুতর সংখ্যায় সমবেত হয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেতে উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে সংবিধান-সভা ভেঙে দিয়ে প্রচণ্ড আলোড়নের মাঝে চলছিল নতুন নির্বাচনের প্রস্তুতি, আর ওদিকে, জার্মানির পূর্ব সীমান্তে হাঙ্গেরীয়রা পর পর কয়েকটা দেদীপ্যমান বিজয়ের সাহায্যে একমাসের মধ্যে থেইস্‌ থেকে লেইথা অবধি অস্ট্রীয় আক্রমণ পিছনে গুটিয়ে দিয়েছিল, ঝটিকা আক্রমণে ভিয়েনা দখল প্রত্যাশিত ছিল যেকোন দিন। চতুর্দিকে জন-মানস উদ্দীপিত হয়ে উঠছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়, আর সরকারগুলোর আক্রমণমুখী কর্মনীতি আরও স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হয়ে উঠছিল প্রতিদিনই, তার ফলে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য; একমাত্র ভীরু অক্ষমতাই সেই অবস্থায় সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ধারণায় বশীভূত হতে পারত। কিন্তু এই ভীরু অক্ষমতা খুবই ব্যাপক ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে।

লণ্ডন, জুলাই, ১৮৫২

১৭

অভ্যুত্থান

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় পরিষদ এবং জার্মানির রাজ্য সরকারগুলির মধ্যকার অনিবার্য সংঘাত প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়েছিল ১৮৪৯

সালের মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে। অস্ট্রীয় ডেপুটিদের ফিরে যেতে আদেশ করেছিল তাদের সরকার, — বাম বা গণতান্ত্রিক তরফের অল্প কয়েক জন ছাড়া তারা পরিষদ ছেড়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। অবস্থাটা যেভাবে মোড় ঘুরতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে অবহিত রক্ষণশীল ডেপুটিদের প্রধান অংশটা নিজ নিজ সরকার তা করতে আদেশ করার আগেই সরে গিয়েছিল। এইভাবে, যেসব কারণে বামের প্রভাব আরও শক্তিশালী হচ্ছিল বলে পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে দেখান হয়েছে সেগুলি থেকে স্বাধীনভাবে স্রেফ দক্ষিনে সদস্যরা ভঙ্গ দেবার ফলেই পরিষদের আগেকার ঊনজন পরিণত হয়েছিল অধিজনে। এই নতুন অধিজন আগে কখনও এই সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি: প্রতিপক্ষ সারিতে আসন থেকে পুরন অধিজন এবং সাম্রাজ্যিক সরকারের দুর্বলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং জড়তার বিরুদ্ধে বাক্যোদ্গার করার সুবিধে তাদের ছিল। তখন সহসা সেই পুরন অধিজনের স্থানপূরণ করার ডাক এল **তাদেরই** কাছে। তারা কী সম্পাদন করতে পারে সেটা তখন **তাদের** দেখাবার পালা। তাদের নিশ্চয়ই হওয়া চাই তেজ, স্থিরসংকল্প এবং তৎপরতার কর্মধারা। তারা, জার্মানির সেরা অংশ তখন অচিরেই সাম্রাজ্যের ভীমরতিগ্রস্ত রাজ-প্রতিনিধিকে এবং তার দোলায়মান মন্ত্রীদের ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে, আর সেটা অসম্ভব হলে তারা — এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না! — জনগণের সার্বভৌম অধিকারবলে অক্ষম সরকারটাকে গদিচ্যুত করে সে জায়গায় বসাবে তেজীয়ান, অক্লান্ত সরকারকে, যে নিশ্চিত করবে জার্মানির মোক্ষ। হতভাগার দল! **তাদের** শাসন — যেটাকে কেউ মান্য করে না সেটাকে যদি বলা যায় শাসন — ছিল এমনকি তাদের পূর্বগামীদের শাসনের চেয়েও উপহাসাস্পদ।

নতুন অধিজন ঘোষণা করল, সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যিক সংবিধান বলবৎ করতে হবে, আর সেটা **তখনই**; সামনের ১৫ জুলাই জনসাধারণ নতুন প্রতিনিধি-সভার জন্যে ডেপুটিদের নির্বাচিত করবে, তার পরের ২২ আগস্ট এই সভার অধিবেশন বসবে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এটা হল যেসব সরকার সাম্রাজ্যিক সংবিধান মানে নি সেগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা, ঐসব সরকারের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী ছিল প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া, সেগুলিতে ছিল জার্মান জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশের বেশি; এই যুদ্ধঘোষণা তারা গ্রহণ করেছিল

চটপট। প্রাশিয়া আর ব্যাভেরিয়া থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঠান ডেপুটিদেরও ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে তারা জাতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি ত্বরিত করল। অন্য দিকে, সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদের সপক্ষে গণতান্ত্রিক তরফের অভিমতপ্রদর্শনগুলো (পার্লামেন্টের বাইরে) আরও বেশি দুর্দান্ত এবং প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল, আর সবচেয়ে চরমপন্থী তরফের লোকেদের নেতৃত্বে মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশ অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল এই কর্মব্রতের জন্যে, সেটা তাদের নিজস্ব না হলেও তাতে জার্মানিকে পুরন রাজতান্ত্রিক বেড়ি থেকে মুক্ত করে তাদের লক্ষ্যের দিকে অন্তত কিছুটা এগোবার সুযোগ আসে। এইভাবে সর্বত্র জনসাধারণ এবং সরকার এই বিষয়ে খড়্গহস্ত হয়ে দাঁড়াল; বিস্ফোরণ অনিবার্য হয়ে উঠল; মাইন্ তখন পাতা হয়ে গেছে, সেটা ফেটে পড়ার জন্যে তখন শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ আবশ্যক। সাক্সনিতে চেম্বার ভাঙা, প্রাশিয়ায় লান্ডভেয়ার (সামরিক রিজার্ভ) তলব, সাম্রাজ্যিক সংবিধানের বিরুদ্ধে সরকারের প্রকাশ্য প্রতিরোধ — এগুলো হল ঐসব স্ফুলিঙ্গ; সেইসব স্ফুলিঙ্গ ছুটল — অমনি সহসা জ্বলে উঠল দেশটা। ৪ মে ড্রেসডেনে বিজয়ী জনগণ শহরটিকে দখল করে খেদিয়ে দিল রাজাকে*, চারপাশের সমস্ত এলাকা থেকে সৈন্যসাহায্য গেল বিদ্রোহীদের কাছে। রাইনীয় প্রাশিয়ায় আর ওয়েস্টফালিয়াতে লান্ডভেয়ার মার্চ করতে নারাজ হল, অস্ত্রাগার দখল করে তারা অস্ত্রসজ্জিত হল সাম্রাজ্যিক সংবিধানের সমর্থনের জন্যে। পেলাট্নেটে জনগণ ব্যাভেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করল, সরকারী অর্থাদি হস্তগত করল, স্থাপন করল একটা 'প্রতিরক্ষা কমিটি', এই কমিটি প্রদেশটিকে ন্যস্ত করল জাতীয় পরিষদের রক্ষণাধীনে। ভ্যুর্টেমবের্গে জনগণ রাজাকে** সাম্রাজ্যিক সংবিধান মানতে বাধ্য করল; বাডেনে জনগণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফৌজ গ্রান্ড ডিউককে*** পালিয়ে যেতে বাধ্য করল এবং দাঁড় করাল একটা অস্থায়ী সরকার। জার্মানির অন্যান্য জায়গায় জনসাধারণ অপেক্ষা করছিল — জাতীয় পরিষদের কাছ থেকে

---

* দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ-অগস্টাস। — সম্পাঃ

** প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

*** লেওপল্দ। — সম্পাঃ

একটা স্থিরনিশ্চিত সংকেত পেলেই তারা অস্ত্রধারণ করে পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হত।

জাতীয় পরিষদের হীন কর্মজীবনের পরে যা আশা করা যেতে পারত তার চেয়ে ঢের বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়াল সেটার অবস্থান। জার্মানির পশ্চিমার্ধ পরিষদের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল; সর্বত্রই সৈন্যবাহিনী ছিল দোদুল্যমান; ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে তারা নিঃসন্দেহেই ছিল আন্দোলনের অনুকূল। হাঙ্গেরীয়দের বিজয়ী অগ্রগতির ফলে অস্ট্রিয়া ছিল প্রায় ভূমিশায়ী; জার্মান সরকারগুলোর রিজার্ভ শক্তি রাশিয়া সমস্ত ক্ষমতা খাটাচ্ছিল মাগিয়ার বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার জন্যে। দমন করার দরকার ছিল শুধু প্রাশিয়াকে; সে দেশে যে বৈপ্লবিক সহানুভূতি ছিল তাতে সে লক্ষ্য হাসিল করার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে, পরিষদের আচরণের উপর নির্ভর করছিল সবকিছু।

যুদ্ধ কিংবা অন্য যেকোন কিছুর মতো অভ্যুত্থানও একটা আর্ট এবং কোন কোন কার্যবাহ-নিয়মাধীন, সেসব নিয়ম অবহেলিত হলে যে তরফ সেই অবহেলা করে সেটার সর্বনাশ ঘটে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তরফগুলি এবং পরিস্থিতির প্রকৃতি থেকে পাওয়া যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে এইসব নিয়ম এতই সাদাসিধে যে, ১৮৪৮ সালের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলো সম্বন্ধে জার্মানেরা বেশ ভালভাবেই অবহিত ছিল। প্রথমত, খেলাটার পরিণামের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত না হয়ে অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। অভ্যুত্থান একরকমের ক্যালকুলাস, তাতে থাকে বহু অনির্দিষ্ট মাত্রা, সেগুলোর মূল্য বদলে যেতে পারে প্রতিদিন। বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর রয়েছে সংগঠন, শৃঙ্খলা আর অভ্যস্ত কর্তৃত্বের সুবিধা; সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রবল পালটা শক্তি দাঁড় না করালে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হবে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, অভ্যুত্থানের কার্যক্রম একবার ধরলে কাজ চালাতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্থির-সংকল্প হয়ে এবং আক্রমণাত্মক উপায়ে। আত্মরক্ষামূলক অবস্থান হল যেকোন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু; শত্রুর সঙ্গে নিজের তুলনামূলক মূল্যায়নের আগেই সেটার হার হয়। প্রতিপক্ষীয়দের শক্তি ছড়িয়ে থাকতে-থাকতে তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালান দরকার; নতুন নতুন সাফল্য লাভ করা দরকার, তা যতই ক্ষুদ্র হোক, কিন্তু দৈনন্দিন; বিদ্রোহীদের প্রথম সার্থক আক্রমণ

থেকে পাওয়া মনোবলের শ্রেষ্ঠত্বটাকে বজায় রাখতে হবে; দোদুল্যমান যারা সবসময়ে চলে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা অনুসারে, আর সবসময়ে খোঁজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পক্ষটাকে, তাদের নিজেদের পক্ষে জড়ো করতে হবে; শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে শক্তি সমবেত করতে পারার আগেই তাকে হঠে যেতে বাধ্য করা দরকার; বৈপ্লবিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে এযাবত জ্ঞাত মহত্তম বিশারদ দাঁতোঁর ভাষায়: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace!*

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় পরিষদের যে নিশ্চিত সর্বনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা এড়াবার জন্যে সেটার করণীয় ছিল কী? সর্বপ্রথমে, পরিস্থিতিটার মর্ম স্পষ্ট বুঝে এই প্রত্যয় জন্মান দরকার ছিল যে, সরকারগুলোর কাছে নিঃশর্তে বশ্যতাস্বীকার করা কিংবা কোন দ্বিধা না রেখে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মব্রত গ্রহণ করা ছাড়া তখন গত্যন্তর ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইতোমধ্যে যেগুলো শুরু হয়েছিল সেই সমস্ত অভ্যুত্থানকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা, এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা সার্বভৌম জনগণের বিরোধিতা করতে সাহস করে এমন সমস্ত রাজন্য, মন্ত্রী এবং অন্যান্যকে আইনবহির্ভূত ক'রে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের সমর্থনে অস্ত্রধারণের জন্যে সর্বত্র জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানান দরকার ছিল। তৃতীয়ত, জার্মান সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধিকে তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত করা, শক্তিশালী, সক্রিয় যেকোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা, ফ্রাঙ্কফুর্টকে অবিলম্বে রক্ষা করার জন্যে বিদ্রোহী সৈনিকদের আহ্বান করা, এইভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থানের প্রসারের আইনগত উপলক্ষ যুগিয়ে দেওয়া, হাতে যা ছিল সেই সমস্ত শক্তিকে একটা ঘনবিন্যস্ত সংস্থায় সংগঠিত করা এবং, সংক্ষেপে, নিজ অবস্থান মজবুত করা এবং বিরোধীদের অবস্থান দুর্বল করার জন্যে যা পাওয়া যায় এমন সমস্ত উপায়ে দ্রুত এবং নিঃসংকোচে লাভবান হওয়া দরকার ছিল।

এই সমস্ত ব্যাপারে ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের নিষ্পাপ গণতন্ত্রীরা কাজ করেছিল ঠিক উলটোটা। সবকিছুকে আপন-আপন মর্জিমাফিক আকার লাভ করতে দিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে এই গুণধরেরা তাদের বিরোধিতা মারফত

---

* সাহসিকতা, সাহসিকতা এবং আরেকবার সাহসিকতা। — সম্পাঃ

যেগ্যুলির প্রস্তুতি চলছিল সেই সমস্ত অভ্যুত্থানমূলক আন্দোলনকে দমন পর্যন্ত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ন্যুরেম্বার্গে এমনটা করেছিলেন মিঃ কার্ল ফগ্‌ট। প্রুশীয় সরকারের নির্মম হিংস্রতার বিরুদ্ধে মৃত্যু-পরবর্তী ভাবালু প্রতিবাদ করা ছাড়া অন্য কোন সাহায্য না করে তারা স্যাক্সনির, রাইনীয় প্রাশিয়ার, ওয়েস্টফালিয়ার অভ্যুত্থানকে দমিত হতে দিয়েছিল। দক্ষিণ জার্মান অভ্যুত্থানের সঙ্গে তারা একটা গোপন সংসর্গ বজায় রেখেছিল, কিন্তু প্রকাশ্য স্বীকৃতির সমর্থন কখনও দেয় নি। সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন সরকারগুলোর পক্ষে, তারা জানত, অথচ সরকারগুলোর চক্রান্তের বিরোধিতা করার জন্যে তারা আবেদন জানিয়েছিল তাঁর কাছে, যিনি কখনও নড়েন নি। সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা, পুরন রক্ষণপন্থীরা প্রত্যেকটা অধিবেশনে এই অক্ষম পরিষদকে উপহাস করত, তা তারা বরদাস্ত করেছিল। সাইলেসিয়ার একজন ডেপুটি এবং 'Neue Rheinische Zeitung'-এর অন্যতম সম্পাদক ভিলহেল্‌ম ভল্‌ফ তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধিকে* আইনবহির্ভূত করে দিতে — এই ডেপুটি ঠিকই বলেছিলেন, ঐ রাজ-প্রতিনিধি ছিল সাম্রাজ্যের পয়লা নম্বরের এবং সবচেয়ে মস্ত বেইমান মাত্র — তখন ঐসব গণতান্ত্রিক বিপ্লবওয়ালারা সবাই মিলে সুনীতিসম্পন্ন ক্রোধ প্রকাশ করে অবজ্ঞাধ্বনি তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল! সংক্ষেপে, তারা কথা বলে, প্রতিবাদ ঘোষণা উক্তি করেই চলেছিল, কিন্তু কিছু করার সাহস কিংবা বোধশক্তি তাদের ছিল না কখনও — যখন সরকারগুলোর প্রতি বৈরভাবাপন্ন সৈনিকেরা ক্রমাগত আরও কাছিয়ে আসছিল, আর তাদের নিজেদের নির্বাহক — সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি তাদের দ্রুত বিনাশের জন্যে রাজন্যদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। এইভাবে, এই ঘৃণ্য পরিষদ বিচারবুদ্ধির শেষ চিহ্ন পর্যন্ত খুইয়ে বসেছিল; পরিষদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিদ্রোহীরা তারা সেটাকে আর গণ্য করত না, আর শেষে যখন ঘটল কলঙ্কজনক সমাপ্তি তখন, যা আমরা দেখতে পাব, সেটার অ-সম্মানিত মৃত্যুতে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি।

লন্ডন, আগস্ট, ১৮৫২

---

* ইয়োহান। — সম্পাঃ

১৮

পেটি বুর্জোয়ারা

গত কিস্তিটিতে আমরা দেখিয়েছি, একদিকে জার্মান সরকারগুলি এবং অন্য দিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচণ্ডতা শেষে এমন মাত্রায় চড়েছিল যাতে মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে অভ্যুত্থান ফেটে পড়েছিল জার্মানির একটা মস্ত অংশে: প্রথমে ড্রেসডেনে, তারপরে ব্যাভেরীয় পেলাটিনেটে, রাইনীয় প্রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়, শেষে বাডেনে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীদের **আসল লাড়িয়ে** অংশটা, সেটা প্রথম অস্ত্রধারণ ক'রে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেটা ছিল **শহরের শ্রমিকদের** নিয়ে। সংঘর্ষ যথার্থই বেধে যাবার পরে তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে শামিল হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে গরিব মানুষদের একাংশ, খেতমজুর আর খুদে খামারীরা। পুঁজিপতি শ্রেণীর নিচকার সমস্ত শ্রেণীর নওজোয়ানদের অধিকাংশকে অন্তত কিছুকালের জন্যে বিদ্রোহী বাহিনীগুলির কাতারে দেখা যেত, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা গুরুতর আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের এই পাঁচমিশালী জটলাটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের যারা 'বোধশক্তির প্রতিনিধি' বলতে ভালবাসত সেই ছাত্ররা বিশেষত ঝাণ্ডা ছেড়ে গিয়েছিল সবার আগে, যদি না তাদের রেখে দেওয়া হয়েছিল অফিসারের পদ দিয়ে, সেজন্যে অবশ্য তাদের যোগ্যতা ছিল বিরল ক্ষেত্রেই।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিক প্রাধান্য এবং সমাজ-বিপ্লবের দিকে অগ্রগতির পথ থেকে কোন কোন প্রতিবন্ধ অপসারণের পূর্বলক্ষণ যাতে থাকে, কিংবা সমাজের অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী কিন্তু কম সাহসী শ্রেণীগুলি তদবধি যে ধারায় চলেছে তার চেয়ে স্পষ্ট-নিশ্চিত এবং বৈপ্লবিক ধারায় সেগুলি যাতে অন্তত সংলগ্ন হয়, এমন অন্য কোন অভ্যুত্থানে যেমনটা করত সেইভাবেই শ্রমিক শ্রেণী এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। ব্যাপারটার সরাসর তাৎপর্যের দিক থেকে এটা শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দ্বন্দ্ব ছিল না, এটা পুরোপুরি জেনে-বুঝেই এই শ্রেণীটি অস্ত্রধারণ করেছিল, কিন্তু আঁকড়ে ধরে ছিল নিজস্ব একমাত্র সাচ্চা কর্মনীতি: শ্রমিক শ্রেণীর নিজ স্বার্থের জন্যে সংগ্রামের অন্তত ন্যায্য ক্ষেত্রটা

খুলে না দিলে যেকোন শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চেপে বসে (১৮৪৮ সালে বুর্জোয়া শ্রেণী যা করেছিল) সেটার শ্রেণীগত আধিপত্য মজবুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না; তাছাড়া, যা-ই ঘটুক, অবস্থাটাকে এমন একটা সন্ধিক্ষণে আনা, যাতে হয় জাতি বৈপ্লবিক গতিপথে স্থাপিত হবে স্পষ্ট এবং দুর্নিবার ভাবে, নইলে বিপ্লবের আগেকার স্থিতাবস্থা যতখানি সম্ভব পুনঃস্থাপিত হবে, যাতে নতুন বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী তুলে ধরেছিল সমগ্র জাতির সত্যিকারের এবং ভালভাবে উপলব্ধ স্বার্থটাকে, বিপ্লবের ধারাটাকে শ্রমিক শ্রেণীর যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা দরকার ছিল; তখন বিপ্লব সভ্য ইউরোপের সাবেক সমাজগুলির পক্ষে ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল, তাই তেমন যেকোন সমাজ নিজের শক্তির অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব আর নিয়মিত বিকাশ সম্বন্ধে ভাবতে পারত না সেই বিপ্লব ছাড়া।

গ্রামাঞ্চলের যারা অভ্যুত্থানে শামিল হয়েছিল তারা বৈপ্লবিক তরফের বাহুবন্ধনে এসে পড়েছিল, প্রধানত অপেক্ষাকৃত বিপুল করভার এবং অংশত সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের চাপে। নিজেদের কোন উদ্যম ছাড়াই তারা ছিল অভ্যুত্থানরত অন্যান্য শ্রেণীর লেজুড়, তারা দোলায়মান ছিল একদিকে শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্য দিকে খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর মাঝে। প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কোন্ দিকে তারা ঘুরবে সেটা নির্ধারিত হয়েছিল তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থান অনুসারে। খেতমজুর সাধারণভাবে সমর্থন করেছিল শহরের শ্রমিকদের, আর পেটি বুর্জোয়াদের হাতধরাধরি করে চলার প্রবণতা ছিল খুদে খামারীদের।

এই খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর মস্ত গুরুত্ব এবং প্রভাবের কথা আমরা ইতোমধ্যে কয়েক বার উল্লেখ করেছি — এই শ্রেণীটাকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের অভ্যুত্থানের পরিচালক শ্রেণী হিসেবে ধরা যেতে পারে। জার্মানির বড় বড় শহরের কোনটা এবার আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল না বলে মাঝারি আর ছোট শহরগুলিতে সবসময়ে প্রাধান্যশালী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী আন্দোলনের অভিমুখটাকে নিজ হাতে নেবার উপায় বের করেছিল। অধিকন্তু, আমরা দেখেছি, সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জার্মান পার্লামেন্টের অধিকারের জন্যে সংগ্রামে এই বিশেষ শ্রেণীটির স্বার্থ বিপন্ন ছিল। সমস্ত বিদ্রোহী

অঞ্চলে গঠিত অস্থায়ী সরকারগুলির অধিকাংশ ছিল জনসাধারণের এই অংশটার প্রতিনিধি, কাজেই সেগুলো যতদূর এগিয়েছিল সেটা দিয়ে মোটামুটি পরিমাপ করা যেতে পারে জার্মান পেটি বুর্জোয়াদের দৌড়টা কতখানি। আমরা দেখতে পাব, পেটি বুর্জোয়ার হাতে ন্যস্ত যেকোন আন্দোলনের সর্বনাশ করার ক্ষমতা ছাড়া তাদের কিছুই নেই।

পেটি বুর্জোয়ারা বড়াই করতে দড়, কাজে অত্যন্ত অক্ষম, আর কোন ঝুঁকি নিতে বড়ই কুণ্ঠিত। এই শ্রেণীর ব্যাপার-ব্যবসায় এবং ধারের কারবারের তুচ্ছ প্রকৃতি এটার চরিত্রে উৎসাহ আর কর্মতৎপরতার ঊনতার ছাপ লাগিয়ে দিতে খুবই উপযোগী; তাই তাদের রাজনীতিক কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য তদনুযায়ী। তদনুসারে, পেটি বুর্জোয়ারা কী করতে যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে লম্বাই-চওড়াই মেরে এবং দেদার বড়াই ক'রে অভ্যুত্থানে উৎসাহ যুগিয়েছিল; তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্ষমতা হস্তগত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল; অন্য কিছু নয়, অভ্যুত্থানের ক্রিয়াফলগুলিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তারা ব্যবহার করেছিল সেই ক্ষমতা। যেখানেই সশস্ত্র সংঘাতের ফলে দেখা দিয়েছিল গুরুতর সংকটাবস্থা সেখানে পেটি বুর্জোয়াদের পক্ষে গড়ে-ওঠা বিপজ্জনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল — অস্ত্রধারণ করার জন্যে তাদের সদম্ভ আহ্বান যারা গ্রহণ করেছিল ঐকান্তিকভাবে তাদের প্রসঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত; এইভাবে তাদের নিজেদের হাতে মুঠোয় ঢুকিয়ে-দেওয়া ক্ষমতা সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত; আতঙ্কগ্রস্ত, সর্বোপরি, যে কর্মনীতিতে ব্যাপৃত হতে বাধ্য হয়েছিল, নিজেদের ক্ষেত্রে, তাদের সামাজিক অবস্থানের বেলায়, তাদের ধনদৌলতের ক্ষেত্রে সেটার পরিণতি সম্বন্ধে। তারা যেমনটা বলত তাতে অভ্যুত্থানের কর্মব্রতের জন্যে 'জীবন আর সম্পত্তির' ঝুঁকি তারা নেবে বলেই তো প্রত্যাশিত ছিল? তারা বাধ্য হয়ে অভ্যুত্থানে বিভিন্ন সরকারী পদ নিয়েছিল তো — যেখানে পরাজয় ঘটলে তাদের পুঁজি খোয়া যাবার ঝুঁকি ছিল? আর জয় হলে তারা তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত হবে, তাদের লড়িয়ে বাহিনীর প্রধান অংশটা যাদের নিয়ে গঠিত সেই বিজয়ী প্রলেতারিয়ানরা তাদের সমগ্র কর্মনীতি বানচাল করে দেবে — এটা নিশ্চিত ছিল না কি? এইভাবে চারদিক থেকে নানা বিরুদ্ধ বিপদের বেষ্টনীর মধ্যে প'ড়ে পেটি বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতাটাকে শুধু

একটা কাজেই লাগাতে জানত, সেটা হল সবকিছুকে আপতিকতার উপর ছেড়ে দেওয়া, তাতে করে অবশ্য সাফল্যের যা সামান্য সম্ভাবনা হয়ত ছিল তাও নষ্ট হয়, এবং অভ্যুত্থানের সমূহ সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে যায়। পেটি বুর্জোয়ার কর্মনীতি, বরং বলা ভাল কর্মনীতির অভাব ছিল সর্বত্র একই, কাজেই ১৮৪৯ সালের মে মাসের অভ্যুত্থানগুলো জার্মানির সর্বত্র একই ছাঁচে ঢালা।

ড্রেসডেন শহরের রাস্তায়-রাস্তায় সংগ্রাম চালু ছিল চারদিন ধরে। ড্রেসডেনের পেটি বুর্জোয়ারা, 'বারোয়ারি রক্ষিদল' লড়ে নি তো বটেই, অধিকন্তু বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের কার্যকলাপে আনুকূল্য করেছিল। এই বিদ্রোহীরাও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছিল চতুষ্পার্শ্বস্থ ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকাগুলির মেহনতীজনদের নিয়ে। তারা পেয়েছিল **একজন সুযোগ্য এবং স্থিরমস্তিষ্ক সেনাপতি — রুশী শরণার্থী মিখাইল বাকুনিন**, তিনি পরে বন্দী হয়েছিলেন, এখন তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে হাঙ্গেরিতে মুন্‌কাচ্* অন্ধকূপে। সংখ্যাবহু প্রুশীয় সৈনিকদের হস্তক্ষেপে দমন হয়েছিল এই অভ্যুত্থান।

রাইনীয় প্রাশিয়ায় যথার্থ লড়াইয়ের গুরুত্ব ছিল সামান্যই। বড় শহরগুলো ছিল সুরক্ষিত নগরদুর্গ, তাই বিদ্রোহীরা শুধু কিছু হানা-দাঙ্গাই করতে পেরেছিল। যখনই যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য জড় করা হয়েছিল অমনি সশস্ত্র বিরোধিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পেলাট্‌নেটে এবং বাডেনে হল উলটোটা — একটি সমৃদ্ধ, ফলপ্রসূ প্রদেশ, এবং একটা গোটা রাজ্য পড়েছিল বিদ্রোহীদের হাতে। অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, সৈনিক, সামরিক সরবরাহ ভাণ্ডার, সবকিছু পাওয়া গিয়েছিল ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায়। নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকেরাই শামিল হয়েছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, শুধু তাই নয়, বাডেনে তারা ছিল সর্বাগ্রবর্তী বিদ্রোহীদের মধ্যে। সাক্সনি আর রাইনীয় প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান আত্মবলিদান করেছিল এই দক্ষিণ-জার্মান আন্দোলন সংগঠনের সময় পাবার জন্যে। একটা প্রাদেশিক এবং আংশিক অভ্যুত্থানের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা হয় নি কখনও। প্যারিসে

* ইউক্রেনীয় ভাষায়: মুকাচেভো। — সম্পাঃ

বিপ্লব প্রত্যাশিত ছিল; হাঙ্গেরীয়রা তখন ভিয়েনার দ্বারদেশে; জার্মানির সমস্ত মধ্য রাজ্যে জনগণই শুধু নয়, এমনকি সৈনিকেরাও ছিল অভ্যুত্থানের প্রবল পক্ষপাতী, তারা প্রকাশ্যে অভ্যুত্থানের শামিল হবার জন্যে শুধু একটা সুযোগ চাইছিল। তবু আন্দোলনটা যেই গেল পেটি বুর্জোয়াদের হাতে অমনি সেটার সর্বনাশ হল একেবারে শুরুতেই। পেটি-বুর্জোয়া শাসকেরা, বিশেষত বাডেনের পেটি-বুর্জোয়া শাসকেরা — তাদের নেতৃত্বে ব্রেণ্টানো — কখনও ভোলে নি যে, 'আইনসম্মত' সার্বভৌম শাসক গ্র্যান্ড ডিউকের পদ আর বিশেষাধিকার জবরদখল করে তারা রাষ্ট্রদ্রোহ করছিল। মন্ত্রীর গদিগুলোতে তারা বসেছিল অন্তরে অপরাধবোধ নিয়ে। কী আশা করা যেতে পারে এমনসব কাপুরুষের কাছে? অভ্যুত্থানটাকে তারা ফেলে দিয়েছিল অকেন্দ্রীকৃত কাজেই অকার্যকর স্বতঃস্ফূর্ততার মাঝে; আন্দোলনটাকে ভোঁতা করে দেবার জন্যে, আন্দোলনকে লোকবলবর্জিত, বিনষ্ট করার জন্যে তারা যথার্থই করেছিল সাধ্যায়ত্ত সবকিছু। এবং তারা কৃতকার্য হয়েছিল, এই সাফল্যে সহায় ছিল রাজনীতিকদের সেই প্রগাঢ় বর্গটার, পেটি বুর্জোয়াদের 'গণতন্ত্রী' বীর নায়কদের সোৎসাহ ঐকান্তিক সমর্থন, এরা সত্যিই মনে করত 'দেশকে ত্রাণ করছে', যখন তারা নিজেদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে দিয়েছিল আরও চতুর বর্গের মুষ্টিমেয় লোককে, তাদের একজন ব্রেণ্টানো।

ব্যাপারটার লড়াইয়ের দিকটা: নিয়মিত ফৌজের একজন প্রাক্তন লেফটেন্যাণ্ট বাডেনের প্রধান সেনাপতি জিগেলের অধীনে যেমনটা হয়েছিল তার চেয়ে এলোমেলো, তার চেয়ে নিস্তেজ সামরিক কার্যকলাপ আর কখনও হয় নি। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছিল, খোয়ান হয়েছিল প্রত্যেকটা সুবর্ণসুযোগ, প্রত্যেকটা অমূল্য মুহূর্ত হেলাফেলায় নষ্ট করা হয়েছিল ভীমকায় কিন্তু অসাধনীয় বিভিন্ন প্রকল্প রচনায়, শেষে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রতিভাশালী পোল্ মেরোস্লাভ্স্কি, তখন ফৌজ বিশৃঙ্খল, মার-খাওয়া, নিরুৎসাহ, সেটার জন্যে যোগান অপকৃষ্ট, সেটার বিরুদ্ধে চারগুণ সংখ্যাবহু শত্রু। তার ফলে তিনি করতে পেরেছিলেন শুধু এই: ভাগহাইজেলে একটা অকৃতকার্য হলেও গৌরবময় লড়াই, চতুর পশ্চাদপসরণ, রাশতাদ-এর প্রাকার-প্রান্তে শেষ ব্যর্থ লড়াই; তারপরে তিনি পদত্যাগ করেন। প্রত্যেকটা অভ্যুত্থান-যুদ্ধে যা হয় — বাহিনীগুলি ছিল ভালভাবে তালিম-পাওয়া

সৈনিক এবং কাঁচা রংরুটদের মিশ্র, তাতে বীরত্বের পরিচয় ছিল প্রচুর, আর বৈপ্লবিক বাহিনীতে অসৈনিকোচিত, অনেক সময়ে কল্পনাতীত আতঙ্কও ছিল বিস্তর। ত্রুটিবিশিষ্ট না হয়ে পারত না, তবু সেটার আত্মপ্রসাদের কারণ ছিল এই যে, সেটাকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করতে চারগুণ সংখ্যাবহুতাও বিপক্ষের কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয় নি, কুড়ি হাজার বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অভিযানে এক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য লাগিয়ে তাদের প্রতি সামরিক দিক দিয়ে এমন সম্মান প্রদর্শন করা হল যেন লড়াইটা ছিল নেপোলিয়নের ওল্ড গার্ডের বিরুদ্ধে।

অভ্যুত্থান ফেটে পড়েছিল মে মাসে; ১৮৪৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাত সেটা দমিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে — প্রথম জার্মান বিপ্লবের অবসান ঘটল।

১৯

অভ্যুত্থানের অবসান

প্রকাশ্য অভ্যুত্থান ঘটেছিল দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানিতে; ড্রেসডেনে যুদ্ধবিগ্রহ প্রথম শুরু হওয়া থেকে রাশতাদ-এ আত্মসমর্পণ অবধি প্রথম জার্মান বিপ্লবের চূড়ান্ত অগ্নিচ্ছটা নির্বাপিত করতে সরকারগুলোর লেগেছিল দশ সপ্তাহের একটু বেশি; আর জাতীয় পরিষদ রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল, সেটার প্রস্থানের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি।

এই জাঁকাল সংস্থাটিকে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে; সেটার মর্যাদার উপর সরকারগুলোর উদ্ধত আক্রমণ, সেটার নিজেরই সৃষ্টি-করা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা এবং বিশ্বাসঘাতক অনীহা, সেটার সমর্থনে খুদে ব্যাপারী শ্রেণী এবং অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক আখেরী লক্ষ্যের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান এই সবকিছুর দরুন সংস্থাটা তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিষাদ আর হতাশা তখন চরম মাত্রায়; ঘটনাবলি সহসা এমন নির্দিষ্ট এবং চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল যাতে এই বিদ্বান বিধানকর্তাদের আসল ক্ষমতা আর প্রভাব সম্বন্ধে তাদের মোহ একেবারেই

টুটে গিয়েছিল অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যেই। সরকারগুলোর দেওয়া সংকেত অনুসারে রক্ষণপন্থীরা এই পরিষদ থেকে সরে গিয়েছিল আগেই, এই যে সংস্থাটা বিধিসম্মতভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে ছাড়া অতঃপর টিকতে পারত না। উদারপন্থীরা চূড়ান্ত গোলমেলে অবস্থা মনে করে সবকিছু খুইয়ে বসেছিল; ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। মান্য-গণ্য ভদ্রলোকেরা পিট্‌টান দিয়েছিল শ'য়ে-শ'য়ে। সদস্যসংখ্যা ৮০০ কিংবা ৯০০ থেকে দ্রুত এতই কমে গিয়েছিল যাতে তখন ১৫০ এবং কয়েক দিন পরে ১০০ জন হাজির হলেই কোরাম বলা হত। পরিষদে গোটা গণতান্ত্রিক তরফ বজায় থাকা সত্ত্বেও এমনকি অত জনকে জড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পার্লামেন্টের অবশেষের কোন্ পথে চলা উচিত সেটা ছিল বেশ স্পষ্টই। প্রকাশ্যে এবং স্থিরনিশ্চিত হয়ে অভ্যুত্থানের পক্ষে পার্লামেন্টের দাঁড়ান উচিত ছিল, এইভাবে সেটাকে বৈধতা যতখানি শক্তি যোগাতে পারত সেটা দেওয়া, এবং সঙ্গেসঙ্গেই নিজেদের প্রতিরোধব্যবস্থার জন্যে পার্লামেণ্ট এমনিভাবে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজ লাভ করতে পারত। সমস্ত লড়াই বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে তাদের তলব দিতে হত; যা বোঝাই যাচ্ছিল, যদি এই ক্ষমতা তা করতে পারতও না, চাইতও না, সেক্ষেত্রে সেটাকে তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত করে সেই জায়গায় আরও বেশি কর্মোদ্যোগী সরকার বসান উচিত ছিল। বিদ্রোহী সৈনিকদের ফ্রাংকফুর্টে আনা না গেলে (গোড়ায়, যখন জার্মান রাজ্য সরকারগুলো সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল সামান্যই, তখনও দ্বিধা করছিল, তখন সেটা করা যেতে পারত সহজেই) পরিষদ তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারত বিদ্রোহী এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে। মে মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষে স্থিরনিশ্চিত হয়ে এই সবকিছু অবিলম্বে করা হলে অভ্যুত্থান আর জাতীয় পরিষদের বিজয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত।

কিন্তু জার্মান দোকানদারিতন্ত্রের কাছে এমন স্থিরসংকল্প কর্মধারা আশা করা যায় নি। এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রীয় কর্মী মোহমুক্ত হয় নি আদৌ। যেসব সদস্য পার্লামেন্টের শক্তি আর অলঙ্ঘনীয়তায় মারাত্মক বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল — তারা আগেই চম্পট দিয়েছিল; গণতন্ত্রীরা যারা থেকে গিয়েছিল তাদের বার মাস ধরে পোষণ-করা ক্ষমতা আর মহত্ত্বের স্বপ্ন ছাড়তে রাজী করানো সহজ ছিল না। তদবধি অনুসৃত কর্মধারায়

অবিচলিত থেকে তারা নিষ্পত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে পিছিয়েই থেকেছিল — শেষে পার হয়ে গিয়েছিল সাফল্যের সমস্ত সুযোগ, অধিকন্তু পার হয়ে গিয়েছিল অন্তত যুদ্ধের কৃতিত্ব পেয়ে ডোবার যাবতীয় সুযোগ। কাজেই, যেটার পুরোদস্তুর অক্ষমতা এবং তার সঙ্গে চড়া দুরহঙ্কার করুণা আর বিদ্রূপ না জাগিয়ে পারে না তেমনি একটা কৃত্রিম, ব্যস্তবাগীশ গোছের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টায় তারা প্রস্তাবাদি, অভিভাষণ এবং অনুরোধ পাঠাতেই থাকল সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধির কাছে, যিনি সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি, আর মন্ত্রীদের কাছে, যাদের প্রকাশ্য যোগসাজশ ছিল শত্রুর সঙ্গে। স্ট্রিগাউ* থেকে ডেপুটি, 'Neue Rheinische Zeitung'-এর অন্যতম সম্পাদক এবং গোটা পরিষদে একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী **ভিলহেল্ম ভল্ফ** শেষে তাদের বললেন, তারা যা বলে তাই যদি তাদের অভিপ্রায় হয় তাহলে তারা বরং কথা বলা বন্ধ ক'রে মুখ্য দেশদ্রোহী সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধিকে অবিলম্বে আইনের বার বলে ঘোষণা করুক; তখন এই পার্লামেণ্টওয়ালা ভদ্রলোকদের সমগ্র চাপা সুনীতিসম্পন্ন বিক্ষোভ এমন সতেজে ফেটে পড়েছিল যেমনটা তারা কখনও দেখায় নি যখন সাম্রাজ্যিক সরকার গাদা গাদা অপমান চাপিয়ে দিয়েছিল তাদের উপর। তার কারণ অবশ্য এই যে, সেণ্ট পল গির্জার (৫৬) চার-দেয়ালের ভিতরে উচ্চারিত প্রথম যুক্তিযুক্ত কথা হল **ভল্ফের** উপস্থাপনাটা, কেননা এটাই ছিল ঠিক যা করণীয় সেই জিনিসটাই — এমন সাদাসিধে কথা যা ছিল সরাসরি উদ্দেশ্যের অনুযায়ী, তাতে অপমান না হয়ে পারে না সেই ভাববিলাসীদের, যারা স্থিরচিত্ত ছিল শুধু অস্থিরচিত্ততায়, যারা এত ভীরু যে কিছুই করতে পারত না, যারা চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলেছিল যে, কিছু না করে তারা করছিল ঠিক যা করণীয়। যা তাদের মনের মোহাচ্ছন্ন কিন্তু অভিপ্রেত তালগোল পাকান অবস্থাটাকে বিদ্যুৎচমকের মতো সাফ করে দেয় এমন প্রত্যেকটা কথা, যেটাকে তারা যথাসম্ভব স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে নিতে জিদ ধরে ছিল সেই গোলকধাঁধা থেকে তাদের বের করে আনার উপযোগী প্রত্যেকটা

---

* পোলীয় নাম: স্ত্শেগম্। — সম্পাঃ

সহায়ক পরামর্শ, বাস্তবে সবকিছু যেভাবে বিদ্যমান সে সম্বন্ধে প্রত্যেকটা স্পষ্ট ধারণা তাদের কাছে অবশ্য ছিল এই সার্বভৌম পরিষদের মর্যাদাহানিকর।

সমস্ত প্রস্তাব, আবেদন-নিবেদন, কৈফিয়ত তলব আর ঘোষণা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফুর্টের এই মান্য-গণ্য ভদ্রলোকদের অবস্থান অসমর্থনীয় হয়ে পড়ার স্বল্পকাল পরেই তারা হঠে গিয়েছিল, কিন্তু কোন বিদ্রোহী এলাকায় নয়, সেটা হত তাদের পক্ষে বড্ড বেশি স্থিরসংকল্প পদক্ষেপ। তারা গিয়েছিল স্টুটগার্টে, যেখানে ভ্যুর্টেমবের্গ সরকার প্রতীক্ষমাণ নিরপেক্ষতা গোছের কিছু বজায় রেখেছিল। অবশেষে সেখানে তারা ঘোষণা করেছিল যে, সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি তাঁর ক্ষমতা খুইয়েছিলেন, আর সেখানে তারা নিজেদের সংস্থা থেকে নির্বাচিত করেছিল পাঁচ-জনের রাজ-প্রতিনিধিত্ব। এই রাজ-প্রতিনিধিত্ব সঙ্গে সঙ্গে জারি করেছিল স্বেচ্ছা-সৈনিকদল সম্বন্ধে আইন, সেটাকে যথার্থই যথাবিধি পাঠান হয়েছিল জার্মানির সমস্ত সরকারের কাছে। তাদের, পরিষদের সেই ঘোর শত্রুদেরই হুকুম করা হয়েছিল সেটার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে সৈন্য দিতে! এইভাবে জাতীয় পরিষদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে একটা ফৌজ গঠন করা হয়েছিল — অবশ্য শুধু কাগজপত্রে। বিভিন্ন ডিভিশন, ব্রিগেড, রেজিমেণ্ট, ব্যাটারি, সবকিছুর বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। বাস্তবতা ছাড়া কিছুরই অভাব ছিল না: সেই ফৌজের অস্তিত্ব দান করা হয় নি কখনও।

জাতীয় পরিষদের কাছে এসেছিল একটা শেষ কর্ম-পরিকল্পনা। দেশের সমস্ত জায়গা থেকে গণতন্ত্রী জনসাধারণ ডেপুটেশন পাঠিয়ে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল, তারা তাগিদ দিয়েছিল নিষ্পত্তিকর কার্যকরণের জন্যে। ভ্যুর্টেমবের্গ সরকারের মতলবটা কী সেটা জেনে ঐ সরকারটাকে বিদ্রোহী প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রকাশ্য এবং সক্রিয় অংশীদার হতে বাধ্য করতে জাতীয় পরিষদকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল জনসাধারণ। কিন্তু বৃথাই। স্টুটগার্টে যাওয়াতেই জাতীয় পরিষদ ভ্যুর্টেমবের্গ সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তে চলে গিয়েছিল। ডেপুটিরা সেটা বুঝল, তাই তারা জনগণের মধ্যে আলোড়নে বাধা দিল। প্রভাবের যে আখের অবশেষ হয়ত বজায় রাখতে পারত তাও তারা খোয়াল এইভাবে। অবজ্ঞাভাজন হল তারা — অবজ্ঞার উপযুক্ত পাত্রই তারা ছিল, আর প্রাশিয়া এবং সাম্রাজিক রাজ-প্রতিনিধির চাপে পড়ে

ভ্যুর্টেমবের্গ সরকার গণতান্ত্রিক প্রহসনে যবনিকাপাত করল: যেখানে পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসত সেই কামরাটা বন্ধ করে দিল ১৮৪৯ সালের ১৮ জ্বন, আর রাজ-প্রতিনিধিত্বের সদস্যদের দেশ ছেড়ে যেতে হ্বকুম করল।

তারপরে তারা গিয়েছিল বাডেনে — বিদ্রোহীদের শিবিরে, কিন্তু তখন সেখানে তারা অকেজো-অনবশ্যক। কেউ তাদের গণ্য করে নি। তবে রাজ-প্রতিনিধিত্ব সার্বভৌম জার্মান জনগণের তরফে সেটার উদ্যম দিয়ে দেশোদ্ধার করেই চলেছিল। যেকেউ সেটার কাছ থেকে **পাস্‌পোর্ট** নিতে চায় তাকে তা দিয়ে সেটা বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করেছিল। যখন সময় ছিল তখন ভ্যুর্টেমবের্গের ঠিক যেসব এলাকার সক্রিয় সহায়তা সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেইসব এলাকাকেই বিদ্রোহী করাবার জন্যে তারা বিভিন্ন ইস্তাহার ছেড়েছিল আর পাঠিয়েছিল কমিসারদের, তাতে অবশ্য কোন ফল হয় নি। এখন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে রাজ-প্রতিনিধিত্বের কাছে অন্যতম কমিসার মিঃ রোয়েসলারের (ওয়েল্‌স* থেকে সদস্য) পাঠান একটা ম্বলে বিবরণ, সেটার বিষয়বস্তু কিছ্বটা বিশেষকই বটে। এটার তারিখ হল — স্টুটগার্ট, ৩০ জ্বন, ১৮৪৯। অর্থের নিষ্ফল সন্ধানে এইসব কমিসারের জনা-ছয়েকের অভিযান বর্ণনা করার পরে তিনি তখনও নিজের কাজে লেগে না যাবার একগ্বচ্ছ ওজর দেন, তারপরে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া আর ভ্যুর্টেমবের্গের মধ্যে সম্ভাব্য মতভেদ এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে খ্ববই গ্বর্বতর য্বক্তি বিবৃত করেন। এটা নিয়ে সম্যক বিচার বিবেচনা করে তিনি কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পেঁছন যে, স্বযোগ-সম্ভাবনা আর নেই। তথ্যাদি জ্ঞাপন করার জন্যে বিশ্বস্ত লোকেদের বিভিন্ন চৌকি, আর ভ্যুর্টেমবের্গ মন্ত্রিসভার মতিগতি এবং সৈন্যদের গতিবিধির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাব তিনি তোলেন তারপরে। এই চিঠি কখনও সেটার ঠিকানায় পেঁছয় নি, কেননা এটা লেখার সময়ে 'রাজ-প্রতিনিধিত্ব' ইতোমধ্যে প্বরোপ্বরি চলে গিয়েছিল 'বৈদেশিক বিভাগে', অর্থাৎ স্বইজারল্যাণ্ডে; আর বেচারা মিঃ রোয়েসলার যখন মাথা ঘামাচ্ছিলেন একটা

---

* পোলীয় নাম: ওলেস্‌নিৎসা। — সম্পাঃ

ষষ্ঠ শ্রেণীর রাষ্ট্রের জাঁদরেল মন্ত্রিসভার মতিগতি নিয়ে তখন প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া এবং হেসে'র একলক্ষ সৈন্য রাশতাদ-এর প্রাকারের সামনে শেষ লড়াইয়ে সমগ্র ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছিল ইতোমধ্যে।

এইভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল জার্মান পার্লামেণ্ট, আর সেটার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রথম এবং শেষ সৃষ্টি। জার্মানিতে বাস্তবিকই একটা বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রথম নিদর্শন হল এই পার্লামেণ্ট আহ্বান করা; এই, প্রথম আধুনিক জার্মান বিপ্লবের যতকাল অবসান ঘটে নি ততকাল এটা বিদ্যমান ছিল। পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভাবাধীনে গ্রামাঞ্চলের খণ্ডছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি, যাদের বেশির ভাগ সবে জেগে উঠছিল সামন্ততন্ত্রের আমলের মূক অবস্থা থেকে, তাদের মনোনীত এই পার্লামেণ্ট ১৮২০-১৮৪৮ সালের সমস্ত নামজাদা জনপ্রিয় মানুষকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমবেত করে পরে তাদের একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এখানে জড় হয়েছিল বুর্জোয়া উদারপন্থার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। নানা অবাককাণ্ড আশা করেছিল বুর্জোয়ারা, কিন্তু নিজেদের এবং নিজেদের প্রতিনিধিদের কলঙ্কিত করেছিল তারা। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের পুঁজিপতি শ্রেণী অন্য যেকোন দেশের চেয়ে কঠোরভাবে পরাস্ত হয়েছিল জার্মানিতে। প্রথমে জার্মানির পৃথক পৃথক প্রত্যেকটা রাজ্যে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ, পরাস্ত এবং রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল, আর তারপরে বিপর্যস্ত, অপদস্থ, ধিক্কৃত করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় জার্মান পার্লামেণ্টে। বুর্জোয়াদের যা নিয়ম-নীতি, রাজনীতিক উদারপন্থা, সেটা রাজতান্ত্রিক কিংবা প্রজাতান্ত্রিক যেকোন রূপের শাসনের আমলে হোক, তা জার্মানিতে চিরকাল অসম্ভব।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে বরাবর যে অংশটা ছিল সরকারী প্রতিপক্ষের নেতৃত্বে, অর্থাৎ গণতন্ত্রীরা, যারা ছিল খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর এবং অংশত খামারী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি, তাদের চিরকালের মতো অপদস্থ করল জার্মান পার্লামেণ্ট সেটার অস্তিত্বের শেষবর্তী কালপর্যায়ে। ঐ শ্রেণীটা জার্মানিতে সুস্থিত সরকার গঠনের সামর্থ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিল ১৮৪৯ সালের মে আর জুন মাসে। কিভাবে সেটা ব্যর্থ হয়েছিল তা আমরা দেখেছি; সেটা ততটা নয় প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন, তার চেয়ে বেশি বরং বিপ্লব শুরু হবার পরবর্তী সমস্ত পরীক্ষাস্বরূপ আন্দোলনে

যথার্থ এবং অবিরাম ভীরুতার দরুন; সেটার ব্যবসায়ের কাজকারবারের বিশেষক অদূরদর্শী, দুর্বলচিত্ত, দোদুল্যমান মনোবৃত্তিটাকে রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রদর্শনের দরুন। ১৮৪৯ সালের মে মাসে সেটা এই কর্মধারার দরুন সমস্ত ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের আসল লড়িয়ে শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর আস্থা খুইয়েছিল। কিন্তু তবু সেটা একটা অনুকূল সুযোগ পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াপন্থী আর উদারপন্থীরা সরে যাবার পরে জার্মান পার্লামেন্ট সম্পূর্ণভাবেই ছিল সেটার হাতে। গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টি ছিল সেটার সপক্ষে; বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর রাজ্যের বাহিনীগুলির দুই-তৃতীয়াংশ, প্রুশীয় বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ, প্রুশীয় লান্ডভেয়ারের (রিজার্ভ বা স্বেচ্ছা-সৈনিকদল) অধিকাংশ সেটার সঙ্গে শামিল হতে প্রস্তুত ছিল — যদি সেটা শুধু কাজ করত স্থিরসংকল্প হয়ে এবং অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি থেকে উদ্ভূত সাহসের সঙ্গে। কিন্তু এই শ্রেণীটার পরিচালক রাজনীতিকেরা তাদের অনুগামী পেটি বুর্জোয়াদের বিপুল অংশের চেয়ে বেশি স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। তারা ছিল মোহাচ্ছন্ন, ইচ্ছাপূর্বক বজায় রাখা বিভ্রমগুলোর প্রতি একান্ত আসক্ত, সহজবিশ্বাসী, প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্থিরসংকল্প হয়ে ব্যবস্থা করতে অপারক — এই সবই উদারপন্থীদের চেয়ে বেশি পরিমাণে, তাইই প্রতিপন্ন হল। তাদের রাজনীতিক গুরুত্বও নেমে গেল হিমাঙ্কের নিচে। কিন্তু নিজেদের মামুলি নীতিগুলিকে বাস্তবিক কার্যে পরিণত করে নি বলে তারা ছিল খুবই অনুকূল পরিস্থিতিতে, যাতে তারা সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে সক্ষম ছিল — যখন এই শেষ আশাটা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে লুই বোনাপার্টের কূদেতা ফ্রান্সে তাদের 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' সহযোগীদের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির অভ্যুত্থানের পরাজয়ে এবং জার্মান পার্লামেন্ট ছত্রভঙ্গ হওয়ায় প্রথম জার্মান বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটল। প্রতিবৈপ্লবিক জোটের

বিজয়ী সদস্যদের উপর এখন আমাদের একবার বিদায়ী দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেটা আমরা করব পরের প্রবন্ধে (৫৭)।

লণ্ডন, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫২

১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে
১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বর
মাসের মধ্যে এঙ্গেলসের লেখা

সংবাদপত্রটির বয়ান
অনুসারে ছাপা হল

'New-York Daily Tribune'
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়
১৮৫১ সালে ২৫ আর ২৮ অক্টোবর,
৬, ৭, ১২ আর ২৮ নভেম্বর
এবং ১৮৫২ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি,
৫, ১৫, ১৮ আর ১৯ মার্চ,
৯, ১৭ আর ২৪ এপ্রিল,
২৭ জুলাই, ১৯ আগস্ট,
১৮ সেপ্টেম্বর, ২ আর ২৩ অক্টোবর

স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কোলন্‌-এর সাম্প্রতিক মামলা

লণ্ডন, বুধবার, ১ ডিসেম্বর, ১৮৫২

প্রাশিয়ার কোলন-এ বিকট কমিউনিস্ট মামলা (৫৮) এবং সেটার ফল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকাগুলি মারফত আপনারা এর আগে বহু রিপোর্ট পেয়ে থাকবেন। কিন্তু যেহেতু ঐসব রিপোর্টের কোনটাই তথ্যগুলো সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণের কাছাকাছিও নয়, আর যেহেতু ইউরোপের মূলভূমিকে দাস-দশায় রাখার রাজনীতিক উপায়াদির উপর প্রবল আলোকপাত করছে এইসব তথ্য, তাই এই মামলার কথায় ফিরে আসা আমি আবশ্যক বিবেচনা করছি।

সভা-সমিতির অধিকার দলনের দরুন ইউরোপের মূলভূমিতে বৈধ সংগঠন হিসেবে দাঁড়াবার উপায় থেকে বঞ্চিত ছিল কমিউনিস্ট বা প্রলেতারিয়ান তরফ, যেমন অন্যান্য তরফও। তাছাড়া, নিজ নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত ছিলেন এর নেতারা। অথচ সংগঠন ছাড়া কোন রাজনীতিক তরফের অস্তিত্ব থাকে না; তবে উদারপন্থী বুর্জোয়া আর গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া উভয়েই তাদের সামাজিক অবস্থা, সুবিধাদি এবং তাদের লোকদের দীর্ঘকালের দৈনন্দিন সংসর্গের কল্যাণে কমবেশি পরিমাণে যোগাতে পেরেছিল সেই সংগঠন, কিন্তু তেমন সামাজিক অবস্থা আর আর্থিক সংস্থান না থাকায় প্রলেতারিয়েত অনিবার্য কারণে বাধ্য হয়ে সেটা পেতে চেষ্টা করেছে গুপ্ত সমিতি হিসেবে। এই কারণে ফ্রান্স আর জার্মানি দুই দেশেই দেখা দেয় বহু গুপ্ত সমিতি, আর ১৮৪৯ সাল থেকে বরাবর পুলিস সেগুলিকে একটার পরে একটা খুঁজে বের করে ষড়যন্ত্র বলে অভিযুক্ত করেছে। তার অনেকগুলিই ছিল সত্যিকারের ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, সরকারকে উলটে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেগুলি গড়া হয়েছিল — কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে যে ষড়যন্ত্র করবে

না সে কাপুরুষই বটে, ঠিক যেমন অন্য কোন কোন পরিস্থিতিতে তা যে করে সে মূর্খ। তবে অন্য কোন কোন সমিতি গড়া হয়েছিল ব্যাপকতর এবং আরও উন্নত উদ্দেশ্য অনুসারে, সেগুলি জানত কোন বিদ্যমান সরকার উলটে দেওয়াটা হল আসন্ন মহাসংগ্রামে একটা স্বল্পকালস্থায়ী পর্যায় মাত্র, সেগুলি ছিল তরফটার কোষকেন্দ্র, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল তরফটাকে একাট্টা রেখে প্রস্তুত করা সেই আখেরী নিষ্পত্তিকর লড়াইয়ের জন্যে, যাতে একদিন না একদিন ইউরোপে চিরকালের মতো খতম হবে শুধু 'জালিম', 'স্বৈরশাসক' আর 'জবরদখলদার'দের কর্তৃত্ব নয়, খতম হবে তাদের চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ, তাদের চেয়ে ঢের প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা — শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য।

জার্মানিতে অগ্রুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির (৫৯) সংগঠন ছিল এই ধরনের। এই সংগঠনের 'ইশতেহার'-এর (১৮৪৮ সালে প্রকাশিত) নীতিগুলি এবং 'New-York Daily Tribune' পত্রিকায় প্রকাশিত **'জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব'*** সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিতে ব্যাখ্যাত নীতিগুলি অনুসারে এই পার্টি কখনও ধারণা করে নি নিজ ভাব-ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার বিপ্লবটাকে সেটা যেকোন সময়ে এবং ইচ্ছামতো পয়দা করতে পারে। ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি পয়দা হবার কারণ এবং সেসব আন্দোলন ব্যর্থ হবার কারণগুলি নিয়ে এই পার্টি বিচার-বিশ্লেষণ করেছিল। সমস্ত রাজনীতিক সংগ্রামের মূলে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সামাজিক বিরোধ লক্ষ্য করে এই পার্টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় সেই পরিবেশটা যাতে সমাজের কোন একটা শ্রেণীর উপর জাতির সমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার এবং তাই জাতির উপর রাজনীতিক কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব পড়তে পারে এবং তা হবেই। ইতিহাস থেকে কমিউনিস্ট পার্টি দেখল — কিভাবে মধ্যযুগের ভূসম্পত্তি অধিকারীদের পরে প্রথম-প্রথম পুঁজিপতিদের অর্থঘটিত ক্ষমতা দেখা দিয়েছিল এবং তারা দখল করেছিল শাসনভার; কিভাবে স্টীম চালু হবার পর থেকে পুঁজিপতিদের ঐ অর্থপতি অংশটার সামাজিক প্রভাব আর

* এই খণ্ডে ৭-১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

রাজনীতিক কর্তৃত্বের জয়গায় এসেছিল **ম্যানুফ্যাকচারিং** পুঁজিপতিদের বেড়ে-চলা ক্ষমতা, আর কিভাবে এখন কর্তৃত্বের পালা দাবি করছে আরও দুটো শ্রেণী — পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণী। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের ব্যবহারিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় তত্ত্বের সেই বিচারধারাটা প্রতিপন্ন হল যার থেকে সিদ্ধান্ত এল যে, পেটি বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রের পালাই আসতে হবে আগে, তারপরে কমিউনিস্ট শ্রমিক শ্রেণী অবিরাম সংগ্রামের পথে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদেরকে বুর্জোয়াদের জোয়ালে জুতে রাখার মজুরি-শ্রম দাসত্ব খতম করার আশা করতে পারে।

এইভাবে জমিদানির **বিদ্যমান** সরকারগুলিকে উলটে দেবার সরাসর উদ্দেশ্য থাকতে পারত না কমিউনিস্টদের গুপ্ত সংগঠনের। এইসব সরকারকে নয়, কিন্তু এগুলোর পরে আগেপিছে যে বিদ্রোহী সরকার আসবে সেটাকে উচ্ছেদ করার জন্যে গঠিত হয় ঐ সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা তখন বিদ্যমান স্থিতাবস্থার (status quo) বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পৃথকভাবে সক্রিয় হয়ে হাত লাগাতে পারে এবং তা নিশ্চয়ই লাগাবে, কিন্তু গোপনে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট মত ছড়িয়ে ছাড়া কোন উপায়ে অমন আন্দোলনের প্রস্তুতি কমিউনিস্ট লীগের একটা উদ্দেশ্য হতে পারত না। সমিতির বেশির ভাগ সদস্য সেটার এই ভিত্তিটাকে এতই ভালভাবে বুঝত যাতে উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে কেউ এটাকে কোন প্রস্তুতি ছাড়া উপস্থিতমতো বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্রে পরিণত করলে তাদের ঝটিতি বের করে দেওয়া হত।

ধরাধামে কোন আইন অনুসারে এমন একটা সমিতিকে রাষ্ট্রদ্রোহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা যায় না। এটা যদি ষড়যন্ত্র হয়েও থাকে, তা বিদ্যমান সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এর সম্ভাব্য কোন কোন উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে। প্রুশীয় সরকার সে সম্বন্ধে অবগতও ছিল। এই কারণেই সবচেয়ে আজব এই বিচারঘটিত অদ্ভুতকর্মে কর্তৃপক্ষের অতিবাহিত আঠার মাস ধরে প্রতিবাদী এগার জনকে আটক রাখা হয়েছিল নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ভাবুন একবারটি, বন্দীদের আট মাস হাজতে আটক রাখার পরে তাঁদের আবার হাজতে পোরা হল আরও কয়েক মাসের জন্যে, 'অপরাধের কোন সাবুদ তাঁদের বিরুদ্ধে না থাকায়!' অবশেষে যখন তাঁদের হাজির করা হল জুরির এজলাসে তখনও রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক ধরনের একটা প্রত্যক্ষ

কাজ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হল না। অথচ তাঁরা অপরাধী বলে রায় দেওয়া হল — এখুনি দেখবেন সেটা কিভাবে।

সমিতির একজন বিশেষ দূত* গ্রেপ্তার হন ১৮৫১ সালের মে মাসে, তাঁর কাছে পাওয়া দলিলপত্র অনুসারে গ্রেপ্তার হন আরও কেউ কেউ। তথাকথিত চক্রান্তের শাখাপ্রশাখা খুঁজে বের করার জন্যে স্টিবার নামে জনৈক প্রুশীয় পুলিস অফিসারকে সঙ্গেসঙ্গে লণ্ডন যেতে হুকুম দেওয়া হল। সমিতি থেকে বেরিয়ে-যাওয়া উল্লিখিত লোকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাগজপত্র সে পেলও বটে; সমিতি থেকে বিতাড়িত হবার পরে তারা যথার্থই একটা ষড়যন্ত্র করেছিল প্যারিসে আর লণ্ডনে। ঐসব কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল জোড়া দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে। রয়টার নামে একটা লোককে ঘুষ দিয়ে তাকে দিয়ে সমিতির সম্পাদকের** ডেস্ক ভেঙে সেখান থেকে ঐ কাগজপত্র চুরি করান হয়েছিল। কিন্তু তাও তো কিছুই নয়। ঐ চুরি থেকে প্যারিসে তথাকথিত ফরাসী-জার্মান চক্রান্ত (৬০) আবিষ্কৃত হয়, তাতে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু মহান কমিউনিস্ট লীগ সম্বন্ধে কোন সূত্র তার থেকে বের হয় না। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, প্যারিস চক্রান্তটার পরিচালক ছিল লণ্ডনে অল্প কয়েক জন অতি-আকাঙ্ক্ষী ক্ষীণচেতা এবং রাজনীতিক chevaliers d'industrie,*** আর আগেই দণ্ডিত একজন জালিয়াত, সে তখন প্যারিসে পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করছিল****। তাদের রাজনীতিক জীবন ছিল একেবারেই নগণ্য, এই অভাবটাকে পুষিয়ে দিয়েছিল তাদের ভজানো লোকগুলোর হন্যে বুলি আর রক্তপিপাসু গলাবাজি।

প্রুশীয় পুলিসকে তখন নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্যে তল্লাশ করতে হয়েছিল। লণ্ডনে প্রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাসে তারা গুপ্ত পুলিসের একটা পুরাদস্তুর আপিস খুলেছিল। গ্রেইফ্‌ নামে একজন পুলিসের চর তার জঘন্য কাজটা চালাচ্ছিল রাষ্ট্রদূতাবাসের একজন সহদূত (অ্যাটাশে) হিসেবে — এই

---

* পিটার নটিয়ুং। — সম্পাঃ

** অ. ডিট্‌স্‌। — সম্পাঃ

*** বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী, ভাঁওতাবাজ। — সম্পাঃ

**** শেভাল। — সম্পাঃ

ব্যবস্থাটার ফলে সমস্ত প্রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাস আন্তর্জাতিক আইনের চৌহদ্দির বাইরে পড়ে যায়, যেমন ব্যবস্থা এখনও নিতে সাহস করে নি এমনকি অস্ট্রীয়রাও। তার অধীনে কাজ করত জনৈক ফ্লেয়ির, লণ্ডন ব্যবসায়কেন্দ্রের একজন ব্যাপারী, বেশকিছুটা পয়সাওয়ালা লোক, তার কিছুটা যোগাযোগ ছিল মান্যগণ্য মহলে -- জঘন্যতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাবশত যারা সবচেয়ে হীন কাজকর্ম করে সেইসব নিচ জীবদের একটি। আর-একজন চর ছিল হির্‌শ নামে ব্যবসায় মহলের জনৈক কেরানি, সে অবশ্যি হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে চর হিসেবে শনাক্ত হয়ে গিয়েছিল। লণ্ডনে কিছু কিছু জার্মান কমিউনিস্ট শরণার্থীদের মহলে সে হাজির হয়েছিল, তার আসল পরিচয় সম্বন্ধে প্রমাণাদি পাবার জন্যে তারা তাকে গ্রহণ করেছিল স্বল্পকালের জন্যে। পুলিসের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল চটপট, আর তখন থেকে মিঃ হির্‌শ উধাও। যেসব তথ্য জোগাড় করার জন্যে তাকে পয়সা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পাবার সুযোগ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও সে নিষ্ক্রিয় থাকে নি। কেনসিংটনে নিজের গুপ্তস্থানে সে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্টদের একজনেরও দেখা পায় নি, কিন্তু প্রুশীয় পুলিস যেটার কোন সূত্র পায় নি ঠিক সেই তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক সংস্থা তথাকথিত কেন্দ্রীয় কমিটির তথাকথিত বৈঠকগুলোর তথাকথিত রিপোর্ট সে বানিয়েছিল প্রতি সপ্তাহে। এইসব রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল অতি আজগুবি ধরনের; একটাও মূলনাম সঠিক ছিল না, সঠিক বানান ছিল না একটিও নামের, একজনের মুখেও সে এমন কোন কথা বসাতে পারে নি যেমনটা সে বলতে পারত। তার মনিব ফ্লেয়ির তাকে এইসব জালিয়াতিতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু 'সহদূত' গ্রেইফ্ এইসব জঘন্য ব্যাপারের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে এমনটা এখনও প্রমাণিত হয় নি। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও, প্রুশীয় সরকার ঐ সমস্ত বানানো বাজে কথাকে ধরে নিয়েছিল একেবারে পরম সত্য বলে, কিন্তু জুরির এজলাসে হাজির-করা সাক্ষ্য-সাবুদের মধ্যে এমনসব এজাহার কী তালগোল পাকান অবস্থা সৃষ্টি করেছিল সেটা ধারণা করে নিতে পারেন। মামলা শুরু হলে, আগেই উল্লিখিত পুলিস অফিসার স্টিবার সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠে হলফ করে বলল এই সমস্ত আজগুবি কথা সত্যি, আর সমানই আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে সে বলল, এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রটার পালের গোদা বলে বিবেচিত লণ্ডনের

মহলগুলির সঙ্গে চূড়ান্তভাবে ঘনিষ্ঠ একজন গুপ্তচর তার ছিল। এই গুপ্তচরটি খুবই গুপ্তই ছিল বটে, কেননা আট মাস ধরে সে কোনসিংটনে মুখ লুকিয়ে ছিল, কেননা যেসব মহলের অতি গোপন ভাবনা, কথা আর কাজ সম্বন্ধে সে নাকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ রিপোর্ট দিচ্ছিল তাদের কারও সঙ্গে পাছে সত্যিই দেখা হয়ে যায়।

মিঃ হিরশ আর মিঃ ফ্লোরির হাতে কিন্তু ছিল আরও একটা উদ্ভাবনা। তাদের পাঠান সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে তারা বানিয়েছিল (যেটার অস্তিত্ব সমর্থন করছিল প্রুশীয় পুলিস) সেই গুপ্ত সর্বোচ্চ কমিটির বৈঠকগুলির 'মূল কার্যবিবরণী পুস্তক'। আর মিঃ স্টিবার যেইমাত্র দেখলেন একই মহল থেকে আগেই পাওয়া রিপোর্টগুলোর সঙ্গে এই পুস্তক চমৎকার মিলে যাচ্ছে, অমনি তিনি সেটাকে জুরির কাছে পেশ করে হলফ করে বললেন, গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিবেচনার পরে এবং তাঁর পরিপূর্ণ প্রত্যয় অনুসারে পুস্তকখানা সাচ্চা। হিরশের রিপোর্ট-করা বেশির ভাগ আজগবি কথা প্রকাশ পায় তখনই। সেই গুপ্ত কমিটির তথাকথিত সদস্যরা যখন তাঁদের সম্বন্ধে বিবৃত জিনিসগুলো দেখলেন যা তাঁরা কখনও জানতেন না তখন তাঁরা কী অবাক হয়েছিলেন সেটা অনুমান করতে পারেন। যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল ভিলহেল্ম তাঁরা এখানে পরিচিত ছিলেন লুই কিংবা শার্লেমেন বলে; অন্য কেউ কেউ যখন ছিলেন ইংলণ্ডের অপর প্রান্তে তখন তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছিল লণ্ডনে; আরও কাউকে দিয়ে চিঠি পড়ান হয়েছিল যা তাঁরা কখনও পান নি; রিপোর্টে তাঁদের নিয়মিতভাবে একত্র করান হয়েছিল বৃহস্পতিবারে, যখন তাঁরা সপ্তাহে একবার পান-ভোজনে মিলিত হতেন বুধবারে; একজন মজুর বড় একটা লিখতেই পারতেন না, তাঁকে দেখান হল সভার কার্যবিবরণ লেখক এবং তদনুসারে তাতে সইদাতা হিসেবে; আর তাঁদের সবাইকে এমন ভাষায় কথা বলান হল যেটা প্রুশীয় পুলিস থানার ভাষা হতে পারে, কিন্তু নিজেদের দেশে দেশে সুখ্যাতি-পরিচিতিসম্পন্ন সাহিত্যিক মহলের মানুষ যাতে অধিকাংশ এমন জমায়েতের ভাষা নয় নিশ্চয়ই। আর সর্বোপরি কিছু টাকার একখানা জাল রসিদ, জালিয়াতরা নাকি ঐ পুস্তকখানা বাবত টাকাটা দিয়েছিল কল্পিত কেন্দ্রীয় কমিটির তথাকথিত সম্পাদককে। কিন্তু বেচারা হিরশের সঙ্গে একজন

খুনসুড়ে কমিউনিস্টের ভাঁওতাই ছিল শুধু এই তথাকথিত সম্পাদকের অস্তিত্বের ভিত্তি।

আনাড়ি উদ্ভাবনটা ছিল এতই কেলেংকারির ব্যাপার যা সেটার ঈপ্সিত ক্রিয়াফলের বিপরীতটাই পয়দা না করে পারে নি। যদিও প্রতিবাদীদের লন্ডনের বন্ধুরা মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি যাতে জুরির কাছে হাজির করতে পারেন তেমন সমস্ত উপায় থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছিল, যদিও প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির কাছে তাঁরা যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেগুলিকে চেপে দিয়েছিল ডাক বিভাগ, যেসব দলিলপত্র আর শপথনামা তাঁরা ঐ আইনক্ষেত্রের ভদ্রলোকদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সেগুলি যদিও সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয় নি, তবু সর্বসাধারণের ঘৃণা আর ক্রোধ ছিল এমনই যাতে সরকারী অভিশংসকেরা, শুধু তাই নয়, সেই পুস্তকের যাথার্থ্যের গ্যারান্টি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল যার হলফ-বাক্য সেই মিঃ স্টিবারও সেটাকে জালিয়াতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে পুলিস যে ধরনের অপরাধে অপরাধী ছিল তার একমাত্র উপাদান নয় এই জালিয়াতিটা। মামলা চলার সময়ে অমন আরও দু'-তিনটে ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছিল। রয়টারের চুরি-করা দলিলপত্রের মধ্যে পুলিস নানা কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাতে সেটার অর্থ বিকৃত হয়। অতি জঘন্য বাজে কথা লেখা একখানা কাগজ লেখা হয়েছিল ডঃ মার্কসের হাতের লেখার ছাঁদে, আর সেটা তাঁরই লেখা বলে চালানো হয়েছিল কিছুকাল, শেষে বাদীপক্ষ সেটাকে জালিয়াতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুলিসের জঘন্যতা একটা প্রমাণিত হলে তার জায়গায় তোলা হয়েছে নতুন আরও পাঁচ-ছ'টা, সেগুলোর স্বরূপ তখনই খুলে ধরা যায় নি, কেননা সেগুলো আসে প্রতিবাদীপক্ষের দিক থেকে অতর্কিতে, প্রমাণাদি পাওয়া দরকার ছিল লন্ডন থেকে, কিন্তু লন্ডনে কমিউনিস্ট শরণার্থীদের সঙ্গে প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির প্রত্যেকটা চিঠিপত্র তথাকথিত চক্রান্তে সহযোগ বলে ধরা হচ্ছিল প্রকাশ্য আদালতে।

গ্রেইফ্ আর ফ্লোরিকে এখানে যেভাবে দেখান হল তারা তাইই সেটা মিঃ স্টিবার নিজেই বলেছেন তাঁর সাক্ষ্যে; আর হির্শ — সে লন্ডনের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে 'কার্যবিবরণী পুস্তক' সে জাল

করেছিল হুকুমমাফিক এবং ফ্লোরির সাহায্যে, তারপরে সে ফৌজদারী অভিযোগ এড়াবার জন্যে এদেশ থেকে পালিয়ে যায়।

এই মামলা চলার সময়ে যেসব কলঙ্ককর ব্যাপার ফাঁস হয়েছিল তার ফলে সরকার খুবই কঠিন অবস্থায় পড়েছিল। জুরি যা ছিল তেমনটা রাইন প্রদেশ আগে কখনও দেখে নি। ছ'জন একেবারে বিশুদ্ধতম প্রতিক্রিয়াপন্থী অভিজাত, ফিনান্স জগতের লর্ড চার জন, দু'জন সরকারী কর্মকর্তা। ছ'সপ্তাহ ধরে তাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে গাদা-করা সাক্ষ্য-সাবুদ খুঁটিয়ে দেখার মতো মানুষ এরা নয়, যখন অবিরাম ঢাক পিটিয়ে তাদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে, প্রতিবাদীরা ছিল একটা ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের সর্দার, পবিত্র সবকিছু — মালিকানা, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা, সরকার আর আইন — উলটে দিতে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল! কিন্তু তবু তার সঙ্গে সঙ্গে সরকার যদি বিশেষাধিকারী শ্রেণীগুলিকে জানিয়ে না দিত যে, এই মামলায় বেকসুর খালাসের রায় হত জুরিকে দমন করার সংকেত, যদি তাদের জানিয়ে না দেওয়া হত যে, খালাসের রায়টাকে ধরা হত সরাসর রাজনীতিক প্রদর্শন হিসেবে এবং অতি চরম বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গেও বুর্জোয়া উদারপন্থী প্রতিপক্ষের এক হতে প্রস্তুত থাকবার প্রমাণ হিসেবে, তাহলে বেকসুর খালাসের রায়ই হত। যা হল তাতে নতুন প্রুশীয় ফৌজদারী সংহিতাকে অতীত সম্পর্কে প্রয়োগ করে সরকার সাত জন বন্দীকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারল, বেকসুর খালাস হলেন মাত্র চার জন। যাঁরা অপরাধী সাব্যস্ত হলেন তাঁদের উপর কারাদণ্ডাদেশ হল তিন থেকে ছয় বছরের বিভিন্ন মেয়াদের, যা আপনারা নিশ্চয়ই খবরটা আপনাদের কাছে পেঁছবার সময়েই বিজ্ঞাপিত করেছিলেন।

১৮৫২ সালে ২৯ নভেম্বর
এঙ্গেলসের লেখা

সংবাদপত্রটির বয়ান
অনুসারে এখানে ছাপা হল

১৮৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর
'The New-York Daily Tribune'-এর
৩৬৪৫ নং সংখ্যায় ছাপা হয়

স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসন (৬১)

লণ্ডন, শুক্রবার, ১০ জুন, ১৮৫৩

...হিন্দুস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তার আল্‌প্‌স্‌, বাংলার সমভূমি যেন তার লম্বার্দি সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার অ্যাপেনাইন্স এবং সিংহল তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায় সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝেমাঝে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিতে সংহত হয়েছে, তেমনি দেখা যায় হিন্দুস্তানেও মুসলমান বা মোগল বা বৃটনদের চাপ যখন থাকে নি, তখন হিন্দুস্তানও যতগুলি বিবদমান স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে গেছে তার সংখ্যা হিন্দুস্তানের নগর এমন কি গ্রামগুলির সংখ্যার মতো। তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, হিন্দুস্তান ইতালি নয়, প্রাচ্যের আয়র্ল্যাণ্ড। এবং ইতালি ও আয়র্ল্যাণ্ড — ভোগবিলাসী এক জগতের সঙ্গে দুর্দশার এক জগতের এই বিচিত্র মিলন — তা হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ ইন্দ্রিয়াতিশয্য ও আত্মনিগ্রহী কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম, লিঙ্গম্‌ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও বায়াদেরের (দেবদাসীর) ধর্ম।

যাঁরা হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই, তবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমি স্যার চার্লস উডের মতো কুলি-খাঁর নজির দেব না। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে যখন মোগল এবং দক্ষিণে পোর্তুগীজদের উদয় হল সেই যুগটা, অথবা

মুসলিম অভিযান ও দাক্ষিণাত্যের হেপ্তার্কির যুগই*। কিংবা চাই কি, আরো পুরাকালে গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক — তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল-নির্দেশ হয়েছে, সেটা খৃষ্টীয় ধারণানুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি** এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি যে দানবীয় এক জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার কথা আমি বলছি না। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এটা নয় — এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে হলে জাভার ইংরেজ লাট স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস অতীতের ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট:

'ওলন্দাজ কোম্পানি শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়েছিল এবং আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহিনীকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার চেয়েও কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিককে মনুষ্যসম্পদ ক্রয় করার জন্যে টাকা দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয় নি। এ কোম্পানি

---

* হেপ্তার্কি (সপ্তরাজ্য) — ইংলণ্ড যখন সাতটি এঙ্গলো-স্যাক্সন রাজ্যে বিভক্ত ছিল (৬ষ্ঠ — ৮ম শতক) তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনায় ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ব্যবহৃত একটি শব্দ। উপমা হিসেবে মার্কস এই শব্দটি ব্যবহার করছেন মুসলিম অভিযানের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের (মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) সামন্ত বিখণ্ডীকরণ নির্দেশের জন্য। — সম্পাঃ

** বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি — ভারতের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের জন্য এটি গঠিত হয় ১৬০০ সালে। 'বাণিজ্য' কারবারের আড়ালে ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারত জয় করতে থাকে ও কয়েক দশকের মধ্যে তার শাসক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭—১৮৫৯ সালের ভারতীয় অভ্যুত্থানের সময় কোম্পানি তুলে দেওয়া হয় ও ইংরেজ সরকার ভারত শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। — সম্পাঃ

স্বেচ্ছাতন্ত্রের সবখানি প্রচলিত যন্ত্র প্রয়োগ করেছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি পারা যায় আদায় করার জন্যে, নিংড়ে নেবার জন্যে তাদের মেহনতের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এবং এই ভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এক সরকারজনিত কুফল বাড়িয়ে তুলত রাজনীতিকদের অভ্রান্ত সবখানি ধূর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখানি একচেটিয়া স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যন্ত্রকে পরিচালিত করে।'

হিন্দুস্থানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সবকিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উৎপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামে নি। ইংলণ্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র ভিত্তিটাই ভেঙে দিয়েছে, তার পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে ও বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল: অর্থবিভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধবিভাগ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পূর্তকর্মের বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। বিনা অপচয়ে, সমবেতভাবে জল-ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যান্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে এগিয়েছিল, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ -- এ প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব -- পূর্তকর্ম

সংগঠনের কাজ। ভূমির এই যে কৃত্রিম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসারণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গেসঙ্গেই যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই অন্যথা-বিচিত্র ঘটনাটির — কেন আমরা পালমিরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দেখি, একদা অতি উত্তমরূপে কর্ষিত গোটাগুটি এক একটা এলাকা আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটি মাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়।

পূর্বে ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পূর্তকর্মটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি, অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি —laissez faire, laissez aller* এই নীতিতে এ কৃষি পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে কৃষি এক সরকারের আমলে অবনত হচ্ছে আবার অন্য সরকারের আমলে উন্নত হচ্ছে, এ দেখতে আমরা বেশ অভ্যস্ত। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ আবহাওয়া অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, ওখানে তেমনি বদলায় ভালো মন্দ সরকার অনুসারে। সুতরাং কৃষির পীড়ন ও অবহেলা খারাপ জিনিস হলেও ভারতীয় সমাজের ওপর সেইটাই বৃটিশ অভিযানকারীদের চূড়ান্ত আঘাত বলে গণ্য না করা সম্ভব হত, যদি এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি পরিস্থিতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে নিয়মিতভাবে তাঁতী আর সুতাকাটুনির

* Laissez faire, laissez aller — কার্যকলাপের স্বাধীনতা দাও — (অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় না-হস্তক্ষেপের মতাবলম্বী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ধ্বনি)। — সম্পাঃ

অক্ষৌহিণী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে তার বহুমূল্য ধাতু। সে ধাতু পৌঁছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, ভারতীয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে — এ সমাজে অলঙ্কার-প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও সাধারণত এক জোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংটি পরাও খুব চল। নারী ও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে ভারি ভারি সোনারুপোর কঙ্কণ আর মল, এবং ঘরে দেখতে পাওয়া যায় সোনারুপোর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংলণ্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রকে বিতাড়ন করে; অতঃপর সে হিন্দুস্থানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে সুতা চালানের অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়টুকুই কিন্তু বৃটিশ আধিপত্যের সর্বনিকৃষ্ট ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মূলিত করে দিয়েছে।

এই দুটি অবস্থা — একদিকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক সর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পূর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পণ, এবং অন্যদিকে জনসমষ্টির সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বন্ধন — এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ-ব্যবস্থা — তথাকথিত **গ্রামগোষ্ঠী-ব্যবস্থার** সৃষ্টি করেছে, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে

বৃটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারী দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে:

'ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটা গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল; রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের: **পটেল** (potail) অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ চালায় — ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। **কার্নম** (kurnum) চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সবকিছু নথিবদ্ধ করে। **তৈলার** (tallier) আর **তোত্তী** (totie)– প্রথম জনের কাজ অপরাধাদির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা; অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। **সীমানাদার** — তার কাজ গ্রামের সীমা রক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পুজা-অর্চনা। গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন। পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি। এই সব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা, কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারিত নয়, উপরিকথিত দায়-দায়িত্বের কতকগুলি একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও কিছু বেশি লোক দেখা যায়। এই প্রাথমিক ধরনের পৌরশাসনের আওতায় স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে কচিৎ; এবং যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন কি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে এই সব গ্রামের অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন্ শক্তির কাছে তা গেল, কোন্ সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না — গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অপরিবর্তিতই থাকে। সেই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদে বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়।'

এই সব ছোটো ছোটো বাঁধি-গৎ ধরনের সামাজিক সত্তাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ

সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কুটির শিল্প — হাতে কাটা সুতো, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক বিশিষ্ট সমন্বয়, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাংকাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সুতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে **সামাজিক** বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায় — দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল (idyllic) গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ় ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্যমানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা ক্ষুদ্র ভূমিখন্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকান্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবে নি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অচল ও উদ্ভিদ্-সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যাব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই

সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকাশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজো যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের অধিকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে ঘোষণা করার:

'Sollte diese Qual uns quälen
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?'*

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের
১০ জুন লিখিত
'New-York Daily Tribune' পত্রিকায়
৩৮০৪ নং সংখ্যায়
১৮৫৩ সালের ২৫ জুন প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

স্বাক্ষর: **কার্ল মার্কস**

---

* 'এ নির্যাতন থেকে যদি পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্যে মনঃপীড়া? তৈমুরের শাসনের মাধ্যমে কি হয় নি আত্মার অশেষ নির্বাণ?' (গ্যেটের 'Westöstlicher Diwan', 'An Suleika' থেকে)। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল

লন্ডন, শুক্রবার, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩

আমি ভারত সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলির খতিয়ান করতে চাই এই প্রবন্ধে।

ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কী করে? মহা মোগলের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটেন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রমজাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে; — এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই! বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই — অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে

গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়: প্রশ্ন এই, তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় কি বৃটেনদের দ্বারা ভারত বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবব?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক -- পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই **হিন্দুভূত হয়ে গেছে**; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। বৃটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় লক্ষ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম সর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য — মোগল-ই-আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূরপ্রসারিত। বৃটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী বৃটিশ ড্রিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্মমুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির sine qua non*। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল সেই সমাজের পুনর্নির্মাণের এক নূতন ও শক্তিশালী কারিকা। জমিদার ও রায়তোয়ার যত ঘৃণাই হোক, তারা হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ,

---

* Conditio sine qua non — অপরিহার্য শর্ত। — সম্পাঃ

যা এশীয় সমাজের মহান অপেক্ষিত আবশ্যিকতা। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে ও কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা শাসন পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের শাসক শ্রেণীগুলির যা স্বার্থ ছিল সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল জয়, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন, এবং মিলতন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল। কিন্তু এখন অবস্থা উল্টে গেছে। মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের উপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদন-শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারতের চেয়ে বেশি আর কোথাও দেখা যায় না। ১৮৪৮ সালে ব্রিটিশ কমন্স সভার একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে,

'খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে — সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।'

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর অঞ্চলে জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য সর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত কর যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের অসাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচ-দেওয়া জমিগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেণ্ট উইলিয়মের সেনাপতি কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন:

'বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আগের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও গোলাবারুদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের এত বেশি প্রয়োজন থাকবে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।'

আমরা জানি, গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির নিজেদের পরিচালিত সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক —বাঁধি-গৎ ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে যা সৃষ্টি, ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী এমনি পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার নিম্নতম

মাত্রয় বেঁচে এসেছে। গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির এই স্বপর্যাপ্ত জাড্য ভেঙে দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ মেটাবে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। তাছাড়া,

'রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে — রেলপথের নিকটবর্তী প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে প্রথমত ভারতের বংশানুক্রমিক বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগরের পুরো যোগ্যতার পরখ হবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে' (চ্যাপম্যান, 'ভারতের তুলো ও বাণিজ্য')।

আমি জানি যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথে বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের গতিপথে যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় মেকানিকরা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যাম্পবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত **শিল্প-ক্ষমতা** বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং অঙ্ক ও

গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।' উনি বলছেন, 'এদের মেধা চমৎকার' (৬২)।

রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির উপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না — এগুলি শুধু উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব-গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যেই বৈষয়িক পূর্বসর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দীনতা ও হীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট ব্রিটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক নিঃসন্দেহে আশা করতে পারি, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার এমন কি হীনতম শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও শিষ্ট দেশবাসীরা — প্রিন্স সালতিকভের ভাষায় — 'sont plus fins et plus adroits que les italiens', যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা প্রতিতুলিত (counterbalanced), স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা ব্রিটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিরূপ।

---

* 'ইতালীয়দের চেয়ে মার্জিত ও দূরদর্শী' (৬৩)। — সম্পাঃ

উপসংহারের কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। বুর্জোয়ারা নিজেদের সম্পত্তির সমর্থক বলে দেখায়, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন কেবল দুর্নীতি দিয়ে লালসার তাল ধরা যাচ্ছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয় নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে নি — কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয় নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে ধাবমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায় নি? 'সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের' ধ্বজাধারী হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতি সংগঠিত, ও হল তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসেবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে,বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেই নিয়মগুলিকেই উদ্ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা — একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের

ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগতের এই সব বৈষয়িক সর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

কার্ল মার্ক্স কর্তৃক ১৮৫৩ সালের ২২ জুলাই লিখিত

'New-York Daily Tribune' পত্রিকায় ৩৮৪০ নং সংখ্যায় ১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **কার্ল মার্ক্স**

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

(১) 'জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব' রচনাটিতে এঙ্গেলস ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের ফলাফলের পর্যালোচনা করেছেন, আর সেই বিপ্লবের বিভিন্ন পূর্বশর্ত, বিকাশের মূল পর্বগুলি এবং বিভিন্ন শ্রেণী আর পার্টির অবস্থানের প্রগাঢ় বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী মতাবস্থান থেকে। এতে তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেছেন প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মকৌশলের মূল উপাদানগুলি, আর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেছেন।

১৮৫১-১৮৫২ সালে 'The New-York Daily Tribune'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে এই রচনাটি। মার্কস তখন আর্থনীতিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁর অনুরোধক্রমে এঙ্গেলস লিখেছিলেন এইসব প্রবন্ধ। পত্রিকাটির সরকারী সংবাদদাতা ছিলেন মার্কস, তাঁরই নামে বেরিয়েছিল প্রবন্ধগুলি। মার্কস এবং এঙ্গেলসের মধ্যে লেখা চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, শুধু তখনই জানা যায় এগুলি লিখেছিলেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৭

(২) 'In partibus infidelium' (আক্ষরিক অর্থে — 'বিধর্মীদের দেশে') — অখৃস্টান দেশে নিছক নামে মাত্র ডায়োসেসে নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের খেতাবে একটা সংযোজন। কোন একটা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিদেশে গঠিত রাজতন্ত্রীদের সরকার প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাগুলিতে প্রায়ই এই কথাটা ব্যবহার করা হয়। পৃঃ ৭

(৩) 'The Tribune' — ১৮৪১-১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র 'The New-York Daily Tribune'-এর সংক্ষেপিত নাম। ১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা দিয়েছিলেন। পৃঃ ৯

(৪) **মূলভূমি ব্যবস্থা** অথবা ইউরোপের মূলভূমি অবরোধ — ইংলণ্ডের সঙ্গে ইউরোপীয় মূলভূমির দেশগুলির বাণিজ্যের উপর ১৮০৬ সালে প্রথম নেপোলিয়নের প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই অবরোধ ভেঙে যায়। পৃঃ ১০

(৫) **১৮১৮ সালের সংরক্ষণ শুল্ক** — প্রাশিয়ার রাজ্যক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শুল্ক রহিত করা। পৃঃ ১২

(৬) Zollverein **(কাস্টম্স সম্মিলনী)** — প্রায় সমস্ত জার্মান রাজ্য নিয়ে প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে এটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৪ সালে; অভিন্ন সাধারণের কাস্টম্স চৌহদ্দি স্থাপন ক'রে এটা জার্মানির রাজনীতিক একীকরণের সহায়ক হয়েছিল। পৃঃ ১২

(৭) **সাইলেসিয়ার** তাঁতিদের ১৮৪৪ সালের ৪-৬ জুনের অভ্যুত্থান — জার্মানিতে প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রথম বড়রকমের শ্রেণীগত লড়াই — এবং ১৮৪৪ সালে জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চেক্ শ্রমিকদের অভ্যুত্থান প্রচণ্ড বলপূর্বক দমন করেছিল সরকারী ফৌজ। পৃঃ ১৫

(৮) **জার্মান কনফেডারেশন** — ১৮১৫ সালে ৮ জুন ভিয়েনা কংগ্রেসে গঠিত সংস্থা। তাতে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিত হয় এবং জার্মানির রাজনীতিক আর অর্থনীতিক বিভাগ দৃঢ় করা হয়। তখন জার্মানিতে প্রধান ভূমিকায় ছিল অস্ট্রিয়া। পৃঃ ১৭

(৯) **কনফেডারেশনের ডায়েট** — জার্মান কনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সংস্থা, সেটার অধিবেশনগুলো চলত মাইন্-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে; প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক হাতিয়ার হিসেবে এটাকে ব্যবহার করত জার্মান সরকার। পৃঃ ১৭

(১০) তথাকথিত **কাস্টম্স ইউনিয়ন** (Steuerverein) স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৪ সালের মে মাসে; এটার অন্তর্ভুক্ত ছিল জার্মান রাজ্য হানোভার, ব্রাউন্শ্ভিগ, ওল্ডেনবুর্গ এবং শাউম্বুর্গ-লিপে, এগুলি ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহান্বিত ছিল। ১৮৫৪ সাল নাগাদ এই বিচ্ছিন্নতাপন্থী সম্মিলনীটা ভেঙে যায়, এতে অংশগ্রাহীরা যোগ দেয় Zollverein-এ (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৭

(১১) ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার পাণ্ডারা — অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড আর জারতান্ত্রিক রাশিয়া — জাতিগুলির জাতীয় একীকরণ এবং স্বাধীনতার স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে বিভিন্ন লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮১৪-১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রটাকে নতুন ক'রে খণ্ড-বিখণ্ড করে। পৃঃ ১৮

(১২) ১৮৩০ সালের জ্বলাই মাসে ফ্রান্সে একটা ব্র্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল, সেটার পরে অভ্যুত্থান ঘটে বেলজিয়ম, পোল্যান্ড, জার্মানি এবং ইতালিতে। পৃঃ ১৯

(১৩) **'নবীন জার্মানি'** ('Junges Deutschland')— উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে জার্মানিতে উদ্ভূত একটা সাহিত্যিক চক্র; এটার সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকতার রচনাগ্রলিতে পেটি ব্র্জোয়াদের মধ্যে বিরোধিতার মনোভাব প্রকাশ পায়; সেগ্রলিতে ধর্মবিশ্বাস এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে বলা হত। পৃঃ ১৯

(১৪) **'পবিত্র মৈত্রী'** — বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা এবং সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার গড়া ইউরোপীয় রাজাদের প্রতিক্রিয়াশীল জোট। পৃঃ ২১

(১৫) 'Berliner politisches Wochenblatt' ('বার্লিন রাজনীতিক সাপ্তাহিক')-এর কথা বলা হচ্ছে; 'আইন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের' অন্ব্গামীদের অংশগ্রহণে ১৮৩১-১৮৪১ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাটা ছিল চ্ড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পৃঃ ২২

(১৬) **'আইন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়'** — আঠার শতকের শেষের দিকে জার্মানিতে দেখা দিয়েছিল ইতিহাস আর আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতধারাটা। পৃঃ ২২

(১৭) **লেজিটিমিস্টরা** — বংশান্ক্রমিক ব্হৎ ভূস্বামী ব্যবস্থার প্রতিনিধি 'লেজিটিমেট' (বৈধ) ব্রবোঁ রাজবংশের সমর্থকেরা; ১৮৩০ সালে এই রাজবংশ উৎখাত হয়। অর্থপতি অভিজাতকুল এবং ব্হৎ ব্র্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল শাসক অর্লিয়ান্স বংশের (১৮৩০-১৮৪৮) বির্দ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ ভুয়ো গলাবাজি ক'রে শাসক ব্র্জোয়াদের বির্দ্ধে মেহনতী জনগণের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করে। পৃঃ ২২

(১৮) 'Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe' ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্পের রাইন গেজেট') —১৮৪২ সালের ১ জান্য়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কলোন্-এ প্রকাশিত জার্মান দৈনিক। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে মার্কস এই পত্রিকায় লেখা দিতে শ্র্ করেন, আর ঐ বছরই অক্টোবর মাসে তিনি হন এটার অন্যতম সম্পাদক। পৃঃ ২৪

(১৯) **সম্মিলিত কমিশনসম্হ** — প্রাশিয়ায় প্রাদেশিক ডায়েটগ্নলি তাদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করত এইসব সামাজিক-বর্গগত পরামর্শদাতা সংস্থা। পৃঃ ২৫

(২০) 'Seehandlung' ('বহির্বাণিজ্য') — 'Preussische Seehandlungsgesell-

schaft' ('প্রুশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য কম্পানি')-র সংক্ষেপিত নাম; ১৭৭২ সালে প্রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-বাণিজ্যিক এবং ব্যাঙ্কিং সমিতিটাকে রাষ্ট্র কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিত; সমিতি মোটা মোটা টাকার ঋণ দিত সরকারকে। পৃঃ ২৫

(২১) **সম্মিলিত ডায়েট** — রাজার বন্দোবস্ত করা একটা বৈদেশিক ঋণের দায়িত্ব নেবার জন্যে ১৮৪৭ সালে এপ্রিল মাসে বার্লিনে আহুত প্রাদেশিক সাম্রাজ্যিক বর্গগত লান্ডটাখগুলির সংযুক্ত পরিষদ। লান্ডটাখ-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ বুর্জোয়াদের খুবই সীমাবদ্ধ রাজনীতিক দাবিদাওয়া মেটাতে রাজা নারাজ হওয়ায় তারা ঋণটার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, সেই কারণে ঐ বছরই জুন মাসে রাজা লান্ডটাখ ভেঙে দেন। পৃঃ ২৬

(২২) জার্মান বা 'সাচ্চা' সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের বিভিন্ন রচনার পরোক্ষ উল্লেখ; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে জার্মানিতে প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই প্রতিক্রিয়াশীল মতধারাটা। পৃঃ ২৮

(২৩) **গোথা পার্টি** — অস্ট্রিয়া বাদে সমগ্র জার্মানিকে হয়েনৎসলার্ন প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে এক করার লক্ষ্য অনুসারে ১৮৪৯ সালের জুন মাসে প্রতিবিপ্লবী বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী উদারপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। পৃঃ ৩০

(২৪) **'জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্র'** — ১৮৪৪ সালে উদ্ভূত এই ধর্মীয় আন্দোলনে শামিল হয়েছিল মাঝারি আর পেটি বুর্জোয়াদের বড় বড় স্তর; ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ভণ্ডামির মাত্রাতিরিক্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল এই আন্দোলন। 'জার্মান ক্যাথলিকরা' পোপের প্রাধান্য এবং বহু ক্যাথলিক আপ্তবাক্য আর আচার-অনুষ্ঠান মানত না এবং ক্যাথলিকতন্ত্রকে জার্মান বুর্জোয়াদের চাহিদাগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করত।

'মুক্ত সম্প্রদায়গুলো' — ১৮৪৬ সালে অফিশিয়াল প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সম্প্রদায়গুলো। এই ধর্মীয় প্রতিপক্ষতা ছিল জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার প্রতি উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের জার্মান বুর্জোয়াদের অসন্তোষ জ্ঞাপনের একটা ধরন। ১৮৫৯ সালে তারা 'জার্মান ক্যাথলিকদের' সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পৃঃ ৩২

(২৫) **ইউনিটারিয়ানরা** (একেশ্বরবাদীরা) বা অ্যান্টি-ট্রিনিটারিয়ানরা (ত্রিত্ববাদবিরোধীরা) — ষোল শতকে জার্মানিতে উদ্ভূত একটা ধর্মীয় মতধারার প্রতিনিধিরা, যারা সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণ এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের সংগ্রামের মুখপাত্র ছিল। ইউনিটারিজম ইংলন্ড আর আমেরিকায়

দেখা দেয় সতর শতকে। উনিশ শতকের ইউনিটারিয়ান মতবাদ ধর্মের বাহ্য, আচার-অনুষ্ঠানের দিকটার বিরোধিতা ক'রে জোর দেয় নৈতিক দিকটার উপর। পৃঃ ৩২

(২৬) ১৮০৬ সাল পর্যন্ত জার্মানি ছিল জার্মান জাতির তথাকথিত পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। দশম শতকে প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যটা ছিল সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা মান্যকারী বিভিন্ন সামন্ত প্রিন্স-শাসিত রাজ্য এবং স্বাধীন নগররাষ্ট্রের পরিমেল। পৃঃ ৩৩

(২৭) এক এবং অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের স্লোগান মার্কস এবং এঙ্গেলস তুলেছিলেন বিপ্লবের প্রাক্কালে 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির দাবি' রচনায়। পৃঃ ৩৪

(২৮) তথাকথিত **প্রথম ওপিয়াম যুদ্ধের** (১৮৩৯-১৮৪২) কথা বলা হচ্ছে — এটা ছিল চীনের বিরুদ্ধে বৃটেনের রাজ্যজয়ের যুদ্ধ; চীনের আধা-উপনিবেশে পরিণত হবার সূত্রপাত করে এই যুদ্ধ। পৃঃ ৩৫

(২৯) ১৮৪৬ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্রাকোভে জাতীয়-মুক্তি অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্যালিসিয়ায় ঘটেছিল একটা মস্ত কৃষক অভ্যুত্থান, সেটাকে ছুতো করে অস্ট্রিয়া সরকার পোল্যান্ডের অভিজাতকুলের বিদ্রোহ আন্দোলন দমন করেছিল। ক্রাকোভের অভ্যুত্থান দমন ক'রে অস্ট্রিয়া সরকার গ্যালিসিয়ার কৃষক বিদ্রোহও দমন করেছিল। পৃঃ ৩৬

(৩০) অস্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে ইতালির জনগণের ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে। ইতালির বৈপ্লবিক ঐক্যসাধন সম্বন্ধে আতঙ্কিত ছিল ইতালির শাসক শ্রেণীগুলো, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ঐ সংগ্রামের পরাজয় ঘটে। পৃঃ ৪৬

(৩১) ১৮৪৮ সালে ২৬ আগস্ট মালমোয়ে-তে ডেনমার্ক এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়; জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে প্রাশিয়া শ্লেজ্‌ভিগ এবং হোলস্টাইনের বিদ্রোহীদের পক্ষে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল; ঐ বিদ্রোহীরা লড়ছিল জার্মানির সঙ্গে সম্মিলনের জন্যে এবং দোনিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে নকল যুদ্ধ চালিয়ে প্রাশিয়া সাত মাস মেয়াদের কলঙ্কজনক যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিল ডেনমার্কের সঙ্গে; সেপ্টেম্বর মাসে ঐ চুক্তি ফ্রাংকফুর্ট জাতীয় পরিষদে অনুসমর্থিত হয়। যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছিল ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু ১৮৫০ সালের জুলাই মাসে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তি সই করে, তাতে ডেনমার্ক বিদ্রোহীদের দমন করতে সমর্থ হয়। পৃঃ ৩৮

(৩২) ১৭৭২ সালে প্রথম বিভাগের আগেকার পোল্যাণ্ডের সীমান্তের কথা বলা হচ্ছে; পোল্যাণ্ডের রাজ্যক্ষেত্রের বেশকিছু অংশ ১৭৭২ সালে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছিল রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির মধ্যে। পৃঃ ৬০

(৩৩) **হুস্সাইটদের যুদ্ধ** — জার্মান সামন্ত এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চেক্ জনগণের ১৪১৯-১৪৩৭ সালের জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধ। চেক্ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা ইয়ান হুস-এর নাম থেকে আসে হুস্সাইল। পৃঃ ৬২

(৩৪) মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের কোন কোন স্লাভ জাতি-উপজাতির ঐতিহাসিক ভাগ্য এবং জীবনী শক্তি সম্পর্কে এই মত ঠিক নয়। কেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিয়ে ছোট ছোট জাতিকে বড় বড় জাতির অঙ্গীভূত করার পুঁজিতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে দেখে এঙ্গেলস ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে, নিজেদের রাষ্ট্র সৃষ্টি করার জন্যে তাদের আগ্রহ এবং জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এইসব জাতি-উপজাতির বৃহৎ সম্ভাবনার কথা মনে রাখেন নি। এই মূল্যায়নের কিছুটা ভিত্তি ছিল এই যে, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে হাপস্বুর্গ সাম্রাজ্য আর রুশী জারতন্ত্রের গলাবাজির সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে জার্মান আর হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে পশ্চিমী এবং দক্ষিণ স্লাভ্দের জাতীয় আন্দোলন ব্যবহার করা হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া-জমিদারদের প্রভাবে পড়ে এই সমস্ত আন্দোলন প্রতিবিপ্লবের বাস্তব হাতিয়ারে পরিণত হয়।

পরে শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সেটার রাজনীতিক চেতনা আর সংগঠন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমেত বৈপ্লবিক আর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমস্ত ধারার খুবই অগ্রগতি ঘটেছিল। টুকরো টুকরো রাজ্যক্ষেত্র নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল; সেই সাম্রাজ্যের শিকার ছোট ছোট জাতিগুলি স্বতন্ত্র বিকাশের পথে পা বাড়িয়েছিল; সেগুলোর কোন কোন জাতি এখন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃঃ ৬৩

(৩৫) **স্লাভ কংগ্রেস** —১৮৪৮ সালে ২ জুন প্রাগে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে দেখা যায়, হাপস্বুর্গ সাম্রাজ্যের উৎপীড়িত স্লাভ লোকসমাজগুলির জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ছিল দুটো মতধারা। জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে একক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে অপারক হয় এই কংগ্রেস। কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের মধ্যে র‍্যাডিকাল বিভাগের কিছু কিছু সদস্য, যাঁরা ১৮৪৮ সালের জুন মাসের প্রাগ অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের উপর কঠোর দমন-পীড়ন চলে। নরম-উদারপন্থী বিভাগের প্রতিনিধিরা, যাঁরা প্রাগে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা ১৬ জুন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কংগ্রেসটাকে মুলতবি রাখার ঘোষণা করেন। পৃঃ ৬৪

(৩৬) জনগণের সনদ (চার্টার) গ্রহণ করাবার ব্যাপারে একখানা আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল লণ্ডনে যে গণ-মিছিলের জন্যে চার্টিস্টরা আহ্বান জানিয়েছিল সেটা পরিচালকদের অস্থিরমতি আর দোদুল্যমানতার জন্যে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সেটাকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ব্যবহার করেছিল শ্রমিকদের উপর হামলা এবং চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন শুরু করার জন্যে। পৃঃ ৬৮

(৩৭) **১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল** প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপের' দাবি করে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে যাচ্ছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে; সেটাকে থামিয়ে দিয়েছিল বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্যেই জড়ো-করা বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল। পৃঃ ৬৮

(৩৮) **১৮৪৮ সালের ১৫ মে** একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক আর হস্তশিল্পীরা ঢুকে পড়েছিল সংবিধান-সভার অধিবেশনের সভাগৃহে, তারা সংবিধান-সভা খতম হল ঘোষণা করে গড়েছিল একটা বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যরা বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল অচিরেই। ব্লাঙ্কি, বার্বে, আলবের, রাস্পাই, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন। পৃঃ ৬৮

(৩৯) **১৮৪৮ সালের ১৫ মে** নেপ্‌ল্‌সের রাজা ২য় ফার্ডিনাণ্ড একটা জন-অভ্যুত্থান দমন করেন, জাতীয় রক্ষিদল আর পার্লামেণ্ট ভেঙে দেন, এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনগণের চাপে প্রবর্তিত সংস্কারগুলি লোপ করেন। পৃঃ ৬৮

(৪০) ১৮৪৮ সালে ২৩-২৬ জুন ফরাসী বুর্জোয়াদের খুবই নির্মমভাবে দমন করা প্যারিসের শ্রমিকদের সাহসিক অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। অভ্যুত্থানটি হল প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের মধ্যে ইতিহাসের প্রথম মহাগৃহযুদ্ধ। পৃঃ ৬৯

(৪১) ১৮৪৮ সালের ১ এপ্রিল অস্ট্রিয়া সরকারের জারি করা **অস্থায়ী সংবাদপত্র আইনে** মোটা টাকা জামানত রাখলে তবেই কোন সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হত। পৃঃ ৭৩

(৪২) **১৮৪৮ সালের ২৫ এপ্রিলের সংবিধানে** এমনসব বাধানিষেধ ছিল যাতে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তির মালিকেরা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থায়ী বাসস্থান যাদের ছিল কেবল তারাই ডায়েট নির্বাচনে ভোটাধিকারী হত; এই সংবিধানে দুটো কক্ষ চালু করা হয় — নিম্নতর কক্ষ আর সেনেট, প্রাদেশিক সামাজিক-বর্গীয় প্রতিনিধি-সংস্থাগুলি বজায় রাখা হয়, আর কক্ষ-দুটোয় পাস-করা আইন বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সম্রাটকে। পৃঃ ৭৩

(৪৩) **১৮৪৮ সালের ৮ মে তারিখের নির্বাচনী আইনে** শ্রমিক, দিনমজুর এবং চাকরদের নির্বাচনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিছু-কিছু সেনেটরকে নিয়োগ করতেন সম্রাট, আর সর্বোচ্চ পরিমাণের করদাতাদের মধ্য থেকে দুই-পর্বের নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হত অন্যান্যেরা। নিম্নতর কক্ষের নির্বাচনও হত দুই পর্বে। পৃঃ ৭৩

(৪৪) **অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন** — ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডিকাল মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের নিয়ে গড়া একটা সামরিকীকৃত নাগরিক সংগঠন। পৃঃ ৭৩

(৪৫) 'Wiener Zeitung' — পুরো নাম 'Oesterreichische Kaiserische Wiener Zeitung' ('অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যিক ভিয়েনা গেজেট') — পত্রিকার কথা বলা হচ্ছে; এটা ছিল অফিশিয়াল সরকারী সংবাদপত্র, এই নামে এটার প্রকাশন আরম্ভ হয়েছিল ১৭৮০ সালে। পৃঃ ৭৬

(৪৬) **ফ্রীট্রেডাররা** — অবাধ বাণিজ্য (ফ্রী ট্রেড) এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপের সমর্থকেরা। উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে ফ্রীট্রেডারদের নিয়ে ছিল একটা বিশেষ রাজনীতিক গ্রুপ, সেটা পরে লিবারাল পার্টিতে শামিল হয়ে যায়। পৃঃ ৮৪

(৪৭) অভ্যুত্থান দমন করার জন্যে হাঙ্গেরিতে পাঠান জারতান্ত্রিক ফৌজের কাছে গ্যোর্গের পরিচালিত হাঙ্গেরীয় ফৌজ **ভিলাগোশের** নিকটে আত্মসমর্পণ করেছিল ১৮৪৯ সালের ১৩ আগস্ট। পৃঃ ৮৪

(৪৮) 'Neue Rheinische Zeitung. Organ der Democratie' ('নতুন রাইন পত্রিকা। গণতন্ত্রের মুখপত্র') — ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত কলোন্-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; মার্কস ছিলেন প্রধান সম্পাদক, এঙ্গেলস — সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। পৃঃ ৮৫

(৪৯) **ল্যাঙ্কাস্টারীয় বিদ্যালয়সমূহ** — গরিব বাপ-মায়েদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, সেখানে পারস্পরিক শিক্ষণের প্রণালী প্রয়োগ করা হত; প্রণালীটার নাম হয় একজন ইংরেজ শিক্ষক জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টারের (১৭৭৮-১৮৩১) নাম অনুসারে। পৃঃ ৮৭

(৫০) **ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বাম পক্ষ** — জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পরে আহূত জাতীয় পরিষদের পেটি-বুর্জোয়া বাম বিভাগের কথা বলা হচ্ছে; ১৮৪৮ সালে ১৮ মে মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে শুরু হয়েছিল এই পরিষদের অধিবেশন। জার্মানির রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘুচান এবং সারা জার্মানির সংবিধান রচনা করাই ছিল

সেটার প্রধান কাজ। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বাম বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন জাতীয় পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারক হয় এবং ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে স্থিরনিশ্চিত মতাবস্থান নিতে পারে নি। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে পরিষদকে চলে যেতে হয়েছিল স্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পৃঃ ৮৭

(৫১) সতর শতকের বৃটিশ বুর্জোয়া বিপ্লবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জন হ্যাম্পডেন ১৬৩৬ সালে 'জাহাজী অর্থ' কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন — ঐ কর কমন্স-সভায় অনুমোদিত হয় নি। হ্যাম্পডেনের মামলা ইংরেজ সমাজে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

বৃটিশ সরকারের চালু করা স্ট্যাম্প-কর দিতে আমেরিকানরা ১৭৬৬ সালে অস্বীকার করেছিল, আর ১৮ শতকের অষ্টম দশকে শুরু হয়েছিল বৃটিশ পণ্য বয়কট — ঘটনা দুটো হয়েছিল ইংলণ্ডের উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮৩) একটা মুখবন্ধস্বরূপ। পৃঃ ৯১

(৫২) ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের একটা পশ্চিমী প্রদেশের ভাঁদে-তে ফরাসী রাজতন্ত্রীদের চালু-করা একটা প্রতিবৈপ্লবিক বিদ্রোহ সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ; ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজতন্ত্রীরা ঐ প্রদেশের অনগ্রসর কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। পৃঃ ৯৭

(৫৩) **পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য** — ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথাভিত্তিক রোম সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া রাষ্ট্র, সেটার প্রধান শহর ছিল কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌। পরে এই রাষ্ট্রের নাম হয়েছিল বাইজান্‌টিয়াম। ১৪৫৩ সালে তুর্কী দখল পর্যন্ত সেটার অস্তিত্ব ছিল। পৃঃ ১০২

(৫৪) প্রুশীয় বুর্জোয়া মন্ত্রীদের উদ্যোগে ১৮৪৮ সালের ২১ মার্চ বার্লিনে একটা জাঁকাল রাজ-শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়েছিল। জার্মানির একীকরণের পক্ষে প্রবলভাবে মতপ্রকাশ করা হয়েছিল সেটার সঙ্গে সঙ্গে। চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্‌ম রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি করে যাবার সময়ে তাঁর একীভূত জার্মানির একটা প্রতীক ছিল কালো-লাল-সোনালী রঙের বাহুবন্ধনী, আর তিনি নকল-দেশপ্রেমিক বক্তৃতা করেছিলেন কয়েকটা। পৃঃ ১০৫

(৫৫) তথাকথিত 'সাম্রাজ্যিক সংবিধান' সংশোধনের উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। সেটার ফলে ১৮৪৯ সালের ২৬ মে প্রাশিয়া, স্যাক্সনি এবং হ্যানোভারের রাজাদের মধ্যে একটা চুক্তি ('তিন রাজার সম্মিলনী') সম্পাদিত হয়েছিল। এই

'সম্মিলনী' ছিল জার্মানিতে প্রুশীয় রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব লাভ করার একটা চেষ্টা, যেহেতু প্রাশিয়ার রাজা হতেন সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি, কিন্তু অস্ট্রিয়া আর রাশিয়ার চাপে পড়ে প্রাশিয়া ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসেই 'সম্মিলনী' ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পৃঃ ১০৮

(৫৬) ১৮৪৮ সালের ১৮ মে থেকে ১৮৪৯ সালের ৩০ মে পর্যন্ত মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে সেণ্ট পল গির্জায় সারা-জার্মান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলেছিল। পৃঃ ১২২

(৫৭) এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধটি 'The New-York Daily Tribune'-এ প্রকাশিত হয় না। মার্কসের মেয়ে এলেওনোরা মার্কস-এভেলিং প্রকাশনের জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন ১৮৯৬ সালের যে ইংরেজী সংস্করণ সেটাতে এবং কয়েকটা পরবর্তী সংস্করণে এঙ্গেলসের 'কলোন্-এর সাম্প্রতিক মামলা' রচনাটিকে (এই বইয়ের ১২৮-১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শেষ প্রবন্ধ হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, এটা ঐ সিরিজে ছিল না। পৃঃ ১২৭

(৫৮) **কোলন্-এ কমিউনিস্ট মামলা** (১৮৫২ সালে ৪ অক্টোবর - ১২ নভেম্বর) — কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রুশীয় সরকারের আয়োজিত প্ররোচনামূলক মামলা। জাল দলিল আর মিথ্যাসাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত করা আসামীদের মধ্যে সাত জনকে ৩ থেকে ৬ বছরের মেয়াদে কেল্লায় বন্দী রাখার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রুশীয় পুলিসী রাষ্ট্রের ইতর প্ররোচনামূলক পদ্ধতির মুখোস খুলে দিয়েছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। পৃঃ ১২৮

(৫৯) **কমিউনিস্ট লীগ** — মার্কস এবং এঙ্গেলসের গড়া প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন; এটা ছিল ১৮৪৭-১৮৫২ সালে। পৃঃ ১২৯

(৬০) ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভিল্লিখ্-শাপের গ্রুপের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ-কেউ গ্রেপ্তার হয়; এই গ্রুপটা ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই গ্রুপটার পেটি-বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকৌশলের দরুন প্যারিসের একটা সম্প্রদায়ের নেতা প্ররোচক-গুপ্তচর শের্ভালের সাহায্যে ফরাসী আর প্রুশীয় পুলিস তথাকথিত জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্র মামলা সাজাতে পেরেছিল। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা কুদেতার আয়োজন করার জন্যে অপরাধী বলে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রায় জারি হয়েছিল। জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলসের পরিচালিত কমিউনিস্ট লীগ অংশগ্রাহী বলে সেটাকে অভিযুক্ত করার জন্যে প্রুশীয় পুলিসের চেষ্টা ভেস্তে গিয়েছিল। পৃঃ ১৩১

(৬১) জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মার্কসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে পড়ে 'ভারতে বৃটিশ শাসন' এবং 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' এই প্রবন্ধ-দুটি। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতে বৃটিশ শাসনের দৃষ্টান্ত দিয়ে মার্কস প্রাচ্যের অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির উপর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ঔপনিবেশিক আধিপত্য ব্যবস্থার বিশেষক উপাদানগুলিকে খুলে ধরেছেন। বৃটেনের ভারত দখল এবং ভারতকে দাসে পরিণত করার প্রধান পর্বগুলিকে বের করে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতে ইংরেজদের দখল আর লুণ্ঠন ছিল খোদ ইংলণ্ডে ভূমি-সম্রাট আর ধনকুবেরদের শাসক-চক্রতন্ত্রের সমৃদ্ধি আর শক্তি বৃদ্ধির একটা উৎপত্তিস্থল। মার্কস এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, হয় ইংলণ্ডে প্রলেতারিয়ান বিপ্লব, নইলে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের নিজেদের মুক্তি-সংগ্রামের ফলে ভারত মুক্ত হতে পারে। পৃঃ ১৩৬

(৬২) G. Campbell. 'Modern India : a Sketch of the System of Civil Government', London, 1852, pp. 59-60 (জ. ক্যাম্পবেল, 'সমসাময়িক ভারত: সিভিল শাসন ব্যবস্থার একটি রূপরেখা', লণ্ডন, ১৮৫২, পৃঃ ৫৯-৬০)।

পৃঃ ১৪৯

(৬৩) আ. দ. সাল্তিকভ-এর বই 'Lettres sur l'Inde', Paris, 1848, p. 61. ('ভারত সম্বন্ধে পত্রাবলী', প্যারিস, ১৮৪৮, পৃঃ ৬১) থেকে মার্কস উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ১৮৫১ সালে মস্কোতে রুশ সংস্করণ বেরিয়েছিল। পৃঃ ১৪৯

নামের সূচি

জ

ড

ত

দ

ন

প

ফ

ব

ল

শ

স

সাহিত্য এবং পৌরাণিক চরিত্র